বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা

মিঠুন কুমার সাহা

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৫, ২০১৪-১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধীন এম.ফিল.
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
নভেম্বর ২০২০

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

গবেষক

মিঠুন কুমার সাহা

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৫, ২০১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, মিঠুন কুমার সাহা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম.ফিল. গবেষক (নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৫, ২০১৪-১৫)। তার গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা'। রচিত ও উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং গবেষক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন।

তার অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে মুদ্রণ বা ডিগ্রির জন্য তিনি উপস্থাপন করেননি।

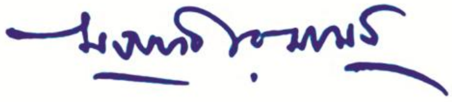

(অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা' শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব রচনা। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সাময়িকীতে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

মিঠুন কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নিবন্ধন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৮৫, ২০১৪-১৫

নিবেদন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিষয়ে যে কোনোদিন গবেষণা করব তা ২০১৪ সালের পূর্বে আমি কখনো ভাবিনি। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে আমি 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' শীর্ষক একটি কোর্স পড়েছিলাম। এই কোর্সে পাঠ শেষ হয়েছিল '২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়' বক্তব্যের (লেকচার) মধ্য দিয়ে। হয়ত সেকারণে মুক্তিযুদ্ধকে শুধু একটি যুদ্ধ (দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি) বলে ভেবে নিয়েছিলাম। সেকালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এরূপ ভাবনার দায় সম্পূর্ণ আমার। এরপর এমএ পাস করে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সাথে কাজ শুরু করার পরপরই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ যে বহুমাত্রিক, এটি যে বিরাট সংখ্যার ধারণাতীত ত্যাগ, অশ্রু, বেদনাভোগের সফল পরিণতি তা উপলব্ধি করতে পারি স্যারের লেখা পড়ে। আর তার কাছ থেকেই জানতে পারি, এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বহু পক্ষ, মুক্তিযুদ্ধের বহু দিক আজো অনালোচিত। আলাপকালে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধকে সংঘবদ্ধ সংখ্যালঘিষ্ঠ সুকৌশলে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রতিষ্ঠা করতে মাঠের কর্মীদের ভূমিকা তুলে ধরতে হবে।' সেক্ষণ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণায় আমার আগ্রহ জন্মে। ২০১৪ সালের দ্বিতীয় ভাগে কোনো একদিন ড. মামুনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থগুলো দেখছিলাম। তিনি তখন লিখছিলেন। কাদের সিদ্দিকী'র *স্বাধীনতা '৭১* গ্রন্থটি আমি দেখছি খেয়াল করে স্যার টেবিল ছেড়ে উঠে এসে বললেন, "মুক্তিযুদ্ধে এরূপ আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করতে পার। এ বিষয়টি অনেককে দিয়েছিলাম, কেউ করেনি। তুমি পারলে দেখ। এরা মুক্তিযুদ্ধের unsung hero।" এরপর গবেষণার একটি কাঠামো স্যার আমাকে দিলেন। তার কথামতো আগ্রহ নিয়ে আমি এ বিষয়টি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। অবশেষে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হলো 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা'।

এই গবেষণাকর্মের প্রতিটি পর্যায়ে যার উপদেশ, উৎসাহ ও নির্দেশনা আমার সহায় হয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন। তিনি সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণায় আমাকে উদ্বুদ্ধ ও ঋদ্ধ করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণার সার্বিক বিষয়ে তিনি আমাকে একান্তভাবে সহায়তা করেছেন এবং অভিসন্দর্ভের অধ্যায়গুলো যত্ন সহকারে পড়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার প্রতি তার আস্থা আমাকে স্বাধীনভাবে অভিসন্দর্ভ রচনায় সাহায্য করেছে। তার এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাকর্মকে সফল রূপ দিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সহযোগিতা পেয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং গবেষণার খোঁজখবর নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সর্বক্ষণ তাগিদ এবং পরামর্শ দিয়েছেন আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল হাসান। তার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে ঋণী লেখক ও গবেষক মামুন সিদ্দিকী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আহম্মেদ শরীফ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত ও সহযোগী অধ্যাপক ড. শহীদ কাদের চৌধুরী, বাংলা একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা রেহানা পারভীন-এর প্রতি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অভিমত, নির্দেশনা ও নানামুখি সহযোগিতা গবেষণা কর্ম সম্পাদনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা সম্পাদনে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের উৎসের সন্ধান দিয়ে, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষকবৃন্দের সাথে যোগযোগ করিয়ে দিয়ে, নিজেদের সংগৃহীত গ্রন্থ দিয়ে তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া গবেষণার প্রয়োজনে যে কোনো সময় তাদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ প্রদান করে তারা আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বিরামহীনভাবে তাগিদ দেয়ার কাজটি নিষ্ঠার সাথে করেছেন আমার বড় ভাই মিল্টন কুমার সাহা, প্রশান্ত পত্রনবীশ এবং বৌদি সরস্বতী রানী ও নীলা দে।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, মুনতাসীর মামুন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, অনুদ্বৈপায়ন স্মৃতি গ্রন্থাগার (জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই অভিসন্দর্ভ রচনার অন্যতম উৎস সাক্ষাৎকার। যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন, যারা সাক্ষাৎকারদাতার সাথে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এছাড়া বিবিধ পর্যায়ে সংখ্যাহীন ব্যক্তি বহুরকমে গবেষণাকর্মে আমাকে সহযোগিতা করেছেন যাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। তারা রইলেন আমার আন্তরিক স্মরণ ও শ্রদ্ধায়। আমাদের খুব কাছাকাছি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক, চিন্তক ও গবেষণাবান্ধব শিক্ষক আছেন যার নাম উল্লেখ করা নিষেধ। ধারণা দিয়ে ও গবেষণা ক্ষেত্রে মান্য এমন নানা বিষয় জানিয়ে তিনি গবেষণা কর্মটিকে উপকৃত করেছে। তিনি ধন্যবাদার্হ।

এম.ফিল. ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ করে মো. মাসুদুর রহমান, মো. ফয়সাল আখতার, চন্দন কুমার বিশ্বাস, শৈশব দে-কে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মো. সাইফুল হাসান শামীমকে এই অভিসন্দর্ভ কম্পোজ করার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত মানচিত্র প্রস্তুতকরণে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই গ্রাফিক ডিজাইনার মোস্তাফিজুর রহমানকে।

পরিশেষে এই গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপের সহযাত্রী- আমার বন্ধু, জীবনসঙ্গী, সহকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শান্তা পত্রনবীশ-এর কথা। তিনিই আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে একপ্রকার বাধ্য করেছেন। তার নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। সংসারের যাবতীয় কাজে তার সহযোগিতা আমার গবেষণায় আরো বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ঊর্ধ্বে। তবে আমি বিশ্বাস করি আমার যে কোনো অর্জন তার জন্য সর্বদাই গর্বের ব্যাপার।

সর্বোপরি 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি যদি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সামান্যতম অবদান রাখে এবং শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকদের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

সূচিপত্র

শব্দসংক্ষেপ ও টীকা	১-৪
ভূমিকা	৫-২৯
প্রথম অধ্যায় আঞ্চলিক বাহিনী : ঢাকা বিভাগ (যুদ্ধকালীন)	৩০-১৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায় আঞ্চলিক বাহিনী : চট্টগ্রাম বিভাগ (যুদ্ধকালীন)	১৪৫-১৮১
তৃতীয় অধ্যায় আঞ্চলিক বাহিনী : রাজশাহী বিভাগ (যুদ্ধকালীন)	১৮২-২৪৪
চতুর্থ অধ্যায় আঞ্চলিক বাহিনী : খুলনা বিভাগ (যুদ্ধকালীন)	২৪৫-৩২৪
পঞ্চম অধ্যায় উপসংহার	৩২৫-৩৩৬
মানচিত্র তালিকা	৩৩৭
গ্রন্থপঞ্জি	৩৩৮-৩৫৩

শব্দসংক্ষেপ ও টীকা

ইপিসিএএফ : EPCAF, ইস্ট পাকিস্তানসিভিলআর্মড ফোর্স। এ বাহিনীকেইপিকাপবলেও অভিহিতকরাহতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেপাকিস্তানসরকার এ বাহিনীগঠনকরে।

ইবিআর : ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। বাঙালিসদস্যদের সমন্বয়ে সৃষ্টপাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেজিমেন্ট। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানত এই রেজিমেন্টেরসদস্যদের মাধ্যমেইবাংলাদেশ সেনাবাহিনীরভ্রুণগঠিতহয়।

ইপিআর : ইস্ট পাকিস্তানরাইফেলস। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)। বর্তমানেবর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

ইপিআরটিসি : ইস্ট পাকিস্তানরাইফেলস ট্রেনিং সেন্টার

ইউওটিসি : ইউনিভার্সিটিঅফিসার্স ট্রেনিংকর্পস্। সেনাবাহিনীররিজার্ভ সৈন্য তৈরিরজন্যসাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়েরশিক্ষার্থীদেরমধ্য থেকে বাছাইকৃতদেরকেসাধারণপ্রশিক্ষণদিয়ে সৈন্য তৈরিরপ্রকল্প।

একেএফ : আজাদ কাশ্মীর ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরএকটিব্যাটালিয়ন।

এফএফ : ফ্রন্টিয়ার ফোর্স। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরএকটিব্যাটালিয়ন।

ওপি : অবজারভেশন পোস্ট বাপাহারা চৌকি।

বিওপি : বর্ডারআউট পোস্ট বাসীমান্ত চৌকি।

বিএলএফ : বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট

এমএনএ : মেম্বারঅবন্যাশনালঅ্যাসেম্বলি

এমপিএ : মেম্বারঅব প্রোভেন্সিয়ালঅ্যাসেম্বলি

র (RAW) : রিসার্চ অ্যান্ডএনালাইসিস উইং, ভারত

সিআইএ : সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সএজেন্সি, যুক্তরাষ্ট্র

সিএসপি : সেন্ট্রালসার্ভিসঅবপাকিস্তান

সিজিএস : চিফঅব জেনারেল স্টাফ

সিপিআইএম : কমিউনিস্ট পার্টি অবইন্ডিয়া-মার্কসবাদী

আইএসআই : ইন্টারসার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, পাকিস্তান

আইবি : ইন্টেলিজেন্সব্যুরো, ভারত

আর এন কাও	:	রামেশ্বরনাথ কাও
এফএফ	:	ফ্রিডমফাইটার
এমএ	:	মাস্টার অফ আর্টস
এম-এল	:	মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
এলএমএফ	:	লাইসেন্সশিয়েট মেডিক্যালফ্যাকাল্টি (কোর্স)
এলএমজি	:	লাইট মেশিনগান
এসএমজি	:	সাব মেশিনগান
এসএলআর	:	সেলফ লোডেডরাইফেল
ন্যাপ	:	ন্যাশনালআওয়ামীপার্টি
পিডিপি	:	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিকপার্টি
বিএ	:	ব্যাচেলর অফ আর্টস
বিকম	:	ব্যাচেলর অফ কমার্স
এসডিও	:	সাবডিভিশনালঅফিসার

বিশিষ্ট ও পারিভাষিকশব্দ ও সংকেতেরব্যাখ্যা

এস ফোর্স : নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ও একাদশইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টছিল এস ফোর্সেরঅধীন।

কিলোফ্লাইট : মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর একটিবিমান উইং গঠনকরাহয়। এরসাংকেতিকনাম ছিলকিলোফ্লাইট।

কিলো ফোর্স : কে ফোর্সেরঅধিনায়ক মেজরখালেদ মোশাররফআহতহওয়ায়এরকাঠামোতে পরিবর্তনএনেকিলো ফোর্স নামেনতুনএকটিবাহিনীগঠনকরাহয়।

কে ফোর্স : নিয়মিত মুক্তিবাহিনীরএকটি ব্রিগেড। কে ফোর্সেরঅধীনছিলচতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

জেড ফোর্স : নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। জেড ফোর্সেরঅধীনছিলনিয়মিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম,তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

ডিফেন্স : প্রতিরক্ষাঅবস্থান।

মুজিবব্যাটারি : মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটিছিল কে ফোর্সেরঅধীন।

রওশন আরা ব্যাটারি : মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ দল। এটিছিল জেড ফোর্সেরঅধীন।

লিসনিং পোস্ট : রণাঙ্গনে মূলঘাঁটিরঅগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র।

বাহিনী : শব্দটিসাধারণত‘দল’বা‘সৈন্যদল’ অর্থে ব্যবহারকরাহয়।

ইউনিট : unit, গুচ্ছ গুচ্ছ দলেরপ্রত্যেকটিপৃথক একক।

কমান্ড : Command, কর্তৃত্ব বানিয়ন্ত্রক অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

আর্মড : armed, 'সশস্ত্র' এবং 'অস্ত্র ও গোলাবারুদ'উভয় অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

রেকি : recce via reconnoiter, গোপননজরদারি ও যোগাযোগ।

কনভেয়ার : conveyer, পরিবহনএরসকল অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

গেরিলা : guerrilla, ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে চোরাগুপ্তাহামলাচালিয়েঅধিকতর শক্তিশালী অস্ত্রসজ্জিত সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীকেবিপর্যস্ত করতেপারেএমন যোদ্ধা।

মিলিটারি : military, আভিধানিক অর্থ 'সামরিকবাহিনী'। আলোচ্য আলোচনায় 'উগ্র সামরিক বাহিনী' অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

মিলিশিয়া : militia, অস্ত্র ব্যবহারেপ্রশিক্ষিতআধাসামরিকবাহিনী। আলোচ্য আলোচনায় 'বাংলাদেশেরমুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারীপুলিশ, ইপিআরএবংঅবাঙালিবিহারি' অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

সাইক্লোস্টাইল : cyclostyle, কলম ও স্টেনসিল পেপার ব্যবহারকরেনানাবিধ দলিলপত্রনকলকরার যন্ত্র।

বাইনোকুলার্জ : binoculars, দূরবীণ।

এ্যাম্বুশ : ambush, অতর্কিতআক্রমণেরজন্য ওত পেতে থাকা।

এমিউনিশন : ammunition, গোলাবারুদ এবংসংশ্লিষ্টসংরক্ষণাগার।

মুজাহিদ বাহিনী : ১৯৬৫ সালেরপাকিস্তান-ভারতযুদ্ধের পর পাকিস্তানসরকার এই অনিয়মিতবাহিনী গঠনকরে। এ বাহিনীবিভিন্নশ্রেণি-পেশারযুবকদের নিয়েগঠিতহয়। আধাসামরিক বাহিনীরমতোপ্রশিক্ষণদিয়েতাদের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরবিভিন্ন সেনাইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করাহয়। মুজাহিদ বাহিনীর দলনেতাদের অনারারিক্যাপ্টেনবলাহতো।

রাজাকার : শব্দটিরআভিধানিক অর্থ 'স্বেচ্ছাসেবক'। আলোচ্যআলোচনায়'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেগণহত্যা-নির্যাতনসহপূর্ব বাংলারআপামরজনসাধারণকেবলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, অগ্নিসংযোগ,লুটপাটেজড়িতএবংপাকিস্তানি সৈন্যদের সার্বিকসহায়তা প্রদানকারী অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে।

সেক্টর : মুক্তিযুদ্ধ শুরুহওয়ার পর যুদ্ধ-তৎপরতাচালানোরসুবিধার্থে প্রবাসীবাংলাদেশ সরকার সারা দেশকেকয়েকটিঅঞ্চলেভাগকরে। এ রকমপ্রতিটিযুদ্ধ-অঞ্চলকে সেক্টরবলা হতো। প্রতিটি সেক্টরের অধীনসাব-সেক্টর, নিয়মিত সেনা ও গেরিলাযোদ্ধাএবং সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগকরাহয়।

নকশাল : একটিকমিউনিস্ট আন্দোলনেরনাম। বিংশশতাব্দীরসাত দশকেরপ্রথমভাগেভারতের পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি জেলা থেকে এ আন্দোলনটিশুরুহয়েধীরেধীরে দেশটির অন্যান্য রাজ্যসমূহ যেমন-ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশেরবিভিন্ন জেলায়ছড়িয়েপড়ে। তারইধারাবাহিকতায়বাংলাদেশের জন্মলগ্নহতে অদ্যাবধিনকশাল আন্দোলনপূর্ব বাংলায় বেশসক্রিয়। বাংলাদেশেরউত্তর ও দক্ষিণঅংশসহভারতেরকর্নাটক-কেরালাঅবধিসমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমঅঞ্চলজুড়ে কৌণিকভাবেবিস্তৃত এই এলাকাটি‘রেডকরিডোর’নামেপরিচিত

দ্রষ্টব্য :আলোচ্য আলোচনায় যে সমস্ত স্থানেসালব্যতীতদিন ও মাসউল্লিখিতহয়েছে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুক্ত সালটি ১৯৭১ হিসাবেবিবেচ্য হবে।

ভূমিকা

এক

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ উভয় ক্ষেত্রে বিপুল বিজয় অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন এবং জাতীয় পরিষদের মোট ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ভোটার ছিলেন ২,৯৪,৭৯,৩৮৬ জন। তাদের মধ্যে ভোট দেন ১,৭০,০৫,১৬৩ জন, যার মধ্যে বৈধ ভোট ছিল ১,৬৪,৫৪,২৭৮টি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে মোট বৈধ ভোটের ৮৯ শতাংশ এবং জাতীয় পরিষদে মোট বৈধ ভোটের ৭৪.৯ শতাংশ লাভ করে। আবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ মোট বৈধ ভোটের ৩৯.২ শতাংশ লাভ করে যেখানে আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি লাভ করে ১৮.৬ শতাংশ ভোট।[১] নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অর্জিত পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তার ৬-দফা কর্মসূচিকে জনগণের কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। নির্বাচন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রদেশের সবকয়টি জেলায় কমপক্ষে ১১১টি নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেন। এসব ভাষণে জনগণের কাছে প্রদত্ত তার নির্বাচনি অঙ্গীকারের মূলকথা ছিল- নির্বাচনে বিজয়ী হলে আওয়ামী লীগ প্রদেশে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করবে ও কেন্দ্রে ৬-দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনা করবে।[২] পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ১৯৭০ কুমিল্লা টাউন হলের নির্বাচনি জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "ভাইরা আমার, স্মরণ রাখবেন, এবারই আমাদের শেষ যুদ্ধ- এইবার হয় আমরা বিজয়ী হব, নয়তো আমরা সংগ্রামের পথে আত্মদান করে শহিদের রক্তের দেনা শোধ করবো"।[৩] অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ এর নির্বাচনকে বাঙালির স্বার্থরক্ষার শেষ সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। এজন্যই তিনি এই নির্বাচনকে ৬-দফা'র প্রশ্নে 'রেফারেন্ডাম' বলেছিলেন এবং নির্বাচন শেষে প্রত্যাশিত গণরায়ও পেয়েছিলেন।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিধ্বস বিজয়ে বাঙালি সমাজের প্রায় প্রতিটি অংশই আন্দোলিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

> ১৯৭০ সনের সেই নির্বাচনী ফলাফল বাঙালী জাতীয়তাবাদেরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল আমার কাছে। সেদিন আওয়ামী লীগের বিজয় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত এদেশের বুদ্ধিজীবী, আমলা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ই,পি,আর, আনসারসহ সাধারণ জনগণও আওয়ামী লীগের বিজয়ে অভূতপূর্ব উল্লসিত হয়েছিল। সে মুহূর্তে আওয়ামী লীগ অতি সার্থকভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারণ এবং লালন করেছিল। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে, ক্ষেতে-খামারে, অফিস আদালতে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, নদী-সাগরে এমনকি বিদেশ বিভূঁইয়ে বসবাসরত প্রত্যেকটি বাঙালির বুক জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বেলিত-আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।[৪]

একজন সামরিক কর্মকর্তা হয়েও মেজর জলিলের উপর্যুক্ত বক্তব্য (তৎকালে সেনাব্যারাকে থেকেও) নিশ্চয়ই সমকালীন মনোভাবের প্রমাণ বহন করে।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার প্রায় দুই মাস পর ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ৩ মার্চে অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বা বিরোধী দল পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি ঢাকায় অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে অংশগ্রহণ

করবে না বলে ১৫ ফেব্রুয়ারি জানিয়ে দেয়।[৫] এই প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন করার কার্যকর উদ্যোগ না নিয়েই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করেন। অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩-৬ মার্চ সকাল ৬টা-দুপুর ২টা পর্যন্ত সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদিন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) বায়তুল মোকাররমে এক সমাবেশ পরবর্তী বিক্ষোভ মিছিল করে শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। গুলিস্থানে এক পথ সভায় এ দলের নেতা মতিয়া চৌধুরী বলেন, "আজ আর কোনো দল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ। শেখ সাহেব আপনার কাছে আমাদের আবেদন আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।"[৬] আওয়ামী লীগের ঘোষণা মোতাবেক ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩-৬ মার্চ পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ. স. ম আব্দুর রব স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বাদেও ন্যাপসহ আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়।[৭] পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তা বুঝে নিতে কারো কোনো কষ্ট হয়নি। ঢাকায় কর্মরত মার্কিন কূটনীতিক আর্চার কে ব্লাড লিখেছেন, "Mujib's specch on Sunday March 7 was more notable for what he did not say than for what he actually said" [৮] ৭ মার্চের ভাষণ শেষ হওয়ার পর ঐদিন বিকাল বেলা ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী অজয় দাশগুপ্তের নিকট থেকে ভাষণের মূলাংশ শুনে কমিউনিস্ট পার্টি নেতা কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ মন্তব্য করেছিলেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে শেখ সাহেব সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন।"[৯] এই ভাষণের দিন সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থাকা বঙ্গবন্ধুর অন্যতম হত্যাকারী লে. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ বলেছিলেন, "যুদ্ধের কোনো বিকল্প ছিল না। ... রেইসকোর্সের মিটিঙে। যদিও আমি সরকারি দায়িত্বে ছিলাম, তবে আমি সেখানে ছিলাম। তো সেখানে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের যে ইন্সপারেশন, তাদের যে ফিলিং সেটাতে মনে হচ্ছিল যে, বাংলাদেশের জনগণও তার (যুদ্ধের) জন্য প্রস্তুত।... ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ এবার স্বাধীন হবেই।"[১০]

৭ মার্চের ভাষণে প্রভাবিত বি এন পি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন, "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম।"[১১] ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল কিনা এ বিষয়ে গবেষক মোস্তফা হোসেইন লিখেছেন, "৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার কথা নেই- কারা এই প্রশ্ন তোলেন? কী তাদের শ্রেণি অবস্থান? কিন্তু, তৃণমূলের মানুষ তো ঠিকই বুঝেছিল যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষাণা দিয়েছেন।"[১২] ৭ মার্চের ভাষণের মর্মার্থ যে তৃণমূলের মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় *একাত্তরের* ৭১ গ্রন্থের এই বর্ণনায়:

> নাঠে গ্রামের সৈয়দ আবুল হোসেন গৈলা বাজারে চালের ব্যবসা করতেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তিনি শোনেন ৮ মার্চ সকালে ঢাকা রেডিওতে। ... বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর দুপুরে বাড়ি ফিরে হোসেন সাহেব স্ত্রীকে বলেন, স্বাধীনতার ডাক এসে গেছে। আর ঘরে বসে থাকার সময় নেই। তার ছিল ৬ ছেলে মেয়ে। কারো বয়স এমনকি ১০ বছরও হয়নি। তারা ২৪ মার্চ দেখল আব্বা রাইফেল হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মায়ের চোখে পানি।[১৩]

সুতরাং উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে ৭ মার্চের ভাষণ একটি পরিষ্কার বার্তা দিয়েছিল। এই বার্তা বাঙালি ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-জনতার মধ্যে

একটি যুদ্ধমন তৈরিতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের ঘোষণা আসার পর ২ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্‌ফর), কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (ভাসানী), পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী), ছাত্র ইউনিয়নসহ অসংখ্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গ লিখিতভাবে অথবা বক্তৃতায় শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এছাড়া, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকগুলো দল ভুট্টোর কূটকৌশলের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়ে দেন।[১৪] এছাড়া অধিবেশন বাতিলের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম পর্বে ৪ মার্চ থেকে প্রদেশের প্রায় সকল পর্যায়ের পেশাজীবী সংগঠন প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং ১৯ মার্চের পর থেকে আওয়ামী লীগ, বিশেষত শেখ মুজিবের সমস্ত কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ও একাত্মতা প্রকাশ করে।[১৫]

৭ মার্চের ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী সমস্ত প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলা, মহকুমা, থানা এমনকি ইউনিয়ন পর্যন্ত হয় এককভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অথবা সম্মিলিতভাবে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দলগুলোর সহযোগিতায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। দেশের প্রত্যেকটি স্থানে (শহরে, মফস্বলে এমনকি গ্রামে) সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিদিন মিছিল-সভা-সমাবেশ হতে থাকে। দেশের প্রায় প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট (বিশেষত জেলা, মহকুমা, থানা পর্যায়ে) সংগ্রাম পরিষদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-যুবকদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়ে যায়। সবকিছু মিলিয়ে স্বাধীনতার দাবিতে এ অঞ্চলের মানুষ সোচ্চার হয়। আর এই স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রধান নেতা হয়ে আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রদেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়। অথচ অসহযোগ চলাকালে সামরিক কর্তৃপক্ষের গুলিতে ও অন্যান্য নির্যাতনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে প্রায় দেড়শ সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মী নিহত হন ও প্রায় দুইশ জন আহত হয়।[১৬] অসহযোগ কালে নিহতের সংখ্যা অন্য একটি উৎসে প্রায় তিনশ বলে উল্লেখ করা হয়।[১৭] এছাড়া শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে (মূলত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য) সরকারি কল-কারখানা (বিশেষভাবে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, টাঙ্গাইল এলাকায় অবস্থিত) থেকে কত কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছিল এবং সমগ্র দেশে কী পরিমাণ রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার ও পুলিশি নির্যাতন করা হয়েছিল তার সঠিক হিসাব জানা যায় না। তারপরও সারা দেশ ইয়াহিয়া-ভুট্টো গংদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে এবং অলিখিতভাবেই দেশ চলতে থাকে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নির্দেশে। পূর্ব পাকিস্তানে চলমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা নিরসনে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে ১৬ মার্চ থেকে শেখ মুজিব ও আরো কয়েক আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকায় গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হন। একদিকে ইয়াহিয়া খান আলোচনা চালাতে থাকেন এবং অন্যদিকে অতি গোপনে মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকেই সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[১৮]

১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চললেও তা ফলাফলবিহীন থাকে। ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ জানায় যে, তাদের পক্ষ থেকে সকল বক্তব্য উপস্থাপন শেষ। এখন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পালা।[১৯] নির্বাচনের রায়ের পর প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি প্রশাসকদের সামনে মোট দুটো বিকল্প ছিল হয় "ছ-দফা কর্মসূচী অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের

লুপ্ত-প্রায় পারস্পরিক আস্থা পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করা; অথবা নির্বাচনের রায় অগ্রাহ্য করে নগ্ন সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করা।”[২০]

পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করে। তারা ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা শুরু করে। গণহত্যা শুরুর খবরে সারাদেশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এসময় দেশের মানুষের মনোভাব কেমন ছিল সে সম্পর্কে মঈদুল হাসান লিখেছেন, “ঢাকার বুকে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড শুরু করায় এবং বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স (ইপিআর) এর সদর দপ্তরের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর ঢালাও আক্রমণ চালাবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঢাকার বাইরে ঘটনা মোড় নেয় অভাবনীয় বিদ্রোহের পথে।”[২১] অচিরেই এই বিদ্রোহ রূপ নেয় সশস্ত্র গণবিদ্রোহে।

দুই

আলোচনার এই পর্যায়ে একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন হলো পূর্ব বাংলার মানুষ কেন বিদ্রোহ করল? কোন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ অপরিহার্য হলো? কোন প্রেক্ষাপটে এই প্রতিরোধ প্রচণ্ডতা পেল? মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী টেড রবার্ট গার তার *Why Men Rebel* গ্রন্থে গণবিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন।[২২] তার মূল বক্তব্য হলো, দুই ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমাজে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের সূচনা হতে পারে। প্রথমত, বাইরের কোনো শোষণকারী শক্তির নীতি ও কর্মকাণ্ডের ফলে শোষিত সমাজের মৌল সংস্কৃতির উপাদানসমূহের ওপর অভিঘাত এলে সেখানে প্রচণ্ড রকমের সমষ্টিগত প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে। একটি জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব যে সকল উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল সেই উপাদানসমূহকে মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ওপর অভিঘাত এলে সেক্ষেত্রেও প্রতিরোধ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ হবে তা খুব তীব্র বা তুলনামূলকভাবে খুব ব্যাপক হবে না, বা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে গোটা জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে আলোড়িত করে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে না। প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলোর প্রকৃতি শোষণমূলক প্রক্রিয়ার কারণে বিকৃত হলে একটি জনগোষ্ঠীর চেতনালোক বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু সেই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ সৃষ্টিতে আপেক্ষিক বঞ্চনা (Relative Deprivation) একটি অভিন্ন উপাদান হিসেবে সক্রিয় থাকে। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয় এবং তা যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তাহলে আপেক্ষিক বঞ্চনার সৃষ্টি হয়।[২৩]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত অভিমতটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে হলে আলোকপাত করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির ওপর। এক্ষেত্রে বহুল আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলা যায় যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথা ছিল ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান প্রধান এলাকাগুলোতে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই প্রস্তাবটিকে পরবর্তীকালে বিকৃত করে একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পাকিস্তান নামের অদ্ভুত রাষ্ট্রের প্রায় ১২০০ মাইলের ব্যবধানে এই রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হয় ইসলাম ধর্মকে। কিন্তু ধর্মীয় বন্ধনের কথা বলা হলেও এই বন্ধনের আড়ালে পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ শুরু হতে সময় লাগেনি। নবসৃষ্ট রাষ্ট্রের পূর্বাংশে প্রথমেই আঘাত এসেছিল ভাষা-সংস্কৃতির ওপর। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিমাংশের উপনিবেশবাদী নেতৃত্বের প্রতি

পূর্বাংশের প্রথম জনপ্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্বাংশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। এ ধারায় দ্বিতীয় প্রতিরোধ ছিল ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে বঞ্চনার সমন্বিত ফসল হিসেবে জন্ম নিয়েছিল ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন। এরপর ৬-দফা ও ১১-দফা'র মিলিত ধারায় গড়ে উঠেছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী বঞ্চনার (জনরায় মেনে ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিমের গড়িমসি) মধ্য দিয়ে পূর্বাংশে এলো ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ।

তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দুটো বক্তব্য উঠে আসে। প্রথমত, ১৯৭১ পূর্ব পশ্চিমের বিরুদ্ধে বাঙালির যে প্রতিরোধ তা প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহে অভিঘাত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণেই সে প্রতিরোধগুলোতে প্রচণ্ডতা ছিল না বা ছিল না যুগান্তকারী কোনো পরিকল্পনা। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন ছিল সেগুলো। কিন্তু ১৯৭১-এর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের গণহত্যা ছিল মৌল সাংস্কৃতিক অভিঘাত। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার বাঙালির অস্তিত্বকে মুছে ফেলার নীল নক্সা নিয়েই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি সেদিন গণহত্যা ও অন্যান্য নির্যাতন শুরু করেছিল। আর এই জন্যেই পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠেছিল প্রচণ্ড ও ব্যাপক জনপ্রতিরোধ যার নাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।[২৪]

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে সাথে সাথেই সারা দেশে প্রচণ্ড প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে বিশেষ করে যেসব এলাকায় বা শহরে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প ছিল সেসব স্থানে জনতা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে, রাস্তা খুঁড়ে বা অন্যান্য বিবিধ উপায়ে সেনা চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে। পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাদল কর্তৃক আক্রান্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স এর সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল অনেক বেশি ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত।[২৫] এসময় বাঙালি সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ের মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক ছাত্র-যুবক-জনতার অংশগ্রহণে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

প্রতিরোধ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্য-জনতা বেশ কয়েকটি স্থানে সাফল্য অর্জন করে যেমন কুষ্টিয়ার যুদ্ধ, যশোর যুদ্ধ, পাবনার যুদ্ধ। এছাড়া নরসিংদী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা-নোয়াখালী, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল, রংপুর, রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে বাঙালি সৈন্য-জনতার মিলিত শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যদল। কিন্তু এসব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ছিল মূলত অসংগঠিত, অপরিকল্পিত, সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন অথচ স্বতঃস্ফূর্ত। এ ধরনের প্রতিরোধপর্ব চলতে থাকে মোটা দাগে মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত দুটি ভাগে। প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও পশ্চাদপসরণ চলে ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাগে কিছুটা পরিকল্পিত প্রতিরোধ চলতে থাকে মে থেকে জুন পর্যন্ত।[২৬] প্রতিরোধপর্বে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথম সাংগঠনিকভাবে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ছিল ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী। এই আলোচনায় যুদ্ধের জন্য সমগ্র দেশকে ৪টি জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।[২৭]

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ মার্চ ভারতে যান ও ২ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস

দিলে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে জয়ী এমএনএ এবং এমপিএ-দের একটি অধিবেশন আহ্বান করেন কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে।[২৮] এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল গঠন করা হয় একটি সার্বভৌম সিভিল কর্তৃপক্ষ যার নাম বাংলাদেশ সরকার। মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য গঠিত হয় মন্ত্রিপরিষদ। ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার প্রথম বেতার ভাষণে বাংলাদেশে চলমান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ৮টি রণাঙ্গনের কথা উল্লেখ করেন।[২৯] ১১ এপ্রিল সরকার এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন।[৩০] জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সার্বিক যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন রণাঙ্গন তথা যুদ্ধাঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে কর্নেল ওসমানীকে সমন্বয় সভা আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১১ থেকে ১৭ জুলাই সেনা সদরদপ্তরে তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সার্বিকভাবে একটি কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি, লে. কর্নেল এম এ রবকে চীফ অফ স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। এ সভায় সম্পূর্ণ বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সেক্টরের সীমা নির্দিষ্টকরণ ও সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়। এসব কর্মকাণ্ড শেষ করতে করতে সরকার আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময় নিয়ে ফেলে।[৩১] ডিসেম্বরে বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সামরিক ফ্রন্টে বাংলাদেশ সরকার উল্লিখিত কাঠামোই বলবৎ রাখে।

বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনী এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তিকে মোকাবেলা করেছিল প্রধানত দেশের সীমান্ত এলাকায়। কিন্তু অবরুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে এপ্রিল থেকেই চলছিল সর্বাত্মক প্রতিরোধযুদ্ধ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে কারা করছিল এসব প্রতিরোধ? মূলত বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থনের বাইরে অঞ্চল ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল বেশকিছু আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দল। এসব মুক্তিযোদ্ধা দল বা বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই গড়ে উঠেছিল স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষাবধি তারা অবরুদ্ধ দেশে অবস্থান করেই শত্রুসৈন্য ও তাদের দালালদের (রাজাকার, আল বদর, আল শামস) মোকাবেলা করেছিল। অবরুদ্ধ জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করে, অসংখ্য যোদ্ধা তৈরি করে, বাংলাদেশ সরকারের অধীন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়তা করে ও নানাভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সফল করতে এসব বাহিনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের অবদান রয়ে গেছে অনালোচিত।

বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন মনে করেন যে, মুক্তিযুদ্ধ শুধু ১১টি সামরিক সেক্টরের বিষয় নয়। বরং ১১টি সেক্টর মুক্তিযুদ্ধের একটি দিক মাত্র। পাকিস্তানি দখলদার শক্তিকে (সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির মিলিত জোট অর্থে) সামরিক ফ্রন্টে মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ১১টি সেক্টরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধে আরো কয়েকটি পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এরা প্রত্যেকেই এক একটি আলাদা সেক্টর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মুক্তিযুদ্ধকালে কোটি কোটি বাঙালির মনোবল চাঙা রেখেছিল এই বেতার কেন্দ্র। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে মুক্তিযুদ্ধের '১২ নম্বর সেক্টর' হিসেবে

অভিহিত করেছেন।[৩২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেকালে সমগ্র বিশ্বে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল অন্য কোনো ঘটনা সমকালে তা পারেনি। সারা বিশ্বের সিভিল সমাজ বাংলাদেশ আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিল। বিদেশি সিভিল সমাজের সমর্থন নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে শক্তি জুগিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি সিভিল সমাজকে অধ্যাপক মামুন মুক্তিযুদ্ধের '১৩ নম্বর সেক্টর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩৩] একই সাথে মুক্তিযুদ্ধে বিপুলভারে অবদান রাখা অথচ আজও অনালোচিত আঞ্চলিক বাহিনীসমূহকে (স্থানীয় বাহিনী নামে) তিনি মুক্তিযুদ্ধের '১৪ নং সেক্টর' বলে মনে করেন।[৩৪]

মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মানেই ১১টি সেক্টরের বিজয়ের ইতিহাস। এর বাইরে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত বাংলাদেশ সরকার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, বিদেশি সিভিল সমাজ, অবরুদ্ধ দেশ, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষ, গণহত্যা-নির্যাতন প্রভৃতি সেভাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান পায়নি। আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে অনালোচিত রয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ দেশে সক্রিয় আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা।

তিন

আঞ্চলিক বাহিনী বলতে আমরা সেই সব মুক্তিযোদ্ধা দলকে বুঝি যারা ভারত সরকার, বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা (অস্ত্র, প্রযুক্তি, অর্থ, প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ও অন্যান্য লোকবল, ইত্যাদি) ব্যতীত সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে অবরুদ্ধ দেশে গড়ে উঠে এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষাবধি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির (রাজাকার, আল বদর, আল শামস, শান্তি-কমিটি, দালাল ইত্যাদি পাকিস্তানপন্থি) বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ সর্বদাই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো আঞ্চলিক বাহিনীর সামর্থ্যে ও কর্মকাণ্ডে আশ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশ সরকার বা সেক্টর কর্তৃপক্ষ আগস্টের পর থেকে নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা অধিনায়ককে সাব-সেক্টর কমান্ডার বা এরিয়া কমান্ডার বা থানা কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং এই কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো বাহিনী সামান্য অস্ত্র সহায়তাও পেয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের অধীন যথাযথ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। এ ধরনের সহায়তা প্রাপ্তি সত্ত্বেও যেসব মুক্তিযোদ্ধা দল তাদের স্বকীয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং যুদ্ধকালে কখনোই অন্য কোনো বাহিনী বা দলের কমান্ডের অধীন থেকে যুদ্ধ করেনি সেসব মুক্তিযোদ্ধা দল আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে গণ্য। আঞ্চলিক বাহিনী বলতে আমরা সেইসব মুক্তিযোদ্ধা দলকে বুঝি যারা কোনো আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্য এমন কোনো মুক্তিযোদ্ধার হয়ত কোনো ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য থেকে থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর বাংলাদেশ সরকার ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য ছিল না। উপর্যুক্ত শর্তের আওতায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধা দলকে আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

আঞ্চলিক বাহিনী'র উপর্যুক্ত সংজ্ঞানুসারে মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকা বিভাগে সক্রিয় থাকা টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী, মানিকগঞ্জের হালিম বাহিনী, গোপালগঞ্জের হেমায়েত বাহিনী ও নরসিংদীর মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী; চট্টগ্রাম বিভাগে তৎপর চাঁদপুরের পাঠান বাহিনী ও নোয়াখালীর লুৎফর বাহিনী; রাজশাহী বিভাগে গড়ে ওঠা কুড়িগ্রামের আফতাব বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী ও নওগাঁর ওহিদুর বাহিনী; খুলনা বিভাগে ক্রিয়াশীল

মাগুরার আকবর বাহিনী, বাগেরহাটের রফিক বাহিনী, সুন্দরবনের জিয়া বাহিনী ও ভোলার সিদ্দিক বাহিনী আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে বর্তমান গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে বিবেচিত উল্লিখিত বাহিনীসমূহের বাইরেও আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা দলকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও উৎসে আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬) এর বিভিন্ন খণ্ডে; সুকুমার বিশ্বাস রচিত *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯), তপন কুমার দে লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী* (কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮), লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) রচিত *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী* (কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০), মো. সরোয়ার হোসেন এর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ *Liberation War of Bangladesh – 1971: A Study on the Armed Struggle: 25 March to 16 December* (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬) সহ প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের বিভিন্ন অংশে সক্রিয় থাকা বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দলকে ‘আঞ্চলিক বাহিনী’, ‘স্থানীয় বাহিনী’, 'Informal forces'[৩৫] বলা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় আঞ্চলিক বাহিনীর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে সংজ্ঞানুযায়ী পূর্বোল্লিখত গ্রন্থসমূহ ও গবেষণা অভিসন্দর্ভে দাবি করা নিম্নোল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধা দলসমূহ ‘আঞ্চলিক বাহিনী’ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি হারায়।

ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেনের ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ান (কামালপুর-হালুয়াঘাট এলাকা)

তখন কুমার দে রচিত *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী* (কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮) গ্রন্থের ১২১-২৫ পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেনের ইনফেনট্রি ব্যাটালিয়ানকে ‘আঞ্চলিক বাহিনী’ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে টাঙ্গাইলের চর অঞ্চলের ১৭৫ জন যুবককে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যান। সেখানে তুরার (মেঘলায়, ভারত) রওশন আরা ক্যাম্পে ব্রিগেডিয়ার সান্থ সিং বাবাজীর তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন ১১ নং সেক্টরের অধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৩৬] সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল আঞ্চলিক বাহিনী নয়।

জর্জ বাহিনী, দিনাজপুর

লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) রচিত *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী* (কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০) গ্রন্থের ‘লেখকের কথা’ অংশের প্রথম পাতায় আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী হিসেবে দিনাজপুরের জর্জ বাহিনীর কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া রোনাল্ড দেবাশীষ দাশ লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে জর্জবাহিনীর অবদান ও মহানায়ক জর্জ দাশ* (রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭) গ্রন্থটি জর্জ দাশের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদলকে আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছে। এই গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশের প্রথম পৃষ্ঠায় (প্রকৃত পৃষ্ঠা নং ৯) মুখবন্ধ লেখক গবেষক তপন বাগচী লিখেছেন:

> মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং কিছু এলাকা দখলমুক্ত করে। ... এছাড়া টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী ও আফতাব বাহিনী,

> সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী, মাগুরার আকবর বাহিনী বরিশালের কুদ্দুস বাহিনী ও গফুর বাহিনী, গোপালগঞ্জের অর্থাৎ বৃহত্তর ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী উল্লেখযোগ্য। নানান কারণে এই বাহিনীগুলো আলোচিত হলেও এর বাইরে রয়ে গেছে আরো কয়েকটি বাহিনীর কর্মকাণ্ড। এরকমই একটি সাহসী বাহিনী গড়ে উঠেছিল দিনাজপুরে জর্জ দাশের নামে 'জর্জ বাহিনী'।

প্রকৃতপ্রস্তাবে জর্জ বাহিনী আঞ্চলিক বাহিনী নয়। ১৪ এপ্রিল দিনাজপুর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে জর্জ দাশ ভারতের রাধিকাপুরে (দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, পশ্চিমবঙ্গ) আশ্রয় নেন।[৩৭] এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানাধীন শিব্বাড়িতে ইয়ুথ ক্যাম্প গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হন।[৩৮] জুলাই মাসে ৭ নং সেক্টর গঠিত হলে তিনি হামজাপুর সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের অধীন শিববাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্প কমান্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৩৯] এই ইয়ুথ ক্যাম্পের যোদ্ধারা ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে থেকেই দেশের অভ্যন্তরে দিনাজপুরের বিরল থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করতেন।[৪০] সুতরাং জর্জ দাশের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদলকে আঞ্চলিক বাহিনী বলা সমীচীন হবে না।

শফি বাহিনী, চট্টগ্রাম

লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'লেখকের কথা' অংশে চট্টগ্রামের শফি বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থে, শফি (প্রকৃত নাম মো. সফিউল আলম) বাহিনী বলতে সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ১ নং সেক্টর কমান্ডের অধীন তবলছড়ি সাব-সেক্টরভুক্ত প্লাটুন কমান্ডার নায়েক শফিউল আলমের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলকে চিনতেন।[৪১] ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক মো. সফিউল আলম সীতাকুণ্ড প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে ভারতে আশ্রয় নেন।[৪২] এরপর ১ নং সেক্টর কমান্ডের মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশ মোতাবেক তিনি সীতাকুণ্ড-মীরসরাই-ফটিকছড়ি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় যুক্ত থাকেন।[৪৩] জুলাই মাসের শেষ দিকে নায়েক সফিউল আলমের নেতৃত্বে স্পেশাল মোবাইল কমান্ড গঠন করা হয়।[৪৪] ১ নং সেক্টর কমান্ডভুক্ত তবলছড়ি সাব-সেক্টরের নিয়ন্ত্রণে নায়েক সফির মোবাইল কমান্ড সীতাকুণ্ড-মীরসরাই এলাকায় সক্রিয় ছিল। সুতরাং এ মুক্তি দল 'আঞ্চলিক বাহিনী' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মোতালেব বাহিনী, সুনামগঞ্জ

গবেষক এ এস এম সামছুল আরেফিন রচিত *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান* (সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭) গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৪৮-এ স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মোতালেব বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মোতালেব (প্রকৃত নাম আব্দুল মোত্তালিব) এর নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল কোনো অর্থেই আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী নয়। কারণ ১০ মে সুনামগঞ্জ মহকুমা পাকিস্তানি সৈন্যদলের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে সুনামগঞ্জ মহকুমা সংগ্রাম কমিটির মূল নেতৃত্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি জেলার বালাটে আশ্রয় নেয়। বালাটের জোয়াই হিল ইকো ওয়ান ট্রেনিং সেন্টারে[৪৫] মহকুমা সংগ্রাম কমিটির ব্যবস্থাপনায় এ মহকুমার অসংখ্য ব্যক্তিকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত বালাট মুক্তিবাহিনীর কোনো সামরিক কমান্ডার ছিল না। আগস্টে ৫নং সেক্টর কমান্ড থেকে এ টি এম সালাহ উদ্দিনকে বালাট সাব-সেক্টরের কমান্ডার করে পাঠানো হয়। তিনি প্রায় দুই মাস নেতৃত্ব দেওয়ার পর বদলি হয়ে গেলে তার স্থলে অক্টোবরে ক্যাপ্টেন আব্দুল মোত্তালিবকে বালাট সাব-সেক্টরের কমান্ডার করে পাঠানো হয়।[৪৬] বালাট সাব-সেক্টরের দায়িত্বে আসার পূর্বে ক্যাপ্টেন আব্দুল মোত্তালিব কিছুদিন সেলা সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন।[৪৭] সুতরাং ক্যাপ্টেন আব্দুল মোত্তালিবের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল যে পূর্ণরূপেই বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতাপ্রাপ্ত মুক্তিদল ছিল সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

আউয়াল বাহিনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত) লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের লেখকের কথা অংশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'আউয়াল বাহিনী'র উল্লেখ মেলে। অথচ মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে ঐ নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোথাও কোনো 'আঞ্চলিক বাহিনী'র উপস্থিত পাওয়া যায়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এখনো পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও সুলিখিত গ্রন্থ *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া* (জয়দুল হোসেন, গতিধারা, ঢাকা, ২০১১) এর পৃষ্ঠা ৮৭-তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে ওঠা গেরিলা বেইসের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত এসব মুক্তিদলের পাশাপাশি এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৮৮ ও ৮৯-এ বিএলএফ, ন্যাপ ও অন্যান্য বামপন্থি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপেরও তালিকা আছে। কিন্তু এসব তালিকার কোথাও 'আউয়াল বাহিনী'র উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোথাও যে এই নামে কোনো আঞ্চলিক বাহিনী ছিল না তা বর্তমান গবেষকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া* গ্রন্থের লেখক নিশ্চিত করেছেন।[৪৮]

শাহজাহান মাস্টার বাহিনী, সাতক্ষীরা

লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী লিখিত *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (এস আর প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১) গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠায় লেখক ৯ নং সেক্টরভুক্ত সাতক্ষীরার দেবহাটা এলাকায় শাহজাহান মাস্টার বাহিনী নামের একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতির কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাহজাহান মাস্টারের নেতৃত্বাধীন একটি মুক্তিদল এখানে সক্রিয় থাকলেও এই মুক্তিদল কোনো আঞ্চলিক বাহিনী ছিল না। শাহজাহান মাস্টারের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী জুন মাসের পূর্ব থেকেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার টাকিতে অবস্থান করছিল।[৪৯] টাকি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার সীমান্তের পশ্চিমে অবস্থিত। জুলাই মাসের ৯ নং সেক্টর গঠন করা হলে এর সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের আহ্বানে শাহজাহান মাস্টার ৯ নং সেক্টর কমান্ডের অধীন টাকিতে অবস্থান করেই বাংলাদেশের ভেতরে (প্রধানত দেবহাটা এলাকায়) কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন।[৫০] এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ মোহাম্মদ শাহজাহান (মাস্টার) কে ৯ নং সেক্টরাধীন দেবহাটা কলারোয়া সাব-সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[৫১] সুতরাং শাহজাহান মাস্টার বাহিনী কোনো আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী নয়।

মানিক বাহিনী, ঝালকাঠি

লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১৯ নং পৃষ্ঠায় ঝালকাঠির 'মানিক বাহিনী'র উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনো বিবেচনায়ই এটি আঞ্চলিক মুক্তিদল নয়। কেননা, ঝালকাঠি সদর থানার বেশাইন খান গ্রামের রেজাউল করিম আজাদ ওরফে মানিকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধকালে একটি স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিদল গড়ে উঠেছিল। এই দল মূলত মানিক (তৎকালে ঢাকা কলেজে বিএ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত), সাইদুল করিম রতন (মানিকের অনুজ) সহ মোট ২৪ জন সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিবাহিনী ছিল। আটঘর, কুড়িয়ানা, ভীমরুলি এলাকার হাজার হাজার মানুষ (বিশেষত হিন্দু পরিবার) পাকিস্তানি সেনাদলের আক্রমণের ভয়ে পেয়ারা বাগানে আশ্রয় নিলে সহায় সম্বলহীন এসব মানুষকে নানারকম সহযোগিতা প্রদান করেন মানিক বাহিনীর সদস্যরা। এমনকি এসব সন্ত্রস্ত পরিবারের অনেকের পরিত্যক্ত বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করেন এ বাহিনীর সদস্যরা।[৫২] ১০ জুন মানিক বাহিনীর সদস্যরা আকস্মিকভাবে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদলের নিকট থেকে একটি স্পিডবোট ও কয়েকটি রাইফেল দখল করেন। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে ১৪ জুন ভোরবেলা স্থানীয় রাজাকার-দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সৈন্যদল মানিক বাহিনীর ঘাঁটিতে অভিযান চালায়। আকস্মিক এ আক্রমণে মানিক বাহিনীর সকলেই ধরা পড়েন। এ দলের ১৬ জন সদস্যকে তাৎক্ষণিক হত্যা করা হয়। মানিকসহ বাকি ৮ জনকে ঝালকাঠি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনাদলের ঝালকাঠি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আজমতের নির্দেশে তাদেরকেও হত্যা

করা হয়।[৫৩] এর মধ্য দিয়ে ঝালকাঠির স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিদল 'মানিক বাহিনী'র কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটে।[৫৪] সুতরাং, উল্লিখিত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী বলতে যা বোঝানো হয় 'মানিক বাহিনী' সে ধরনের কোনো মুক্তিদল ছিল না।

শাহজাহান বাহিনী, বরিশাল

লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১৮-২২০ পৃষ্ঠায় বরিশাল এলাকায় সক্রিয় শাহজাহান বাহিনী নামক একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর কথা বলা হয়েছে। অথচ 'শাহজাহান বাহিনী' নামে বরিশাল এলাকায় যে মুক্তিদল সক্রিয় ছিল, তারা মূলত ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের (ওমর তার ছদ্মনাম) নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দল। ক্যাপ্টেন শাহজাহান পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে জুলাই মাসে ভারতে প্রবেশ করেন। পিরোজপুরের বাসিন্দা হওয়ায় তাকে ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিলের অধীন ন্যস্ত করা হয়। আগস্টে শাহজাহান ওমরকে বরিশাল সাব-সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করে প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ বরিশালের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫৫] এই মুক্তিদল ৬ সেপ্টেম্বর বরিশালের উজিরপুর থানার বড়াকোটা দরগাহবাড়ির প্রাইমারি স্কুলে সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন।[৫৬] সুতরাং শাহজাহান বাহিনী প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনী ছিল, আঞ্চলিক বাহিনী নয়।

দাস পার্টি, হবিগঞ্জ

বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময় হবিগঞ্জের হাওর এলাকায় (আজমিরীগঞ্জ-বানিয়াচং-লাখাই প্রভৃতি) মুক্তিযুদ্ধকালে সক্রিয় 'দাস পার্টি'র কথা জানা যায়। এছাড়া ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক তপন পালিত (শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) 'দাস পার্টি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। প্রথমোক্ত উৎসে দাস পার্টিকে 'আঞ্চলিক বাহিনী' হিসেবে চিহ্নিত করার আগ্রহ লক্ষণীয় এবং এই মুক্তিদল আদৌ আঞ্চলিক বাহিনী ছিল কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন দাবি ছিল দ্বিতীয় উৎস থেকে। এই বিষয়ে গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ৫নং সেক্টরের অধীন প্রথমে বড় ছড়া সাব-সেক্টর ও পরে টেকেরঘাট সাব-সেক্টরের অধীন গেরিলা কমান্ডার জগৎজ্যোতি দাসের নেতৃত্বে একদল গেরিলা যোদ্ধা ছিলেন যাদেরকে সাব-সেক্টরের দলিলপত্রে 'দাসপার্টি' হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।[৫৭] এই মুক্তিদলের প্রত্যেকে ভারতের মেলাঘরের ইকো ওয়ান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষিত ছিলেন ও সাব-সেক্টর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হতেন।[৫৮]

সোনামিয়া বাহিনী, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, *সেক্টর এগার* (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬) গ্রন্থের ৪৯১ পৃষ্ঠায় টাঙ্গাইলের সোনামিয়া বাহিনী নামের একটি আঞ্চলিক বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সোনামিয়া বাহিনীর সূচনা হয়েছিল টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার পাকুল্লা গ্রামে এরকম একটি বর্ণনা পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সোনামিয়া বাহিনী নামে স্বতন্ত্র কোনো বাহিনীর অস্তিত্ব গবেষণাকালে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক সোনামিয়া, তার পুত্র (অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুক্তিযুদ্ধকালে করটিয়া সাদত কলেজের বাংলা বিভাগের বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্র), টাঙ্গাইল সদর থানাধীন ছিলিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আলী সরকার, ইসমাইল হোসেনসহ প্রায় ষাটজন সদস্য মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এর মধ্যে তারা খবর পান যে, নাগরপুরে খন্দকার আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে। এই খবর পেয়ে সোনামিয়া ও তার প্রায় ষাটজন সঙ্গী মে মাসের শুরু দিকেই বাতেন বাহিনীতে যোগ দেন।[৫৯] অর্থাৎ সোনামিয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল বাতেন বাহিনীর

সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং মে'র পর থেকে এ দলের কোনো স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সোনামিয়া বাহিনী নামে কোনো স্বতন্ত্র আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি ছিল এমন দাবি অগ্রহণযোগ্য।

গফুর বাহিনী, বরিশাল

মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩) গ্রন্থের ২৬১-২৬৩ পৃষ্ঠায় এবং সুকুমার বিশ্বাস তার *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯) গ্রন্থের ২৪৯ পৃষ্ঠায় বরিশালের গফুর বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, মো. সরোয়ার হোসেন ও তার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের (পূর্বে উল্লিখিত) ১৯৮ পৃষ্ঠায় গফুর বাহিনীর কর্মকাণ্ড নিয়ে নীতিদীর্ঘ একটি বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বর্তমান গবেষক মনে করেন যে, গফুর বাহিনী নামে বরিশালে (প্রকৃতপক্ষে বাবুগঞ্জ, বরিশাল) কোনো আঞ্চলিক বাহিনী ছিল না। পেশায় শিক্ষক আব্দুল গফুরের তত্ত্বাবধানে একদল মুক্তিযোদ্ধা (স্থানীয়ভাবে ও ভারতে প্রশিক্ষিত) ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছিলেন বটে, তবে পুরোপুরি স্বতন্ত্র বা স্থানীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে নয়।[৬০] এরপর বরিশাল সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর বরিশালে আসলে এই পুরো দলটি ক্যাপ্টেন ওমরের সাথে মিশে যায়।[৬১] একই বক্তব্য এসেছে আব্দুল গফুরের সাক্ষাৎকারে।[৬২] আরো উল্লেখ্য যে, আব্দুল গফুর প্রকৃতপক্ষে কোনো মুক্তিযোদ্ধা দলকে নেতৃত্ব দান বা কমান্ড করেননি। অত্র এলাকার একজন মান্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে একজন স্থানীয় সংগঠক হিসেবে এবং পরবর্তীকালে বরিশাল সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীর পরামর্শদাতা ও যোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন।[৬৩]

কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী, বরিশাল

মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি ও সুকুমার বিশ্বাস (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ দুটির পূর্বোক্ত নং পৃষ্ঠায়) বরিশাল এলাকার আর একটি আঞ্চলিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী' বা 'কুদ্দুস বাহিনী' হিসেবে পরিচিত এই মুক্তিদল সম্পর্কে অল্প কথার একটি বিবরণ দিয়েছেন গবেষক মো. সরোয়ার হোসেন তার অভিসন্দর্ভের ১৯৭ পৃষ্ঠায়। আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, কুদ্দুস মোল্লার নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল প্রকৃতপক্ষে 'আঞ্চলিক বাহিনী' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। কেননা, কুদ্দুস মোল্লা বরিশাল সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের অধীন হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ এলাকার বেইজ কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৬৪] কুদ্দুস মোল্লার মুক্তিদল সম্পর্কে আরেকটি উৎসে জানা যায়:

> কুদ্দুস মোল্লা (সোনামদ্দিন) ১৯৭১ সালের আগে পেশায় ডাকাত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ডাকাতি পেশা ছেড়ে দেন এবং যুদ্ধে অংশ নেন। কুদ্দুস মোল্লা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর দলবল নিয়ে ভারতে চলে যান। আর ডাকাতি করবেন না অঙ্গীকার করার পর তাঁকে এবং তাঁর দলবলকে মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি জুলাই মাসে দেশে ফেরেন। কুদ্দুস মোল্লা পরে ৯ নম্বর সেক্টরের টাকি সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের অধীন যুদ্ধ করেন। হিজলা, মুলাদি, মেহেন্দিগঞ্জ, বাবুগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে মুলাদি থানার ছবিপুর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না থাকলেও তিনি যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম কয়েক মাস এলাকার বাইরে ছিলেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মানিক বীরপ্রতীক। তিনি আরো নিশ্চিত করেছেন যে, কুদ্দুস মোল্লার

নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল স্বতন্ত্র কোনো মুক্তিদল ছিল না।[৬৬] কাজেই এটা সন্দেহাতীত যে, কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী কোনো আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী ছিল না।

সিরাজ সিকদার বাহিনী, বরিশাল

বামপন্থি রাজনীতিক সিরাজ সিকদার মুক্তিযুদ্ধকালে বৃহত্তর বরিশাল জেলার বিভিন্ন মহকুমায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেন। এই সময় সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দলকে স্থানীয়ভাবে 'সিরাজ সিকদার বাহিনী নামে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই মুক্তিযোদ্ধা দলকে 'আঞ্চলিক বাহিনী' হিসেবেও উল্লেখ করা হয় বিভিন্ন উৎসে।[৬৭] মুক্তিযুদ্ধকালে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত শক্তির (লোকবল ও যুদ্ধরসদ) ওপর নির্ভর করে কর্মকাণ্ড চালালেও এই মুক্তিবাহিনী ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ প্রভাবিত রাজনৈতিক সংগঠনের অধীন। এই রাজনৈতিক সংগঠনের নাম পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি যার আত্মপ্রকাশ ঘটে ৪ এপ্রিল ১৯৭১[৬৮] (মতান্তরে ৩ জুন ১৯৭১[৬৯] বরিশালে এই দলের ভ্রূণ গঠিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি সিরাজ সিকদার প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন নামের সংগঠনের সূচনায়। ১৯৭০ সালের শেষের দিক থেকে সিরাজ সিকদার শ্রমিক আন্দোলনের কার্যক্রম বরিশাল জেলার পেয়ারা বাগান এলাকা থেকে পরিচালনা করতে থাকেন।[৭০]

মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি মুক্তিযুদ্ধকালে বৃহত্তর বরিশালের স্বরূপকাঠি, বানারিপাড়া, ঝালকাঠি, ভোলা এলাকায় সক্রিয় ছিল। কখনো কখনো এই দল পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধাদলের সাথেও কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন করেছিল।[৭১] রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির যেসব সদস্য মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি দখলদার পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তারা মূলত তাদের সংগঠনের আদর্শ, কর্মপন্থা ও নির্দেশনা অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন। সুতরাং এই সংগঠনের অধীন মুক্তিযোদ্ধা দলকে আঞ্চলিক বাহিনী বলা যায় না।

উল্লিখিত বাহিনীসমূহের বাইরে বরিশাল এলাকার আরো কয়েকটি মুক্তিদলকে আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুকুমার বিশ্বাস লিখিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠায় বরিশাল এলাকার আরব আলী, মধু বাহিনীর উল্লেখ আছে। সুকুমার বিশ্বাস ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল: প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ* (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩) গ্রন্থের ১৪, ৩০-৩১, ৩৮ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় নাসির বাহিনী', 'জাফর বাহিনী', 'বেণু বাহিনী', ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এসব মুক্তিযোদ্ধা দল ছিল মূলত ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বাধীন বরিশাল সাব-সেক্টরের অধীন মুক্তিবাহিনী। উল্লিখিত বাহিনীসমূহের কমান্ডারদের মধ্যে নাসির বাহিনীর মহম্মদ নাসির উদ্দীন বাকেরগঞ্জ থানা ও বেণীলাল দাশ গুপ্ত ছিলেন বানারীপাড়া থানার বেইজ কমান্ডার এবং এরা সবাই শাহজাহান ওমরের নিয়ন্ত্রণে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।[৭২] এছাড়া হুমায়ূন রহমান লিখিত *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (আপন প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৮) গ্রন্থের ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় 'জাহাঙ্গীর বাহাদুরের বাহিনী'র উল্লেখ আছে। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাহাদুর বাহিনী বৈশিষ্ট্য বিচারে আঞ্চলিক বাহিনী হতে পারে না। তাছাড়া এই বাহিনীর কমান্ডার জাহাঙ্গীর বাহাদুর স্বরূপকাঠি-নাজিরপুর থানা এলাকায় বরিশাল সাব-সেক্টরের বেইজ কমান্ডার (থানা) ছিলেন।[৭৩] কাজেই এই বাহিনী আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি হারায়।

মানস বাহিনী, বাগেরহাট

বিভিন্ন উৎসে বাগেরহাটের বাহিরদিয়া-মানসা এলাকায় আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে 'মানস ঘোষের বাহিনী' এর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মানস ঘোষের নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল প্রকৃতপক্ষে কোনো স্বতন্ত্র মুক্তিদল ছিল না। এই মুক্তিদল বাগেরহাটের রফিক বাহিনীর প্রধান রফিকুল ইসলাম খোকনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল তথা 'রফিক বাহিনী'র অংশ ছিল।[৭৪] মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকে জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত মানস ঘোষের দল রফিক বাহিনীর অংশ হিসেবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। কিন্তু উল্লিখিত সময়ের পর মানস বাহিনী আদর্শিক কারণে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কাজ করতে থাকেন।[৭৫] কাজেই, মানস বাহিনী কোনো আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের (ঢাকা বিভাগ: টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী, মানিকগঞ্জের হালিম বাহিনী, গোপালগঞ্জের হেমায়েত বাহিনী ও নরসিংদীর মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী; চট্টগ্রাম বিভাগ: চাঁদপুরের পাঠান বাহিনী ও নোয়াখালীর লুৎফর বাহিনী; রাজশাহী বিভাগ: কুড়িগ্রামের আফতাব বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী ও নওগাঁর ওহিদুর বাহিনী; খুলনা বিভাগ: মাগুরার আকবর বাহিনী, বাগেরহাটের রফিক বাহিনী, সুন্দরবনের জিয়া বাহিনী ও ভোলার সিদ্দিক বাহিনী) ভূমিকা যথাযথভাবে নিরূপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার

সাহিত্য পর্যালোচনা

আলোচ্য বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনে অসংখ্য গ্রন্থ ও বেশ কিছু গবেষণা কর্ম অধ্যয়ন করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ ও গবেষণা কর্ম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয় উদ্যোগেই প্রকাশিত। এসব গ্রন্থ, গবেষণা কর্ম, আত্মকথা, স্মৃতিকথার মধ্যে বেশ কিছু আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে হয় অনেকটা মিলে যায় নতুবা অন্তত প্রাসঙ্গিক। নিম্নে ঐসব গ্রন্থ, গবেষণা কর্ম, আত্মকথা, স্মৃতিকথার শক্তি ও দুর্বলতার বিষয়ে আলোকপাত করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড, স্বাধীন বাংলা বেতার, বিদেশি ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড, প্রভৃতি বিষয়ক অগণিত মূল্যবান দলিল এখানে আছে। আর রয়েছে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী, বাতেন বাহিনী, আফসার ব্যাটেলিয়ন, হেমায়েত বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: সেক্টর ভিত্তিক ইতিহাস* গ্রন্থে ১১টি সেক্টরে সংঘটিত প্রতিরোধ পর্ব ও প্রধান প্রধান যুদ্ধগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থে পূর্বে উল্লিখিত আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থে সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি, বিশেষ করে যুদ্ধসমূহের বর্ণনা রয়েছে। এই সমগ্রে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকার ওপর সবিশেষ মনোযোগ দৃশ্যমান। এই সমগ্রে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের আংশিক বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলা একাডেমির উদ্যোগে অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজামান খান এর সম্পাদনায় প্রকাশিত *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস* গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রয়েছে। এই সিরিজে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের মধ্যে আফসার বাহিনী, আকবর বাহিনী, বাতেন বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, আফতাব বাহিনী সম্পর্কে গবেষণা ধর্মী মূল্যবান প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে হালিম বাহিনী প্রধান ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী ও হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দীনের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ এ গ্রন্থসিরিজে বিদ্যমান। কিন্তু এসব প্রবন্ধ বর্তমান গবেষণার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ।

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মিজানুর রহমান মিজান লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে ওহিদুর বাহিনী* একটি সুলিখিত গবেষণা গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধে নওগাঁর আত্রাই অঞ্চলে গড়ে ওঠা ওহিদুর বাহিনী এর ওপর এটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণা গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থটিও আলোচ্য গবেষণার সব প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী লিখিত *স্বাধীনতা '৭১* গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী ও কাদেরিয়া বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিশদ বর্ণনা হাজির করেছে। এই গ্রন্থে কাদেরিয়া বাহিনীর পাশাপাশি বাতেন বাহিনী সম্পর্কিত কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। তবে এই স্মৃতিকথার প্রধান দুর্বলতা হলো প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যক্তি হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর প্রভাবশীল উপস্থিতি। শুধু এই গ্রন্থের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর ভূমিকা নির্ণয় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় কিছুটা ছেদ তৈরি করে। এছাড়া কাদের সিদ্দিকী লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ* গ্রন্থটি *স্বাধীনতা '৭১* গ্রন্থটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

সমরূপ সমস্যা তৈরি হয় মাগুরার আকবর বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী* শীর্ষক গ্রন্থ অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনীর ভূমিকা নির্ণয় প্রচেষ্টায়।

মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.) লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উম্মাতাল দিনগুলি* প্রধানত একটি স্মৃতিকথা। এই গ্রন্থ অবলম্বনে সুন্দরবনে জিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ডের একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হলেও একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব। তাছাড়া বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্নতো রয়েই যায়।

মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীর ভূমিকা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ হলো তপন কুমার দে লিখিত *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*। এই গ্রন্থে লেখক মুক্তিযুদ্ধকালে ভূমিকা রাখা কাদেরিয়া বাহিনী, আফসার বাহিনী, হালিম বাহিনী, বাতেন বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, আকবর বাহিনী, লতিফ মীর্জা বাহিনী ও ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেন এর বাহিনী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রেখেছেন। আলোচ্য বাহিনীগুলোর ইতিহাস পুনর্গঠনে গ্রন্থটি বেশ কার্যকর। কিন্তু, গ্রন্থটির প্রধান দুর্বলতা হলো- এখানে আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেনের মুক্তিযোদ্ধা দলের অন্তর্ভুক্তি। 'আঞ্চলিক বাহিনী' বলতে মোটা দাগে সেই মুক্তিযোদ্ধা দলকে বোঝানো হয় যে দল বাংলাদেশ সরকার বা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সরাসরি প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র বাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরুদ্ধ দেশেই গড়ে উঠেছিল ও যুদ্ধের শেষাবধি প্রধানত নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই টিকে ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইঞ্জিনিয়ার আবুল হোসেনের মুক্তিযোদ্ধা দল আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না। কেননা, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ভারতে আশ্রয় নেওয়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সবল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল আবুল হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং এই দল ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডে পরিচালিত।

এছাড়া আলোচ্য গ্রন্থটি উপর্যুক্ত বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছে মাত্র, এখানে বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। তাছাড়া এই একটি গ্রন্থে আলোচ্য গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবগুলো বাহিনীর কথা জানা যায় না।

এস আই এম নুরুন্নবী খান রচিত *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী* এবং কর্নেল (অব.) সফিকউল্লাহ্ রচিত *একাত্তরের রণাঙ্গন: গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী* গ্রন্থ দুটি মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে ভূমিকা রাখা হেমায়েত বাহিনীকে নিয়ে লেখা। মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর অবদান তুলে ধরার ক্ষেত্রে গ্রন্থ দুটি খুবই উপকারী। কিন্তু আলোচ্য গবেষণার সকল প্রশ্নের উত্তর গ্রন্থ দুটিতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সেক্টর বা সাব-সেক্টর অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ্ রচিত *মুক্তিযুদ্ধে আট নম্বর সেক্টর*, মোঃ শহিদুল হক রচিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ৬নং সেক্টরের ইতিহাস*, মুহাম্মদ লুৎফর হক রচিত *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স*, রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর) রচিত *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, এম. এ. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক (উইং কমান্ডার অব.) রচিত *একাত্তরের নবম সেক্টরে যুদ্ধ* ও তপন কুমার দে রচিত *মুক্তিযুদ্ধে ৪নং সেক্টর ও মেজর জেনারেল (অব.), সি আর দত্ত বীরউত্তম*, আবু ওসমান চৌধুরী (লে. কর্নেল অব.) রচিত *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ড. শেখ গাউস মিয়া রচিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুন্দরবন সাব-সেক্টর* গ্রন্থগুলোতে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের বর্তমান ৬৪টি জেলার ও কয়েকটি থানা/উপজেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গ্রন্থ পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষণার স্বার্থে গ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু গ্রন্থগুলোর অধিকাংশ পদ্ধতিগতভাবে সঠিক- এ দাবি করা যাবে না। আবার জেলা বা থানাভিত্তিক একটি গ্রন্থ কোনো একটি আঞ্চলিক বাহিনীর গোটা কর্মকাণ্ডের অংশবিশেষ উপস্থাপন করে থাকে। যেমন গবেষক মো. হাবিবুল্লাহ বাহার রচিত *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থটিতে টাঙ্গাইলে গড়ে ওঠা কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে যেগুলো শুধু টাঙ্গাইলের সীমানার মধ্যে ঘটেছে, লেখক মাত্র সেসব ঘটনার বিবরণই উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু, আমরা দেখি উল্লিখিত বাহিনী দুটির কর্মকাণ্ড টাঙ্গাইল ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো স্পর্শ করেছে। সুতরাং প্রতিটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর সুনির্দিষ্ট ও পদ্ধতিগত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কতক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে। এসব গবেষণা কর্ম মূলত এম. ফিল. বা পিএইচ. ডি. গবেষণা এবং এগুলো মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সম্পন্ন হয়েছে। এসব গবেষণা কর্মের মধ্যে নিম্নোক্ত গবেষণা কর্ম আলোচ্য গবেষণার সাথে সম্পর্কিত:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খুলনা জেলা, মোল্লা আমীর হোসেন, এম. ফিল., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী জেলা: জনসাধারণের অংশগ্রহণ, মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, পিএইচ. ডি., ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা ১৯৪৭-১৯৭১, মো. আবদুস ছাত্তার, পিএইচ. ডি., জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী (১৯৪৭-৭১), সৈয়দ মোঃ শাহান শাহ, এম. ফিল., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬

মুক্তিযুদ্ধে ঝিনাইদহ: প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা অর্জন, মাধুরী রাণী, এম. ফিল., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলা, মো: হাবিব উল্লাহ বাহার, এম. ফিল., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩

মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ, মীর ফেরদৌস হোসেন, এম. ফিল., জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

মুক্তিযুদ্ধে যশোর ও মাগুরা, মৌসুমী খন্দকার, পিএইচ. ডি., জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪

মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী, মো. আবদুস ছাত্তার, এম. ফিল., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

উল্লিখিত গবেষণা কর্মগুলো যে স্ব স্ব অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুবই সমৃদ্ধ গবেষণা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরেও এই গবেষণা কর্মগুলোর আওতা বা পরিধি শুধু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে আবর্তন করে। ফলে, মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র দেশের সব আঞ্চলিক বাহিনীর ভূমিকা উপরোল্লিখিত গবেষণা কর্মে পাওয়া যায় না।

পাঁচ

গবেষণার উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশাল ও বিচিত্র পরিসর রয়েছে। নানা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী বিবিধ উপায়ে ও প্রকারে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন। এ ভূমিকা ইতিবাচক বা নেতিবাচক বা যুগপৎ দুইই হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ ও বিশ্লেষণ থাকা উচিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত উপেক্ষিত বা অবহেলিত রয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা। এদিক বিবেচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় অর্ধশত বছর পরেও দেখা যায় মাত্র কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনীর স্বীকৃতি মিলেছে। যেমন কাদেরিয়া বাহিনী, বাতেন বাহিনী, হালিম বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী ও আকবর বাহিনী। আবার এই বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ডের মধ্যে শুধু কয়েকটা যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, বাহিনীগুলোর পরিপূর্ণ কর্মকাণ্ড নয়। এছাড়া আরো বেশ কতক আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী রয়েছে যাদের ভূমিকা জাতীয় ইতিহাসে অনালোচিত, সুতরাং তারা অস্বীকৃত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সেরা অর্জন। এই অর্জনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। আর এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হবে তখনই যখন মুক্তিযুদ্ধে জড়িত সকল পক্ষের ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে '১৪ নং সেক্টর' বা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা নির্ণয় অতীব প্রয়োজনীয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো:

ক) প্রতিটি আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট নির্ণয়।
খ) প্রতিটি বাহিনীর সাংগঠনিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ;
গ) বাহিনীসমূহ যেসব অঞ্চলে সক্রিয় ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তৈরি;
ঘ) বাহিনীসমূহ প্রতিরোধ পর্ব থেকে বিজয় অর্জন অবধি যে যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল তা চিহ্নিত করা;
ঙ) অবরুদ্ধ দেশে জনগণের সাথে বাহিনীগুলোর সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটন করা;
চ) মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে বাহিনীগুলোর ভূমিকা নিরূপন করা;
ছ) মুক্তিযুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' এর চরিত্র দিতে বাহিনীগুলো কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল?
জ) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্কের স্বরূপ কী ছিল?

ঝ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস কেন অসম্পূর্ণ?

গবেষণার যৌক্তিকতা

মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ ইতোমধ্যে লিখিত হয়েছে। অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নানা রকম গবেষণাও সম্পন্ন হয়েছে দেশে ও বিদেশে। কিন্তু, 'মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনী সমূহের ভূমিকা' বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট গবেষণা হয়নি। সুতরাং উপর্যুক্ত বিষয় যথাযথ গবেষণার দাবি রাখে। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রকাশিত দলিলপত্র, গবেষণাগ্রন্থ/গবেষণাপত্র, আত্মকথা/স্মৃতিকথা, অঞ্চলভিত্তিক প্রকাশনাসমূহের প্রধান দুর্বলতাগুলো হলো:

(ক) মুক্তিযুদ্ধের সামরিক দিকের ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে বেশি তথা যুদ্ধসমূহের বর্ণনাই মূখ্য হয়েছে;

(খ) যুদ্ধসমূহের মধ্যে আবার সেসব যুদ্ধসমূহের বর্ণনা বেশি পাওয়া যায় যেসব যুদ্ধ সেক্টর/সাব-সেক্টর কমান্ডার বা মুজিব বাহিনীর কমান্ডাররা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পরিচালনা করেছিলেন;

(গ) আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ড কখনো কখনো কোনো একক মহকুমা বা জেলা বা সেক্টর এলাকার বাইরে একাধিক মহকুমা বা জেলা বা সেক্টর এলাকায় বিস্তৃত ছিল। সে কারণে, কোনো নির্দিষ্ট মহকুমা বা জেলা বা সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ডের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না;

(ঘ) দেশি ও বিদেশি অনেক গ্রন্থ অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট;

(ঙ) কোনো কোনো আঞ্চলিক বাহিনী প্রধান বা বাহিনীভুক্ত যোদ্ধার লিখিত আত্মকথা বা স্মৃতিকথায় বস্তুনিষ্ঠতার অভাব রয়েছে;

(চ) রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতার দরুন কোনো কোনো আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড বা ভূমিকা ইতিহাসে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত;

(ছ) আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে যেসব বাহিনী যুদ্ধকালেই বাংলাদেশ সরকার বা সেক্টর কমান্ডারদের স্বীকৃতি ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন, শুধু তাদের ভূমিকার আংশিক চিত্র পাওয়া যায়;

সুতরাং, আলোচ্য বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা তর্কাতীত। এই গবেষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হবে।

গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণার পরিধি মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৭১ এর মার্চের ১ তারিখ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে সমগ্র বাংলাদেশে এর প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন শুরু হতে দেখা যায়। এরপর ৩ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ ও ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে জনগণ পায় নির্দেশনা। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যদল গণহত্যা শুরু করলে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়। ডিসেম্বর এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ স্বাধীন দেশের সরকারের নিকট (দু একটি বিকল্প বাদে) অস্ত্র সমর্পণ করে। অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়েই শেষ হয় বাহিনীসমূহের কার্যক্রম।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুইই স্থান পাবে। প্রধানত এটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এই গবেষণা কাজে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার, একই অঞ্চলে যুদ্ধরত অন্য বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় বা স্থানীয় সংগঠকের সাক্ষাৎকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকের সাক্ষাৎকার। এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা নিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আরো ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন দলিলপত্র, সনদ, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত দিনলিপি, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিবেদন। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধা বা অবরুদ্ধ দেশে বসবাসকারী ব্যক্তির আত্মকথা ও স্মৃতিকথাও ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক থানা বা জেলা বা সেক্টর বা অঞ্চলভিত্তিক যেসব পুস্তিকা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেসব পুস্তিকা ও গ্রন্থও ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার রূপরেখা

বর্তমান গবেষণাটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঢাকা বিভাগে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের কর্মকাণ্ড। আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ও বাতেন বাহিনী, ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী, মানিকগঞ্জের হালিম বাহিনী, বৃহত্তর ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী ও নরসিংদীর মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট, সাংগঠনিক বিন্যাস, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, কার্যাঞ্চল ও যুদ্ধসমূহ, বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি প্রসঙ্গ, প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বাহিনী সম্পর্কে নির্ধারিত আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কর্মকাণ্ডের একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগাধীন বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে গড়ে ওঠা লুৎফর বাহিনী ও চাঁদপুর অঞ্চলে গড়ে ওঠা পাঠান বাহিনীর কার্যক্রম। শত্রু কবলিত এলাকায় এসব বাহিনী কোন প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠল, কেমন ছিল এসব বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো, কীভাবে তারা অবরুদ্ধ দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ও অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল, এসব বাহিনীর কার্যাঞ্চলে সংগঠিত যুদ্ধসমূহ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত অঞ্চলে শত্রুপক্ষের বিপরীতে তাদের কর্মকাণ্ডেরও একটি মূল্যায়ন রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজশাহী বিভাগাধীন আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এ বিভাগের সিরাজগঞ্জ পাবনা অঞ্চলে গড়ে ওঠা লতিফ-মীর্জা বাহিনী, নওগাঁর আত্রাই কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ওহিদুর বাহিনী ও কুড়িগ্রামের রৌমারী অঞ্চল ভিত্তিক আফতাব বাহিনীর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মুক্তিযুদ্ধে খুলনা বিভাগের অন্তর্গত আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা। খুলনা বিভাগাধীন মাগুরার আকবর বাহিনী, সুন্দরবন অঞ্চলের জিয়া বাহিনী, বাগেরহাটের রফিক বাহিনী, ভোলা অঞ্চলের সিদ্দিক বাহিনীর কার্যক্রম ও অবদান অনুসন্ধান করা হয়েছে। এছাড়াও ছোট পরিসরে উপস্থাপিন করা হয়েছে সিরাজ সিকদার গ্রুপ ও কুদ্দুস মোল্লার গ্রুপের কর্মকাণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপসংহার। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধকালে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের প্রকৃত

ভূমিকা। সুপ্রশিক্ষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর সহযোগী সশস্ত্র ও প্রশিক্ষিত রাজাকার ও অন্যান্য দলের বিপরীতে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথ রচনায় আলোচ্য বাহিনীগুলো কতটুকু কার্যকর ছিল এ প্রশ্নের বিশ্লেষণধর্মী উত্তর প্রদানই এ অধ্যায়ের লক্ষ্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। প্রথমত, কৌশলগত ও নিরাপত্তার কারণে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর প্রায় সবাই তাদের কর্মকাণ্ডের প্রায়শ কোনো দালিলিক প্রমান রাখেননি। কেননা তাদেরকে অবরুদ্ধ দেশেই সর্বদা শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের প্রয়োজনে বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষে বাহিনীর সদস্যরা যার যার মতো জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করেছিলেন। ফলে যেসব দলিল যুদ্ধের পরও কারো কারো কাছে ছিল, সেগুলোর অধিকাংশ এখন হয় নিখোঁজ, অথবা ব্যবহারের অনুপেযোগী। তৃতীয়ত, এসব বাহিনীর ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা বা সংগঠকদের সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিকথা বা আত্মকথার ওপর। ব্যক্তির বক্তব্য বা লেখায় অতিরঞ্জন, অতিকথন, আত্মপ্রচার বা রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে পক্ষপাতিত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। চতুর্থত, আঞ্চলিক বাহিনীর সংগঠক ও অন্যতম মুক্তিযোদ্ধাগণের অনেকেই আজ জীবিত নেই। আবার যারা জীবিত আছেন তাদের অধিকাংশ স্মৃতিভ্রষ্ট অথবা নানা কারণে অনেক কথা গোপন করেছেন অথবা অপরিষ্কার করে বলেছেন। এটিও বস্তুনিষ্ঠ বা সঠিক ইতিহাস রচনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে গবেষণা কর্মটি অনেক ক্ষেত্রেই দৈতয়িক উৎসের শরণাপন্ন হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

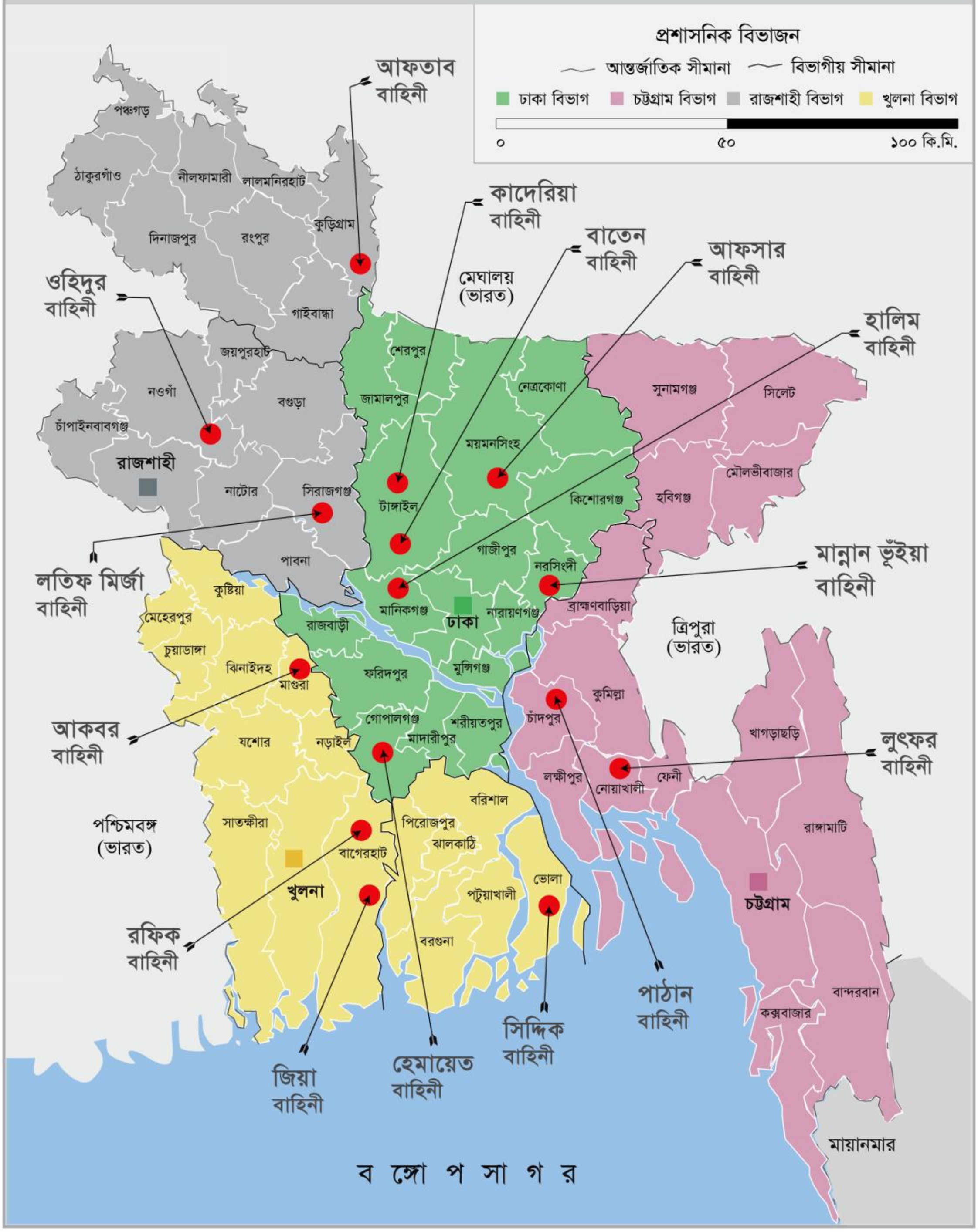

তথ্যসূত্র

---

১ এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩, ২৫

২ মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান, *স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধু : পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০-এর নির্বাচন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪৬-৫৩ বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত

৩ *ঐ*, পৃ. ৬৮

৪ আতিক হেলাল (সম্পা.), *মেজর জলিল রচনাবলী*, কমল কুঁড়ি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৩

৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *২য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৬৩২

৬ দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ ১৯৭১

৭ হোসনে আরা খানম, ১৯৭১ *অসহযোগ আন্দোলনের কালপঞ্জি*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২৪-৪০ দেখুন

৮ Archer K Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh*, UPL, Dhaka, 2002, p. 172

৯ অজয় দাশগুপ্ত, *একাত্তরের* ৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭

১০ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৫ নভেম্বর ২০০৭

১১ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৬ মার্চ ১৯৭৪

১২ মোস্তফা হোসেইন, ‘উপেক্ষিত জনযুদ্ধ’, *দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

১৩ অজয় দাশগুপ্ত, একাত্তরের ৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৩

১৪ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৩-৭৬৩

১৫ হোসেনে আরা খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৭৬

১৬ হোসনে আরা খানম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬-৮৭

১৭ মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশি জেনারেলদের মন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৬৯৭

১৮ এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় ২য় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৩

১৯ *বিবিসি*, ২৪ মার্চ ২০১৯

২০ মঈদুল হাসান, *মূলধারা* ’৭১, ইউপিএল, ঢাকা, ৮ম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩

২১ *ঐ*, পৃ. ৫

২২ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Princeton University Press, New Jersey, 1970; গণবিদ্রোহের কারণ সম্পর্কিত টেড রবার্ট গারের তাত্ত্বিক কাঠামোটি নিম্নরূপ:

Intrusion অভিঘাত	Cultural cores (মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ) Relative Deprivation (আপেক্ষিক বঞ্চনা)	High intensity of collective violence (সমষ্টিগত প্রতিরোধের উচ্চ সম্ভাবনা)
Intrusion অভিঘাত	Cultural peripherals (প্রান্তিক সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ) Relative Deprivation (আপেক্ষিক বঞ্চনা)	Low intensity of collective violence (সমষ্টিগত প্রতিরোধের মৃদু সম্ভাবনা)

উদ্ধৃত, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৪

২৩ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

২৪ *ঐ*, পৃ. ১৫

২৫ মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

২৬ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২৭ এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম সময় প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৪৮

২৮ এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬২-৬৩

২৯ মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ, ৪র্থ খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৩৯

৩০ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১৬

৩১ মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২৪

৩২ মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নম্বর সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭

৩৩ *ঐ*, পৃ. ৮

৩৪ মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ২৪

৩৫ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত English-Bangla Dictionary-তে Informal শব্দের বাংলা অর্থ 'অনিয়মিত', 'অনানুষ্ঠানিক', 'ঘরোয়া', ইত্যাদি থাকলেও Informal forces শব্দবন্ধ দ্বারা গবেষক মো. সরোয়ার হোসেন আঞ্চলিক বা স্থানীয় গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা দল বোঝাতে চেয়েছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ Md. Sarwar Hossain, *Liberation War of Bangladesh-1971: A Study on the Armed Struggle : 25 March to 16 December*, Ph.D Thesis, Department of History, University of Dhaka, 2016, p. 188

৩৬ তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১২১

৩৭ শাহজাহান শাহ ও মাসুদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ: দিনাজপুর*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬৬

৩৮ এম.এ কাফি সরকার, *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর*, ডি এস কে প্রকাশনী, দিনাজপুর, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪

[৩৯] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪, পৃ. ৪৯৫

[৪০] শাহজাহান শাহ ও মাসুদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[৪১] জামাল উদ্দিন, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬, পৃ. ২৫২

[৪২] জামশেদ উদ্দীন, *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সীতাকুণ্ড অঞ্চল*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৮, পৃ. ১৫৫

[৪৩] *ঐ*, পৃ. ১৫৬

[৪৪] জামাল উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

[৪৫] *দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

[৪৬] মোহাম্মদ আলী ইউনুছ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ*, মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতি ট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ, ১৯৯০, পৃ. ৩৮

[৪৭] *ঐ, পৃ. ৫৫*

[৪৮] সাক্ষাৎকার: জয়দুল হোসেন (লেখক: *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া*), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: হেরিটেজ আর্কাইভ্স, কাজলা, রাজশাহী, ১৫ জুন ২০১৯ বিকাল ৫টা

[৪৯] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬০-৬১

[৫০] *ঐ*, পৃ. ৫৬০, ৫৬৩ ও ৫৯০

[৫১] এ এস এম সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

[৫২] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব*, ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫, পৃ. ২০৯

[৫৩] *ঐ*

[৫৪] 'মানিক বাহিনী'র সদস্যদের নাম জানতে দেখুন; এম. ফরিদ উদ্দিন মনজু, *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল নির্যাতন ও গণহত্যা*, আপন প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১১৩

[৫৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৩ ও মুহাম্মদ লুৎফুল হক (সম্পা.), *বরিশাল ১৯৭১: অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১২৫

[৫৬] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস*, প্রকাশক: আলহাজ্ব কাজী হারুনর-রশিদ, মুদ্রণ: দি প্রিন্টার্স, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৬২৬

[৫৭] *www.ajmiriganj.habiganj.gov*, প্রবেশের তারিখ, ২০ মার্চ ২০২০, বেলা ১২টা

[৫৮] শেখ ফজলে এলাহী, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২১৩-১৪

[৫৯] সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫ মে ২০১৮, সকাল ১১.৩০ মি; মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৬, ১৫৩

৬০ সাক্ষাৎকার: মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি (বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল শাখার বিপরীতে), বগুড়া রোড, সদর, বরিশাল, ২০ আগস্ট ২০২০, বেলা ১১টা

৬১ Md. Sarwar Hossain, Op.cit., p. 198

৬২ সুকুমার বিশ্বাস ও নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল : প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৯

৬৩ সাক্ষাৎকার: মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত

৬৪ সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯

৬৫ এম. ফরিদ উদ্দিন মনজু, *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল : নির্যাতন ও গণহত্যা*, আপন প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৭, পৃ. ১০০

৬৬ সাক্ষাৎকার: মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত

৬৭ হুমায়ূন রহমান, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, আপন প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৬২

৬৮ *ঐ*

৬৯ *blog.bdnews24.com*, প্রবেশের তারিখ : ৫ মে ২০২০, বেলা ১২টা

৭০ *ঐ*

৭১ *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৭২ সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-৭৩; সাক্ষাৎকার : মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত

৭৩ *ঐ*, পৃ. ১৭৩

৭৪ *ঐ*

৭৫ স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৮২

প্রথম অধ্যায়

আঞ্চলিক বাহিনী : ঢাকা বিভাগ (যুদ্ধকালীন)

বর্তমান গবেষণার ভূমিকা অংশে আমরা ইতোমধ্যে জানিয়েছি যে, এই গবেষণায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে পনেরটি আঞ্চলিক বাহিনী সক্রিয় ছিল। এসব বাহিনী যেসব এলাকায় সক্রিয় ছিল সাধারণত তা কোনো একক জেলা বা সেক্টর বা সাব-সেক্টর এর সীমানা ধরে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। এই প্রেক্ষাপটে আমরা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের কর্মকাণ্ড তৎকালীন চারটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপন করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে যুদ্ধকালীন ঢাকা বিভাগে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে অন্যান্য বিভাগে সক্রিয় আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ড।

ঢাকা বিভাগ বর্তমান বাংলাদেশের আটটি বিভাগের অন্যতম একটি বিভাগ। এই বিভাগের উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল ও চাঁদপুর জেলা; পূর্বে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা; পশ্চিমে নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পরাজয়ের পর ঢাকা কোম্পানির দখলে চলে যায়। ব্রিটিশ কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ করার পর প্রশাসনিক একক ইউনিট হিসেবে যে ঢাকা লাভ করে তা ১৭২২ সালে মুর্শিদ কুলি খান সৃষ্ট 'চাকলা জাহাঙ্গীরনগর' নামে পরিচিত ছিল।[১] ঢাকা জেলা হিসেবে ঠিক কখন যাত্রা শুরু করে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে যখন প্রত্যেক পরগণা, সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে 'ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা প্রশাসন গড়ে তোলেন[২] তখন থেকেই ঢাকা জেলার যাত্রা শুরু। এরপর ১৮২৯ সালে ঢাকা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।[৩] ১৭৪৭ সালের বাংলা ভাগের পর ঢাকা বিভাগ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের অধীন ছিল ঢাকা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলা।[৪]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তৎকালীন ঢাকা বিভাগের প্রত্যেকটি জেলায় ও মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে, ঢাকা বিভাগ ঐ ১১টি সেক্টরের মধ্যে ২, ৩, ৮ ও ১১নং সেক্টরভুক্ত হয়। সেক্টরভুক্ত এসব এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনী ও যথাযথ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় ভারতে প্রশিক্ষিত ও আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধাগণ ঢাকা বিভাগে অবস্থানরত দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিযোদ্ধাদল ছাড়াও ঢাকা বিভাগভুক্ত টাঙ্গাইল জেলায় 'কাদেরিয়া বাহিনী' ও 'বাতেন বাহিনী', ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানায় 'আফসার বাহিনী', ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় 'হালিম বাহিনী' ও নরসিংদী মহকুমায় 'মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী' এবং ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় 'হেমায়েত বাহিনী' নামে ছয়টি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। আলোচ্য বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ড বর্তমান অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

কাদেরিয়া বাহিনী

টাঙ্গাইল

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর থানাকে কেন্দ্র করে একটি আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে। এই দলের কর্মতৎপরতা প্রধানত টাঙ্গাইল জেলাব্যাপী বিস্তৃত হলেও তা টাঙ্গাইলের পার্শ্ববর্তী তৎকালীন ময়মনসিংহ সিরাজগঞ্জ ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ করা যায়। এই দলের প্রধান সংগঠক ছিলেন টাঙ্গাইলের সুপরিচিত 'সিদ্দিকী পরিবার' এর সন্তান আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (এরপর থেকে শুধু 'কাদের সিদ্দিকী' নামে লেখা হবে)। কাদের সিদ্দিকীর জন্ম ১৯৪৮ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ছাতিহাটি গ্রামে। তার পিতার নাম আব্দুল আলী সিদ্দিকী ও মাতার নাম লতিফা সিদ্দিকী। তার পিতা টাঙ্গাইল জজ কোর্টের একজন নামকরা আইনজীবী ছিলেন।

১৯৭১ সালে কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এর পূর্বে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে পুনরায় শিক্ষাজীবনে ফিরে আসেন ও ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন।[৫] ১৯৭১ এর মার্চে গঠিত টাঙ্গাইল জেলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে তিনি যুগ্ম আহ্বায়কের ভূমিকা পালন করেন।[৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার জন্য তিনি 'বাঘা সিদ্দিকী' নামেও পরিচিত। তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারণার মাধ্যমে 'কাদেরিয়া বাহিনী' নামে পরিচিতি পায়। বস্তুত, কাদের সিদ্দিকীর একক সাংগঠনিক দক্ষতায় গড়ে ওঠা এই মুক্তিদল বাহিনী প্রধানের নামানুসারে অবরুদ্ধ জনগণের নিকট কাদেরিয়া বাহিনী নামেই সমধিক পরিচিত ছিল।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল টাঙ্গাইল। পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এ জেলার জাতীয় পরিষদের পাঁচটি ও প্রাদেশিক পরিষদের নয়টি আসনেই জয়ী হয়। এই নির্বাচনে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল) যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ (টাঙ্গাইল-১) ও প্রাদেশিক পরিষদ (টাঙ্গাইল-৬) আসনে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্য হলেন ব্যারিস্টার শওকত আলী খান (টাঙ্গাইল-২), অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালিদ (টাঙ্গাইল-৩), হাতেম আলী তালুকদার (টাঙ্গাইল-৪), শামসুর রহমান খান শাজাহান (টাঙ্গাইল-৫) এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে রাফিয়া আক্তার ডলি। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হলেন ডা. নিজাম উল ইসলাম (টাঙ্গাইল-১), বদিউজ্জামান খান (টাঙ্গাইল-২), আবদুল বাছেত সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল-৩), আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী (টাঙ্গাইল-৪), ইনছান আলী মোক্তার (টাঙ্গাইল-৫), সেতাব আলী খান মোক্তার (টাঙ্গাইল-৭), ফজলুর রহমান খান (টাঙ্গাইল-৮), শামসুদ্দীন আহমেদ (টাঙ্গাইল-৯)[৭]

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ হিসেবে ৩ মার্চ নির্ধারণ করেন। কিন্তু, ১ মার্চ আকস্মিকভাবে তিনি উক্ত

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে টাঙ্গাইলে এ ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২ ও ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ডাকে টাঙ্গাইলে হরতাল পালিত হয়।

এদিকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারাদেশে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠনের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে টাঙ্গাইলে 'জয় বাংলা বাহিনী' গঠন করা হয়। টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম ছিলেন এই বাহিনীর মূল নেতা। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন এই বাহিনীর অন্যতম সংগঠক।[৮] মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ মাঠে 'জয় বাংলা বাহিনী'র প্রায় চারশ সদস্যের প্রশিক্ষণ হয় টানা একমাস। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন ধরের বাড়ি গ্রামের জয়নাল আবেদীন।

১৯৭১ এর ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির আলোকে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ গণসংযোগ, হরতালসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে থাকেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালিয়েছে এ মর্মে খবর টাঙ্গাইলে পৌঁছালে টাঙ্গাইল শহরের অলিগলি থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ছাত্র-যুবক-জনতা।[৯] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মীর্জা তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল) শহরের আদালত পাড়াস্থ অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামের বাসায় ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 'টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন বদিউজ্জামান খান এমপিএ ও আহ্বায়ক নির্বাচিত হন আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এমপিএ। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন (১) সৈয়দ আব্দুল মতিন (ন্যাপ), (২) জনাব আল মুজাহিদী (জাতীয় লীগ) (৩) হবিবুর রহমান হবি মিয়া (সাধারণ সম্পাদক, মোটর এ্যাসোসিয়েশন), (৪) শামসুর রহমান খান শাজাহান এমএনএ, (৫) ফজলুর রহমান খান ফারুক এমপিএ, (৬) অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম (৭) আলী আকবর খান খোকা ও (৮) বীরেন্দ্র কুমার সাহা। এই কমিটির উপদেষ্টা করা হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব খন্দকার আসাদুজ্জামানকে।

উপরে বর্ণিত কমিটি গঠনের পাকিস্তানি পাশাপাশি সর্বদলীয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়

(১) এই কমিটি হবে জেলার সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী;
(২) এই কমিটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করবে;
(৩) এই কমিটির নাম হবে টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ;
(৪) এই পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকবে;
(৫) সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব থাকবে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের উপর। তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কাউকে, কিংবা কয়েকজনকে মনোনীত করে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন;
(৬) সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কাজ করতে পারবে না;
(৭) কমিটি গঠনের মুহুর্ত থেকে টাঙ্গাইল জেলার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব আপনা-আপনি এই কমিটির উপর বর্তাবে।[১০]

এদিকে ২৫ মার্চ গভীর রাতে কাগমারী বেতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি ধরা পড়ে। এই বার্তাটি চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী টাঙ্গাইলের কাগমারী ওয়ারলেস সেন্টারে পাঠান। বার্তাটি কাগমারী ওয়ারলেস সেন্টারের অপারেটর আব্দুর রাজ্জাক ২৬ মার্চ সকাল নয়টার পর আওয়ামী লীগ অফিসে ফোন করে জানান।[১১] এছাড়া বার্তাটি ২৬ মার্চ সকালে কাগমারী ওয়ারলেস স্টেশন থেকে দু'জন পুলিশ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির কাছে পৌঁছে দেন। তিনি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ও সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্তগুলো জনগণের মধ্যে প্রচারের নির্দেশ দেন। স্বাধীনতার ঘোষণা ও সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত প্রচার করা শুরু হলে টাঙ্গাইলের সকল পর্যায়ের প্রশাসনিক প্রধানগণ গণমুক্তি পরিষদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। গণমুক্তি পরিষদের স্থায়ী কার্যালয় হিসেবে টাঙ্গাইলের পুরানো কোর্ট বিল্ডিংকে বেছে নেওয়া হয়।

টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজে তখন ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি অবস্থান করছিল। তারা গণমুক্তি পরিষদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি। ২৭ মার্চ কাদের সিদ্দিকী গণমুক্তি পরিষদের আহ্বায়ক লতিফ সিদ্দিকী এমপিএ-কে সার্কিট হাউজে থাকা সেনাসদস্যদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাগিদ দেন। এদিন পরিষদ আহ্বায়ক কাদের সিদ্দিকীর উপর পুলিশ কোথের দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১২] ২৭ মার্চ রাতে গণমুক্তি পরিষদের নির্দেশে সার্কিট হাউজ ঘেরাও করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ঘেরাও অভিযানে কাদের সিদ্দিকীও ছিলেন। এরপর কাদের সিদ্দিকী ও তার কিছু সহযোগী ২৮ মার্চ সার্কিট হাউজে অবস্থানরত ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানির সহকারী কমান্ডার সুবেদার জিয়াউল হক ভূঁইয়ার সাথে দেখা করে এই কোম্পানিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনেন। এর ফলে জনগণের মধ্যে একটি আশা জেগে ওঠে। এরপর ৩১ মার্চ ইপিআর-এর সদস্যবৃন্দ গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং ঢাকার দিকে প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হলো।[১৩] এরপর ১ এপ্রিল ইপিআর ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের নাটিয়াপাড়ায় এসে ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ৩ এপ্রিল ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দলের সাথে ইপিআর ও মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষ হয় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গোরান-সাটিয়াচরা নামক স্থানে যা টাঙ্গাইল শহর হতে ১২ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। গোরান-সাটিয়াচরা যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদলের অনেক সৈন্য ও রসদ হানি হলেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে ঐ দিনই পাকিস্তানি সৈন্যদল টাঙ্গাইলে প্রবেশ করে।[১৪]

গোরান-সাটিয়াচরার যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী অংশ নিয়েছিলেন। এখানে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়লে তিনি দুটি গাড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ও জ্বালানি নিয়ে টাঙ্গাইলের পাহাড়ি এলাকা সখিপুর থানায় চলে যান। প্রথম দিকে তিনি এ অঞ্চলে থেকেই মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।[১৫] পাশাপাশি তিনি আরেক পাহাড়ি এলাকা হালুয়াঘাটের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। টাঙ্গাইল শহরে পাকিস্তানি সৈন্যদল প্রবেশ করার কিছুদিনের মধ্যেই গণমুক্তি পরিষদ ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ভারতে আশ্রয় নেন। গণমুক্তি পরিষদের আহ্বায়ক লতিফ সিদ্দিকী এমপিএ তখনো ভারতে যাননি। তিনি পুনরায় বিক্ষিপ্ত ইপিআর সদস্যদেরকে সংগঠিত করেন এবং কালিহাতীতে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯ এপ্রিল কালিহাতীতে ইপিআর-এর একটি দলের সাথে পাকিস্তানি সেনাদলের আরেকটি সংঘর্ষ হয় এবং ইপিআর সদস্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এরপর লতিফ সিদ্দিকীও ভারতে আশ্রয় নেন। এর মধ্য দিয়েই টাঙ্গাইল গণমুক্তি পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। কাদের সিদ্দিকী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তার কিছু সঙ্গীসহ কালিহাতীর মরিচা গ্রামে তার বাহিনীর প্রথম শিবির গড়ে তোলেন। এরপর তিনি তার দলসহ সখিপুরে চলে যান এবং সেখানেই গড়ে তোলেন 'কাদেরিয়া বাহিনী'।

সংগঠন

কাদেরিয়া বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকার পরিধি, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যায় ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত একটি বিশাল আঞ্চলিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর দাবি অনুযায়ী বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রায় ১৭ হাজার এবং স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রায় ৭২ হাজার।[১৬] অন্য একটি উৎসে এ বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যা ১৫ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] তবে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক বিভাগের প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ জানাচ্ছেন- কাদেরিয়া বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন ১৪ হাজার (প্রায়) ও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন ৬০ হাজারের বেশি।[১৮] এই বাহিনী পরিচালনার জন্য বিশেষত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সংগঠন গড়ে তোলা হয়। বাহিনীর প্রথম সদর সপ্তর স্থাপন করা হয় সখিপুর থানা থেকে ৪ কি.মি. উত্তরে কচুয়া ও বহেরাতৈলের মাঝামাঝি গ্রাম আন্ধিতে।[১৯] জুলাইয়ের প্রথম থেকে অবশ্য সদর দপ্তর পরিবর্তন করে সখিপুরের মহানন্দপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনকে বেছে নেওয়া হয়। তখন থেকে আন্ধি ঘাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রানজিট ও ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

উল্লেখ্য, এপ্রিলের শেষ নাগাদ পুরো টাঙ্গাইলে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে কাদের সিদ্দিকী মুক্তিবাহিনী গঠন করছেন। এ খবরে টাঙ্গাইলের সখিপুর, বাশাইল, কালিহাতী, ফুলবাড়িয়া, মধুপুর, ঘাটাইল তথা উত্তর টাঙ্গাইলের ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য পেশার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ কাদের সিদ্দিকীর দলে যোগ দিতে শুরু করেন। এই যোদ্ধা দলকে আরো শাক্তিশালী করেন উল্লিখিত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধপন্থি ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর প্রাক্তন বা ছুটিতে থাকা বা পাকিস্তানের পক্ষত্যাগকারী সদস্যবৃন্দ। মে মাসের মাঝামাঝি এ বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা যেখানে প্রায় চারশত ছিল, জুলাই মাসে বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় তিন হাজারে পৌঁছে।[২০] মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি এ বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের কার্যক্রমও চলতে থাকে। নভেম্বর নাগাদ টাঙ্গাইলসহ ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এলাকা থেকে এই বাহিনীতে যোগ দেওয়া সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজারে ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ৬০ হাজারের উর্দ্ধে পৌঁছে।[২১] স্মর্তব্য যে, ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকের উল্লিখিত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

সমর শক্তির বিন্যাস

কাদেরিয়া বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকায় বাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথমবার নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করেছিল:[২২]

কোম্পানি নম্বর	নেতৃত্বে	আওতাভুক্ত এলাকা
এক	অধিনায়ক মনিরুল ইসলাম (মনির)	বড়চওনা, বাটাজোর ও ভালুকা
তিন	অধিনায়ক শওকত মোমেন শাজাহান	দেওপাড়া, সাগরদিঘী ও সখিপুর
চার	অধিনায়ক লোকমান হোসেন ও আব্দুল গফুর	গোপালপুর, ভুয়াপুর ও চলমান কোম্পানি হিসেবে
পাঁচ	অধিনায়ক লাবিবুর রহমান	বাশাইল এলাকা
বার	অধিনায়ক লাল্টু ও সরোয়ার	ভুঞাপুর ও সখিপুর (চলমান দল হিসেবে)
তেইশ	অধিনায়ক: আব্দুল খালেক ও আনোয়ার (এ কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার ও সিগন্যাল প্লাটুন নামে চিহ্নিত)	স্থায়ী দপ্তর, মহানন্দপুর

উপরিল্লিখিত কোম্পানিগুলো তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের সহযোগী শক্তিকে মোকাবেলার পাশাপাশি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করত:

(১) সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে রাস্তাঘাট চেনা, মানচিত্র তৈরি ও হাইড আউট নির্ধারণ করা;

(২) মুক্তিযুদ্ধপন্থি   জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করা;

(৩) প্রয়োজনবোধে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (ব্রিজ, রাস্তা, অন্যান্য) বিনষ্ট করা;

(৪) চুরি-ডাকাতি নিবারণ করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। প্রয়োজনবোধে দুস্কৃতকারী নিধন করা;

কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ও অস্ত্রবল যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এই বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা তত বাড়তে থাকে। উল্লেখ্য যে, টাঙ্গাইল পতনের পরপর কবি বুলবুল খান মাহবুব বামপন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের নিয়ে একটি মুক্তিদল গড়ে তোলেন। একই রকমভাবে আনোয়ার উল আলম শহীদ ও কয়েকজন মিলে জুনের মাঝামাঝি নাগাদ আরো একটি ছোট দল গড়ে তুলেছিলেন। জুনের শেষ সপ্তাহ নাগাদ উল্লিখিত দুটি দলই কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে যুক্ত হন।[২৩] ফলে এই বাহিনীর কর্মতৎপরতা জুন মাস থেকেই দুটি ভাগে চলতে থাকে। এর একদিকে চলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ, অন্যদিকে চলে সৃষ্ট মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।[২৪] সখিপুরের মহানন্দপুরে সদর দপ্তর (পরিবর্তিত) স্থাপন করার পর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী ইতোমধ্যে গড়ে তোলা মুক্তাঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য নিম্নলিখিত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন ও ঘাঁটি পুনর্বিন্যাস করেন:[২৫]

বহেরাতৈল ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ৪ নং কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান; সহঅধিনায়ক গোলাম মোস্তফা
মরিচা ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ২ নং কোম্পানি কমান্ডার নবী নেওয়াজ
দেওপাড়া ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ১ নং কোম্পানি কমান্ডার লোকমান হোসেন
রাঙামাটি ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ১১ নং কোম্পানি কমান্ডার মনিরুল ইসলাম
ধলাপাড়া ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ১ নং (ক) কোম্পানি কমান্ডার হাকিম
আছিম ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ১২ নং কোম্পানি কমান্ডার লাল্টু ও সহ অধিনায়ক গোলাম সরোয়ার
ভালুকা-শ্রীপুর ঘাঁটি	:	৬ নং কোম্পানি অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ[২৬]
হতেয়া ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ১৩ নং কোম্পানি কমান্ডার হবি; সহ অধিনায়ক ইউনুস
পাথরঘাটা ঘাঁটি	:	অধিনায়ক ৩ নং কোম্পানি কমান্ডার মতিয়ার রহমান; সহ অধিনায়ক মোকাদ্দেছ আলী।

উল্লিখিত মুক্তাঞ্চলের পাশাপাশি টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের পশ্চিম দিক থেকে যমুনার পাড় পর্যন্ত বিরাট চরভর এলাকায় আরেকটি মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে। উত্তরে জগন্নাথগঞ্জ ঘাট থেকে দক্ষিণে নাগরপুর পর্যন্ত ধলেশ্বরী যমুনা নদীর চরাঞ্চল মিলে গড়ে ওঠে এই মুক্তাঞ্চল। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক সদর দপ্তর করা হয় ভূঞাপুর থানায়। এই নতুন মুক্তাঞ্চলের জন্য নিম্নোক্ত তিন কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিযুক্ত করা হয়:[২৭]

১ নং (খ) কোম্পানি: অধিনায়ক নায়েক আব্দুল গফুর

১নং (গ) কোম্পানি: অধিনায়ক নায়েক খুরশীদ আলম

২৭ নং বাঘা কোম্পানি: অধিনায়ক নায়েক হাবিবুর রহমান

উল্লিখিত ২৭ নং কোম্পানির প্রধান দায়িত্ব ছিল ভূঞাপুর থানা এলাকা প্রতিরক্ষার। এর পাশাপাশি এই কোম্পানির উপর বাড়তি দায়িত্ব ছিল নদীপথ আগলে রাখার। এই কোম্পানিকে সাহায্য করতে

রেজাউল করিম, আমানউল্লাহ, হুমায়ুন ও বেনুর নেতৃত্বে তিনশ মুক্তিযোদ্ধার আরো কয়েকটি দল পাঠানো হয়। এর বাইরে বেসামরিক সদর দপ্তরের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য খলিলুর রহমানের অধিনায়কত্বে ১৩ (ক) কোম্পানি দায়িত্ব পালন করে। এই কোম্পানির আরেকটি প্লাটুন সদর দপ্তরের বেসামরিক বিভাগের সহায়তায় নিযুক্ত ছিল।

অক্টোবরের তৃতীয় ভাগে এসে কাদেরিয়া বাহিনীর সামরিক শক্তি পুনর্বার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। সামরিক শক্তি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই বাহিনীর ৯৭ টি কোম্পানি সমগ্র টাঙ্গাইল, ঢাকা জেলার তিনটি, ময়মনসিংহের চারটি, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জের চারটি, মানিকগঞ্জের তিনটি, বগুড়ার দুটি থানায় ছড়িয়ে আছে। এবং এই বাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ বাহিনীর আওতাভুক্ত সমগ্র এলাকাকে ৫টি সামরিক সেক্টরে বিভক্ত করে পূর্বোল্লিখিত ৯৭ টি কোম্পানিকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের জন্য একজন সেক্টর কমান্ডার ও কয়েকজন কমান্ডারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি সেক্টরের জন্যই আলাদা আলাদা সদর দপ্তর অনুমোদিত ছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর সামরিক শক্তির সর্বশেষ পুনর্বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ[২৮] :

এক নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরভুক্ত এলাকা ছিল টাঙ্গাইল-মধুপুর সড়কের পশ্চিম থেকে যমুনার বিস্তীর্ণ এলাকা। এই সেক্টরের মূল লক্ষ্য ছিল গোপালপুর, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, ধনবাড়ির শত্রু ঘাঁটির এবং টাঙ্গাইল-মধুপুর-ধনবাড়ি সড়কের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর আব্দুল হাকিম। সেক্টর কমান্ডারের অধীন অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন কমান্ডার আনিস, মেজর আঙ্গুর, ক্যাপ্টেন আরজু, মেজর তারা, ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন হবি, ক্যাপ্টেন চান্দ মিয়া। এই সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল গোপালপুরের নলিনবাজার।

দুই নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরের আওতাভুক্ত এলাকা ছিল ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের পশ্চিমে মির্জাপুর, নাগরপুর, টাঙ্গাইল থানা; মানিকগঞ্জের ধামরাই, ঘিওর, সাটুরিয়া; সিরাজগঞ্জের চৌহালী ও বেতিল থানা। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর হাবিব। মেজর হাবিবের নেতৃত্বে অন্যান্য কমান্ডাদের অন্যতম ছিলেন কমান্ডার সুলতান, কমান্ডার মঈনুদ্দীন, কমান্ডার মোজাম্মেল। নাগরপুর থানার সলিমাবাদে এই সেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় যার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন করটিয়া সাদত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শাহ আলম।

তিন নম্বর সেক্টর: ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের পূর্ব পাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও টাঙ্গাইল শহরের শত্রু ঘাঁটি ছিল এই সেক্টরের পরিধিভুক্ত। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল ফজলুর রহমান। তার সহযোগী অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা ছিলেন মেজর মনিরুল ইসলাম, মেজর মোস্তফা, মেজর লোকমান, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন কলিবুর রহমান বাঙালি, কমান্ডার মতি, কমান্ডার মোকাদ্দেছ, ক্যাপ্টেন আজাদ কামাল, ক্যাপ্টেন জসিম, ক্যাপ্টেন আমাউল্লাহ। এই সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল সখিপুরের বহেরাতলী।

চার নম্বর সেক্টর: টাঙ্গাইল-মধুপুর সড়কের পূর্বাংশের সমস্ত এলাকা এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সেক্টরের প্রধান লক্ষ্য ছিল কালিহাতী ও ঘাটাইল থানা এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কে যাতায়াতকারী শত্রুর কনভয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নবী নেওয়াজ ও সহকারী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন গোলাম সরোয়ার, ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ, ক্যাপ্টেন রিয়াজ ও ক্যাপ্টেন শাহজাহান। সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল কালিহাতীর মরিচাতে।

পাঁচ নম্বর সেক্টর: এই সেক্টরের আওতাভুক্ত এলাকা ছিল মধুপুর, মুক্তাগাছা ও ভালুকা এবং লক্ষ্যবস্তু ছিল শত্রুর মধুপুর, জলছত্র, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল ও ভালুকা থানা এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-ভালুকা সড়কে যাতায়াতকারী শত্রুর কনভয়। এই সেক্টরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর আফসার ও পূর্ব উত্তর অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপ্টেন লাল্টুর উপর। এই সেক্টরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমান্ডারগণ ছিলেন ক্যাপ্টেন ইদ্রিস, মেজর আব্দুল গফুর, কমান্ডার আব্দুস সামাদ।

এছাড়া মুক্তাঞ্চল ও স্থায়ী ঘাঁটি রক্ষার জন্য পঞ্চাশটি কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। বাকি কোম্পানিগুলোকে চলমান ভিত্তিতে রাখা হয় যাতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদেরকে ব্যবহার করা যায়। কাদেরিয়া বাহিনীর সকল কার্যক্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর একটি হল সামরিক কার্যক্রম ও অপরটি বেসামরিক কার্যক্রম। সামরিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধানত:

(ক) অস্ত্র সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ;
(গ) প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন, যুদ্ধ পরিচালনা ও মুক্তাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ;

এগুলোর বাইরে জনসংযোগ, সাধারণ প্রশাসন, অর্থ সংগ্রহ ও হিসাবরক্ষণ, প্রচার কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম ছিল বেসামরিক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। এই বেসামরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। এই বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান ছিলেন জনাব আনোয়ার উল আলম শহীদ। তার নেতৃত্বে অধিক কার্যকর হয়ে ওঠা বেসামরিক প্রশাসন নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হতো:[২৯]

জনসংযোগ বিভাগ: জনসংযোগ বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা ও তার প্রতিকার সাধন। গণপরিষদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাছেত সিদ্দিকী এই বিভাগের দায়িত্ব কিছুদিন পালন করেছিলেন।

অর্থ বিভাগ: এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক আনোয়ার হোসেন। বাহিনীর সকল প্রকার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণই ছিল এ বিভাগের প্রধান কাজ।

প্রচার বিভাগ: মুক্তিবাহিনীর যাবতীয় প্রচারযোগ্য সংবাদ, নির্দেশনামা, উদ্দীপনামূলক রচনা জনগণের মধ্যে প্রচার করা ও বাহিনীর যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ করা এই বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। এই বিভাগ থেকে *রণাঙ্গন* নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হতো। প্রচার বিভাগের দায়িত্বে শুরু থেকে ছিলেন ফারুক আহমেদ, সৈয়দ নুর ও কচুয়ার আব্দুল্লাহ। পরবর্তীকালে এই বিভাগে যুক্ত হন অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, সোহরাব আলী খান আরজু ও অধ্যাপক কাজী আতোয়ার। কবি রফিক আজাদ ও অধ্যাপক শরীফও কিছুদিন ওই বিভাগে কাজ করেছিলেন।

খাদ্য বিভাগ: খাদ্য বিভাগের প্রধান কাজ ছিল খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখা। বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবকদের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব পালন করতেন করটিয়া সাদত কলেজের ছাত্র ওসমান গণি ও তার ভাই আলী। এছাড়া, এই বিভাগের মূল দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন হামিদুল হক, খোরশেদ মাস্টার, আওয়াল সিদ্দিকী, খোরশেদ আলম, আব্দুল আলীম, ভোলা ও মোয়াজ্জেম হোসেন খান, নয়া মুন্সী।

স্বাস্থ্য বিভাগ: স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ছিল প্রধানত আহত বা অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। তবে মুক্তিবাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার সাধারণ মানুষকেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হতো। স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র ডা.

শাহজাদা চৌধুরী, ডা. নিশি রঞ্জন সাহা ও আমজাদ হোসেন মাস্টার। এদের নেতৃত্বে আন্ধি গ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণে একটি বাড়িতে বাহিনীর কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও বেশ কয়েকটা অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। এই হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য বিভাগের সূচনা হয় হামিদুল হক, শওকত মোমেন শাহজাহান ও আমজাদ হোসেনের প্রচেষ্টায়। হাসপাতালের সূচনাপর্ব থেকে এখানে চিকিৎসক হিসেবে ছিলেন ডা. অমল কৃষ্ণ সরকার[৩০]

বেতার ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ: মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর সাফল্যের অন্যতম কারিগর ছিল এই বিভাগের কর্মীবৃন্দ। বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ও শত্রুপক্ষের বিভিন্ন সংবাদ দক্ষতার সাথে আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই বিভাগ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম দিকে এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন অপারেটর আনিস। পরে এ দায়িত্ব পালন করেন আজিজ বাঙ্গাল, শামসু, রশিদ, আব্দুল আজিজ, হাকিম প্রমুখ। বাহিনীর নিজস্ব বেতার যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছিল মহানন্দপুর সদর দপ্তর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ইংরাজ নামক এক কাঠুরিয়ার বাড়িতে। এই পরিবার যুদ্ধকালীন পুরোটা সময়ে বাহিনীর অপারেটরদের খাদ্য ও বস্ত্র চাহিদা পূরণ করেছিল। এই বিভাগের অন্যতম অপারেটর ছিলেন টাঙ্গাইল ক্যাডেট কলেজ বেতার ঘাঁটির আবু বকর সিদ্দিকী। তাছাড়া, কাদেরিয়া বাহিনীর ওয়ারলেস অপারেটরদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতেন কাগমারী রেডিও স্টেশনের আব্দুর রাজ্জাক, মানিকগঞ্জ স্টেশনের জিল্লুর রহমান, জামালপুর স্টেশনের মুজিবুর রহমান ও সিরাজগঞ্জের আব্দুর রহমান।

গোয়েন্দা বিভাগঃ বাহিনীর সদস্যদের কর্মকাণ্ড তথা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি করে প্রাপ্ত খবরাদি সদর দপ্তরকে জানানো ছিল এই বিভাগের কাজ। এছাড়া, শত্রুপক্ষের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ খবরাদিও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া এ বিভাগের অন্যতম কাজ ছিল। শুরুর দিকে এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন আব্দুল খালেক, আনোয়ার এবং মুছা। জুলাই থেকে এ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেন নুরুন্নবী।

বিচার বিভাগঃ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও আওতাভুক্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একটি বিচার বিভাগ গঠন করা হয়। সাধারণত কাদের সিদ্দিকী, আনোয়ার উল আলম শহীদসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয়ভাবে বিচার বিভাগ পরিচালনা করতেন। তাছাড়া, এলাকাভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণই বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া, দণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আটকে রাখার জন্য একটি বিশেষ কারাগার ছিল। এ কারাগার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। তাকে সহযোগিতা করেছেন আনসার আলী ও মহু সর্দার।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব বন্টন, তাদেরকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একটি দল কাজ করতেন। এ দলের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন সোহরাব আলী খান আরজু ও আলী আজগর খান দাউদ। সুনির্দিষ্ট পরিচালন নীতিমালার মাধ্যমে কাদেরিয়া বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দলকে সংগঠিত করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক দলই ছিল কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের মাঝে মূল সেতু। উল্লেখ্য, কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসনের উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সখিপুরের হামিদুল হক। মোয়াজ্জেম হোসেন খান, আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, আব্দুল আলীম, সৈয়দ জিয়া, আব্দুল হামিদ ভোলা ও খন্দকার নুরুল ইসলাম আঞ্চলিক বেসামরিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া, মোহাম্মদ নুরুন্নবী ছিলেন এ বাহিনীর প্রধান লিঁয়াজো অফিসার ও নুরুল ইসলাম ছিলেন লিঁয়াজো অফিসার।[৩১]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহ

কাদেরিয়া বাহিনীর সূচনা পর্বে যারা এ বাহিনীর সদস্য ছিলেন, তাদের অধিকাংশই টাঙ্গাইলের মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ মাঠে প্রায় মাসব্যাপী চলা 'জয় বাংলা বাহিনী' আয়োজিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তবে এই প্রশিক্ষণ ছিল সাধারণ মানের এবং তখনই সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অনুপযোগী। তবুও এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অন্তত সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একটি মানসিক প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলেন। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অন্তর্ভুক্তকরণ শুরু হয় সখিপুরের বহেরাতৈলে ৮ মে থেকে।[৩২] এই বহেরাতৈল ক্যাম্পেই বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর বাহিনীর অন্যতম প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করা হয় সখিপুর থানা থেকে ৪ কি. মি. উত্তরে কচুয়া ও বহেরাতৈলের মাঝামাঝি আন্ধিতে। এই ক্যাম্পের উদ্যোক্তা ছিলেন শওকত মোমেন শাজাহান। এই কেন্দ্রে বাহিনীর অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে রিক্রুটিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন খোরশেদ আলম। আন্ধি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ছিলেন কোকডহরার স্বপন ভট্টাচার্য।[৩৩] এর বাইরে বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি কোম্পানির কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডারদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা নিজ নিজ আওতাভুক্ত এলাকার বিভিন্ন ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এসব প্রশিক্ষণকার্য প্রধানত ই বি আর অথবা ইপিআর ফেরত সদস্যরাই তত্ত্বাবধান করতেন। বাহিনী প্রধানের বক্তব্যনুযায়ী 'শত্রুর মোকাবেলা করেই বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধ শিখেছেন'।[৩৪]

কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের প্রথম উৎস ছিল টাঙ্গাইলের পুলিশ কোথ। ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইলের পতন ঘটলে কাদের সিদ্দিকী ও তার সহযোদ্ধারা ইতোমধ্যে টাঙ্গাইল পুলিশ কোথ থেকে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে প্রায় ২০টি রাইফেল সাথে নিয়ে সখিপুরের দিকে রওনা হন।[৩৫] এরপর ১৯ এপ্রিলে সংঘটিত কালিহাতী যুদ্ধের পর ইপিআর সদস্যদের ফেলে যাওয়া ১টি ব্রিটিশ এলএমজি, এলএমজি ম্যাগজিনের ১টি বক্স, ৪টি রাইফেল, গুলিভর্তি ২টি বাক্স ও ১টি কলসি এবং সতেরটি গ্রেনেড ৩ মে পাওয়া গেল কুমার পাড়া থেকে ইপিআর সদস্য মনিরুল ইসলামের প্রদত্ত খবরের ভিত্তিতে।[৩৬] ৭ মে আব্দুল মালেকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কাছাকাছি আঙ্গারগারা ফরেস্ট অফিসের ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত পরশুরাম মেম্বারের বাড়ি থেকে ২টি ব্রিটিশ রকেট লাঞ্চার, ৩টি ২ ইঞ্চি মর্টার, ২০টি স্টেনগান, ১৪০টি রাইফেল, ৩টি বেরি লাইট, ৪০ হাজার নানা ধরনের গুলি, ১২টি ব্রিটিশ'র ম্যাগাজিন বক্স, ৩০০ এর বেশি গ্রেনেড পাওয়া যায়।[৩৭] এছাড়া, ইতোমধ্যে কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দেওয়া ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যদের সাথে করে আনা অস্ত্রশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রের চাহিদা কিছুটা মিটিয়েছিল। এর বাইরে ২২ মে কালিহাতীর চারানে এ বাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংঘটিত যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া কিছু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্রসামর্থ্য বৃদ্ধি করে।[৩৮] এভাবে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার-দালালদের সাথে যুদ্ধ করে এই বাহিনী অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেছিল। এছাড়া, জুলাই মাসের ৭ তারিখ ভারত থেকে ছয়টি নৌকায় বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বাহিনীর অস্ত্রসম্ভারে যুক্ত হয়।[৩৯] তবে এ বাহিনীর অস্ত্র চাহিদা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মিটে যায় ১১ আগস্ট মেজর হাবিবের নেতৃত্বে ভুঞাপুরের মাটিকাটা এলাকায় শত্রুদলের অস্ত্রবোঝাই ২টি জাহাজ আটকের মাধ্যমে। এই জাহাজ দুটি থেকে নিম্নোক্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল:[৪০]

চাইনিজ ৩ ইঞ্চি মর্টার শেল	:	এক লক্ষ কুড়ি হাজার
চাইনিজ আড়াই ইঞ্চি মর্টার শেল	:	দশ হাজার
ব্রিটিশ ২ ইঞ্চি মর্টার শেল	:	চল্লিশ হাজার
৮২ ব্লান্ডার সাইট শেল	:	ষাট হাজার
৭২ আরআর শেল	:	বার হাজার
৬ পাউন্ডার শেল	:	সাত হাজার

১২০ এমএম শেল	:	পাঁচ হাজার বাক্স
চাইনিজ রাইফেল	:	পঁচিশ টি
৩০৩ রাইফেল	:	একশটি
৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড	:	সত্তর হাজার
স্মোক গ্রেনেড	:	দশ হাজার
চাইনিজ এমজি	:	দুটি
চাইনিজ ৭.৬২ গুলি	:	দশ লক্ষ
চাইনিজ ৭.৬৫ গুলি	:	দু লক্ষ
৩০৩ গুলি	:	এক লক্ষ
চাইনিজ এমজি গুলি	:	পাঁচ হাজার

বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা

কাদেরিয়া বাহিনী মূলত টাঙ্গাইল জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে এই বাহিনী পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মোটা দাগে এই বাহিনী পুরো টাঙ্গাইল জেলা, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষসহ প্রায় ৩৮৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সক্রিয় ছিল।[৪১] এর মধ্যে উত্তরে মধুপুর-ময়মনসিংহ সড়কের দক্ষিণ থেকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর এর উত্তর পর্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল জঙ্গল এলাকা, পূর্বে ভালুকা, গফরগাঁও ও শ্রীপুর, পশ্চিমে টাঙ্গাইল-মধুপুর সড়ক প্রায় ৩০ মাইল অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা এ বাহিনীর করায়ত্তে ছিল।[৪২] এর মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার পূর্বে সখিপুর থানায় একটি এবং পশ্চিমে ভুঞাপুর থানাসহ যমুনার চরভর এলাকায় একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য যে, সমগ্র দেশকে বাংলাদেশ সরকার যে ১১টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করেছিল, তার মধ্যে ৩, ৭ ও ১১ নং সেক্টরব্যাপী কাদেরিয়া বাহিনীর কর্ম তৎপরতা লক্ষ করা যায়।

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ: ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধীন ৩৬ পদাতিক ডিভিশনের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের অন্যতম ছিল ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। এই ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। ডিভিশন অধিনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল মুহম্মদ জামশেদ খান। এই ডিভিশনের অধীন ৯৩ পদাতিক ব্রিগেড টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এই ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান। এই ব্রিগেডের সদর দপ্তর ছিল ময়মনসিংহ। মুক্তিযুদ্ধকালে এই ব্রিগেডের সেনাবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:[৪৩]

৯৩ পদাতিক ব্রিগেড : আওতাভুক্ত এলাকা ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা
৮৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি : জামালপুর ও শেরপুর এলাকা

৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট	:	ময়মনসিংহ, ফুলপুর ও হালুয়াঘাট এলাকা
৩১ বালুচ রেজিমেন্ট	:	জামালপুর, রাজেন্দ্রগঞ্জ, হাতিবান্ধা, দেওয়ানগঞ্জ ও টাঙ্গাইল এলাকা
৭০ উইং রেঞ্জার্স	:	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর এলাকা
৭১ উইং রেঞ্জার্স	:	জারিয়া, শিবগঞ্জ, বিরিশিরি ও ঝাঞ্জাইল এলাকা
রাজাকার কোম্পানি	:	ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন এলাকা

যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই ৯৩ ব্রিগেডের (৭১ উইং রেঞ্জার্স বাদে) মুখোমুখি হতে হয়েছিল কাদেরিয়া বাহিনীকে। শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করার যুদ্ধকৌশল হিসেবে কাদেরিয়া বাহিনী গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি ও সম্মুখ যুদ্ধ পদ্ধতি উভয়ই অনুসরণ করেছিল। উল্লেখ্য, গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির সাধারণ কৌশল 'আঘাত কর ও সরে পড়' এর স্থলে কাদেরিয়া বাহিনীর গেরিলা কৌশল ছিল 'আঘাত করো ও অবস্থান করো'। এরপর যুদ্ধের শেষভাগে এই বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন এনে কৌশল ঠিক করা হয় 'আঘাত করো, অবস্থান করো এবং এগিয়ে যাও'।[৪৪] গেরিলা যুদ্ধের এই ধারাটি প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকর হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে কাদেরিয়া বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সাথে অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে প্রতিদিনই এই বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ নিজ নিজ আওতাভুক্ত এলাকায় ছোট-বড় কোনো না কোনো অভিযানে ব্যস্ত থাকতেন। সে হিসেবে এই বাহিনী তিনশতাধিক যুদ্ধাভিযানে যুক্ত ছিল।[৪৫] এছাড়া গুরুত্ব বিবেচনায় এ বাহিনীর প্রায় একশটি যুদ্ধের উল্লেখ আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। অবশ্য এই সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। কাদেরিয়া বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম মনে করেন যে, এই বাহিনীর যোদ্ধাগণ ৭০টি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৪৬] যাহোক, কাদেরিয়া বাহিনীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

চারান অভিযান[৪৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১২ মে বিকাল বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ১২ মে কালিহাতীর বল্লা বাজারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল অগ্নিসংযোগ করে ও অর্ধশতাধিক সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিয়ে স্থানীয় মানুষের মনোবল ফেরানোর উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা এই গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আব্দুস সবুর, খোরশেদ আলম, মনিরুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, আব্দুল হালিম, আবু নাসির, আব্দুর রশিদ, ছাবদুল ও শামসু এলএমজি, রকেট লাঞ্চার, ২ ইঞ্চি মর্টার, রাইফেল ও গ্রেনেড নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: চারান গ্রামটি টাঙ্গাইলের কালিহাতী থানার টাঙ্গাইল-ধলাপাড়া রাস্তা ও কালিহাতী-বল্লা রাস্তার নিকট অবস্থিত। এই গ্রামেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদলকে আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে থাকেন। পাকিস্তানি সৈন্যদল বল্লা বাজার আক্রমণ শেষে যখন টাঙ্গাইল-ধলা পাড়া রাস্তা ধরে ফিরে যাচ্ছিলেন তখনই মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দায় তাদেরকে আক্রমণ করেন। পাকিস্তানি সৈন্যদলও খানিকটা সময় ধরে পজিশন নিয়ে ফিরতি আক্রমণ চালান। শত্রুসৈন্যের মেশিনগানের গুলির জবাবে মুক্তিযোদ্ধারা রকেট লাঞ্চার, ২ ইঞ্চি মর্টার ও বেশ কয়েকটি হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেন। জীবনহানি এড়াতে পাকিস্তানি সৈন্যরা কালিহাতীর দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ প্রায় আধাঘণ্টা চলে।

ফলাফল: এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদলের মধ্যে চারজন নিহত ও চৌদ্দজন আহত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানি সৈন্যের পলায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ মুক্তিবাহিনীর সামর্থ্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন।

বল্লা অভিযান[৪৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১২ জুন সকাল সাড়ে নয়টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: কালিহাতী ক্যাম্প থেকে প্রায় একশ জনের একটি পাকিস্তানি সৈন্যদল রাস্তার পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে করতে বল্লা বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলকে আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি সম্পর্কে পাকিস্তানি সৈন্যদল ও স্থানীয় মানুষকে ধারণা দিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদেরিয়া বাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী, এই বাহিনীর লাবিবুর রহমান, হুমায়ন, খোরশেদ আলম, সাইদুর রহমান, আব্দুস সবুর খান, আব্দুল মালেক, আব্দুল হালিম, রফিক, নিতাই পাল, বাবুল সাহা, আমজাদ এবং আফসার বাহিনীর আফসার উদ্দিন আহমেদ ও তার কয়েকজন সহযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার শেল, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র ছিল।

অভিযানের বিবরণ: বল্লা কালিহাতী থানার বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বাজার। এই বাজারের উত্তরের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিল পাকিস্তানি সেনাদল। আর মুক্তিবাহিনীর অবস্থান ছিল বাজার ও বাজার ভেদকারী নদীর দক্ষিণে। ১২ জুন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্যদল বাজারের কাছাকাছি এসে গোলাগুলি ও মর্টার শেল ছুঁড়তে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা রফিকের নিকট থেকে একটি মিসফায়ার হয়ে যায়। এই অবস্থায় কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্যরা একযোগে শত্রুসৈন্যের প্রায় ১০ জনের অগ্রবর্তী দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। এদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্রবর্তী দলের পিছনে থাকা সৈন্যরা তাৎক্ষণিক অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে হালকা ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। এভাবে উভয় পক্ষে প্রায় চার ঘণ্টা লড়াই অব্যাহত থাকে। লড়াইয়ের প্রায় শেষদিকে কমান্ডার লোকমানের নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনীর আরো একটি দল শত্রুসৈন্যের অবস্থানের পূর্ব দিক থেকে শত্রুসৈন্যের দিকে দশের অধিক ২ ইঞ্চি মর্টার শেল নিক্ষেপ করেন। এভাবে দুইদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে শত্রুসৈন্য অবস্থান ছেড়ে কালিহাতীর দিকে পালিয়ে যান।

ফলাফল: যুদ্ধেশেষে পাকিস্তানি সৈন্যের পাঁচটি লাশ পাওয়া যায় এবং চারটি চাইনিজ রাইফেল, চারটি ২ ইঞ্চি মর্টার শেল, একটি রাইফেল, দশটি গ্রেনেড, এক হাজার গুলি উদ্ধার করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এ যুদ্ধের ফলে বল্লা বাজার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ হন।

কামুটিয়া অভিযান[৪৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৭ জুন সকাল ৯টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল টাঙ্গাইল থেকে করটিয়া হয়ে বাসাইলের দিকে আসছিল। অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আব্দুস সবুর, সামসু, সাইদুর, ছানোয়ারসহ মোট ত্রিশজনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, রাইফেল, গ্রেনেড নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: কামুটিয়া বাসাইল থানার প্রায় তিন মাইল পশ্চিমের একটি স্থান। এই স্থানের নামেই এখানে একটি নদী আছে যা প্রকৃতপক্ষে মূল বংশাই নদীর অংশ। এই নদী বাসাইল ও করটিয়াকে ছেদ করেছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা করটিয়া থেকে পূর্বমুখে বাসাইল আসতে এই নদী পার হতে বাধ্য। পাকিস্তানি সৈন্যের বাসাইলমুখী যাত্রা প্রতিরোধ করতে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল কামুটিয়া নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থান নেন। অপরদিকে শত্রুসৈন্যের দল নদীর অপর পাড়ে এসে নৌকা যোগাড় করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা কিছুটা অসতর্ক হয়ে খানিকটা জটলা পাকিয়ে অবস্থান নেন। এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে গুলি চালানো শুরু করেন শত্রুসৈন্যর উদ্দেশে। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে শুরুতে কয়েকজন নিহত ও আহত হন। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে লক্ষ করে ২ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার এবং রকেট লাঞ্চার থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যদল। উভয়পক্ষে ঘণ্টাব্যাপী গুলি বিনিময় চলে। গুলিচালনার ফাঁকেই পাকিস্তানি সৈন্যদল পিছু হটতে থাকে। এই সুযোগে ছোট ডিঙি নৌকাতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নদী পার হয়ে যায়। কিন্তু, পাকিস্তানি সেনারা ততক্ষণে পিছিয়ে করটিয়ার দিকে বাংরা বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে যান।

ফলাফল: এ যুদ্ধে ৫ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন ও বেশ কয়েকজন আহত হন। পাকিস্তানি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছিল না।

পাথরঘাটা অভিযান[৫০]

অভিযানের তারিখ ও সময় : ২৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা (আনুমানিক)।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ২২ জুলাই পাকিস্তানি সৈন্যদল পাথরঘাটায় মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি দখল করে নেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তিবাহিনী পাথরঘাটা ঘাঁটি পুনর্দখল করতে ২৫ জুলাই অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কমান্ডার আব্দুস সবুর খান, মোকাদ্দেছ, মতিয়ারসহ নব্বই জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল, ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও কিছু হালকা অস্ত্র নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: পাথরঘাটা মির্জাপুর থানাধীন একটি স্থান যার অবস্থান মির্জাপুরের উত্তরে ও বাসাইলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ভূকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাথরঘাটা বাজারে পাকিস্তানি সেনাদলের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে প্রায় একশ জনের একটি সৈন্যদল অবস্থান করছিল। তারা ঘাঁটি প্রতিরক্ষায় ঘাঁটির উত্তর-পূর্ব মুখে বাঙ্কার খনন করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটি রেকি করে এসে ছয়টি নৌকায় পাথরঘাটা ঘাঁটির পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে পৌঁছান। এই অভিযানের পূর্বে অবশ্য পাথরঘাটা ঘাঁটির পশ্চিমে থাকা পাকিস্তানি সৈন্যের দেওপাড়া ফরেস্ট ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধারা গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে পশ্চিম দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভীতি মুক্তিবাহিনীর ছিল না। যাহোক, সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ পশ্চিম-দক্ষিণ দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটি আক্রমণ করেন। প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান টের পাওয়া দুইজন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করা হয় এবং এর মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল গুলি ও গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে থানায় ঢুকে পড়েন। এছাড়া, ছয়জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল শত্রুঘাঁটির উত্তর-পূর্বমুখী বাঙ্কারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে থাকেন। এর ফলে বাঙ্কার ছেড়ে পাহারারত সৈন্যগণ পালিয়ে পূর্ব দিকে চলে যান। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে ঘাঁটি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট নাজমুল হুদা ও দুইজন হাবিলদার ও একজন সুবেদার গুলিবিদ্ধ হলে পাকিস্তানি সৈন্যদল নেতৃত্বহীন হয়ে পালাতে থাকেন। প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে এ অভিযান চলমান ছিল।

ফলাফল: পাথরঘাটা ঘাঁটি মুক্তিবাহিনী পুনর্দখল করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি ১৪ জন সৈন্য নিহত হন, ৮ জন সৈন্য বন্দি হন ও ৪ জন সৈন্য আহত হন। এছাড়া, ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় চল্লিশ হাজার নগদ টাকা, ২টি আড়াই ইঞ্চি চাইনিজ মর্টার, ১০টি কারবাইন, ১টি ৮২ ব্লান্ডার সাইট, ২টি এলএমজি, ১টি এম এম জি, ২০টি রাইফেল ও কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল, এবং বেশকিছু গোলাবারুদ হস্তগত করেন। মুক্তিবাহিনীর প্রস্তাবে পাকিস্তানি সৈন্যদল বন্দি বিনিময় করতে রাজি হয়। তারা সত্তর জন বেসামরিক বন্দি ছেড়ে দিয়ে মৃত সৈন্যের লাশ, আহত ও জীবিত সৈন্যদেরকে নিয়ে যান।

মাটিকাটায় জাহাজ দখল অভিযান[৫১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১১ আগস্ট সকাল ১১টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ৯ আগস্ট সিরাজকান্দি ঘাটে অস্ত্র, রসদ ও সৈন্য বোঝাই সাতটি জাহাজ নোঙর করেছিল। এসব অস্ত্র ও সৈন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন এবং এগুলো প্রধানত রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ খবরে কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধাগণ উল্লিখিত অস্ত্রশস্ত্র দখলের জন্য এই অভিযানে অংশ নেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদেরিয়া বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার মেজর হাবিবের নেতৃত্বে জামশেদ, মোতাহার, জিয়া, ভোলা, লুৎফর, রেজাউল করিম, মঞ্জু, সামাদ গামাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক মুক্তিযোদ্ধা দুটি এলএমজি (চাইনিজ), চারটি এলএমজি (ব্রিটিশ), ২ ইঞ্চি মর্টার, ব্রিটিশ রকেট লাঞ্চার, বেশ কয়েকটি চাইনিজ ও ব্রিটিশ রাইফেল নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

অভিযানের বিবরণ: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর থানার সিরাজকান্দি ঘাটের কিছুটা উত্তরে সারিয়াকান্দি মাটিকাটা গ্রামের অবস্থান। এই দিকে নদী কিছুটা অগভীর। ৯ আগস্ট সিরাজকান্দি ঘাটে নোঙর করা উল্লিখিত সাতটি জাহাজ ১১ আগস্ট সকাল ৯ টার দিকে উত্তমুখী হয়ে যাত্রা শুরু করেই আবার থামে। এ অবস্থায় মেজর হাবিব মাটিকাটা গ্রামের উত্তর-দক্ষিণ মুখে অবস্থান নেন। বেলা ১১টার দিকে পুনরায় জাহাজ উত্তর দিকে চলতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে দিয়ে প্রথমে ছোট দুটি জাহাজ চলে যায়। এরপর পূর্বে সংগৃহীত খবর অনুযায়ী ত্রিপলঢাকা রসদ ও অস্ত্রবাহী দুটি বৃহৎ জাহাজ যথাক্রমে ইউএস ইঞ্জিনিয়ার্স এল.সি-৩ ও এস.টি রাজন মুক্তিযোদ্ধাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে। কমান্ডার মেজর হাবিব এই জাহাজ দুটির প্রথমটিতে গুলিবর্ষণ করতেই সমস্ত যোদ্ধা উত্তর-দক্ষিণ অবস্থান থেকে গুলি চালাতে থাকেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র রেজাউল করিম অব্যর্থভাবে নিশানায় পরপর ১০-১২ টি ২ ইঞ্চি মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করেন। ডান পাশ থেকে মঞ্জু ১৫-২০টি রকেট শেল ছুঁড়ে জাহাজের সাড়েঙের কেবিন ও নিচতলার সেনা অবস্থান ঝাঁঝরা করে ফেলেন। এতে আক্রান্ত জাহাজ দুটি থেকে আর কোনো প্রতিরোধ আসেনি। আক্রান্ত জাহাজ দুটির পিছনে থাকা দুটি জাহাজ পালিয়ে দক্ষিণ দিকে এবং ইতোমধ্যে সামনে যাওয়া দুটি জাহাজ সিরাজগঞ্জের দিকে চলে যায়।

ফলাফল: আটককৃত জাহাজ দুটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা একুশ কোটি টাকা মূল্যের নানা ধরনের চাইনিজ, ব্রিটিশ ও মার্কিন অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেন। এর মধ্যে থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রামবাসীর সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামে নিয়ে লুকিয়ে রাখেন (উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ 'প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ' অংশে দেখুন)। প্রায় ষাটভাগ অস্ত্র জাহাজে রেখেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে প্রায় ২০ জন সৈন্য নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩ জন শহিদ ও ৭ জন আহত হন। তবে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী কয়েকদিন পাকিস্তানি সৈন্যদলের ৪৭ ব্রিগেড, ৫১ ব্রিগেড, ভূঞাপুর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে। এবং মাটিকাটা গ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের ওপর বিমান হামলা চালানো হয় ও কাদেরিয়া

বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুরো টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিযুক্ত পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার দল খুবই তৎপর হয়ে ওঠে।

ধলাপাড়া-মাকড়াই অভিযান[৫২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর পর্যন্ত দুই দফায় এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ভূঞাপুরের মাটিকাটা গ্রামে পাকিস্তানি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ আটক করার পর থেকেই কাদেরিয়া বাহিনীর প্রায় প্রতিটি অবস্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদল আঘাত করার চেষ্টা করছিল। ১৬ আগস্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক দল সৈন্য মুক্তিবাহিনীর ধলাপাড়া ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে বের হন। এই সৈন্যদলকে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে পূর্বেই তাদেরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধাগণ উল্লিখিত অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদেরিয়া বাহিনীর প্রায় ছয়টি কোম্পানি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে এই অভিযানে অংশ নেন। এদের কাছে এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩ ইঞ্চি মর্টার, স্টেনগান, ব্লান্ডার সাইট, চাইনিজ ও ব্রিটিশ রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: ধলাপাড়া ঘাটাইল থানার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বংশী নদী। ঘাটাইল থেকে ১২ কি.মি. পূর্ব দিকে ধলাপাড়ার চৌধুরী বাড়ির ঘাটের পূর্বপাড়ে অবস্থান ছিল মুক্তিবাহিনীর ৪ কোম্পানি সৈন্যের। এদের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর হাবিব, মেজর হাকিম, মেজর গফুর ও ক্যাপ্টেন হুমায়ুন। মুক্তিবাহিনীর এই অবস্থানের আরো দুই মাইল পশ্চিমে মাকড়াই গ্রামে ঘাটাইল-ধলাপাড়া রোডের দক্ষিণ পাশে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল যোদ্ধা অবস্থান নিয়েছিলেন। কাদের সিদ্দিকীর ডানে পাঁচশ গজের মধ্যে ছিলেন কুদ্দুস, খোকা, সেলিম সিদ্দিকী এবং বামে হালিম, দুলাল ও কাশেম। কাদের সিদ্দিকীর সাথে ছিলেন সাইদুর, শামসু ও ফজলু। মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থানের আরো দু'মাইল পশ্চিমে কমান্ডার বেণুর নেতৃত্বে এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ঘাটাইল থেকে ধলাপাড়া আসার রাস্তায় অবস্থান নেন। এদিকে প্রায় আটশ নিয়মিত সৈন্য ও দুইশো রাজাকার নিয়ে লে. কর্নেল মোক্তার মোহাম্মদ ও মেজর মমিন ১৬ আগস্ট ভোরবেলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করতে ঘাটাইল থেকে ধলাপাড়ার দিকে রওনা করেন। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তারা ধলাপাড়া চৌধুরী বাড়ির ঘাটের (বংশী নদীর ঘাটে) পশ্চিম পাড়ে অবস্থান নেন। নদী পার হওয়ার জন্য তারা নৌকা যোগাড় করতে চেষ্টা করতে থাকেন। এদিকে নদীর অপর পাড়েই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চার কোম্পানির অবস্থান। নৌকা যোগাড় করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যগণ নদীর পাড়ে কিছুটা অসতর্কভাবে জটলা করে অবস্থান করছিলেন। এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে শত্রুপক্ষের ওপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে প্রথম দিকেই পাকিস্তানি সৈন্যদের বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদলও ততোধিক গুলিবর্ষণ করতে শুরু করেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই যুদ্ধ চলমান থাকে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদল নদী পার হতে পারেননি। এ অবস্থায় তারা ঘাটাইল ফিরে যেতে শুরু করেন। চৌধুরী বাড়ির ঘাট থেকে পশ্চিমে মাকড়াই হয়ে ঘাটাইলের পথে যাত্রা শুরু করার পর (আহত ও নিহত সৈন্যের লাশসহ) পাকিস্তানি সৈন্যরা অনেকটা বিশৃঙ্খলভাবে ঘাটাইলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। স্মর্তব্য যে, মাকড়াই-এ কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল যোদ্ধা ওঁৎ পেতে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের এই অবস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়া শুরু করার কিছুক্ষণ পর পুনরায় তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। রাস্তার দক্ষিণ পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি ছুঁড়ছিলেন আর রাস্তার উত্তর পাশের খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে শত্রুরা পিছু হটতে থাকেন। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরাও কিছুটা সামলে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন। শত্রুসৈন্যের

গুলিতে এখানে মুক্তিবাহিনীর দলনেতা কাদের সিদ্দিকী হাতে ও পায়ে আঘাত পান। ইতোমধ্যে ঘাটাইল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আর একটি বড় দল মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের শিকার হওয়া সৈন্যদলকে সহযোগিতা ও রক্ষা করার জন্য ঘাটাইল-ধলাপাড়া সড়ক ধরে এগিয়ে আসার সময় মুক্তিবাহিনীর বেণু কোম্পানির দ্বারা আক্রান্ত হন। এখানেও প্রায় ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক কলাম ছিল আর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র এক কোম্পানি। তাই মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদবসরণ করেন।

ফলাফল: ধলাপাড়া-মাকড়াই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর প্রায় দেড়শতাধিক সৈন্য হতাহত হয়। এই যুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধা হাতেম শহিদ হন এবং কাদের সিদ্দিকী, আনোয়ার, মেজর হাবিব, মেজর গফুর আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুদলের ফেলে যাওয়া ১ টি ব্লান্ডার সাইট, ১টি চাইনিজ, এলএমজি, ৫টি চাইনিজ এসএমজি, ১০টি জি-৩ রাইফেল, ২০টি ৩০৩ রাইফেল ও ১৫-১৬ হাজার গুলি (নানা ধরনের) উদ্ধার করেন।

বাথুলী অভিযান[৫৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২২ নভেম্বর দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ২১ নভেম্বর বাসাইল থানা পাকিস্তানি সৈন্যের দখল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এই খবরে করটিয়া থেকে পূর্বদিকে বাসাইল থানার দিকে একদল মুক্তিযোদ্ধা বাসাইল থানার বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকা হানাদার সৈন্যদের আটক করতে আসে। পথিমধ্যে বাথুলী নামক স্থানে এরকম একটি দলের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনা-সামনি দেখা যায়। এ অবস্থায় হানাদার সৈন্যদের প্রতিরোধ করতেই এই অভিযান চালানো হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কমান্ডার ফজলু, সবুর, বেনুসহ দেড় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩ ইঞ্চি মর্টার, এলএমজি, স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও বিভিন্ন হালকা অস্ত্র নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: বাথুলী বাসাইল থানার পশ্চিমে ও করটিয়া থানার পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। মুক্তিযোদ্ধারা করটিয়া হতে রওনা করে কামুটিয়া নদী পার হয়ে করটিয়া-বাসাইলের কাঁচা রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে বাসাইলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাথুলী বটগাছ থেকে পাঁচশ গজ দূরে থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা খেয়াল করেন বাথুলী বটগাছের নিচে কাশিল-বিয়ালা-বাথুলী সড়ক সামনে রেখে পাকিস্তানি সৈন্যদল (প্রায় একশ জন) অবস্থান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে অবস্থান নেন। সবুর, ফজলু প্রায় চল্লিশজন চৌকস মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে কাশিল-বিয়ালা-বাথুলী সড়কের পাশে অবস্থান নেন। আর কাদের সিদ্দিকী বারজন যোদ্ধাসহ করটিয়া-বাসাইল সড়কের উপরে অবস্থান নিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল গোলাগুলি বিনিময় আরম্ভ হয়। মুক্তিযোদ্ধা সামাদ ৩ ইঞ্চি ব্রিটিশ মর্টার থেকে হানাদার সৈন্যকে উদ্দেশ্য করে গোলা ছুঁড়তে থাকেন। দুই পক্ষই অনেকটা খোলা মাঠে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলির চাপে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাথুলী বটগাছের নিচ থেকে পিছিয়ে বাসাইলের দিকে সরে যেতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধারাও এসময় 'ভি' আকারে এগিয়ে যেতে থাকেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছাতে পিছাতে লাঙ্গুলিয়া খালের পাড়ে শক্ত অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন কাদের সিদ্দিকী মর্টার থেকে শত্রুপক্ষের অবস্থানের ওপর কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করলে পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থানে গিয়ে দুটো গোলা আঘাত হানে। এর ফলে তাদের অবস্থান ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারা এরপর অবস্থান ছেড়ে দিয়ে বাসাইলের দিকে না গিয়ে কাশিল-বিয়ালার দিকে পালিয়ে যান।

ফলাফল: এই বাথুলীর যুদ্ধে প্রায় বিশজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত ও প্রায় চল্লিশজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কমান্ডার বেনু গুলিবিদ্ধ হন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রায় তিনশত সদস্যের পাকিস্তানি সৈন্যদল করটিয়া থেকে এসে নিহত ও আহত সৈন্যদের তুলে নিয়ে যায়।

ঘাটাইল থানা অভিযান[৫৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১০ ডিসেম্বর ভোর চারটা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের নেতৃত্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। এসময় কাদেরিয়া বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্য ঘাঁটি দখল করতে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানা দখল করতে অভিযান চালানো হয়।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মেজর হাবিব, মেজর হাকিম, মেজর মোস্তফা, ক্যাপ্টেন সবুর, ক্যাপ্টেন খোকা, ক্যাপ্টেন হবি তাদের কোম্পানিসহ এই অভিযানে অংশ নেন। প্রায় তিনশত মুক্তিযোদ্ধার নিকট দুটি মেশিন গান, চারটি এমএমজি, চল্লিশটি এলএমজি, ৮২ ব্লান্ডার সাইট, ২ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি মর্টার, এসএমজি, স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল, গ্রেনেড ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল।

অভিযানের বিবরণ: ঘাটাইল থানায় পাকিস্তানি নিয়মিত সৈন্য মিলিশিয়া, রাজাকার মিলে প্রায় আড়াইশো যোদ্ধা ছিল। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কমান্ডারগণ পরিকল্পনা করেন যে, ১০ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় থানায় চূড়ান্ত আঘাত আনা হবে কাদের সিদ্দিকীর নির্দেশনা অনুযায়ী। তার পূর্বে মেজর মোস্তফার নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ঘাটাইল থানা থেকে দুই আড়াই মাইল দক্ষিণে কালিদাস পাড়া সেতু রাত চারটায় ধ্বংস করবেন ও মেজর হাবিব ঘাটাইল থানার উত্তরে বানিয়াপাড়া সেতু ভোর সাড়ে চারটায় ধ্বংস করবেন। দুটি সেতু ধ্বংস হওয়ার পর ঘাটাইল থানা থেকে কিছু সৈন্য দুই দিকে চলে গেলে ভোর পাঁচটায় থানা দখল অভিযান শুরু হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত চারটায় থানার পশ্চিম দিকে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন। এদিকে যথারীতি কালিদাস পাড়া সেতু ও বানিয়াপাড়া সেতু সময়মতো ধ্বংস করার শব্দ পাওয়া যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ৮০/৯০ জন সৈন্য থানার উত্তর ও দক্ষিণে গুলি করতে করতে এগিয়ে যায়। এরপর ভোর পাঁচটায় থানার পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ শুরু করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আঘাতেই থানার উত্তর দিকটা দখলে আসে। তবে অবশিষ্ট তিনদিক দিয়ে থানায় ঢোকা মুশকিল হয়ে পড়ে। এসময় মুক্তিযোদ্ধা মজনু থানার পশ্চিম দিক থেকে ৮২ ব্লান্ডার সাইটের গোলায় পশ্চিমের পাঁচটি বাঙ্কারের তিনটিই গুড়িয়ে দেয়। এর ফলে থানার উত্তর ও পশ্চিম দিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। তবুও পাকিস্তানি সৈন্যদের গোলাগুলির চাপে থানা দখল অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় থানার ভেতর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দুশো গজ সরিয়ে এসে থানার পশ্চিম দিক থেকে মেজর হাকিম মর্টার শেল ছুঁড়তে থাকেন। সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে একটানা প্রায় দু'শো গোলা ছোঁড়ার পর থানা প্রায় ধ্বংস স্তুপে পরিণত হন। সকাল সাতটায় ঘাটাইল থানার পতন হয়।

ফলাফল: ঘাটাইল থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এ থানা অভিযান শেষে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মালামালসহ প্রায় একশ ত্রিশজন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বন্দি হন। প্রায় ২০টি লাশ পাওয়া যায় থানা কম্পাউন্ডের ভেতর। কালিদাস পাড়া ও বানিয়াপাড়া সেতুর দিকে যাওয়া সৈন্য, মিলিশিয়া ও রাজাকাররা অনেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েন, অনেকে আত্মসমর্পণ করেন। অন্যদিকে, ঘাটাইল থানা অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের ১ জন শহিদ ও ৬ জন আহত হয়েছিলেন।

কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যগণ ১১ ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যেই টাঙ্গাইল জেলার সবকয়টি থানা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে ফেলেন। ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল শহরে থাকা পাকিস্তানি সৈন্য ঘাঁটির পতন ঘটানো হয়। এই অভিযানটিও খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এই অভিযানে বিপর্যস্ত প্রায় তিনশ সৈন্য তাদের মেজরসহ কাদের সিদ্দিকীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এর মধ্যে দিয়েই টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। কাদের সিদ্দিকী ও তার কমান্ডারদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯ নভেম্বরের পর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার প্রধান প্রধান ৩২টি সেতু ধ্বংস করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভাতকুড়া সেতু, কোদালিয়া সেতু, মহিষবাথান সেতু, সুত্রাপুর সেতু, মির্জাপুর সেতু, দেওহাটা সেতু, পাকুল্লা সেতু, বানিয়াপাড়া সেতু। এছাড়া, ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধারা অসংখ্য মাইন পুঁতে রেখেছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় পালানোর পথে পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদবাহী অনেকগুলো যান ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই পুঁতে রাখা মাইনে। মাইন পুঁতে রাখার উদ্দেশ্য ছিল পলায়নরত পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে যতটা সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করা।

১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার সান্‌থ সিং বাবাজি ও ব্রিগেডিয়ার হরদেও সিং ক্লেরের ব্রিগেডের সাথে কাদেরিয়া বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার সৈন্য ঢাকা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়। এরপর ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে পুঁতে রাখা মাইন অপসারণের জন্য ঐ রাতেই ক্যাপ্টেন বায়েজিদ, ক্যাপ্টেন সোলায়মান, ক্যাপ্টেন শামসুল হক, ক্যাপ্টেন গাজী লুৎফর ও ক্যাপ্টেন লায়েক আলমের কোম্পানি তৎপরতা শুরু করে এবং ভোর পর্যন্ত মাইনগুলো অপসারণ করতে সক্ষম হয়। এই কাজে অবশ্য দুইজন যোদ্ধা আহত হয়েছিলেন। অবশেষে ১৪ ডিসেম্বর ভোর বেলা যৌথবাহিনীর ঢাকা অভিযান শুরু হয়। টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা পর্যন্ত যৌথবাহিনী শুধু কড্ডা ও সাভারের হেমায়েতপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কঠিন বাঁধার মুখে পড়ে। আর বাকি রাস্তার অধিকাংশ অংশই কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ পূর্বেই মুক্ত করে ফেলেছিল।

অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর সকালে যৌথবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে ও ঢাকার কর্তৃত্ব নেয়। উল্লেখ্য, যৌথবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ১৬ ডিসেম্বর সকালে সাভার-হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলী হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু মিরপুর এলাকায় তখনো সক্রিয় ছিলেন পাকিস্তানি সৈন্য ও স্থানীয় রাজাকার-মিলিশিয়ারা। এদের বিরুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর একটি দল ক্যাপ্টেন সবুরের নেতৃত্বে অভিযান চালায়।[৫৫] যাহোক, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০.১০ মিনিটে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের পাশপাশি মুক্তিবাহিনীর একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন কাদের সিদ্দিকী।[৫৬]

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

কাদেরিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মোয়াজ্জেম হোসেন (তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক, ঘাটাইল থানা আওয়ামী লীগ) সোহরাব আলী খান আরজু, আলী আজগর খান দাউদ (পূর্বোক্ত দু'জন তৎকালে আওয়ামী লীগের যুবনেতা) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইলের (বিশেষ করে সখীপুর ও ঘাটাইল) সমস্ত এলাকা ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলবেন। এই প্রচার কাজের কৌশল হবে:

(১) এলাকার মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ছোটোখাটো সভা অনুষ্ঠান;
(২) প্রচারপত্র ছাপিয়ে তা জনগণের মাঝে বণ্টন।[৫৭]

বিভিন্ন প্রচারপত্র ছাপানো ও বন্টনের এক পর্যায়ে একটি পত্রিকা প্রকাশের ধারণা বাহিনীর নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেন। অবশেষে কাদেরিয়া বাহিনীর মুখপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক *রণাঙ্গন* নামে একটি পত্রিকা প্রচার করা শুরু হয়। এই পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর স্থান পেত।[৫৮] বিশেষ করে অবরুদ্ধ মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করা ছিল এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিভিন্ন খবরের পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, ছোটগল্প প্রভৃতি ছাপা হতো *রণাঙ্গন* পত্রিকায়। *রণাঙ্গন* পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে আনোয়ার উল আলম শহীদ (রণদূত) ও সহ-সম্পাদক হিসাবে ফারুক আহমেদ ও সৈয়দ নুরুর নাম ছাপা হতো। সেপ্টেম্বর থেকে *রণাঙ্গন* পরিচালনা করতেন মূলত অধ্যাপক মাহবুব সাদিক, সোহরাব আলী খান আরজু, সৈয়দ নুর, ফারুক আহমেদ ও শওকত মোমেন শাজাহান। এরপর থেকে সম্পাদক হিসাবে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। এই পত্রিকার একমাত্র কার্টুনিস্ট ছিলেন আনিস।

কাদেরিয়া বহিনীর প্রচার কৌশলের আরেকটি উপায় ছিল জনসংযোগ বৃদ্ধিকরণ। জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে এই বাহিনী জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকায় চৌদ্দটি জনসভা আয়োজন করেছিল। এই চৌদ্দটি জনসভা আয়োজন করা হয়েছিল বল্লা, ভন্তেশ্বর, ধলাপাড়া, সাগরদীঘি, হতেয়া, কচুয়া, সখিপুর ও টাঙ্গাইল শহরে। এইসব জনসভায় বক্তৃতা করতেন ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আব্দুল বাছেত সিদ্দিকী, মোয়াজ্জেম হোসেন খান, সোহরাব আলী খান আরজু, আলী আজগর খান দাউদ, আনোয়ার উল আলম শহীদ, কাদের সিদ্দিকী প্রমুখ।

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যবৃন্দ গেরিলা ও পাকিস্তানি সৈন্য মিলিশিয়া ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, সেসব যুদ্ধে এই বাহিনীর অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। এই বাহিনীর অনেক যোদ্ধা শহিদ অথবা যুদ্ধাহত হয়েছিলেন। *মুক্তিসংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী* গ্রন্থে কাদেরিয়া বাহিনীর শহিদ সদস্যের সংখ্যা পয়তাল্লিশ উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] অন্য একটি উৎসে বলা হয়, কাদেরিয়া বাহিনীর শহিদ সদস্যের সংখ্যা দুইশতের অধিক।[৬০] *স্বাধীনতা '৭১* গ্রন্থে কাদের সিদ্দিকীর দাবি- ১৯৭১ এর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এই বাহিনীর একশ চল্লিশ জন সদস্য শহিদ ও পাঁচ শতাধিক আহত হয়েছিলেন।[৬১] উল্লিখিত এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কেননা এই বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার সদস্য ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা অভিযানে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

কাদেরিয়া বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই গঠন করা হয়। সূচনাপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এই বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই কারণে এ বাহিনী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী যুদ্ধ সংঘটন ও কার্যক্রম চালাতে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ও ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে এ বাহিনীর প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয় জুলাই এর ৪ তারিখ।[৬২] কাদেরিয়া বাহিনীর নুরুন্নবী ও নুরুল ইসলাম ভারতের পোড়া খাশিয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ দিন উপস্থিত হন। এই ক্যাম্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ও ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার সান্থ সিং বাবাজি'র সাথে নুরুন্নবী ও নুরুল ইসলামের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে কাদেরিয়া বাহিনীর জন্য বেশ কিছু অস্ত্র সহযোগিতা পাওয়া যায়। এছাড়া, কাদের সিদ্দিকী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ ভারতের তুরার রওশন আরা ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও ভারতীয় প্রতিনিধির সাথে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে তিনি আগস্টের শেষ সপ্তাহে দেশে ফেরেন। এ সফরে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন।[৬৩] এরপর কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি,

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় কাদেরিয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এ বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস মেলে।[৬৪]

গণমাধ্যমে কাদেরিয়া বাহিনী

কাদেরিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকালে দেশ ও বিদেশে যথেষ্ট প্রচার পেয়েছিল। বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে এই বাহিনীর সংগঠন, প্রশিক্ষণ, যুদ্ধ-তৎপরতা বিবিধ বিষয়ে খবর প্রচারিত হয়। প্রচারিত হয় বাহিনী প্রধান কাদের সিদ্দিকী, বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভয়েস অব আমেরিকা, আমেরিকার এনবিসি টেলিভিশন, অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন-এ উল্লিখিত সাক্ষাৎকার প্রচারিত হতে দেখা যায়। এছাড়া, *জয়বাংলা*, *জাগ্রত বাংলা*, *অগ্নিশিখা*, *দ্যা টাইম্স*, *বিবিসি*, *আকাশবাণী*, *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার* পত্রিকাতে এ বাহিনীর নানা রকম তৎপরতার খবর পাওয়া যায়। ১ সেপ্টেম্বর *বাংলাদেশ* পত্রিকায় কাদেরিয়া বাহিনীর বিখ্যাত 'মাটিকাটা জাহাজ মারা' যুদ্ধসাফল্যের উল্লেখ করে বলা হয়, "টাঙ্গাইলের গেরিলাগোষ্ঠীর হাতে ৩ জনেরও বেশি পাক সেনা নিহত হয়। গেরিলা বাহিনীকে মারার জন্য পাক ব্রিগেড পাক পদাতিক সেনা ও বোমারু বিমান কাজে লাগায়। টাঙ্গাইলে মুক্তি সেনারা একটি পাক সেনা জাহাজ ডুবিয়ে দেয় ফলে ১৫০ জন পাক সেনা নিহত হয়, তাদের কাছ থেকে ২শ' বাক্স গুলি দখল করেন।"[৬৫] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত জনপ্রিয় কথিকা 'চরমপত্র' তে বহুবার কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধ সাফল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচারিত কথিকাগুলোর একটিতে বলা হয়:

> রয়টারের সংবাদদাতা হাওয়ার্ড হুইটেন ঢাকা থেকে আরো জানিয়েছেন যে, প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল থেকে যেসব লোক ঢাকায় পালিয়ে এসেছেন, তাদের মতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা টাঙ্গাইল দখলের পর লাহোর-পিন্ডি থেকে আমদানী করা সশস্ত্র পুলিশের হাতে টাঙ্গাইলের শাসনভার দিয়ে কুমিল্লা সেক্টরের দিকে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে টাঙ্গাইল থনে অহন হেরা অক্করে সাফ হইয়া গ্যাছে। টাঙ্গাইল এখন মুক্ত।[৬৬]

টাঙ্গাইলে দখলদার সৈন্যদলের উপর কাদেরিয়া বাহিনীর বিপুল প্রভাব উল্লেখ করে চরমপত্র-এর অপর একটি কথিকায় বলা হয়: [৬৭]

> অ্যাঃ অ্যাঃ টাঙ্গাইলের খবর হুনছেন নি? ঐদিকে বলে তুফান কাদেরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। টাঙ্গাইল টাউন, ঘাটাইল, কালিহাতি আর মির্জাপুর থানা হেড কোয়ার্টার ছাড়া বে-বা-ক জায়গা মানে মছুয়া Clear- ব্যাডাগো নাম ঠিকানা পর্যন্ত নাইক্যা। টাঙ্গাইলের বিচ্ছুগো দুসরা নাম হইলো কাদেরিয়া বাহিনী। মছুয়াগো সামনে খালি কাদেরিয়া বাহিনীর নাম কইয়া দেইখেন- আস্তে কইর‌্যা সব খাকী-ফুলপ্যান্ট বাসন্তী Colour হইয়া যাইবো। হেইদিন চাড়াবাড়ী, বল্লা, ভূয়াপুর, এইসব জায়গায় মছুয়াগো আলাদা না পাইয়া আরে মাইর-রে-মাইর। মছুয়াগুলী খালি Wireless এর মাইদ্দে চিল্লাইতাছে Help Help। আর আজরাইল ফেরেশতা অক্করে খাতা কলম লইয়া দৌড়াইয়া আইছে। এইতো Help করতে আইছি। আয় মেরি লাল, মৎ কইর‌্যা আখেরি দমডা ছাড়লেই খাতায় নামডা লেইখ্যা লইতাছি। টাঙ্গাইল টাউনের মছুয়ারা কাদেরিয়া মাইরের খবর না পাইয়া কি কাঁপন? খালি খাতার মাইদ্দে লেইখ্যা থুইলো Wireless out of order টাউনের থনে বাইরাইলেই তো মউত খাড়াইয়া আছে। চাড়া-বাড়ী-বল্লী-ভূয়াপুরের মছুয়াগো Help এর দরকার হইবো। এই দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইলের রাস্তাও তো একেবারে ছেরাবেরা হইয়া আছে।
>
> এই রকম একটা ক্যাডাভেরাস অবস্থায় মুরগির আন্ডার যেই রকম হালি হয় হেইরকম হালি হালি হিসাবে চাড়াবাড়ী-বল্লা-ভূয়াপুরে মছুয়ারা স-অ-ব কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হান্দাইয়া গেলো। এইডারেই কয় কাদের বাহিনীর কাদেরিয়া মাইর। নদীর চর, গাং-এর পানি, গেরাম, মাঠ, রাস্তা-ঘাট, জঙ্গল, পাহাড়, টাঙ্গাইলের ইগ্গল এলাকাই মুক্ত হইয়া গেছে। এইসব জায়গায় বাংলাদেশ

সরকারের অফিসাররা কাজ কাম শুরু করছে আর কাদেরিয়া বাহিনীর বিচ্চুরা টাঙ্গাইল টাউন, কালিহাতি, ঘাটাইল, মির্জাপুর থানা ঘেরাও দিয়া বইস্যা রইছে। দেখি দানাপানি ছাড়া মছুয়া মহারাজরা আর কতদিন থাকতে পারে। বাইরইলেই মাইর। বাইরইলেই মাইর।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

পনের হাজারের অধিক সশস্ত্র ও সত্তর হাজারোর্দ্ধ স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত বিরাট আঞ্চলিক মুক্তি বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। এই অনবদ্য ভূমিকার জন্য এই বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বীরত্বসূচক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।[৬৮]

ক্রম	নাম	খেতাব
১.	আব্দুল কাদের সিদ্দিকী	বীর উত্তম
২.	মো. হাবিবুর রহমান	বীর বিক্রম
৩.	আবুল কালাম আজাদ	ঐ
৪.	শহিদ জামাল উদ্দিন	ঐ
৫.	হামিদুল হক	বীর প্রতীক
৬.	হাবিবুর রহমান তালুকদার	ঐ
৭.	শহীদুল ইসলাম লালু	ঐ
৮.	খোরশেদ আলম তালুকদার	ঐ
৯.	মো. ফজলুল হক	ঐ
১০.	মো. আব্দুল গফুর	ঐ
১১.	সৈয়দ গোলাম মোস্তফা	ঐ
১২.	সাঈদুর রহমান	ঐ
১৩.	মো. খসরু মিয়া	ঐ
১৪.	মো. আব্দুল্লাহ	ঐ
১৫.	মো. আব্দুল হাকিম	ঐ
১৬.	আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী	ঐ
১৭.	ফয়েজুর রহমান ফুল	ঐ
১৮.	আনিসুর রহমান	ঐ

এই স্বীকৃতি এই বাহিনী ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণার। কিন্তু, এই বাহিনীর অসংখ্য সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতিটুকু পাননি। এরকম একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন সখিপুরের আব্দুস সালাম সিদ্দিকী। এছাড়া এই বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দলের কেউ-ই মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নন। অথচ তারা অবরুদ্ধ দেশে পাকিস্তানি সৈন্য, মিলিশিয়া, রাজাকার, আল বদর, আল শামস, শান্তি কমিটি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মাঝে থেকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায় জীবন ও সম্পদ হানির ঝুঁকির মধ্যে ছিলেন। এ ঝুঁকি শুধু ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকের জন্য নয়, তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের জন্যও সমান মাত্রায় উপস্থিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে কতরকম ভাবেই যে স্বেচ্ছাসেবকরা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছিলেন, তার কোনো পূর্ণাঙ্গ হিসাব বা বিবরণ নেই। আর এই কারণে তাদের ভূমিকারও কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই।

অস্ত্র সমর্পণ

কাদেরিয়া বাহিনী ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের বিখ্যাত বিন্দুবাসিনী স্কুল মাঠে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে কাদেরিয়া বাহিনীর অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত তার স্টেনগান বঙ্গবন্ধুর পায়ের সামনে রেখে অস্ত্র সমর্পণ পর্বের সূচনা করেন। এরপর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করেন। এর মাধ্যমেই কাদেরিয়া বাহিনীর আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ সমাপ্ত হয়।[৬৯]

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিল। বাহিনী প্রধান আব্দুল কাদের সিদ্দিকী ও অন্যান্য সংগঠকদের প্রচেষ্টায় এ বাহিনী টাঙ্গাইল জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার (প্রায় ৪০০০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী) মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তুলেছিল। এই সাফল্যের মূল কারিগর বাহিনীর প্রায় সতের হাজার সশস্ত্র ও প্রায় সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই সাফল্যের মূল ভিত্তি ছিল অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনতা। এই মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার যুগলবন্দি সৃষ্টি করেছিলে অসাধারণ জনযুদ্ধের আখ্যান।

অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ও পর্যাপ্ত-রসদ, প্রশিক্ষিত সৈন্য, মিলিশিয়া ও অত্র এলাকার রাজাকার ও অন্যান্য সহযোগী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়া শক্তিশালী পাকিস্তানি হানাদার দলকে মোকাবেলা করেছিল কাদেরিয়া বাহিনী। অন্যদিকে কাদেরিয়া বাহিনীর শক্তির জায়গা ছিল বাহিনীর সদস্যদের গভীর দেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ ও জনসমর্থন। এই শক্তির সাথে শৃঙ্খলা, স্বশিক্ষা ও শত্রুর নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র যুক্ত করে এই বাহিনী মুক্ত করেছিল নিজভূমি।

টাঙ্গাইলসহ পূর্বোল্লিখিত এলাকায় ছোটো-খাটো সংঘর্ষ বাদে এই বাহিনী পকিস্তানি সেনাদল ও তার সহযোগী শক্তির বিপক্ষে প্রায় একশটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। এসকল যুদ্ধে যেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ও আহত হয়েছিলেন, তেমনই অপর পক্ষেরও অনেক বড় অংকের সৈন্য ও যুদ্ধ রসদ ক্ষয় হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সৈন্য পাকিস্তানপন্থি জনতার মনোবল হ্রাস পেয়েছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও পাকিস্তানি শক্তির ক্রমপতন দেখে অবরুদ্ধ এলাকার মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার প্রতি এই জনতার নানামুখী সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

কাদেরিয়া বাহিনী তার শত্রুক্ষকে পরাস্ত করতে প্রধান গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। তবে প্রথাগত ‘আঘাত করো ও সরে পড়ো’ গেরিলা কৌশলের জায়গায় এ বাহিনীর অনুসৃত গেরিলা কৌশলটি ছিল ‘আঘাত করো, অবস্থান করো ও এগিয়ে চলো’ যা গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে একটি নতুন সংযোজন। গেরিলা যুদ্ধের একটি সাধারণ কৌশল হলো শত্রুপক্ষের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা। কাদেরিয়া বাহিনীও পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগী শক্তির চলাচল ব্যাহত করতে সড়ক ধ্বসিয়ে দিয়েছিল ও পুল বা ব্রিজ ধ্বংস করেছিল। ঢাকা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের সাথে আভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত প্রায় সব পাকা সড়কেই কাদেরিয়া বাহিনী শাবল-কোদাল চালিয়েছিল। এছাড়া, এসব সড়কে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বত্রিশটি সেতু (এসব সেতুতে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেওয়া হতো) এ বাহিনী ধ্বংস করেছিল। এর ফলে পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদবাহী যান চলাচল তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়।

কাদেরিয়া বাহিনী অবরুদ্ধ জনগণের প্রাণ, মর্যাদা, সম্পদ রক্ষায় ও সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পদক্ষেপ নিয়েছিল। ডাকাতি ও লুটতরাজ বন্ধ করতে এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ শতাধিক সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ ডাকাত ও লুটেরাকে চরম শাস্তি দিয়েছিল। এছাড়া, দুস্কৃতকারী, ধর্ষণের অভিযোগে প্রমাণিত সমাজবিরোধীদেরকেও এই বাহিনী চরম শাস্তি দিয়েছিল। সুযোগসন্ধানী এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী ব্যক্তিকেও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এসব ক্ষেত্রে বাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাকেও কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হয় নি।[৭০]

টাঙ্গাইল ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়। টাঙ্গাইল মুক্ত করার মূল কৃতিত্ব কাদেরিয়া বাহিনীর। টাঙ্গাইল শহরসহ কমপক্ষে বারটি থানা মুক্ত করে এ বাহিনী একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। শুধু টাঙ্গাইল নয়, পার্শ্ববর্তী থানাসমূহ মুক্ত করার পিছনেও এ বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। এছাড়া, যৌথবাহিনীর (ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে গঠিত) টাঙ্গাইল প্রবেশ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে ঢাকা দখল ও পাকিস্তানি সেনাবহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত এ বাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়টি সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়:

(১) জামালপুরের উত্তর দিক থেকে আসা যৌথবাহিনীর জামালপুর দখল অভিযানে সহযোগিতা করতে কাদেরিয়া বাহিনীর মেজর আনিসের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা দক্ষিণ দিক থেকে জামালপুরে পাকিস্তানি সৈন্যঘাঁটি আক্রমণ করে। ফলে জামালপুর অপেক্ষাকৃত দ্রুত দখল করা সম্ভব হয়।

(২) মিত্রবাহিনীর ছত্রীসেনা নামানোর জন্য উপযুক্ত মুক্ত এলাকা প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মেটে কাদেরিয়া বাহিনী কর্তৃক মুক্ত টাঙ্গাইলের ঘাটাইল ও কালিহাতী এলাকা ছত্রীসেনা অবতরণের কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে।

(৩) যৌথবাহিনীর মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ঢাকা অভিযানের পরিকল্পনা ও মানচিত্র তৈরিতে ব্যক্তিগতভাবে কাদের সিদ্দিকী ও কাদেরিয়া বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

(৪) পলায়নপর পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুঁতে রাখা মাইন পুনরায় ঝুঁকি নিয়ে সরিয়ে ফেলা হয় যাতে যৌথবাহিনীর ঢাকা দখল অভিযান ঝুঁকিমুক্ত হয়।

(৫) মিত্র বাহিনীর প্রায় বার হাজার সৈন্যের খাদ্য সরবরাহ করে কাদেরিয়া বাহিনী।

(৬) মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সান্‌থ সিং বাবাজি ও ব্রিগেডিয়ার হরদেও সিং ক্লের-এর ব্রিগেডের সাথে কাদেরিয়া বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা অভিযানে অংশ নেন।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য যে, যৌথবাহিনীর ঢাকা দখল এবং পাকিস্তানি সেনাদলের আত্মসমর্পণের মুহূর্তে সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেবল কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাই ঢাকায় উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। এ বিষয়টি এ বাহিনীর একটি বিশেষ কৃতিত্ব এ কারণে যে, পূর্ব পরিকল্পনা মতো ঢাকা দখলের দায়িত্ব উত্তর দিক থেকে আসা মেজর জেনারেল নাগরার নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর ছিল না। এ কারণে এই কমান্ডে সৈন্য ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল। যশোর, খুলনা, বগুড়া, রংপুর, আখাউড়া, হয়ে ঢাকামুখী সকল সেক্টরের ভারতীয় বাহিনী গোলন্দাজ ও ট্যাংক দিয়ে সাজানো হয়েছিল। আখাউড়ার দিক থেকে আসা বাহিনী সম্ভব হলে ঢাকা দখল নেবে- এটাই ছিল মূল পরিকল্পনা।[৭১] এর কারণ আখাউড়া থেকে ঢাকার দূরত্ব সত্তর-আশি মাইল। ঘোরা পথে একশ

মাইলের বেশি হবে না। সুতরাং এই সেক্টরই ঢাকা দখল নেবে। এই কারণে আখাউড়া হয়ে আসা সেক্টরকে গোলন্দাজ, ট্যাংক স্কোয়াডসহ অনেকগুলো যুদ্ধ হেলিকপ্টার দিয়ে সাজানো হয়। অন্যদিকে, ঢাকার উত্তর দিক তুরা ও ময়মনসিংহ সীমান্ত হয়ে ঢাকার দূরত্ব প্রায় দু'শো মাইল। গ্রাম-গঞ্জের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগোতে আরো বেশি দূর হওয়া স্বাভাবিক। তাই উত্তর দিক থেকে আসার মেজর জেনারেল নাগরার কমান্ডে থাকা যোদ্ধাদের প্রধান কাজ ছিল যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দিক থেকে এসে ঢাকা অবরোধ করা। কিন্তু, প্রকৃত চিত্র হলো অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল কম এবং দূরত্ব বেশি হওয়া সত্ত্বেও উত্তর দিক থেকে আসা যৌথবাহিনী সবার আগে ঢাকার সন্নিকটে পৌঁছে যায়। এর কারণ কী? এর কারণ কাদেরিয়া বাহিনী ঢাকা-ময়মনসিংহ-জামালপুর রাস্তার প্রায় ষাট মাইল মিত্র বাহিনী আসার আগেই মুক্ত করে ফেলেছিল। এছাড়া, টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা-অভিমুখে গাজীপুরের কালিয়াকৈর পর্যন্ত অধিকাংশ স্থান ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বাহিনী প্রায় মুক্ত করে ফেলেছিল। ঢাকা অভিমুখে যৌথবাহিনীকে শুধু জয়দেবপুরের কড্ডা ব্রিজ ও সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি স্থানে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এছাড়া, ঢাকার প্রবেশমুখে মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনীকে পাকিস্তানি সৈন্যদলের যে অংশকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই জামালপুর-ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল এলাকা থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদল। পাকিস্তানি এই সৈন্যদল ইতোমধ্যে 'কাদেরিয়া মাইর' খেয়ে হীনবল ও ভীত সন্ত্রস্ত্র ছিল। সুতরাং, যৌথবাহিনীর পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল।

কাদেরিয়া বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে উপর্যুক্ত সামরিক কর্মকাণ্ডের বাইরে এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় বেসামরিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করেছিল। বেসামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বাহিনীতে একটি সুশৃঙ্খল বেসামরিক বিভাগ সক্রিয় ছিল যার প্রধান ছিলেন আনোয়ার উল আলম শহীদ। মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি এই বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় অবরুদ্ধ জনগণের নিরাপত্তা, বিচার, চিকিৎসাসহ অন্যান্য প্রয়োজন আন্তরিকতার সাথে পূরণ করার চেষ্টা করেছিল এই বেসামরিক বিভাগ। এই কাজে বেসামরিক বিভাগের প্রধান সহায়ক শক্তি ছিল বাহিনীর প্রায় সত্তর হাজার সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক দল। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক পরিপুষ্টকরণে স্বেচ্ছাসেবক দল কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে সখিপুর ও ভূঞাপুর এলাকায় যে দুটি মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছিল, সেখানে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে চালু রাখার মূল কৃতিত্ব এই স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিযোদ্ধাদের। অত্র অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব প্রধানত স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারাই পালন করেছিলেন। এবং অত্র অঞ্চলে যেন কোনোভাবেই পাকিস্তানপন্থি উপাদান শেকড় বিস্তার করতে না পারে, সে প্রচেষ্টায়ও তারা সক্রিয় ছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় বাহিনী তাদের উদ্দেশ্যে, কার্যক্রম, মুক্তিযুদ্ধ কেন প্রয়োজনীয়, যুদ্ধে জনগণের ভূমিকা কী, ইত্যাদি বিষয় জনগণের মধ্যে প্রচার করতে জনসংযোগ শুরু করে। স্বেচ্ছাসেবকদের পরিশ্রমের ফলে এই বাহিনী যুদ্ধকালে চৌদ্দটি জনসভা আয়োজন করেছিল। এই জনসভার ফলে মুক্তিবাহিনী ও জনতার বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।

কাদেরিয়া বাহিনী তাদের সাধ্যমতো জনগণকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছিল। নিরাপত্তা প্রদান, বিচারিক সহায়তা ও চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি দুস্থ মানুষদের মধ্যে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণ করে এই বাহিনী জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। ২৫ অক্টোবর আটককৃত পঞ্চাশ হাজার মণ চাল ও আটা বাহিনীর আওতাভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। ১৭ নভেম্বর কুদ্দুস নগরের ছাব্বিশা গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যদল গণহত্যা চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদেরকে নগদ অর্থ, খাদ্য, নতুন ঘর ও পোশাক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

করা হয় কাদেরিয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে।[৭২] জনগণকে সহায়তার এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে এ বাহিনীর।

কাদেরিয়া বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগীদের হাতে আটক বেসামরিক ব্যক্তিকে রক্ষার একটি কৌশল ব্যবহার করা শুরু করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আটক পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকারদের (অক্ষত, আহত বা নিহত) বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকেও শত্রুর কারাগার থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থার ফলে শতাধিক বেসামরিক ব্যক্তি (মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অভিযোগে আটক) মুক্ত হতে পেরেছিলেন।[৭৩] শুধু বেসামরিক ব্যক্তিবর্গই নয়, এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে যুদ্ধশেষে আটক হওয়া পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদেরকেও এ বাহিনী বন্দির মর্যাদায় রক্ষা করেছিল। জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম অনুযায়ী এই বাহিনীর হাতে আটক প্রায় সাত হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও প্রায় চৌদ্দ হাজার মিলিশিয়া-রাজাকারকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল। অথচ পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে একই আচরণ করেনি। যুদ্ধবন্দি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা কখনোই তাদের বিবেচনায় আসেনি এবং এসব ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চরম আঘাত করা হয়েছিল।

সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, কাদেরিয়া বাহিনীর সামরিক ও বেসামরিক কর্মকাণ্ডে এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার হতোদ্যম জনগণ মনোবল ফিরে পায়। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে অত্র এলাকার যারা নিষ্ক্রিয় ছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধপন্থি হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। অচিরেই তাদের অধিকাংশ আশাবাদী ও সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য জনসাধারণকে অনেক মূল্য (প্রাণ, মান, সম্পদ ও কিছু ক্ষেত্রে ধর্ম) দিতে হয়েছে। এরপরও তারা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক থেকেছেন। এছাড়া, রাজাকার কিংবা শান্তি কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এমনকি কেউ কেউ পক্ষ ত্যাগ করে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করেছেন, সহযোগিতা করেছেন। এই জনসমর্থনই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান শক্তি ছিল যা দীর্ঘ মেয়াদে পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগীদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছে।

টাঙ্গাইলের তথা এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে অথচ দেশের অভ্যন্তরে যারা যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিল কাদেরিয়া বাহিনী। ভারতে প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের (বিশেষ করে তুরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আসা) দেশের নিরাপদ অবস্থান ছিল এ বাহিনীর সৃষ্ট মুক্তাঞ্চল। শুধু তাই নয়, মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের জন্য কৌশলগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। বিশেষ করে বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা প্রমাণ ও স্বীকৃতির প্রশ্নে মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশ সরকারে জন্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে সহায়ক হয়েছিল।

কাদেরিয়া বাহিনী তাদের অর্জনের জন্য মূল্যও দিয়েছে অনেক। এ বাহিনীর দেড় শতাধিক সশস্ত্র যোদ্ধা শহিদ হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন পাঁচ শতাধিক। আর স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কতজন আহত ও শহিদ হয়েছিলেন, তার কোনো হিসাব এই বাহিনীর সংগঠকদের জানা নেই। তাছাড়া, বাহিনীর প্রায় প্রত্যেক সংগঠক, দুধর্ষ যোদ্ধা ও প্রথম সারির স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবারে নেমে এসেছিল নির্যাতন ও ধ্বংসলীলা। অথচ এই বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকার তুলনায় প্রাপ্তি যথোপযুক্ত নয়। সরকার কাদেরিয়া বাহিনীকে গণবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে স্বীকৃতি দিয়েছে, এ বাহিনীর আঠারজন যোদ্ধাকে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেছে। কিন্তু, এই বাহিনীর অনেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বীরত্ব ও অবদানের বিবেচনায় খেতাব প্রাপ্তির দাবিদার। এই বাহিনীর অনেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আজও

‘মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে তালিকাভুক্ত নন। আর এই বাহিনীর প্রায় সত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তো ‘মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে স্বীকারই করা হয় না। অবরুদ্ধ দেশে এই স্বেচ্ছাসেবকগণই ছিলেন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। এরাই ছিলেন জনযুদ্ধের মূল স্রষ্টা। পাকিস্তানি সৈন্য-মিলিশিয়া-রাজাকার-শান্তি কমিটি-মুক্তিযুদ্ধবিরোধ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সামনাসামনি বা আয়ত্তের মধ্যে থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাকে বিবিধ উপায়ে সেবা ও সহযোগিতা করতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই কাদেরিয়া বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ‘মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্য। মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃত অর্থে জনযুদ্ধ বলতে হলে, জনযুদ্ধের এই মূল কারিগরদের স্বীকৃতি আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য-বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কাদেরিয়া বাহিনীর উপস্থিতি শুধু কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণে সীমাবদ্ধ। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দশম খণ্ড* ও *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস সেক্টর-এগার* গ্রন্থে এ বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধের উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই মেলে না। অতএব, স্বীকার করতে হবে যে, টাঙ্গাইল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনযুদ্ধের প্রধান স্রষ্টাদের অবদান আংশিকভাবে নথিভুক্ত করে অত্র অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। আর সেক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের অপূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনার পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে।

বাতেন বাহিনী

টাঙ্গাইল

মুক্তিযুদ্ধকালে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কোনড়া গ্রামকে ভিত্তি করে একটি আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে। এই মুক্তিযোদ্ধা দল প্রধানত দক্ষিণ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এলাকায় তৎপর ছিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার আব্দুল বাতেন। দলের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে এই মুক্তিযোদ্ধা দলের পরিচিতি হয় 'বাতেন বাহিনী' নামে।

খন্দকার আব্দুল বাতেন ১৯৪৬ সালের ১৭ মে জন্মগ্রহণ করেন (এরপর থেকে আব্দুল বাতেন বা বাতেন নামে লেখা হবে)। পিতার নাম খন্দকার সিরাজুল ইসলাম এবং মাতার নাম হাজেরা খাতুন। আব্দুল বাতেনের পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার কোনড়া গ্রামে। তিনি টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদত কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। আব্দুল বাতেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি করটিয়া সাদত কলেজ ছাত্র-সংসদের (১৯৬৭-৬৮ বর্ষে) সহ-সভাপতি (ভিপি) হিসেবে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭২ সালের পরবর্তী ছাত্র-সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হন। মুক্তিযুদ্ধকালেও তিনি এ দায়িত্ব (জেলা ছাত্রলীগের একাংশের) পালন করেন।[৭৪] উল্লেখ্য, ২৬ মার্চ টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হলে আব্দুল বাতেন এ পরিষদের অধীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু, টাঙ্গাইলের কর্তৃত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে চলে গেলে তিনি নাগরপুরের নিজ গ্রামে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে সচেষ্ট হন। এই মুক্তিবাহিনীই পরবর্তীতে বাতেন বাহিনী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে টাঙ্গাইলের সবকয়টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।[৭৫] এই নির্বাচনে খন্দকার আব্দুল বাতেন দক্ষিণ টাঙ্গাইলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের জয়লাভের পেছনে মূল্যবান ভূমিকা রাখেন। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার চাতুরী শুরু করে। এই চাতুরীর প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রদেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য আব্দুল বাতেন নাগরপুর, দেলদুয়ার, মির্জাপুর ও করটিয়া এলাকায় জনসংযোগ, জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করেন।[৭৬] এছাড়া, টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগে পূর্ব থেকে থাকা বিরোধের কারণে তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে পূর্বোল্লিখিত এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন।[৭৭] তিনি জেলার বিভিন্ন থানার (দক্ষিণ টাঙ্গাইল বিশেষত) স্কুল-কলেজগুলোতে 'জয় বাংলা বাহিনী', 'জয় বাংলা ক্যাম্প' গঠন করতে সক্রিয় হন এবং স্বাধীনতার ইশতেহার প্রচার করতে শুরু করেন মার্চের শুরু থেকেই।[৭৮]

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদল গণহত্যা শুরু করলে ২৬ মার্চ টাঙ্গাইল শহরের আদালত পাড়ার অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামের বাসায় টাঙ্গাইল জেলা স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ নামে যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ[৭৯] গঠিত হয়, সেই পরিষদে আব্দুল বাতেন একজন ছাত্রনেতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৮০] এছাড়া, ২৬ মার্চ সকালে ইপিআর বাহিনীর ওয়ারলেস কর্তৃক ট্রান্সমিট করা বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি 'এম এম রহমান' নামে আব্দুল বাতেনের কাছে পৌঁছে। এরপর তিনি মুক্তিবাহিনী গঠনের চেষ্টা শুরু করেন।[৮১]

মার্চের ৩০ তারিখ সখিপুরের আছিমতলায় পাকিস্তানি সেনাদলের সাথে কয়েকজন ইপিআর ও স্থানীয়দের খণ্ডযুদ্ধ হয়। এ খণ্ডযুদ্ধে সাদত কলেজের ছাত্র জমারত আলী শহিদ হন। এই যুদ্ধ শেষে ইপিআর সদস্যরা কিছু অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যান। আব্দুল বাতেন ঐ স্থান হতে দুটি রাইফেল ও একশ পঁয়ষট্টি রাউন্ড গুলি সংগ্রহ করেন।[৮২] এছাড়া ৩ এপ্রিল টাঙ্গাইল শহর পাকিস্তানি সেনাদলের দখলে চলে গেলে তিনি নাগরপুরের নিজ গ্রাম কোনড়াতে ফিরে আসেন। এ গ্রামে মীর শামসুল আলম শাহজাদার নেতৃত্বে ২ এপ্রিল ১০ সদস্যের একটি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে ওঠে। এই কমিটি আব্দুল বাতেনের মুক্তিবাহিনী গঠনের কথা জানতে পেরে বাতেনের সাথে যুক্ত হন।[৮৩] এরপর এই কোনড়া গ্রামকে ভিত্তি করেই আব্দুল বাতেন মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার শুরুর দিকে আব্দুল বাতেনের সাথে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ (শাহজাহান), মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, আফতাব হোসেন আরজু, মো. আলী জিন্নাহ, উপেন্দ্রনাথ সরকার, খন্দকার আব্দুস সালাম, খন্দকার আব্দুল করিম, মেজবাহ উদ্দিন নয়ন, আব্দুর রশীদ, ওয়াজেদ আলী, আব্দুল মান্নান ফিরোজ, মীর শামসুল আলম শাহজাদা, মো. শাহজাহান (গ্যান্ডা), মীর জাহাঙ্গীর, মীর কায়সার, মো. বেলাল হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আব্দুল কুদ্দুছ। এরপর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদাললেয় ছাত্র, যুবক ও বিভিন্ন পেশার মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত বা ছুটিতে থাকা অথবা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী ই বি আর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্য এ বাহিনীতে যোগ দেন। বাতেন মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছেন জেনে কিছুদিনের মধ্যেই করটিয়া সাদত কলেজের বি এ (বাংলা বিভাগ) প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং মির্জাপুর থানার পাকুল্লা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, ছিলিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আলী সরকার, ইসমাইল হোসেনসহ প্রায় ষাটজন বাতেন বাহিনীতে যোগ দেন।[৮৪] এভাবে ধীরে ধীরে এ বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং মে'র মাঝামাঝি এটি একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৮৫]

সংগঠন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাতেন বাহিনী গড়ে উঠেছিল আব্দুল বাতেনের নিজ গ্রাম নাগরপুরের মোকনা ইউনিয়নের কোনড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে। কোনড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে বাহিনী গড়ে তোলার পেছনে প্রধান কারণ ছিল ভূকৌশলগত। কোনড়া গ্রাম বা মোকনা ইউনিয়ন থেকে টাঙ্গাইল সদরের দূরত্ব প্রায় ২৫ কি. মি.। একাত্তরে এই এলাকার সাথে সদর এলাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ছিল না। একমাত্র মির্জাপুর অথবা দেলদুয়ারের লাউহাটি থেকে কোনড়াতে পৌঁছানো যেত সড়ক তথা স্থল পথে। এছাড়া, এই গ্রাম বা ইউনিয়নের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে ধলেশ্বরী ও বংশী নদী বয়ে গেছে। সে কারণে এই এলাকায় চট করে প্রবেশ করা পাকিস্তানি সেনাদলের জন্য সহজ ছিল না।[৮৬]

কোনড়া গ্রামের কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বাতেন যে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন, সেই বাহিনীতে অনেক যুবকসহ যোগ দেন অধ্যাপক আলী আকবর খান ডলার। এরপর বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে জুনের মাঝামাঝি প্রায় দুই হাজারে পৌঁছে।[৮৭] তবে এ বাহিনীতে মোট সদস্য সংখ্যা নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। তপন কুমার দে জানাচ্ছেন যে, বাতেন বাহিনীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। এই যোদ্ধাদল একুশটি কোম্পানি, তেষট্টিটি প্লাটুন ও একশটি সেকশনে বিভক্ত ছিল।[৮৮] গবেষক মো. হাবিবুল্লাহ বাহারের মতে, শেষ পর্যন্ত এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হয় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি।[৮৯] আরেকটি সূত্রে জানা যায় যে, বাতেন বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন প্রায় আট হাজার ও স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন প্রায় বারশত।[৯০] বাতেন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন খন্দকার আব্দুল বাতেন। এই বাহিনীতে সামরিক ও বেসামরিক দুটি বিভাগ ছিল। বাহিনীর সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনীর নিয়মানুযায়ী পরিচালনা করা হতো। সামরিক শাখার প্রধান ছিলেন আব্দুল বাতেন নিজেই। এ শাখার ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মেজর আব্দুল বারী ও

কোয়ার্টার মাস্টার ছিলেন খন্দকার আব্দুল করিম।[৯১] বাহিনীর একুশটি কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডারবৃন্দ ছিলেন মেজর আবু তাহের, নায়েক হুমায়ুন কবীর খান, নায়েক আব্দুস সামাদ, নায়েক সিরাজুল হক খান, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আবুল খায়ের, সুবেদার আলমগীর, মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. হুমায়ুন কবীর খান, মো. ইন্তাজ আলী, মো. আব্দুস সামাদ, মো. ওয়াজেদ আলী খান, মো. আব্দুর রশীদ, মো. বেলাল হোসেন, মো. নূরুল ইসলাম, আমিনুর রহমান খান, মো. আফজাল হোসেন, মো. আল্লাদ খান, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. আবু কায়সার ও মো. কফিল উদ্দিন।

বাতেন বাহিনীর বেসামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক আলী আকবর খান ডলার এবং সচিব ছিলেন মহিদুর রহমান খান আলমগীর। বেসামরিক বিভাগর অন্যতম দায়িত্ব ছিল মুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করা, জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা ও জনসংযোগ রক্ষা করা এবং সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা। বাহিনীর বেসামরিক বিভাগ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত ছিল।[৯২]

বিভাগ	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
(১) নিরাপত্তা বিভাগ	উপেন্দ্রনাথ সরকার, খন্দকার আব্দুস সালাম, মীর শামসুল আলম শাহজাদা প্রমুখ
(২) খাদ্য বিভাগ	অরুণ কুমার বোস (তরুণ) ও আব্দুর রাজ্জাক
(৩) অর্থ বিভাগ	খন্দকার আব্দুস সালাম ও আব্দুর রাজ্জাক
(৪) বিচার ও গণসংযোগ বিভাগ	খন্দকার আব্দুস সালাম, মীর শামসুল আলম শাহজাদা ও সুলতান উদ্দিন আহমেদ
(৫) রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিভাগ	অধ্যাপক আলী আকবর খান ডলার, মীর শামসুল আলম শাহজাদা, খন্দকার আব্দুস সালাম, উপেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক আলী হাসান, মহিদুর রহমান খান আলমগীর, অধ্যাপক আশরাফ আলী খান।

এছাড়া বেসামরিক বিভাগের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন মো. দেলোয়ার হোসেন খান চারু ও মো. সেলিম খান।

এর বাইরে বাহিনীর আহত মুক্তিযোদ্ধা ও বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার বেসামরিক নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডা. জহিরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ডা. বসন্ত কুমার সাহা ও উল্লাপাড়ার ডা. নিখিল চন্দ্র সাহা। এই হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন আঙ্গুরী রাণী সরকার।[৯৩]

জুলাই মাসের ১৭ তারিখ আব্দুল বাতেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে ভারতে যান। এসময় বাহিনীর সামরিক শাখা ও বেসামরিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে পরিবর্তন আসে। বাহিনীর সামরিক শাখার অস্থায়ী হাই কমান্ড গঠিত হয় আবুল কালাম আজাদ (শাহজাহান), মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ ও আব্দুর রশীদকে নিয়ে। এই হাই কমান্ডের প্রধান হন আবুল কালাম

আজাদ (শাহজাহান)। বাহিনীর নিরাপত্তা ও বেসামরিক প্রধান হন মীর শামসুল আলম শাহজাদা, তথ্য ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হন উপেন্দ্রনাথ সরকার এবং রিক্রুটিং ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার আব্দুস সালাম। এসময় দেলোয়ার হোসেন হারিজ হাই কমান্ডের উপ-প্রধান (রিক্রুটিং) এবং আব্দুর রশীদ হাই কমান্ডের উপ-প্রধান ও কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।[৯৪]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহ

বাতেন বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা বাছাই ও দলে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার থানার লাউহাটি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়। এই রিক্রুটমেন্ট সেন্টারটির দায়িত্বে ছিলেন খন্দকার আব্দুস সালাম। বাহিনীর যোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এই বাহিনীর তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার তিল্লী গ্রাম, দেলদুয়ার থানার অন্তর্গত লাউহাটি ও নাগরপুরের শাহজানির চর। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো কোনড়া হেডকোয়ার্টার থেকে নিকটবর্তী ছিল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুবেদার মেজর আবু তাহের, সুবেদার আব্দুল বারী, নায়েক ওয়াজেদ আলী খান, নায়েক আব্দুল খায়ের ও সুবেদার আলমগীর।[৯৫] এছাড়া, বাতেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডারগণকে নিজ নিজ অবস্থানে বা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হতো।

বাতেন বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারের সূচনা হয় বাতেন সাহেব কর্তৃক দুটি রাইফেল ও একশ পয়ষট্টি রাউন্ড গুলি সংগ্রহের মাধ্যমে। এরপর দেলদুয়ার থানাধীন লাউহাটি ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আতোয়ার রহমান খান (কামাল) আব্দুল বাতেনকে ম্যাগাজিনবিহীন চারটি রাইফেলের সন্ধান দেন। চারটি রাইফেল লাউহাটির পার্শ্ববর্তী তারুটিয়া গ্রামের এক ডোবা থেকে তুলে আনা হয়।[৯৬] এছাড়া, দেলদুয়ার থানার গজিয়াবাড়ি গ্রামের ফজলুল হক মল্লিক একটি চাইনিজ এলএমজি ও কিছু অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে বাতেন বাহিনীতে যোগ দেন।[৯৭] এ বাহিনীতে অস্ত্র প্রাপ্তির আরেকটি উৎস ছিল ই বি আর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যের আনা অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তবে গোরান-সাটিয়াচড়া যুদ্ধের (৩ এপ্রিল) পর ইপিআর সদস্যদের রেখে যাওয়া প্রায় আট হাজার গুলি (৩০৩ রাইফেলের গুলি) ও চারটি ৩০৩ রাইফেল (একটি ম্যাগজিনবিহীন) এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাতেন সাহেবের হস্তগত হয়। এই অস্ত্র বাতেন বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। এই অস্ত্র বাতেন সাহেব সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন দেলদুয়ার থানাধীন আটিয়ার পূর্বপাড়া থেকে।[৯৮] এছাড়া, বাতেন বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের মূল উৎস ছিল নাগরপুরের ও কাছাকাছি এলাকার থানা ও পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধশেষে পাওয়া অস্ত্র। এ বাহিনীর অস্ত্রসংগ্রহের মূলনীতি ছিল 'শত্রুর অস্ত্রই আমার অস্ত্র'।[৯৯]

আওতাভুক্ত এলাকা

বাতেন বাহিনীর যুদ্ধ এলাকা ছিল দক্ষিণ টাঙ্গাইল তথা নাগরপুর-দেলদুয়ার থানা ও মির্জাপুরের কিছু অংশ, গাজীপুরের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাংশ, মানিকগঞ্জের উত্তর অংশ তথা, সাটুরিয়া, সিঙ্গাইর, ঘিওর, দৌলতপুর এলাকা, ঢাকার ধামরাই এবং সিরাজগঞ্জের চৌহালী থানা এলাকা।[১০০] এই হিসেবে বাতেন বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা মুক্তিযুদ্ধের চারটি ভিন্ন ভিন্ন সেক্টর তথা ২, ৩, ৭ ও ১১ নং সেক্টরের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে পড়ে। তবে, বাতেন বাহিনী শুরুর দিকে দক্ষিণ টাঙ্গাইল ও উত্তর মানিকগঞ্জেই বেশি তৎপর ছিল।[১০১]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

বাতেন বাহিনীর যুদ্ধকৌশল ছিল সম্পূর্ণরূপে গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধকৌশল অর্থাৎ 'আঘাত করো ও সরে পড়ো' নীতি। এই নীতি অনুসরণ করে এ বাহিনী প্রায় পঞ্চাশটি যুদ্ধে অংশ নেন।[১০২] এসব যুদ্ধের মধ্যে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানা অভিযান, ঘিওর থানা অভিযান, সাটুরিয়া থানা অভিযান, শিবালয় থানা অভিযান, দৌলতপুর থানা অভিযান, টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানা অভিযান, মির্জাপুরের ধল্লা ব্রিজ অভিযান, মানিকগঞ্জের জাব্রা ব্রিজের নিকট পাকিস্তানি সৈন্যদলের গানবোট ধ্বংস, নাগপুরের ঘাসকাউনিয়ায় রাজাকার দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান ছিল এ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযান। এসব যুদ্ধাভিযানের কয়েকটির বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

সিঙ্গাইর থানা অভিযান[১০৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: মে ৪ রাত ১১টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি জানানোর পাশাপাশি বাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল বাতেনের সঙ্গে এই অভিযানে সুবেদার আব্দুল বারী, আবুল কালাম আজাদ (শাহজাহান) মো. দেলোয়ার হোসেন হারিজ, মো. ফজলুল হক মল্লিক, আব্দুর রশীদ, মো. আলী জিন্না, আবতাব হোসেন আরজু, নায়েক আব্দুস সামাদ, হুরমুজ আলী, নয়েক আজাহারুল ইসলাম, নায়েক হুমায়ুন, নায়েক আলাউদ্দিন, নায়েক সিরাজুল হক, বাবুল চৌধুরীসহ অনেকে। অস্ত্রের মধ্যে তাদের কাছে ছিল স্টেনগান, জি থ্রি রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল ও কয়েকটি গ্রেনেড।

অভিযানের বিবরণ: সিঙ্গাইর তৎকালীন মানিকগঞ্জ মহকুমার একটি থানা। টাঙ্গাইলের নাগরপুরের কোনড়া থেকে সিঙ্গাইর থানা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবিস্থত। মে মাসের চার তারিখ বাতেনের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা ধলেশ্বরী নদী বেয়ে নৌকায় করে সিঙ্গাইর থানার নিকট পৌঁছান। মুক্তিযোদ্ধারা আব্দুল বাতেন ও সুবেদার আব্দুল বারীর নেতৃত্বে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে থানার পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থান নেন। ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যেই রাত ১১ টায় বাতেন সাহেব প্রথমে স্টেনগান থেকে থানায় গুলি ছোড়েন। এরপর অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও গুলি ছুঁড়তে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে প্রথমদিকেই থানায় থাকা প্রহরীরা গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর থানায় থাকা পুলিশ ও পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় দু'ঘণ্টা যুদ্ধ চলে।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের চাপে পাকিস্তানি সৈন্য ও পুলিশ সদস্যরা তাদের নিহত ও আহত সদস্যদের ফেলে থানা ছেড়ে পালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধারা থানা থেকে কয়েকটি এলএমজি , ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও রাইফেলের প্রচুর গুলি হস্তগত করেন। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। এ যুদ্ধে সাফল্যের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

দৌলতপুর থানা অভিযান[১০৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৭ মে রাত ২ টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের চাহিদা মেটাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে প্রায় ত্রিশ জনের একটি দল এলএমজি, স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: দৌলতপুর থানা মানিকগঞ্জের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ও টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার দক্ষিণে অবস্থিত। দৌলতপুর থানায় এসময় পাকিস্তানি পুলিশ ও মিলিশিয়াদের অবস্থান ছিল। ১৭ মে রাত দুইটার দিকে আব্দুল বাতেনের মুক্তিযোদ্ধাদল থানার পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ চালায়। থানায় থাকা পুলিশ ও মিলিশিয়া সদস্যরা দ্রুত অবস্থান নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। উভয়পক্ষে প্রায় তিন ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলে।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ৪/৫ জন পুলিশ ও মিলিশিয়া নিহত হন। ভোরবেলা পুলিশ ও মিলিশিয়ারা থানা থেকে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা থানা থেকে বেশ কিছু রাইফেল ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন। ১৮ মে বিকাল নাগাদ মুক্তিযোদ্ধারা থানা থেকে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যান।

চৌহালি থানা অভিযান[১০৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: মে মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন রাত আনুমানিক ১২টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: বাতেন বাহিনীর নিকট খবর পৌঁছে যে, চৌহালীতে প্রচুর গোলাবারুদ লুকানো আছে। বাতেন সাহেবের নেতৃত্বে একদল যোদ্ধা ঐ গোলাবারুদ উদ্ধার করতে চৌহালী যান। মুক্তিযোদ্ধারা চৌহালী থানার খুব নিকটে পৌঁছে যাওয়ার পর একদল গোলাবারুদ উদ্ধারে এবং অন্য এক দল থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। থানা আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র সংগ্রহ করা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে পঁচিশ জনের একটি দল এলএমজি , স্টেনগান, জিথ্রি ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: চৌহালী মুক্তিযুদ্ধকালে পাবনা জেলাধীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার পূর্বপ্রান্তে যমুনা নদীর তীরবর্তী একটি থানা ছিল। চৌহালী টাঙ্গাইলের নাগরপুরের পশ্চিমে অবস্থিত। এই এলাকায় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ আছে জানতে পেরে আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে পঁচিশ সদস্যের মুক্তিযোদ্ধা দল কোনড়া থেকে একটি ছিপ নৌকায় ধলেশ্বরী নদী বেয়ে রওনা হয়। ধলেশ্বরী থেকে যমুনা নদী পার হয়ে তারা চৌহালী পৌঁছে যান। চৌহালীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ জনের একটি দল গোলাবারুদ উদ্ধারে বেরিয়ে যান এবং আব্দুল বাতেনসহ অন্যরা নৌকায় অবস্থান করেন। নৌকায় থাকাকালীন বাতেন সাহেব লক্ষ করেন যে, চৌহালী থানা তাদের অবস্থান থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। তিনি নায়েক আজহারকে থানার খোঁজ নিতে পাঠান। আজহার ফিরে এসে জানান যে, বৃষ্টির কারণে থানার বাঙ্কার সয়লাব হয়ে আছে, ভেতরে দুইজন সেন্ট্রি অস্ত্রসহ ঘুমাচ্ছেন। থানার এরূপ বিবরণ শুনে আব্দুল বাতেন তার তিন সহযোদ্ধাসহ থানায় ক্রলিং করে প্রবেশ করেন। তারা থানার মূল ভবনের বারান্দা থেকে ঘুমন্ত দু'জন সেন্ট্রিকে আটক করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে ভবনের পেছনে আসেন। সেন্ট্রিদের নিকট থেকে তারা জানতে পারেন যে, ভবনের ভেতরে থাকা সৈন্যরা ঘুমাচ্ছেন। এই তথ্য পেয়ে বাতেন ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ঘুমন্ত সৈন্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে থানা থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা নৌকাটি নিয়ে যমুনার উত্তর দিকে রওনা হন এবং তাদের সঙ্গীদেরও খুঁজে পান। মুক্তিযোদ্ধারা নৌকায় রওনা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই থানা থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

ফলাফল: চৌহালী থানা থেকে ১১টি জিথ্রি ও ১২টি ৩০৩ রাইফেলসহ প্রচুর গুলি উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে চৌহালীর একটি গ্রাম থেকে ১৫ পেটি এলএমজি ও রাইফেলের গুলি উদ্ধার করা হয়।

সাটুরিয়া থানা অভিযান[১০৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৭ জুন রাত আনুমানিক ১০টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: সাটুরিয়া থানা দখল করে অস্ত্র সংগ্রহ করা ও মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে বাহিনীর ৭, ১১ ও ১৭ নম্বর কোম্পানি এই অভিযানের অংশ নেন। এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট চাইনিজ এলএমজি, স্টেনগান, জিথ্রি রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ছিল।

অভিযানের বিবরণ: সাটুরিয়া মানিকগঞ্জ সদর হতে উত্তরে অবস্থিত আর নাগরপুর হতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। সাটুরিয়া থানা দখল করার উদ্দেশ্যে বাতেন সাহেব পাকুটিয়া থেকে পীর সাহেব ইয়াকুব ভাইকে সাটুরিয়া পাঠান থানা রেকি করার জন্য। থানা রেকি করে ইয়াকুব ভাইয়ের পাঠানো তথ্য মোতাবেক আব্দুল বাতেন তার পূর্বোল্লিখিত তিন কোম্পানি সৈন্যকে সাটুরিয়া থানার পশ্চিমে হাজির করেন। এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে বাতেন থানার পশ্চিম দিক থেকে, আরেকটি কোম্পানি

থানার দক্ষিণ দিক থেকে এবং একটি কোম্পানি কাভারিং ফায়ার দেওয়ার জন্য এদের পিছনে অবস্থান নেন। বাতেনের গুলির মাধ্যমে একযোগে থানা আক্রমণ শুরু হয়। আক্রমণ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই থানার পশ্চিম দিকের দুটি বাঙ্কার বাতেনের দলের দখলে আসে। বাতেন এবং নায়েক আব্দুস সামাদ একটি বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে থানার ভেতরের মূল ভবনের দরজা-জানালা বরাবর গুলি ছুঁড়তে থাকেন। এর মধ্যে বাতেনের মাথার ক্যাপে গুলি লাগে। এই গুলির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ভবনের পাশেই থাকা বালুর বস্তার আড়ালে। সেখানে প্রায় দশজন পাকিস্তানি সৈন্য প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। এ অবস্থায় বাতেন একটি লাঠির মাথায় ক্যাপটি উঁচু করে ধরেন আর নামাতে থাকেন। ক্যাপটি যখনই শত্রুসৈন্যের কাছে দৃশ্যমান হচ্ছিল, তখনই তারা গুলি করছিল। এ অবস্থায় বাতেন নায়েক সামাদকে নির্দেশ দেন যে, যখনই শত্রুর গুলি বন্ধ হবে। তখনই যেন সামাদ গুলির উৎসমুখে স্টেনগান চালান। বাতেনের নির্দেশ মোতাবেক সামাদ গুলি চালালে বালির বস্তার আড়ালে থাকা কয়েকজন সৈন্য নিহত হন। এরপর বাতেন থানার দক্ষিণ পাশ থেকে থানা ভবনের ওপর গুলি চালনার নির্দেশ দেন। গুলি চালনার কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসৈন্যের আত্মসমর্পণের বার্তা আসে।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সাটুরিয়া থানার পতন ঘটে। এ যুদ্ধে প্রায় পনের জন হানাদার সৈন্য ও পুলিশ নিহত হন। থানা থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। পরদিন সকালে সাটুরিয়া খাদ্য গুদাম জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। খাদ্য গুদামের প্রায় সব খাদ্য স্থানীয় জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

নাগরপুর থানা অভিযান[১০৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো এক দিন আনুমানিক দুপুর ২টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: নাগরপুর থানা থেকে প্রায়ই পাকিস্তানি সৈন্যদল বাতেন বাহিনীর যোদ্ধাদের খোঁজে অভিযান চালাত। এছাড়া, নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে চলে আসে। এসময় পাকিস্তানি সৈন্য ও মিলিশিয়ারা থানার বাইরে খুব একটা আসতেন না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে আরো ভীত ও মনোবলহীন করার জন্য থানা আক্রমণ করা হবে।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: বাতেন বাহিনীর সুবেদার মেজর আবু তাহের ও সুবেদার আব্দুল বারীর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, চাইনিজ স্টেনগান, জি-থ্রি রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে থানা অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: নাগরপুর থানা নাগরপুর সদরে অবস্থিত। এই থানা সুরক্ষার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা বেশ মজবুত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিলেন। সুবেদার মেজর আবু তাহের ও সুবেদার আব্দুল বারীর মুক্তিযোদ্ধা দল নাগরপুর থানা চারদিক থেকে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের প্রথমদিকেই থানার সৈন্যরা নিরাপদ অবস্থানে চলে যান। ফলে উভয়পক্ষে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। গুলি বিনিময়ের মধ্যেই পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আঘাত আনে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ বেকায়দায় পড়েন। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা গুলি বিনিময় বন্ধ করেন যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভাবেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পালিয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই কৌশলে কাজ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারে আনাগোনা বন্ধ হয় এবং থানার অভ্যন্তরে সৈন্যদের অবস্থানও খানিকটা শিথিল হয়। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান ছেড়ে হালকা মেজাজে চলাচল করতে শুরু করেন। তখনই পুনর্বার মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে আর পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরাপদ অবস্থানে যেতে পারেননি। দ্বিতীয়বার আক্রমণের কৌশল ও সাহসিকতার ফলে খান সেনারা থানা থেকে পালিয়ে চলে যান।

ফলাফল: নাগরপুর থানা আক্রমণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা থানা দখল করতে সক্ষম হন। পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রায় পনেরটি লাশ ও দশের অধিক আহত সৈন্য ফেলে থানা থেকে পালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছিল না।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

বাতেন বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার যুদ্ধ তৎপরতাসহ সারাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে *অগ্নিশিখা* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হতো।[১০৮] *অগ্নিশিখা* পত্রিকায় প্রধানত বাতেন বাহিনীর যুদ্ধসাফল্য প্রচার করা হতো। এর পাশাপাশি কাদেরিয়া বাহিনী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের সংবাদও এখানে ছাপা হতো। *অগ্নিশিখা* প্রকাশ করা বাদেও এ বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ অবরুদ্ধ জনতার সাথে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতো। এ বিভাগের প্রধান কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের মনোবল ধরে রাখা।

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

বাতেন বাহিনীর সাতজন যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন এবং উনিশজন যোদ্ধা যুদ্ধাহত হয়েছেন। বাহিনীর শহিদ যোদ্ধাদের মধ্যে জিয়ারত হোসেন, আব্দুল বাতেন, সামাদ, আবদুর রউফ, নিজাম উদ্দিন এর কথা জানা যায়।[১০৯]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

বাতেন বাহিনী গড়ে তোলার সময় বাহিনী প্রধান আব্দুল বাতেন অন্যান্য সংগঠকগণ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। বাতেন বাহিনী যদিও প্রবাসী সরকার বা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সহযোগিতা পায়নি, তবুও এই বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধ ও অন্যান্য নির্দেশনা মেনে বাহিনী পরিচালনা করেছিল। বাতেন বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ স্থাপন করতে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আব্দুল বাতেন জুলাই-এর ১৭ তারিখ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, বাতেন ভারতে বন্দি হয়েছেন। যাহোক, বিজয় অর্জন অবধি বাংলাদেশ সরকারের সাথে এ বাহিনীর কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ঘটেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি বাতেন টাঙ্গাইলে ফিরে আসেন।[১১০]

গণমাধ্যমে বাতেন বাহিনী

বাতেন বাহিনীর যুদ্ধ সাফল্যের কথা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছিল বলে শোনা যায়। এছাড়া, *অগ্নিশিখা* পত্রিকায় এ বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

বাতেন বাহিনীর কোনো মুক্তিযোদ্ধা এ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রীয় খেতাব পাননি।[১১১]

অস্ত্র সমর্পণ:

বাতেন বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র মোট তিনটি পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২ নাগরপুর ডাক বাংলো মাঠে থানা প্রশাসনের নিকট অস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।[১১২] এরপর ৩১ জানুয়ারি খন্দকার আব্দুল বাতেনের নেতৃত্বে এ বাহিনীর একদল মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্র সমর্পণ করেন।[১১৩] এ বাহিনীর অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ১৯৭২-এর মার্চের ৭ ও ৯ তারিখ দেলদুয়ার থানার লাউহাটি স্কুল মাঠে থানা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[১১৪]

মূল্যায়ন

বাতেন বাহিনী সম্পূর্ণ ব্যক্তিপ্রচেষ্টায় ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় গড়ে ওঠা অন্যতম আঞ্চলিক বাহিনী। দক্ষিণ টাঙ্গাইল ও উত্তর মানিকগঞ্জে এ বাহিনীর কর্মতৎপরতা অপেক্ষাকৃত বেশি দৃশ্যমান। এসব এলাকায় এই বাহিনী ব্যতীত অন্য কোনো আঞ্চলিক বাহিনী বা বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগকৃত যোদ্ধাদল প্রায় ছিল না বললেই চলে। সুতরাং, অত্র এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল, তার পুরো কৃতিত্ব বাতেন বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য। এই বাহিনী শুরু থেকেই স্থানীয় ছাত্র-যুবক-জনতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ধীরে ধীরে পাঁচ হাজারের অধিক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও এক হাজার দুশো'র বেশি স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে যে মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিল, সে মুক্তিবাহিনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল স্থানীয় জনসাধারণ। অতএব, এতদ্ অঞ্চলে জনযুদ্ধের প্রধান কারিগর এই বাতেন বাহিনী।

পাকিস্তানি সৈন্য, মিলিশিয়া ও পুলিশ মোকাবেলার পাশাপাশি বাতেন বাহিনীর যোদ্ধাগণ এতদ্ অঞ্চলের ডাকাত লুটেরা ও দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। অসংখ্য ডাকাত ও দুস্কৃতকারীদের শাস্তি দিয়ে এই বাহিনী অত্র অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এ কাজে বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারাও অবদান রেখেছিলেন। তাছাড়া, এই বাহিনীর অতি কার্যকর ভূমিকা ছিল স্থানীয় পাকিস্তানপন্থি ও রাজাকার-শান্তি কমিটির সদস্যদেরকে প্রতিরোধে এই বাহিনীর তৎপরতায় এর আওতাভুক্ত এলাকায় রাজাকারদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসে। এই ক্ষেত্রে বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারা কার্যকর ভূমিকা রাখেন।

বাতেন বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো পত্রিকা প্রকাশ। *অগ্নিশিখা* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে অবরুদ্ধ জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধের নানামুখী কর্মকাণ্ড ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য প্রচার করে এ বাহিনী অত্র অঞ্চলের অবরুদ্ধ জনগণের মনোবল বৃদ্ধিতে বেশ সফল হয়েছিল। এটি মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ উভয়ের জন্যই উপকারী হয়েছিল বলা যায়। এছাড়া, স্থানীয় জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাখতে এই বাহিনীর গণসংযোগ বিভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে অনেকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা বাতেন বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের আনুকূল্য এমনকি সাধারণ স্বীকৃতিও পায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, দশম খণ্ড* এবং *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: সেক্টর ভিত্তিক ইতিহাস সেক্টর ১১* গ্রন্থে বাতেন বাহিনীর কর্মকাণ্ড স্থান পেয়েছে। এটি অবশ্য এক ধররে স্বীকৃতি। কিন্তু, এ বাহিনীর কোনো মুক্তিযোদ্ধা আজ অবধি রাষ্ট্রীয় কোনো খেতাব বা পুরস্কার পাননি। এ বাহিনীর বেশ কয়েকজন সশস্ত্র যোদ্ধা এখনও 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারেন নি। আর বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারাতো রাষ্ট্রের তরফ থেকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতিই পাননি। এ বাহিনীর সদস্যদের আক্ষেপ হলো- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে এই বাহিনীর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি।

হালিম বাহিনী

মানিকগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধকালে তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানা এলাকাকে ভিত্তি করে একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। এই মুক্তিবাহিনী মানিকগঞ্জ মহকুমার পাশাপাশি ঢাকা জেলার পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ এলাকায় সক্রিয় ছিল। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল হালিম চৌধুরী। বাহিনীর প্রদানের নামানুসারেই এই মুক্তিবাহিনীর পরিচিতি তৈরি হয় হালিম বাহিনী নামে।

ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী (এরপর থেকে হালিম চৌধুরী নামে) ১৯২৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার এলাচিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুল মতিন চৌধুরী এবং মাতা হাসিনা চৌধুরী। তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং রাজশাহী কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।[১১৫]

হালিম চৌধুরী সেনাবাহিনীতে প্রথম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এ্যাডজুটেন্ট ও কোয়ার্টার মাস্টার, চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি'র এডিসি এবং পূর্ব পাকিস্তানের ইউওটিসি ব্যাটালিয়নের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জোনে পোস্টিং ছিল) কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে (ইপিআইডিসি) যোগ দেন। এই সংস্থা থেকে তাকে কুষ্টিয়ায় 'জগতি' নামক চিনিকল স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'জগতি' চিনিকল তার অক্লান্ত শ্রমের ফসল। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে তাকে আবার সেনাবাহিনীর তরফে ডাকা হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি অবসরে চলে যান।

হালিম চৌধুরী ১৯৬৬ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (মোজাফ্ফর) যোগদান করেন। ব্যক্তিগতভাবে ন্যাপকর্মী হিসেবেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং মানিকগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি থানার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

মানিকগঞ্জ ঢাকার সন্নিকটে হওয়ায় মার্চ মাসের শুরু থেকেই কেন্দ্রের সাথে তাল মিলিয়ে মানিকগঞ্জেও হরতাল, মিছিল, গণজমায়েত ও জনসভা চলতে থাকে। পাশাপাশি পূর্ব ধারণা অনুযায়ী এখানে স্বাধীনতার বিষয়েও আলোচনা চলছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হলে তা স্বাভাবিকভাবেই সশস্ত্ররূপ নেবে এই বিবেচনা থেকে ৪ মার্চ হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য গেরিলা প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনিক ভবনের পূর্বপ্রান্তে বর্তমান রিজার্ভ ট্যাংকির উত্তর-পশ্চিম কোণের 'মঠ' এর পাশে।[১১৬]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'-আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানিকগঞ্জের জাতীয় পরিষদ সদস্য মোসলেম উদ্দিন খান হাবু মিয়ার বাড়ির সামনে উন্মুক্ত স্থানে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজ থেকে

সংগৃহীত ইউওটিসি এর ডামি রাইফেল নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণ কাজে আবুল কাশেম, তপন চৌধুরী, রতন বিশ্বাস প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক বাহিনীর জনৈক আশরাফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[১১৭] এ সময় দেবেন্দ্র কলেজ মাঠেও প্রশিক্ষণ কর্ম শুরু হয়।

মানিকগঞ্জে ২৫ মার্চ পর্যন্ত নানা স্থানে গেরিলা প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ২৫ মার্চ রাতে মোসলেম উদ্দিন খান হাবু মিয়ার বাসভবনে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ২৭ মার্চে আহুত হরতাল কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে পালনে করণীয় নির্ধারণ প্রসঙ্গে। সভা শেষে নেতৃবৃন্দ চলে গেলে রাত ১২ টার পর মানিকগঞ্জে খবর আসে যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে। মানিকগঞ্জ থানা ওয়ারলেসের মাধ্যমে আরো খবর আসে যে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই খবরে মানিকগঞ্জের নেতৃবৃন্দ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ঐ রাতেই একটি অনির্ধারিত সভায় মিলিত হন।[১১৮] এই সভায় মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা কাউন্সিল বা কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা হয়। কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ হলেন (১) মোসলেম উদ্দিন খান হাবু মিয়া (২) ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী (৩) মাজহারুল ইসলাম চান মিয়া (৪) ডা. মীর আবুল কায়ের মটু, (৫) খন্দকার দেলোয়ার হোসেন (৬) সৈয়দ আনোয়ার আলী চৌধুরী (৭) মফিজুল ইসলাম খান কামাল[১১৯] অন্য একটি উৎসের দাবি-মানিকগঞ্জে ঐদিন তিনটি পরিষদ গঠন করা হয়। সর্বোচ্চ পরিষদে ছিলেন ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, খন্দকার মাজহারুল হক চান মিয়া এমপিএ, সিদ্দিকুর রহমান এমপিএ, আক্তার উদ্দিন বিশ্বাস এমপিএ, মীর আবুল খায়ের ঘটু ডাক্তার এমপিএ, মোসলেম উদ্দিন খান হাবু মিয়া এমএনএ এবং সৈয়দ আনোয়ার আলী।[১২০] দ্বিতীয় পরিষদ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ছিল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিষদ এবং বিভিন্ন উপ-পরিষদের সব সদস্য নিয়ে সর্বমোট ৭৯ জন সদস্য সংগ্রাম কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন।[১২১] এই কমান্ড কাউন্সিল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত মাইক্রোওয়েভ ওয়ারলেসের মাধ্যমে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৫ মার্চ রাতেই কাউন্সিল তরাতে অবস্থিত তৎকালীন ইপিআরটিসি ডিপোতে চাকরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত (সামরিক বাহিনী) কর্মকর্তা সাধারণ সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ঐ রাতেই বিপ্লবী পরিষদ আরিচা ফেরি ঘাটের সব ফেরি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেন যাতে পাকিস্তানি সৈন্যদল আরিচা পাড়ি দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে সহজেই ও দ্রুত পৌছাতে না পারে। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্ত্র চালনায় দক্ষ যোদ্ধাদের দিয়ে ধামরাইয়ের নয়ারহাটে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।[১২২]

২৫ মার্চ রাতেই মানিকগঞ্জ ট্রেজারিতে থাকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ কমান্ড কাউন্সিল হস্তগত করেন। ২৬ মার্চ সকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ঘোষণায় সামরিক শাসন জারি করেন এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন কমান্ড কাউন্সিলকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফিরিয়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করে এই অবস্থায় ৩৬টি রাইফেল ও কিছু গোলাবারুদ রেখে বাকি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ট্রেজারিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[১২৩]

২৭ মার্চ হালিম চৌধুরীর শহরস্থ আলুর গুদামের পিছনে কমান্ড কাউন্সিলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই মর্মে শপথ নেন যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং হালিম চৌধুরীর নেতৃত্ব মেনে চলবেন। এই দিন থেকেই হালিম চৌধুরীর আলুর গুদাম মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং এখানেও সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়।[১২৪] যাহোক, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই মানিকগঞ্জ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল করার চেষ্টা শুরু করে। তারা ছত্রীসেনা নামিয়ে ঢাকা-আরিচা সড়ক দখল করার পর ৮ এপ্রিল মানিকগঞ্জ দখল করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই মানিকগঞ্জের অন্যান্য থানাশহরও তাদের দখলে চলে যায়। এ অবস্থায় কমান্ড কাউন্সিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কমান্ড

কাউন্সিলে হালিম চৌধুরী ও হাবু মিয়া হরিরামপুর থানার কৌড়ী গ্রামে অবস্থান নেন।[১২৫] এখানে ঘাঁটি তৈরি করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রেখে গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হালিম চৌধুরী বাদে কমান্ড কাউন্সিলের সব নেতাই ভারতে চলে যান। এই পরিপ্রেক্ষিতে হালিম চৌধুরী ব্যক্তিগত চেষ্টায় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

সংগঠন

মানিকগঞ্জের মহকুমা আওয়ামী লীগ ও কমান্ড কাউন্সিলের প্রায় সব নেতা এপ্রিলের মধ্যেই ভারতে চলে গেলেও হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে হরিরামপুর থানার কৌড়ী, সুতালড়ী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর অনেক স্থানে প্রশিক্ষণ কর্ম চলমান থাকে।[১২৬] পাশাপাশি হালিম চৌধুরী হরিরামপুর থানা বাদে মানিকগঞ্জের অন্যান্য থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন ও তার দলের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ৭ মার্চের পর মানিকগঞ্জের প্রত্যেক থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, সভা-সমাবেশ হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়। এসব সভা-সমাবেশে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মানিকগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সাথে হালিম চৌধুরীও যেতেন। ফলে, ঐসব থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পূর্ব থেকেই হালিম চৌধুরীর পরিচয় ছিল। এরপর ২৫ মার্চ হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে কমান্ড কাউন্সিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবে এমন সিদ্ধান্ত মানিকগঞ্জব্যাপী প্রচার করা হলে এখানাকার সব পর্যায়ের মানুষ হালিম চৌধুরীকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেন।

হরিরামপুর থানায় হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রস্তুতি চলছিল- এই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনার কাজে ভূমিকা রেখেছিলেন আবদুল মতিন চৌধুরী, আব্দুর রশীদ মাস্টার, মীর মোতাহার হোসেন, মীর হাবিবুর রহমান, খন্দকার লিয়াকত আলী, ইয়াকুব আলী, ডা. চিত্তরঞ্জন দত্ত (ভোলা ডাক্তার), নরেশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ।[১২৭] এদের সহযোগিতায় হালিম চৌধুরী জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে মানিকগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী মুন্সিগঞ্জ, সাভার, কেরানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে পীর সাহেব সেজে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন। এসময় ইঞ্জিনিয়ার তোবারক হোসেন লুডু প্রায়ই হালিম চৌধুরীর সাথে থাকতেন।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠিত হয়ে যায়।[১২৮] কিন্তু প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাবে এ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদলকে মোকাবেলার সুযোগ পাননি। তবে, ১৭ জুলাই মানিকগঞ্জের ঘিওর থানা আক্রমণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এ বাহিনী সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে শুরু করে।[১২৯] সেপ্টেম্বর মাসে হালিম বাহিনী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি হাই কমান্ড গঠন করা হয়। উক্ত হাই কমান্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়:[১৩০]

ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী- মুক্তিবাহিনী প্রধান

আব্দুল মতিন চৌধুরী- প্রশাসনিক প্রধান

আব্দুর রউফ খান- সামরিক প্রধান

আব্দুর রশীদ খান মাস্টার- সদস্য

মীর হাবিবুরর রহমান খান- সদস্য

খন্দকার লিয়াকত আলী- সদস্য

উক্ত হাই কমান্ডের সদস্যদের মধ্যে খাদ্য, অর্থ, বিচার, অস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি দায়িত্ব বিভাজন করে দেওয়া হয়। এই হাই কমান্ডের অধীন সংগঠক হিসেবে তোবারক হোসেন লুডু, আবুল হক, সিদ্দিক মাস্টার ভূমিকা পালন করেন। এই হাই কমান্ডের সামরিক শাখার অধীন সেপ্টেম্বর মাসেই বাহিনীর

উপর্যুক্ত সদস্যদেরকে নিয়ে চারটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এই কোম্পানিগুলোর নাম ও কমান্ডারদের নাম নিম্নরূপ:[১৩১]

কোম্পানির নাম	**কমান্ডারগণ**
আলফা	আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী (হারুন মিয়া), গঙ্গারামপুর ও গোলাম মহীউদ্দিন
বেটা	আবুল বাশার (বিমান বাহিনী সদস্য), মহেশখালী
চার্লি	আবদুল হাকিম (সিপাহী, সামরিক বাহিনী,) খলিলপুর, মৈনুদ্দীন চৌধুরী (শুকুর)
ডেল্টা	আবুল খালেক (রংপুর জেলা)

উল্লিখিত চারটি কোম্পানির মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল মূলত হরিরামপুরের বিভিন্ন গ্রামে। হরিরামপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী থানাগুলোর বিভিন্ন স্থানে হালিম চৌধুরীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল নিম্নরূপ:

ক্যাম্প-১	অধিনায়ক:	লোকমান হোসেন
ক্যাম্প-২	অধিনায়ক:	মফতেজুল ইসলাম খান
ক্যাম্প-৩	অধিনায়ক:	আব্দুস ছালাম বুলু
ক্যাম্প-৪	অধিনায়ক:	আলী আকবর (ই বি আর সদস্য, বরিশাল)
ক্যাম্প-৫	অধিনায়ক:	মহাদেব সাহা
ক্যাম্প-৬	অধিনায়ক:	নুরুল ইসলাম
ক্যাম্প-৭	অধিনায়ক:	আফতাব উদ্দিন খান
ক্যাম্প-৮	অধিনায়ক	এলাহী বক্স

উপরিল্লিখিত সামরিক সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে হালিম বাহিনী মানিকগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এ সময়ে বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার।[১৩২] হালিম বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে হালিম চৌধুরীকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মানিকগঞ্জে ফিরে আসেন। মানিকগঞ্জে ফিরে তিনি তার বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো আরো বিস্তৃতভাবে সাজান। এছাড়া হালিম বাহিনীর কার্যক্রম মানিকগঞ্জের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করে। এর কারণ, বাংলাদেশ সরকারের ২ নং সেক্টর কমান্ডের প্রধান এ টি এম হায়দার হালিম বাহিনীকে ভিত্তি দল হিসেবে গণ্য করে হালিম চৌধুরীকে মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা সদর, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের এরিয়া কমান্ডার নিয়োগ করেন। এছাড়া, এই এলাকার বিভিন্ন থানার জন্য কয়েকজনকেক থানা কমান্ডার নিয়োগ করেন। এরপর তথা নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হালিম বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়ায় নিম্নরূপ:[১৩৩]

এরিয়া কমান্ডার	**এরিয়া/আওতাভুক্ত-এলাকা**
ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল হালিম চৌধুরী	মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা (উ.) ও ঢাকা (দ.) এর অন্তগত ২২টি থানা
সেকেন্ড ইন-কমান্ড আব্দুল মতিন চৌধুরী	ঐ

হালিম বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাকে তিনটি অপারেশনাল ইউনিটে বিভক্ত করে এরূপে সাজানো হয় :

ইউনিট কমান্ডার	**আওতাভুক্ত এলাকা**
আব্দুর রউফ চান মিয়া	হরিরামপুর, শিবালয়, ঘিওর, দৌলতপুর এলাকা
তোবারক হোসেন লুডু	সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ সদর, সাটুরিয়া, সাভার এলাকা
সিরাজ উদ্দিন	নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ এলাকা

উল্লিখিত কাঠামোতে হালিম বাহিনী থানা কমান্ডারগণ ছিলেন নিম্নরূপ :
হরিরামপুর থানা- কাজী মোহাম্মদ সফিক টিপু (কুমারদহ)
সাটুরিয়া থানা- আব্দুল খালেক
ঘিওর থানা- মতিলাল সেন ছানা (কুষ্টিয়া)
সিঙ্গাইর থানা- ফজলুল হক খান
শিবালয় থানা- মীর মোতাহার হোসেন (সুতালড়ী)
দৌলতপুর থানা- আওলাদ হোসেন (দড়িকান্দি)

হালিম বাহিনীর সাথে নভেম্বর মাস থেকে ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার, শ্রীনগর, লৌহজংসহ বৃহত্তর ঢাকার পশ্চিম এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা মিলিতভাবে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে যুক্ত হন। ধামরাই থানায় এসময় মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল রৌহা গ্রামে। ধামরাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে নজরুল ইসলাম খান, শাহজাহান মিয়া, নুরুজ্জামান মিয়া, শরীফ (পরবর্তীকালে উপজেলা চেয়ারম্যান), বেনজীর আহম্মদ (পরবর্তীকালে এমপি), আজাহার খান, বজলুর রহমান, কাদের খান আয়নাল হক, মো. আসলাম, হারান মিয়া, শহীদ মোল্লা, মনিরুজ্জামান, রহিম উদ্দিন, ফজলুল হক, ফজলুর রহমান, আবুল হোসেন, শওকত হোসেন, আব্দুল কাদের, আব্দুল মালেক, জসিম উদ্দিন, সফি উদ্দিন, সায়েদুর কুটু, কাদের (খোড়াকান্দি), দেলোয়ার, ডা. মাসুদ প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন। সাভার থানার কমান্ডার আশরাফ উদ্দিন খান ইমু (পরবর্তীকালে এমপি), দেওয়ান ইদ্রিস, হামিদুর রহমান রঞ্জু, আবদুল কাইয়ুম, সরফরাজ, ফিরোজ কবীর (পরবর্তীকালে উপজেলা চেয়ারম্যান), গিয়াস উদ্দিন, মোজাম্মেল হক প্রমুখ এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। দোহার থানা এলাকায় কালাম ডাক্তার, রজুর আলী, সায়েদুর রহমান খোকা, আসাদুজ্জামান খান কামাল (পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), মাহবুব, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, আক্কেল আলী, সুলতান প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নবাবগঞ্জ থানায় ইয়াহিয়া চৌধুরী, মাহমুদা চৌধুরী, আঙ্গুর, ফজলু, ওয়ারেশ, শরাফত, আজিজুর রহমান হক, সাংবাদিক মুরাদ, নাজির আহমেদ, হারুনার রশীদ, ভন্টনী বাবু প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। অনুরূপভাবে কেরানীগঞ্জ থানায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন বোরহান উদ্দিন গগন (পরবর্তীকালে এমপি), মোস্তফা মোহসীন মন্টু (পরবর্তীকালে এম পি), নাসির উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, নজরুল ইসলা, আবদুর রহীম, মো. হোসেন, আমিরুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন, সমশের উল্লাহ, আমান উল্লাহ খান, আব্দুল হাই প্রমুখ।[১৩৪]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৮ এপ্রিল মানিকগঞ্জ দখলে নিলে হালিম চৌধুরী, মোসলেম উদ্দীন খান হাবু মিয়া মফিজুল ইসলাম খান কামাল পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হরিরামপুরের কৌড়ী গ্রামে অস্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তোলেন। এই খানেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং হালিম চৌধুরী নিজেই প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এরপর কৌড়ীর পাশাপাশি সুতালড়ী, আজিমনগর, কোদালিয়া, পাটগ্রাম, মালুচি, লেছড়াগঞ্জ, চানপুরতরা, বোয়ালী, গোসাইর বাজার, কৃষ্ণপুর, আটিগ্রামসহ প্রভৃতি স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[১৩৫] এসব কেন্দ্রে ছাত্র-যুবক ও অন্যান্য পেশার

মানুষের পাশাপাশি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অথবা ছুটিতে থাকা বা পাকিস্তানের পক্ষত্যাগকারী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেন। এসময় হালিম চৌধুরী বাদে আনসার কমান্ডার চান মিয়া (হাটিপাড়া), আব্দুর রব (সুতালড়ী), এস এ খালেক (সেনা সদস্য), দলিল উদ্দিন, লালু মুন্সী, আব্দুর রউফ মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন। পরবর্তীকালে কোম্পানি কমান্ডারগণ নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দেখভাল করতেন।[১৩৬]

হালিম বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারের প্রথম উৎস ছিল মানিকগঞ্জ ট্রেজারি থেকে নেওয়া অস্ত্র। অবশ্য ট্রেজারি থেকে নেওয়া সব অস্ত্র হালিম বাহিনী ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ, ট্রেজারি থেকে নেওয়া অস্ত্রের অধিকাংশই ঢাকা-মিরপুরে যুদ্ধরত-ছাত্র-যুবক ও ইপিআর সদস্যদের জন্য মানিকগঞ্জ থেকে পাঠানো হয়।[১৩৭]

এছাড়া, হালিম চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদের নামে লাইসেন্সকৃত বন্দুক ও পিস্তল তিনি বাহিনী গঠন করার সময় নেতৃবৃন্দের কাছে অর্পন করেন।[১৩৮] এরপর হরিরামপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কিছু সাধারণ বন্দুক সংগ্রহ করা হয়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারে মোট অস্ত্র ছিল ১৭টি ৩০৩ রাইফেল ও কয়েকটি পিস্তল। জুলাই এ ঘিওর থানা আক্রমণ করে এ বাহিনী কিছু অস্ত্র লাভ করে।[১৩৯] ৯ আগস্ট হরিরামপুরের মালুচি গ্রামে হালিম চৌধুরীর ছোট একটি দলের সাথে শিবালয় থানার তৎকালীন দারোগা ও পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ বাধে। এই খণ্ডযুদ্ধ শেষে হালিম চৌধুরীর দল ৪টি ৩০৩ রাইফেল, ১টি পিস্তল ও কয়েকশো রাউন্ড গুলি হস্তগত করেন।[১৪০] হালিম চৌধুরী সেপ্টেম্বরে ভারতে যাওয়ার পর এ বাহিনীর জন্য ভারত থেকে কিছু অস্ত্র আসে এবং তিনি ফিরে আসার সময় বেশ কিছু উন্নত অস্ত্র ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধা সাথে নিয়ে আসেন।[১৪১] পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সৈন্য, মিলিশিয়া ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করে প্রাপ্ত অস্ত্রই এই বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

আওতাভুক্ত এলাকা

হালিম বাহিনী সূচনাপর্বে মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানা এলাকায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। আগস্ট মাস পর্যন্ত এ বাহিনীর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় পুরো দক্ষিণ মানিকগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পুরো মানিকগঞ্জ হয়ে পড়ে এ বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র। নভেম্বর থেকে এ বাহিনী মানিকগঞ্জের সবগুলো থানাসহ পার্শ্ববর্তী ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার, শ্রীনগর, লৌহজং ও ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল।[১৪২] এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার প্রায় পুরোটা ২ নং সেক্টরভুক্ত ছিল।

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

হালিম বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধকৌশল হিসেবে প্রধানত গেরিলা যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করেছিল। তবে নভেম্বর মাস থেকে এ বাহিনী কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধ ও লিপ্ত হয়। গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ মিলিয়ে এ বাহিনী প্রায় ত্রিশটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[১৪৩]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৫৭ পদাতিক ব্রিগেডের ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট, ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১৩ এল এফ রেজিমেন্ট, ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট ও ৬০৪ গোয়েন্দা ইউনিট নিযুক্ত ছিল।[১৪৪] নভেম্বরের শেষ দিকে উল্লিখিত সেনা বিন্যাসে পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় ৩৬ পদাতিক ডিভিশনকে ঢাকায় অবস্থান নিতে

দেখা যায়। আর এর সাথে ঢাকা সেক্টরে ইপিসিএএফ'র **১৩** ও **১৬** নং উইংকে নিয়োগ করা হয়।[১৪৫] মানিকগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান ক্যাম্প ছিল শহরের পি টি আই ভবনে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযাগী রাজাকার-আল বদর-আল শামসদের বিরুদ্ধে হালিম বাহিনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

সিঙ্গাইর (বায়রা) অভিযান: [১৪৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৩ আগস্ট বিকাল ৩টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: সিঙ্গাইর থেকে ধলেশ্বরী নদী হয়ে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা মানিকগঞ্জে যান খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে। মানিকগঞ্জ থেকে সিঙ্গাইর ক্যাম্পে ফেরার পথে তাদেরকে আঘাত করার জন্যই মুক্তিযোদ্ধারা অভিযানটি পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: মো. মান্নান, মো. আলী হোসেন, মিজানুর রহমান, হযরতসহ প্রায় ত্রিশ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল এলএমজি (রাশিয়ান) এসএলআর (ভারতীয়), ২ ইঞ্চি মর্টার, ব্যাটাগান, ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: সিঙ্গাইর থানার বায়রা নামক স্থানে পাকিস্তানি সেনাদলের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যুদ্ধ হয়। বায়রা সিঙ্গাইর থানার একটি ইউনিয়ন যা সিঙ্গাইয়ের পশ্চিমে ও মানিকগঞ্জে শহরের পূর্বে অবস্থিত। এই এলাকা দিয়ে একাত্তরে ধলেশ্বরী নদী প্রবহমান ছিল। এই নদীপথে নৌকাযোগে একদল পাকিস্তানি সেনা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মানিকগঞ্জ শহর হতে সিঙ্গাইরে ফিরছিলেন। এই খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে নদীর দুই পাড়ে অবস্থান নেন। বেলা ৩টার দিকে পাকিস্তানি সৈন্যবাহী নৌকা মুক্তিযোদ্ধাদের নাগালে আসলে নদীর দুই পাড় থেকেই এক যোগে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আঘাতেই পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রায় পনের জন নিহত হন। আর বাকিরা নদীতে লাফ দিয়ে সাঁতরে পাড়ে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির জবাব দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ক্ষেতের মধ্যে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণ না করায় তাদেরকে হত্যা করা হয়।

ফলাফল: এই অভিযানে প্রায় বাইশজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন আহত হন।

হরিরামপুর সিও অফিস অভিযান: [১৪৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৩ অক্টোবর দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: হরিরামপুর থানার সিও অফিসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি দখলের জন্যই মুক্তিযোদ্ধাদের এই অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আবদুর রউফ চান মিয়ার নেতৃত্বে প্রায় দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএলআর, ২ ইঞ্চি মর্টার, ৩০৩ রাইফেল, ব্যাটাগান, গ্রেনেড প্রভৃতি হালকা অস্ত্র নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বর্ণনা: হারিরামপুর সিও অফিস (সার্কেল অফিসার'স অফিস) থানা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সিও অফিস রেকি করে অফিসের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে থানা আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জবাবে পাকিস্তানি সৈন্যরাও মেশিনগান ও রকেট লঞ্চার থেকে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকেন। কিন্তু, মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম আঘাতের সাথে সাথে সিও অফিসের

খুব কাছাকাছি চলে যাওয়ায় নিরাপদ অবস্থান থেকেই শত্রুসৈন্যকে গুলিবিদ্ধ করতে পারছিলেন। উভয় পক্ষে প্রায় তিন ঘণ্টা গুলি বিনিময় হয়। উল্লেখ্য এই যুদ্ধে ৫ জন বেলুচ সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আঘাতে প্রায় ষাটজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত, চারজন জীবিত বন্দি হন। এই ক্যাম্প থেকে সত্তরটি রাইফেল, তিনটি এলএমজি ও সাত বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন শহিদ ও একজন আহত হন।

গোলাইডাঙ্গা অভিযান: [১৪৮]

অভিযানের তারিখ: ২৮ অক্টোবর সকাল ১১টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: আগস্ট থেকেই মানিকগঞ্জের বিভিন্ন স্থানের মত সিঙ্গাইরেও মুক্তিযোদ্ধারা খুব সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সিঙ্গাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ঘাঁটি ছিল গোলাইডাঙ্গায়। ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানি সৈন্যরা এই গোলাইডাঙ্গা ক্যাম্প দখল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদেরকে প্রতিরোধ করতে গোলাইডাঙ্গা অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: তোবারক হোসেন লুডু ও লোকমান হোসেনের দিক নির্দেশনায় মিরাজ, ইয়াকুব, জাহাঙ্গীর, হেকমত, নূরুল ইসলাম, জলিল, আনোয়ার, ফরিদ, জাহিদুর রহমান, হারুন, মান্নান, চায়নাম্যান, মহাদেব, ভবেশ, লাবু, মোস্তাফিজ, বিল্লাল, বাহার, বাদশা, আসমান, মালেক, মজনু, ওয়াজেদ, লুৎফর আলী, আকবর পাটোয়ারীসহ প্রায় ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা এ অভিযানে যুক্ত ছিলেন। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজি , এসএলআর, স্টেনগান, ৩০৩ রাইফেল, মার্ক-৪ রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করেন।

অভিযানের বিবরণ: গোলাইডাঙ্গা সিঙ্গাইর থানার একটি গ্রাম। এই গ্রামের হাই স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প ছিল। ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানি সৈন্যরা (প্রায় তিনশ জন) দশ/বারটি নৌকায় নবগঙ্গা নদী দিয়ে গোলাইডাঙ্গা স্কুল অভিমুখে অগ্রসর হন। পাকিস্তানি সৈন্যদের আসার খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্কুল ক্যাম্প ছেড়ে নবগঙ্গার খালের দুই পাড়েই (নূরানীগঙ্গা খাল) অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা হাই স্কুলে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে পুনরায় নৌকায় চেপে ফিরে যাচ্ছিলেন। এসময় তাদের নৌকাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের বন্দুকের রেঞ্জে আসামাত্র একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। এরকম আকস্মিক আক্রমণে নৌকায় থাকা পাকিস্তানি সৈন্যগণ কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। নৌকায় গুলিবিদ্ধ হয়েই অসংখ্য সৈন্য মারা পড়েন। অনেকে নৌকা থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়েন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে খুঁজে হত্যা করেন। তবে পাকিস্তানি সৈন্যদের বৃহৎ অংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

ফলাফল: এই যুদ্ধে শতাধিক মতান্তরে আশির অধিক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধশেষে রকেট বোমা, চাইনিজ এসএমজি, চাইনিজ রাইফেল (অটোমেটিক), রকেট লাঞ্চারসহ বেশকিছু হালকা অস্ত্র উদ্ধার করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আলীকর ও বদি নামের দুজন আহত হন। তবে, গোলাইডাঙ্গা যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা পরেই পাকিস্তানি সৈন্যরা এখানে বিমান হামলা চালিয়ে গণহত্যা সংঘটন করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

ঘিওর অভিযান[১৪৯]

অভিযানে তারিখ ও সময়: ২৮ নভেম্বর বিকাল ৫টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ঘিওর থানা থেকে একদল পাকিস্তানি সৈন্য মানিকগঞ্জের দিকে রওনা দিয়েছেন এমন খবর পেয়ে তাদেরকে পথিমধ্যে আক্রমণ করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: মো. মুনসুরুল আলমের নেতৃত্বে প্রায় একশজনের একদল মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি , এসএমজি, স্টেনগান, ব্যাটাগান, ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: ঘিওর থানা থেকে ২৮ নভেম্বর প্রায় চল্লিশজনের একটি পাকিস্তানি সেনাদল মানিকগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই খবর পেয়ে ঘিওর-মানিকগঞ্জ রাস্তার দু'পাশে (নারচী গ্রামের মধ্যে অবস্থান) মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন। বিকাল ৫টা নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্যদলের বহর মুক্তিযোদ্ধাদের নাগালে আসলে তাদেরকে আক্রমণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তাৎক্ষণিক পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরাপদ অবস্থান নিতে সক্ষম হন। এরপর দু'পক্ষ প্রায় চার ঘণ্টা একটানা গুলি বিনিময় করেন। গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘিওরের দিকে পালিয়ে যান।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধারা ২ জন আহত সৈন্য ও ২ জন জীবিত সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করান। যুদ্ধাশেষে বেশকিছু চাইনিজ রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

সিঙ্গাইর (ধল্লা) অভিযান[১৫০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: টাঙ্গাইল ও উত্তর বঙ্গ থেকে পলায়মান পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি অংশ মানিকগঞ্জ হয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হন। তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই মুক্তিবাহিনীর এ অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: ফজলুল হক খানের নেতৃত্বে ১৮৭ জনের মুক্তিযোদ্ধা দল এলএমজি , এসএমজি, চাইনিজ রাইফেল, স্টেনগান, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেলসহ অন্যান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর প্রায় ৩০০ জনের একটি দল সিঙ্গাইরের জয়মন্ডল-ধল্লা সড়ক ধরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এমন খবর জানতে পেরে ফজলুল হক খান উল্লিখিত এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে পরিখা খনন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সংযোগ স্থলের মাঝামাঝি। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিখা ছিল বংশী নদীর পূর্বে ও ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমে। সিঙ্গাইর-ঢাকা সড়ক ধরে পাকিস্তান সৈন্যরা অগ্রসর হয়ে যখন মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আওতায় চলে আসেন তখন হঠাৎ একজন মুক্তিযোদ্ধার রাইফেল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে গুলি বের হয়ে যায়। এতে অপর পক্ষ সতর্ক হয়ে পড়েন। তারা গুলি চালাতে চালাতে বংশী নদী পার হতে থাকেন। আর তাদেরকে পাকিস্তানি সৈন্যদের আর একটি দল ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব পাড় হতে কাভারিং ফায়ার দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলে উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ চলার পর মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান ছেড়ে দেন।

ফলাফল: এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান ছেড়ে দিলে অপরপক্ষ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে ১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

উপরে বর্ণনাকৃত অভিযানগুলো বাদে হালিম বাহিনী চারিগ্রামে লঞ্চে আক্রমণ (১৭ জুন), ঘিওর থানা আক্রমণ (১৭ জুলাই), মাচাইন যুদ্ধ (১৮ জুলাই), সুতালড়ী যুদ্ধ (২২ জুলাই), মানিকগঞ্জের মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ (২৯ জুলাই), বেতিলায় রাজাকার ক্যাম্প অভিযান (২১ আগস্ট), বালিরটেক মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণ (২৬ আগস্ট), নয়াডিঙ্গি ব্রিজ ধ্বংস (২৯ আগস্ট), আজিমনগর যুদ্ধ (২৪ সেপ্টেম্বর), মহাদেবপুর ব্রিজ ধ্বংস (৬ নভেম্বর), নয়াবাড়ি অভিযান (২২ নভেম্বর), দাসকান্দি যুদ্ধ (৮ ডিসেম্বর) বালিরটেক যুদ্ধ (৮ ডিসেম্বর), বরুন্ডি যুদ্ধ (১০ ডিসেম্বর), কাগজীনগর

যুদ্ধ (১২ ডিসেম্বর), সেওতা ব্রিজ যুদ্ধ (৩ ডিসেম্বর), গাজিন্দা যুদ্ধ (১৫ ডিসেম্বর) প্রভৃতি অভিযান পরিচালনা করে।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জনগণকে অবগতকরণ ও মুক্তিযুদ্ধে জনতার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার আহ্বানই নানা বিষয়ে হাতে লেখা প্রচারপত্র এপ্রিলের মধ্যভাগ থেকে বিলি করা শুরু হয়। তখনো পর্যন্ত এসব প্রচার কমান্ড কাউন্সিলের নামেই ছাপা হতো।[১৫১] এরপর হালিম বাহিনীর পক্ষে জুলাই মাসের শেষভাগ থেকে *অগ্নিবাণ* নামক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকা ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। মূলত হালিম চৌধুরীর পৃষ্ঠাপোষকতায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকা পরিচালনায় উপদেষ্টা পরিষদে আব্দুল মতিন চৌধুরী, আবদুর রউফ খান, নরেশ চন্দ্র চৌধুরী, আব্দুর রশীদ খান, তোবারক হোসেন লুডু, হায়াত আলী মিয়া, গোলাম মহিউদ্দিন ছানা, মো. শাহজাহান চৌধুরী, নাসিমা সুলতানাসহ আরো অনেকে যুক্ত ছিলেন। *অগ্নিবাণ* পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে প্রায়ই প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় থাকত। ঢাকার দোহার থানার জয়পাড়া এলাকার অতুল গোমেজ বঙ্গবন্ধুর ছবি স্টেনসিল পেপারে আঁকতেন। পত্রিকাটি সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপা হতো। মেশিনটি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার পাটগ্রাম স্কুল থেকে তৎকালীন ছাত্রনেতা আশরাফ উদ্দিন খান নিয়ে আসেন।[১৫২]

হালিম বাহিনীর সংগঠকগণ পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি জনসংযোগ কার্যক্রমও চলমান রাখেন। জনসংযোগ তথা উঠান বৈঠক, সাধারণ সভা ও গ্রামের নেতৃস্থানীয় মানুষের সাথে কৌশলগত মতবিনিময় প্রভৃতি বজায় রাখেন। বিশেষ করে হরিরামপুর থানায় এ ধরনের জনসংযোগ বেশি করে করা সম্ভব হয়েছিল। হরিরামপুরে কয়েকটি জনসভাও আয়োজন করা হয়।[১৫৩] এছাড়া, মানিকগঞ্জ শহরের কেন্দ্রগুলোতে এইচএসসি পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রচারপত্র বিলি ও পোস্টারিং করা হয়। এই কাজে ভূমিকা রাখেন মুক্তিযোদ্ধা পিয়ারা, বাবলু এবং সুবলা সাহা।

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে হালিম বাহিনীর অর্ধশতাধিক সদস্য শহিদ হয়েছেন। কোনো কোনো উৎসে এ সংখ্যা ৫৪ উল্লেখ করা হয়।[১৫৪] বাহিনীর শহিদ সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন হলেন আবুল কাশেম, নওশের মোল্লা, মো. চাঁন মিয়া, আব্দুল ওহাব, মো. আনিসুর রহমান, আক্কেল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, রমিজ উদ্দিন, আনিস, রাজিব, শরিফুল ইসলাম। এছাড়া এ বাহিনীর ত্রিশের অধিক যোদ্ধা বিভিন্ন যুদ্ধে আহত হন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন পানু মোল্লা, হাবিব, আলীকর, বদি, বাদল।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

হালিম বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এই বাহিনীর প্রধান ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ন্যাপের সাথে জড়িত থাকলেও, মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে একই সংগ্রাম কমিটি ও কমান্ড কাউন্সিলে নেতৃত্ব দেন। এরপর কমান্ড কাউন্সিল ভেঙে গেলে তিনি মূলত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের (হরিরামপুর থানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার) সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী পরিচালনা করেন। তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জেনেই বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে তাকে আগরতলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই আমন্ত্রণ পেয়েই তিনি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ভারতে

তিনি কর্ণেল এম এ জি ওসমানী, মেজর খালেদ মোশারফ, মেজর এ টি এম হায়দারসহ অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১৫৫] নভেম্বর মাসে তিনি মেলাঘরে যান ও ১৯ নভেম্বর তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা সদর উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমার এরিয়া ফোর্স কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৫৬] হালিম চৌধুরীকে এরিয়া ফোর্স কমান্ডার নিয়োগ করার পাশাপাশি এই বাহিনীকে বেশ কিছু উন্নত অস্ত্রও প্রদান করা হয়। তবে, হালিম চৌধুরী যেহেতু বাম ঘরানার রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তাই হালিম বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের নিকট নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে জানা যায়।[১৫৭]

গণমাধ্যমে হালিম বাহিনী

হালিম বাহিনীর যুদ্ধতৎপরতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্থান পেত বাহিনীর নিজস্ব পত্রিকা *অগ্নিবাণ*-এ। এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার, *জয় বাংলা*, *নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স*সহ কয়েকটি গণমাধ্যমে হালিম বাহিনীর যুদ্ধসাফল্যের কথা প্রচার করা হয়। অবরুদ্ধ দেশ থেকে প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধ* পত্রিকার ১০ অক্টোবর সংখ্যায় সরাসরি হালিম বাহিনীর নাম উল্লেখ না করে মানিকগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অভিযানের খবরে বলা হয়, "গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানায় এক অভিযান চালাইয়া মুক্তিযোদ্ধারা ৭৫ জন পুলিশ ও রাজাকারকে বন্দি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দখল করিয়াছে। কিছুদিন যাবৎই এই থানার ঘাঁটি হইতে পুলিশ ও রাজাকাররা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপর নির্যাতন চালাইয়া আসিতেছিল।"[১৫৮]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

হালিম বাহিনীর সদস্য এরকম কোনো মুক্তিযোদ্ধাই সরকার প্রদত্ত কোনো খেতাবে ভূষিত নন। তাছাড়া পুরো মানিকগঞ্জে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেন মো. ইবরাহীম খান বীর প্রতীক।[১৫৯]

অস্ত্রসমর্পণ

ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী ঢাকা পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকার এরিয়া ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর এ বাহিনীর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রাথমিকভাবে হালিম চৌধুরীর নিকট সমস্ত জমা দেন। এরপর তিনি এসব অস্ত্র ২ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর এ টি এম হায়দারকে অবগত করে মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন।[১৬০]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালে ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক মুক্তি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার ভিত্তিতে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এই বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে কিছু অস্ত্র সহায়তা পেয়েছিল। এই সহায়তা বাহিনীর বিদ্যমান শক্তি বৃদ্ধি করেছিল বটে, তবে এ সহায়তা সরকার সরকার এই বাহিনীর কর্মকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পরে দিয়েছিল।

হালিম বাহিনী গঠনের শুরুতে দক্ষিণ মানিকগঞ্জ কেন্দ্রিক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করলেও, ধীরে ধীরে পুরো মানিকগঞ্জ এলাকায় এবং যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢাকার বিরাট এলাকা জুড়ে এ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে মানিকগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক হালিম বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে নভেম্বর পর্যন্ত অত্র এলাকায় সরকারি বাহিনীর কোনো মুক্তিযোদ্ধার চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। এরপর হালিম বাহিনী সৃষ্ট নিরাপদ এলাকায় ২ নং সেক্টর কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা পাঠাতে পেরেছিল। অর্থাৎ হালিম বাহিনী হয়েছিল ভারতে প্রশিক্ষিত উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা। এছাড়া, হালিম বাহিনীর সংগঠকগণ উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য অসংখ্য ছাত্র-যুবক

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তেমনি বাংলাদেশ সরকার মানিকগঞ্জ বা সন্নিহিত এলাকায় স্থানীয় যুবকদেরকেই নিয়োগ করতে পেরেছিল। এর ফলে মানিকগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে অংশ নেওয়া সহজ হয়েছিল।

হালিম বাহিনী গঠনের সূচনাপর্বে পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে এ বাহিনী সরাসরি পাকিস্তানি সেনাদলকে মোকাবেলা করতে না পারলেও সামর্থ্যনুযায়ী স্থানীয় রাজাকার-দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। বিশেষ করে হরিরামপুর থানা এলাকায় এ বাহিনীর তৎপরতার কারণে অত্র এলাকায় খুব বেশি রাজাকার বা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি মাথা তুলতে পারেনি। ফলে, অত্র এলাকায় তুলনামূলকভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। এই কৃতিত্বের অংশীদার নিঃসন্দেহে হালিম বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ।

হালিম বাহিনী যুদ্ধকালে *অগ্নিবান* পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচারপত্র বিলি করার মাধ্যমে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনতার মনোবল বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিল। এছাড়া উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা ও জনসভা করে স্থানীয় মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিল। অবরুদ্ধ দেশে এটি ছিল একটি সাহসী ও অতি প্রয়োজনীয় তৎপরতা।

হালিম বাহিনী যদিও ২ নং সেক্টর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে এ বাহিনীর যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। উপরন্তু, এ বাহিনীর কোনো মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কোনো খেতাব বা পুরস্কার পাননি। এমনকি এ বাহিনীর বেশ কয়েকজন যোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিও পাননি। মানিকগঞ্জ এলাকার জনযুদ্ধের মূল রূপকার হালিম বাহিনীর ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে এ বাহিনীর ভূমিকার উপযুক্ত স্থান না মিললে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হবে খণ্ডিত।

আফসার বাহিনী

ময়মনসিংহ

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিকভাবে যেসব মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা এলাকায় গড়ে ওঠা আফসার বাহিনী একটি। এই বাহিনী স্থানীয়ভাবে 'আফসার ব্যাটালিয়ন' নামে অধিক পরিচিত। এই বাহিনীর যোদ্ধাগণ অবরুদ্ধ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার ভিত্তিতে।

আফসার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা আফসার উদ্দিন আহমেদের জন্ম ৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ (৮ বৈশাখ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার চাউলাদি গ্রামে। তার পিতার নাম কেরামত আলী মুন্সি ও মাতার নাম আয়মন নেছা। ছাত্রকালে তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিকের পাঠ নেন। এর মধ্যে ছিল বাবুর বাড়ি প্রাইমারি স্কুল, ভালুকা প্রাইমারি স্কুল, বাঘমারা প্রাইমারি স্কুল। তিনি ভালুকা হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। এছাড়া, ময়মনসিংহ শহরের নওমহলে অবস্থান করে এক বছর তিনি কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করেন কাশীনাথ কারিগরি বিদ্যালয় থেকে।[১৬১] এরপর তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে সৈনিক পদে যোগদান করেন। সৈনিক হিসেবে তার প্রশিক্ষণ হয় কলকাতায় মিলিটারি একাডেমিতে।

সৈনিক জীবনে তিনি নায়েক পদে উন্নীত হন। ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি বার্মা, সিঙ্গাপুর, জাপান প্রভৃতি ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন।[১৬২] ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলেও সেখানে যোগদান করেননি। এরপর ১৯৫৩ সালে তিনি ইফতেকার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে যোগ দেন। এই কোম্পানিতেই তিন পেশা জীবনের ইতি ঘটান।

পেশাজীবন শেষ করে তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই তিনি ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলেও নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।[১৬৩] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তার নেতৃত্বে ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১৯৯৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এই বীরযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল আসন (জাতীয় পরিষদের আসন) বাদে সবকটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এ নির্বাচনে ময়মনসিংহ হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:[১৬৪]

জাতীয় পরিষদ		প্রাদেশিক পরিষদ	
সংসদীয় আসন নং	বিজয় প্রার্থী	সংসদীয় আসন নং	বিজয় প্রার্থী
ময়মনসিংহ-১	আলহাজ্ব মো. আব্দুস সামাদ	ময়মনসিংহ-১	মো. আশরাফ হোসেন
ময়মনসিংহ-২	করিমুজ্জামান তালুকদার	ময়মনসিংহ-২	মো. রাশেদ মোশাররফ
ময়মনসিংহ-৩	মো. আব্দুল হাকিম	ময়মনসিংহ-৩	মো. আব্দুল হাই
ময়মনসিংহ-৪	মো. আনিছুর রহমান	ময়মনসিংহ-৪	আব্দুল মালেক
ময়মনসিংহ-৫	আব্দুল হাকিম সরকার	ময়মনসিংহ-৫	আক্তারুজ্জামান
ময়মনসিংহ-৬	এ কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ	ময়মনসিংহ-৬	নিজাম উদ্দিন আহমেদ
ময়মনসিংহ-৭	মো. ইব্রাহিম	ময়মনসিংহ-৭	ডা. নাদিরুজ্জামান খান
ময়মনসিংহ-৮	নূরুল আমিন	ময়মনসিংহ-৮	এড. মো. আব্দুল হালিম
ময়মনসিংহ-৯	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	ময়মনসিংহ-৯	মো. কুদরত উল্লাহ মন্ডল
ময়মনসিংহ-১০	এ এন এম নজরুল ইসলাম	ময়মনসিংহ-১০	শামছুল হক
ময়মনসিংহ-১১	অধ্যাপক মো. সামছুল হুদা	ময়মনসিংহ-১১	হাতেম আলী মিয়া
ময়মনসিংহ-১২	এড সদিরউদ্দিন আহমদ	ময়মনসিংহ-১২	মো. আব্দুল মতিন ভূঁইয়া
ময়মনসিংহ-১৩	এড আব্দুল মমিন	ময়মনসিংহ-১৩	এ এম মোশাররফ হোসেন
ময়মনসিংহ-১৪	এম জাবেদ আলী	ময়মনসিংহ-১৪	মো. ইমাম আলী মিয়া
ময়মনসিংহ-১৫	আসাদুজ্জামান খান	ময়মনসিংহ-১৫	খন্দকার আব্দুল মালেক শহিদুল্লাহ
ময়মনসিংহ-১৬	জিল্লুর রহমান	ময়মনসিংহ-১৬	মো. মোসলেম উদ্দিন
ময়মনসিংহ-১৭	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	ময়মনসিংহ-১৭	আবুল মনসুর আহমেদ
ময়মনসিংহ-১৮	এড. আব্দুল হামিদ	ময়মনসিংহ-১৮	মোস্তফা এম এ মতিন
		ময়মনসিংহ-১৯	মো. আব্দুল হাশেম
		ময়মনসিংহ-২০	আব্দুল মজিদ তারা মিয়া
		ময়মনসিংহ-২১	নাজমুল হুদা
		ময়মনসিংহ-২২	ডা. আখলাকুল হোসেন
		ময়মনসিংহ-২৩	আব্বাস আলী খান
		ময়মনসিংহ-২৪	হাদিস উদ্দিন চৌধুরী
		ময়মনসিংহ-২৫	আব্দুল খালেক
		ময়মনসিংহ-২৬	এ কে এম শামছুল হক
		ময়মনসিংহ-২৭	মোস্তাফিজুর রহমান
		ময়মনসিংহ-২৮	এম এ সাত্তার
		ময়মনসিংহ-২৯	এম এ কুদ্দুস
		ময়মনসিংহ-৩০	আব্দুল কাদের
		ময়মনসিংহ-৩১	মনজুর আহমেদ বাচ্চু
		ময়মনসিংহ-৩১	সৈয়দ বদরুজ্জামান

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ময়মনসিংহের প্রতিটি মহকুমা ও থানা সদরে ২ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।[১৬৫] এ দিন ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগ সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন আহমদ শহরে এবং সংগ্রামী ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে দেন। একই দিনে ময়মনসিংহ টাউন হলের সামনে বাংলাদেশের পতাকা (যুদ্ধকালীন) উত্তোলন করেন জেলা আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া। ৭ মার্চের ভাষণের পর ময়মনসিংহে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। ৮ মার্চ মিছিলে মিছিলে ময়মনসিংহের রাস্তাঘাট প্রকম্পিত হয়। এদিনেই ময়মনসিংহে গঠিত হয় 'জয় বাংলা বাহিনী'। বৃহত্তর ময়মনসিংহের 'জয় বাংলা বাহিরী'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান ছাত্রনেতা আবুল হাশেম।[১৬৬]

৮ মার্চে ময়মনসিংহে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এ সংগ্রাম কমিটিতে প্রথমে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে (মুক্তযুদ্ধকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে রফিকউদ্দিন ভূঁইয়াকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংগ্রাম কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ আহমদ, নজরুল ইসলাম খান, প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান, অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান, ময়েজউদ্দিন আহমদ, রহমত উল্লাহ নাম জানা যায়।[১৬৭] উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ বাদেও সংগ্রাম কমিটিতে অ্যাডভোকেট জুবেদ আলী এমপি এ, অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন আকন্দ এম এন এ, অ্যাডভোকেট ঈমান আলী এম পিএ, হাতেম আলী তালুকদার এম এন এ, অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল কাদির, অ্যাডভোকেট আ. হাকিম, আ: সাত্তার (আয়কর উকিল) প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।[১৬৮] জেলার ছাত্র নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন নাজিম উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম খোকন, নূর মোহাম্মদ তালুকদার, প্রদীপ চক্রবর্তী, হামিদুল হক, এরশাদুর রহমান প্রমুখ। শহরের বিপিন পার্কে জেলা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এর যৌথ উদ্যোগে জনসভা আয়োজিত হয়। এ সভায় নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদ জানান। এই সভা থেকে বলা হয়- 'একমাত্র পূর্ণ গণতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধীকার নিরঙ্কুশ হতে পারে'।[১৬৯]

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলা ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সমিতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে ২০ মার্চ পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।[১৭০] ২৩ মার্চ 'প্রতিরোধ দিবস' ময়মনসিংহে পালিত হয়। এদিন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া। প্রতিরোধ দিবসে ময়মনসিংহের প্রতিটি মহকুমা ও থানা সদর এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও পাকিস্তানের পতাকা প্রত্যাখ্যান করে বা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[১৭১] অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে ময়মনসিংহ শহরের সিটি স্কুলে আওয়ামী লীগের এবং মহাকালী পাঠশালায় আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকল স্বাধীনতাকামী দলের কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দ মোহন কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ, নাসিরাবাদ গার্লস স্কুল, জিলা স্কুল, আখতারুজ্জামান কলেজ ও মিন্টু কলেজের মাঠে প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি শুরু হয়।[১৭২] ৮ মার্চে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল মাঠে শামসুল হকের (এমপিএ) নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যে অস্ত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে মিন্টু কলেজের অধ্যক্ষ মতিউর রহমান জোর প্রচেষ্টা চালান।[১৭৩] অনুরূপভাবে, ময়মনসিংহের অন্যান্য মহকুমা ও থানায়ও সংগ্রাম কমিটি সক্রিয় ছিলেন।

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে এবং ২৬ মার্চ প্রথমে স্বাধীনতার ঘোষণা আসলে ২৬ মার্চ ময়মনসিংহে সংগ্রাম কমিটির সভা বসে। এ সভার সিদ্ধান্ত মতে শামসুল হক এমপিএ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পান।[১৭৪] জেলা আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া ও তার সহকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সিভিল এবং পুলিশ লাইন থেকে যেসব অস্ত্র পাওয়া সম্ভব, তা নিয়েই যুবসমাজের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তে ময়মনসিংহে পূর্ব থেকে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাঠে চলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বেগবান হয়। ২৭ মার্চ দুপুর নাগাদ ময়মনসিংহ

জেলার সকল এলাকায় শুরু হয় প্রতিরোধ প্রস্তুতির সার্বিক প্রক্রিয়া। এ দিন সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ শহরের নিকটস্থ খাগডহর-এ ইপিআর উইং এর স্থানীয় হেড কোয়ার্টার সাধারণ ও রাজনীতি সচেতন জনতা ঘেরাও করেন। রাত ১১টার দিকে বাঙালি ও অবাঙালি ইপিআর সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ভোরবেলায় রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, শামসুল হক, 'জয় বাংলা বাহিনী' প্রধান আবদুল হাসেম, মেডিক্যাল কলেজের ভিপি মাহমুদ, এ এম কলেজের ভিপি হামিদ, পুলিশ লাইন স্কুলের শিক্ষক শামসুল আলমসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জেলখানা ও পুলিশ লাইন থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের সাহায্য করেন। ছাত্র জনতা ও ইপিআর-এর সৈনিকগণ একসময় অস্ত্রাগারের দেয়াল ভেঙে অস্ত্রশস্ত্র জনতার মধ্যে বিতরণ করেন। ২৮ মার্চ সকাল আটটা নাগাদ ইপিআর ক্যাম্প মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।[১৭৫] এরপর থেকে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ময়মনসিংহ প্রশাসন চলতে থাকে। তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে ময়মনসিংহে পাকিস্তানি সেনাদলকে প্রতিরোধের চেষ্টা চালাতে থাকেন। তবে ২৩ এপ্রিল সকাল ১০ টার মধ্যে ময়মনসিংহ শহরে পাকিস্তানি সেনারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭৬]

ময়মনসিংহ শহরে ৭ মার্চের পর যে প্রতিরোধ পর্ব শুরু হয়, তার ধারাবাহিকতায় ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণের অন্যতম থানা ভালুকাতেও একই তালে দখলদার প্রতিরোধ প্রচেষ্টা শুরু হয়। ভালুকাতে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন অ্যাডভোকেট মোস্তফা এম এ মতিন এমপিএ, কে বি এম আছমত আলী (সাধারণ সম্পাদক, থানা আওয়ামী লীগ), এম এ কাশেম, নূরুল ইসলাম (সোনামিয়া), কুতুব উদ্দিন মাস্টার, মোহাম্মদ আলী মাস্টার, আফসার উদ্দিন আহমেদ (আফসার বাহিনী প্রতিষ্ঠাতা), ডা. আ. খালেক, শামসুল আলম, জিয়ারত চেয়ারম্যান প্রমুখ। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে এ কে এম আবুল হোসেন মিলন (সভাপতি, থানা ছাত্রলীগ), নূরুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, থানা ছাত্রলীগ), গোলাম মোস্তফা, মতিউর রহমান খান প্রমুখ। কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন।[১৭৭]

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলা প্রতিরোধের জন্য ৮ মার্চের পর থেকে ভালুকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ভালুকা থানা পুলিশের নিকট থেকে ৫/৭ টি রাইফেল সংগ্রহ করা হয়েছিল।[১৭৮] ভালুকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরিতে অত্র এলাকার শীর্ষ আওয়ামী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। স্থানীয়ভাবে চলা এ প্রচেষ্টা ছাড়াও ময়মনসিংহ জেলা সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে ভালুকা থানায় সুবেদার আনোয়ারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি দলকে প্রতিরোধ যোদ্ধা হিসেবে পাঠানো হয়। এই দল ভালুকার সিডস্টোর বাজারে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। তবে, ২৩ এপ্রিল ময়মনসিংহ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথমে ত্রিশাল ও পরে ভালুকা থানা তাদের দখলে চলে যায়।[১৭৯] উল্লেখ্য, পাকিস্তানি সেনাদল ভালুকা প্রবেশের বেশ পূর্বেই (এপ্রিলের ১৫ তারিখের কাছাকাছি) ভালুকার শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (যুব ও ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ) নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ রকম প্রেক্ষাপটে ভালুকা থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মল্লিকবাড়ি ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ মুক্তি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ইতোমধ্যে সংগৃহীত ৮টি রাইফেল নিয়ে ১৭ এপিল মল্লিকবাড়ি বাজারে খেলু ফকিরের বাড়িতে মুক্তিদল গঠন করেন। এই মুক্তিদলে মো. আমজাদ হোসেন, মো. আব্দুল খালেক, নারায়ণ চন্দ্র পাল, মো. আব্দুল বারেক মিয়া, আবদুল মান্নান (যুদ্ধে শহিদ), অনিল চন্দ্র সাংমা (যুদ্ধে শহিদ), ছমির উদ্দিন মিয়া ছিলেন প্রথম দিকের সদস্য।[১৮০]

সংগঠন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল ভালুকা থানাধীন মল্লিকবাড়ি গ্রামে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে আফসার উদ্দিন আহমেদ একটি মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরি করেন। ধীরে ধীরে এই দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আফসার বাহিনী গঠিত হওয়ার পর ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও, বাটাজুর, কাচিনা, ডাকাতিয়া, পাঁচগাও, কাওলামারী, রাইজ, ফলবাড়ীয়া, আমিরাবাড়ী, নারাঙ্গী, বড়াইদ, দক্ষিণ ফুলবাড়িয়া, কালিয়াকৈরসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটিতে থাকা বা অবসরপ্রাপ্ত বা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী ইপিআর, ই বি আর, পুলিশ, আনসার সদস্যবৃন্দ এবং সাধারণ ছাত্র-যুবক-জনতা এই বাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজারে পৌঁছে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের এই সংখ্যার মধ্যে হাসপাতাল, পত্রিকা অফিস, বার্তা বিভাগসহ বেসামরিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত।[১৮১]

আফসার বাহিনীর সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন আফসার উদ্দিন আহমেদ। এই বাহিনীতে সহকারী অধিনায়ক ছিলেন কয়েকজন। তারা বিভিন্ন মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ এর ২৪ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত সহকারী অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মোমতাজ উদ্দিন খান (মুক্তিযুদ্ধে শহিদ)। এরপর ২৯ জুন থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন আফসার সাহেবের ছেলে নাজিম উদ্দিন আহমেদ (যুদ্ধে শহিদ) আব্দুল হাকিম এই দায়িত্ব পালন করেন ১৫ আগস্ট থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং আবুল কাশেম যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত আব্দুল হাকিমের স্থলাভিষিক্ত থাকেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে বাহিনীর অধিনায়ক আফসার সাহেব ১৪ আগস্ট ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। তার অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক আফসার আব্দুল হাকিমকে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পন করে যান।[১৮২]

আফসার বাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে ছিলেন এ. এন. এম মোছলেহ উদ্দিন আহমেদ। সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন মো. আখতার হোসাইন মন্ডল, সহ সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন মো. আব্দুল হামিদ (গফরগাঁও), সুবেদার মেজর ছিলেন সুলতান আহমেদ অফিস ইন-চার্জ ছিলেন মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, জেসিও অ্যাডজুটেন্ট ছিলেন মো. আ. মোতালেব হাবিলদার, একাউন্ট ক্লার্ক ছিলেন মো. আবুল কাশেম ও সহকারী ক্লাক ছিলেন মো. নুরুল আমীন, ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ছিলেন মো. আব্দুল খালেক ও সহকারী ক্লার্ক ছিলেন শাহজাহান চৌধুরী ও সহকারী ক্লার্ক ছিলেন মো. আলী আকবর, রেকর্ড ক্লার্ক ছিলেন এফ এম আবুল কাশেম ও সহকারী ক্লার্ক ছিলেন নুরুল হুদা চৌধুরী (দুলু), বিএইচএম ছিলেন মো. আবুল কাশেম (গফরগাঁও) ও অডিটর ছিলেন মো. আ. সবুর বি. কম।[১৮৩]

আফসার বাহিনীতে কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে ২৪ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন ডা. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও এ. কে. এম আছাদুজ্জামান, ২৯ জুন থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন মো. মোছলেম উদ্দিন (ডাকাতিয়া) ও নুরুল আমিন, ১৫ আগস্ট থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন মো. ফজলুল হক বেগ ও এস. এম. ওমর আলী, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন মো. আ. গফুর মাস্টার ও মোছলেম উদ্দিন (রসুলপুর), ১১ নভেম্বর থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন মো. মোছলেম উদ্দিন (রসুলপুর) ও মো. আ. মোতালেব।[১৮৪]

অধিনায়ক আফসার সাহেব তার বাহিনীকে সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত করেছিলেন। সামরিক ফ্রন্টে এই বাহিনীতে ২৫টি কোম্পানি ছিল। এই ২৫টি কোম্পানি আবার ৫টি ব্যাটালিয়নে বিভক্ত

ছিল। প্রতিটি কোম্পানি আবার ৩টি প্লাটুন এবং প্রতিটি প্লাটুন ৩টি সেকশনে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি সেকশনে ১৫ জন করে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।[১৮৫]

আফসার বাহিনীর ৫টি ব্যাটালিয়নের প্রত্যেকটিতে 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই' নামে ৫টি কোম্পানি ছিল এবং প্রত্যেকটি কোম্পানির জন্য একজন কোম্পানি কমান্ডার ও একজন সহকারী কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন। প্রথম ব্যাটালিয়নের পাঁচটি কোম্পানির (এ বি সি ডি ই) কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. চান মিয়া, ঝালপাজা, ভালুকা; মো. আব্দুল কুদ্দুস খান, বড়াইদ, ভালুকা; মো. আইয়ুব আলী, রায়মণি, ত্রিশাল; মো. আ. হাকিম, বাটাজোর, ভালুকা; মো. আনসার উদ্দিন মাস্টার, খাগাটি, ত্রিশাল। এই ব্যাটালিয়নের পাঁচটি কোম্পানির সহকারী কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. কাজিম উদ্দিন, ভালুকা; মো. মজিবুর রহমান, পনাশাইল, ভালুকা; গাজী মো. আ. বারি মাস্টার, গোপালপুর, ত্রিশাল; মো. সিদ্দিক হোসাইন, মো. সিরাজুল হক, রায়মণি, ত্রিশাল। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের পাঁচটি (এ বি সি ডি ই) কোম্পানির কোম্পনি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে শামছউদ্দিন আহমেদ, বাটাজোর, ভালুকা; মো. কছিম উদ্দিন, পালগাঁও, ভালুকা; মো. নাজিম উদ্দিন, নন্দিপাড়া, ভালুকা; মো. ফয়েজ উদ্দিন, বাটগাঁও, ভালুকা; মো. আবদুল মজিদ, মেদিলা, ভালুকা। উল্লিখিত কোম্পানি কমান্ডারদের সহকারী কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. মজিবুর রহমান, ডুমনিঘাটা, ভালুকা; মো. আব্দুল হালিম, টাঙ্গাব, গফরগাঁও; মো. হাসনাত আলী, ছলিমপুর, ত্রিশাল; মো. জবান আলী, তামাইট, ভালুকা; মো. আবুল কাশেম, তারাকান্দা, ফুলপুর।

তৃতীয় ব্যাটালিয়নের পাঁচটি (এ বি সি ডি ই) কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে বশির উদ্দিন আহমেদ, ডাকাতিয়া, ভালুকা; মো. ফজলুল ওয়াহাব, অলহরী, ত্রিশাল; মো. ওয়াহেদ আলী, বাটাজোর, ভালুকা; গাজী মো. নুরুল ইসলাম, কাচিনা, ভালুকা; মো. ফজলুল বেগ, বাটাজোর, ভালুকা। এই ব্যাটালিয়নের পাঁচটি কোম্পানির সহকারী কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. তমিজ উদ্দিন, মো. আইয়ুব আলী, মো. হাতেম আলী, খুর্দ্দ, ভালুকা; মো. আ. ছাত্তার, দেওয়ানিয়াবাড়ি, ত্রিশাল; মো. সিরাজুল হক, কাঠালী, ভালুকা।

চতুর্থ ব্যাটালিয়নের পাঁচটি (এ বি সি ডি ই) কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. শামসুর রহমান, বাটাজোর, ভালুকা; মো. সিরাজুল হক, শিলাসী, গফরগাঁও; এমদাদুল হক (দুলু), মাসুদপুর, ভালুকা; মো. আ. রাজ্জাক, মো. খলিলুর রহমান, ধামশুর, ভালুকা। উল্লিখিত কমান্ডারগণের সহকারী কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. আ. রশিদ, ধলিয়া, ভালুকা; মো. খোরশেদ আলম, মেদিলা, ভালুকা; মো. সিরাজুল হক, কাচিনা, ভালুকা; মো. আনসার উদ্দিন মুন্সী, গফরগাঁও; মো. মকবুল হোসেন, ঝালপাড়া, ভালুকা।

পঞ্চম ব্যাটালিয়নের পাঁচটি (এ বি সি ডি ই) কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. আলাউদ্দিন আহমেদ, বাটাজোর, ভালুকা; গিয়াস উদ্দিন আহমদ, পিরুজুলি, কালিয়াকৈর; মো. আব্দুল করিম পাঠান, গুজিয়াম; এস. এম. শামসুল হক, আংগারপাড়া, ভালুকা; আ. ছামাদ, ডাকাতিয়া, ভালুকা। আর এই ব্যাটালিয়নে পাঁচজন সহকারী কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মো. আঃ কাশেম, বোকাইনগর, গৌরিপুর; মো. সিরাজুল হক, আঃ মান্নান, আমিরাবাড়ি, ত্রিশাল; মো. নুরুল আমিন খান, সাউথকান্দা, ত্রিশাল; মো. আব্দুল মোতালেব খান, নুন্দিপাড়া, ভালুকা।[১৮৬]

আফসার বাহিনীতে ছোট পরিসরে একটি গুপ্তচর বাহিনী ছিল। এই বাহিনীর সদস্যগণ সরাসরি আফসার সাহেবের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন

গফরগাঁওয়ের সোহরাব উদ্দিন মুন্সী, ভালুকার ভাটগাঁও গ্রামের মো. ময়েজ উদ্দিন, ভালুকার কাঁঠালী গ্রামের জালাল উদ্দিন, ভালুকার আমীর আলী, গফরগাঁওয়ের সান্দিয়ান গ্রামের মো. নুরুল ইসলাম।[১৮৭] এছাড়া কোম্পানি কমান্ডারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণত কোম্পানিভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা বা রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করতেন।

বেসামরিক কর্মকাণ্ড

পাকিস্তনি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তিকে সামরিক ফ্রন্টে মোকাবেলার পাশাপাশি আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায়, বিশেষ করে ভালুকা এলাকায়, বেসামরিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করেন। এসব কর্মকাণ্ডের অন্যতম ছিল বেসামরিক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-

প্রশাসনিক কার্যক্রম

আফসার বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য ও এ বাহিনী যেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অফিসার সাহেবের উদ্যোগে একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। এই প্রশাসনের প্রধান ছিলেন বাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া এই প্রশাসনের সদস্য ছিলেন মো. আব্দুল হাকিম, বাটাজোর, ভালুকা; মো. হাফিজুর রহমান, ভরভরা, ভালুকা; মো. আ. কাশেম খান, বান্দিয়া, ভালুকা; মো. আ. জলিল, নিগুয়ারী, গফরগাঁও; মো. ফজলুল হক বেগম, বাটাজোর, ভালুকা; মো. আখতার হোসেন মন্ডল, নিগুয়ারী, গফরগাঁও; মো. চান মিয়া, ঝালপাজা, ভালুকা ও মো. ফজলুল ওয়াহাব, অলহরী, ত্রিশাল। এই প্রশাসনের প্রধান কাজ ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় জনগণের বিবাদ মীমাংসা করা। এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রশাসনের নিয়ন্ত্রনে গ্রাম্য রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এই রক্ষীবাহিনীর কাজ ছিল মূলত পুলিশী।[১৮৮] এই রক্ষীবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় আফসার সাহেব স্থানীয় ডাকাত, লুটেরা, দুস্কৃতকারী ও পাকিস্তানি অনুচরদের ও রাজাকারদের শাস্তি প্রদান করেন। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত আফসার সাহেবের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক ডাকাত ও লুটেরাকে কঠিন শাস্তি (হত্যা অথবা অন্যান্য) দেওয়া হয়। এর ফলে আগস্টের মধ্যেই ভালুকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণ শান্তিতে ও নিরাপদভাবে বাস করতে শুরু করেন। ডাকাত ও লুটেরা নিধনের পাশাপাশি রক্ষীবাহিনীর সহযোগিতার পাকিস্তানপন্থি গুপ্তচর ও সহযোগীদেরকেও অনুরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক জনগোষ্ঠী স্বস্তিতে চলাফেরা করতে সক্ষম হন। এর বাইরে মুক্তিযোদ্ধা এবং অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর অন্তর্কলহ সালিশ-মীমাংসার মাধ্যমে মিটিয়ে সমাজে বিচার ও আইনের শাসন বজায় রাখার চেষ্টা করেন নিম্নোক্ত বিচার বিভাগ:[১৮৯]

আফসার উদ্দিন আহমদ, অধিনায়ক ও প্রধান বিচারক
মো. সিরাজুল হক, কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক
মো. আইয়ুব আলী, কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক
মো. আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার ও বিচারক
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, অফিসার ইন-চার্জ ও বিচারক
মো. চান মিয়া, কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক
মো. আ. হাকিম, কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক
মো. আবুল কাশেম, সহকারী কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক
মো. শাসছ উদ্দিন আহমেদ, কোম্পানি কমান্ডার ও বিচারক

এ এন এম মোছলেহ উদ্দিন আহমদ, অ্যাডজুটেন্ট ও বিচারক

স্বাস্থ্য বিভাগ

মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের পাশাপাশি অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমদ মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা চাহিদা মেটানোর জন্য ভ্রাম্যমান হাসপাতাল গড়ে তোলেন। এই হাসপাতাল পৃষ্ঠপোষণে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আফসার উদ্দিন আহমেদ। এই পৃষ্ঠপোষণ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন ডা. ওয়াইজ উদ্দিন আহমেদ, মেডিক্যাল অফিসার, বড়াইদ, ভালুকা; গাজী এ এস এম ফজলুল ওয়াহাব, অলহরী, ত্রিশাল; আ. হাকিম, বাটাজোর, ভালুকা; মজিবুর রহমান, পনাশাইল, ভালুকা। এই হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ডা. ওয়াইজ উদ্দিন আহমেদ, ডা. রহমান আলী তরফদার, এম ও, ভালুকা; ডা. ইউসুল আলী, কান্দানিয়া, ফুলবাড়িয়া; ডা. মুহাম্দ আলী, নিঝুরী, ভালুকা; ডা. আব্দুর রশীদ, রান্দিয়া, ভালুকা। এছাড়া সহকারী চিকিৎসক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন ডা, আ. বোবান চৌধুরী, এল এল এফ, উথুরা, ভালুকা; ডা. কলিম উদ্দিন, এলএলএফ, কাচিনা, ভালুকা; ডা. আনছার উদ্দিন, এলএলএফ, মেদিলা, ভালুকা; ডা. আ. বাছেদ, কাচিনা, ভালুকা; ডা. মাইন উদ্দিন আহমেদ, ভিডি ঢালুয়াপাড়া, ভালুকা; ডা. মো. আব্দুল মো. তালেব, ভিডি, কাজা, গফরগাঁও, ডা. পরেশ চন্দ্র সরকার, ভিডি, গোপালপুর, ত্রিশাল; ডা. সনাতন চন্দ্র বর্মণ, ভিডি, তালার, ভালুকা; ডা. আছমত আলী, ভিডি, কাচিনা, ভালুকা; ডা. নুরুল ইসলাম, ভিডি, নিশাইগঞ্জ, ভালুকা। এই হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন মোছাম্মত আনোয়ারা বেগম, কীর্তনখোলা, সফিপুর; মোছাম্মত সুফিয়া বেগম, ভালুকা; মোছাম্মত আনোয়ার খাতুন, মাতেঙ্গা, ভালুকা; রঞ্জিতা রানী, ভালুকা।[১৯০]

আফসার বাহিনীর সামরিক ও বেসামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এই বাহিনীতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন আফসার উদ্দিন আহমেদ অধিনায়ক; ডা. ওয়াইজ উদ্দিন আহমেদ, মেডিক্যাল অফিসার; মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান,. অফিস ইন-চার্জ; মো. আ. হাকিম, কোম্পানি কমান্ডার; হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, সম্পাদক, 'জাগ্রত বাংলা' পত্রিকা; আখতার হোসাইন মন্ডল, সিকিউরিটি অফিসার; মো. ফজলুল হক বেগ, কোম্পানি কমান্ডার; মো. আব্দুল জলিল, কোয়ার্টার মাস্টার; মো. আনছার উদ্দিন মাস্টার, কোম্পানি কমান্ডার; মো. ফজলুল ওয়াহাব, কোম্পানি কমান্ডার।[১৯১]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

আফসার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কার্যের শুরুটা হয়েছিল ভালুকা সংগ্রাম কমিটি পরিচালিত ভালুকা সদরের মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। এই ক্যাম্প বাদেও এই বহিনীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলছিল ভালুকার মল্লিকবাড়ি বাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কেননা জুনের শেষ নাগাদ ভালুকা শহর পাকিস্তান সেনাদলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এরপর থেকে এ বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলতে থাকে ভালুকা থানান ১১ নং রাজৈ ইউনিয়ন এর পইদ্যারটেকে। খুর্দ্দ গ্রামের গভীর জঙ্গলে স্থাপিত পইদ্যারটেক নামক উচু টিলায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে বাহিনীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দীর্ঘদিন চলেছিল। উল্লেখ্য, খুর্দ্দ গ্রামে এই প্রশিক্ষণ কার্য প্রথম শুরু হয়েছিল এই গ্রামের মো. ইছহাক খান সাহেবের মহনাটেক নামক স্থানে। কিন্তু, স্থান স্বল্পতার জন্য কিছুদিন পর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পইদ্যারটেকে স্থানান্তরিত হয়।[১৯২] পইদ্যারটেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মো. আ. মোতালেব খান (পনাশাইল, ভালুকা)। এই কেন্দ্রের সহকারী প্রশিক্ষক ছিলেন ১১ নং রাজৈ ইউনিয়নের মো. রমিজ উদ্দিন খান। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেকর্ড ও হিসাব রক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মো. জগলুল পাশা খান। প্রশিক্ষণার্থীদের হাতিয়ার চালনা ও প্যারেড করানোর দায়িত্ব পালন করেছিলেন সহকারী

প্রশিক্ষক মো. ইদ্রিস আলী (পুলিশ)। তিনি ভালুকার রাজৈ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাছাড়া এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন আ. রফিক, মজিবুর রহমান (সুরুজ), আফাজ উদ্দিন খান প্রমুখ।

এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে যোদ্ধা বাছাই এবং তাদেরকে বিভিন্ন কোম্পানি, প্লাটুন ও সেকশনে অন্তর্ভুক্তকরণ ও বিবিধ, তারা হলেন বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার মো. চান মিয়া, কোম্পানি কমান্ডার মো. এমদাদুল হক দুলু, কোম্পানি কমান্ডার মো. নাজিম উদ্দিন খান, কোম্পানি কমান্ডার বশির উদ্দিন আহমেদ, কোম্পানি কমান্ডার আ. মজিদ, সহকারী কোম্পানি কমান্ডার মো. মজিবুর রহমান (ছাত্রনেতা), প্লাটুন কমান্ডার মো. নিজাম উদ্দিন খান (ছাত্রনেতা), গাজী আব্দুল মান্নান আকন্দ, প্লাটুন কমান্ডার মো. নজরুল ইসলাম, আ. মজিদ সেখ (ছাত্রনেতা), সেকশন কমান্ডার মো. তৈয়ব আলী, সেকশন কমান্ডার মো. জয়নাল আবেদীন, সেকশন কমান্ডার মো. আ. জব্বার, সেকশন কমান্ডার আব্দুল গফুর মাস্টার, মীর মনির উদ্দিন আহমদ (প্রকৌশলী), মো. জামাল উদ্দিন খান, (ছাত্রনেতা), সাইফুল আলম খান, মো. ইছাহাক খান (লেবু মেম্বর, আওয়ামী লীগ নেতা), মো. জমির হোসেন প্রমুখ।[১৯৩]

আফসার উদ্দিন আহমেদ মাত্র ১টি রাইফেল নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করার কাজ শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই বাহিনীতে অস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আফসার বাহিনীর সদস্যদের কৃতিত্বে। বাহিনী গঠনের শুরুর দিকে স্থানীয় দুস্কৃতকারী-ডাকাতদের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে, ভালুকা ও পার্শ্ববর্তী পুলিশ ফাঁড়ি ও থানা আক্রমণ করে ও পরে পাকিস্তানি সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে প্রাপ্ত অস্ত্রেই এই বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীর অস্ত্র সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার। অস্ত্রের মধ্যে ছিল ৩০৩ রাইফেল, বোরটাগান, এসএলআর, এসএমজি, এলএমজি , স্টেশনগান, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেড প্রভৃতি।[১৯৪] এই অস্ত্রভাণ্ডারের সূচনা হয়েছিল ২৩ জুন ১৯৭১ এ ভালুকা থানার রাজৈ গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী মাওলানা মো. আব্দুল হামিদ সাহেবের নিকট থেকে প্রাপ্ত ১টি ৩০৩ রাইফেল ও ৩০ রাউন্ড গুলি নিয়ে। এরপর বাহিনীর হস্তগত হয় ইপিআর সদস্যদের ফেলে যাওয়া ৭টি রাইফেল। এপ্রিল মাসেই স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাকাত ও দুস্কৃতিকারীদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে অস্ত্রের (মূলত রাইফেল) সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টি। মে মাসের ২ তারিখ বাহিনী প্রধান আফসার সাহেবের নেতৃত্বে ভালুকা থানা আক্রমণ করে ১০টি রাইফেল ও ১৫৫০ রাউন্ড গুলি ও ৩০টি বেয়নেট সংগ্রহ করা হয়। ২১ মে ভালুকা থানা আক্রমণ করে বাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে ২টি বোরটাগান, ১০টি রাইফেল এবং ১ বাক্স গুলি উদ্দঅর করা হয়। ২২ মে গফরগাঁওয়ের গয়েশপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের সহযোগিতায় ২টি চাইনিজ রাইফেল, ৬টি ৩০৩ রাইফেল এবং ৬ বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়। ২ জুন স্থানীয় ও আঞ্চলিক ডাকাত ও দুস্কৃতকারীদের নিকট থেকে ১১টি রাইফেল উদ্ধার করা হয়। এছাড়া জুনের শেষ সপ্তাহ থেকে বিজয় অবধি পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের সহযোগী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে এ বাহিনী প্রচুর অস্ত্র হস্তগত করে। মূলত, বিরুদ্ধ পক্ষের অস্ত্রই ছিল আফসার বাহিনীর অস্ত্রের প্রধান উৎস।[১৯৫]

আওতাভুক্ত এলাকা

আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধকালে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল, গফরগাঁও ও টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর, বাসাইল ও কালিহাতী থানার কতকাংশ ও ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর, শ্রীপুর, জয়দেবপুর থানার কতকাংশে সক্রিয় ছিলেন। এর মধ্যে ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও, ফুলবাড়িয়া এলাকায় এই বাহিনীর সদাসক্রিয় তৎপরতা লক্ষণীয়। এই বাহিনীর কল্যাণে ভালুকা থানার বিরাট অংশ মুক্তাঞ্চল ছিল বলা যায়।[১৯৬] আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই

বাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল কমপক্ষে ২টি সেক্টর সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বাহিনীর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল ১১ নং সেক্টরের দক্ষিণ অংশে ও ৩ নং সেক্টরের উত্তর অংশে।

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

আফসার বাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য কমান্ডারগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তে এই বাহিনী যুদ্ধকৌশল হিসেবে 'গেরিলা' পদ্ধতি ও 'সম্মুখ যুদ্ধ' পদ্ধতি দুই-ই অনুসরণ করেছিল। তবে যুদ্ধের শুরু থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি করার প্রচেষ্টা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত বেশি অনসৃত হয়। কেননা, এ সময় পর্যন্ত বাহিনীর অস্ত্রবল ও প্রশিক্ষিত লোকবলের

ঘাটতি ছিল। এরপর, বিশেষ করে অক্টোবর থেকে এই বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ শত্রুদলের সঙ্গে অনেকগুলো সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেসময় থেকে সম্মুখ যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা তৎপরতাও চলমান থাকে।[১৯৭] আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের বিরুদ্ধে শতাধিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।[১৯৮] এসব যুদ্ধের অধিকাংশই ছিল আফসার বাহিনীর নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে। এছাড়া কখনো কখনো এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে সমন্বয় করে ও যৌথভাবে শত্রুপক্ষের মোকাবেল করেছেন। যেমন ১২ মে টাঙ্গাইলের কালিহাতীর বল্লা বাজারের যুদ্ধে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে আফসার বাহিনী যৌথভাবে শত্রুসৈন্যের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এরকম সম্মিলিত যুদ্ধের আরো উদাহরণ রয়েছে। এ বাহিনীর যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরা হলো।

ভাওয়ালিয়াবাজু অভিযান[১৯৯]

অভিযানের তারিখ ও সময় : ২৫ জুন সকাল ১০টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মধুপুর মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ার পর ময়মনসিংহের ভালুকা ও মধুপুর গড়ের জঙ্গলে আফসার উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। এই মুক্তিবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে উক্ত এলাকার দখল নেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনাদল ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে কয়েকটি ভাগে রওয়ানা দেয়। পাকিস্তানি সেনাদলের এই অভিযান রোধ করার জন্যই ছিল আফসার বাহিনীর যোদ্ধাদের ভাওয়ালিয়াবাজু অভিযান।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: ভাওয়ালিয়াবাজু অভিযানে বাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ, সহকারী কোম্পানি কমান্ডার আনছার উদ্দিনসহ প্রায় ৬০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল অংশ নিয়েছিল। এই দলের সদস্যদের কাছে অস্ত্র হিসেবে ছিল এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, বোরটাগান ইত্যাদি।

অভিযানের বিবরণ: ভাওয়ালিয়াবাজু গ্রামটি ভালুকা ও গফরগাঁও থানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি ভালুকা সদর হতে ১৫ কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল অপ্রসারিত একটি নদী। মুক্তিযোদ্ধারা কমান্ডার আনছার উদ্দিনের নেতৃত্বে নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থান নিয়েছিলেন। এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৭০ উইং রেঞ্জার্স ও ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের যোদ্ধাদের একটি অংশ ২৪ জুন গফরগাঁও পর্যন্ত আসে। এরপর ২৫ জুন ভোরবেলা এই দল প্রায় ৪০টি গরু ও মহিষের গাড়ি বোঝাই যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে ভালুকা দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সকাল ১০টা নাগাদ তারা ভাওয়ালিয়াবাজুর ফেরিঘাটে এসে পৌঁছায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর পাকিস্তানি সেনাদল যোদ্ধা ও যুদ্ধরসদ নিয়ে ফেরি পার হওয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়। এই লক্ষ্যে প্রথমে ৬ জন সৈন্য ফেরিতে ওঠেন নদী পার হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল এই সৈন্যগণ নদী পার হওয়ার পর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংকেত দেবেন। কিন্তু উক্ত ৬ জন সৈন্য নিয়ে ফেরি মাঝ নদীতে পৌঁছালে মুক্তিযোদ্ধা দলে কমান্ডারের নির্দেশে তাদের উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়। এই আক্রমণের জবাব পাকিস্তানি সেনাদল তাৎক্ষণিকভাবে দিতে শুরু করে। দু'পক্ষে শুরু হয় তুমুল সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় ১৯ জন ছিলেন। এরপর যুদ্ধস্থলে ৩০ জন যোদ্ধাসহ উপস্থিত হন আফসার বাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ। তিনি যোগ দেওয়ার পর যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। একই দিন রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের আরো সদস্য এই যুদ্ধে যুক্ত হন। যাহোক সারাদিন দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলার পরও কোনো পক্ষই অবস্থান ত্যাগ করেনি। যুদ্ধ গড়ায় ২৬ জুন পর্যন্ত। ২৬ জুন সকালে পাকিস্তানি সেনা নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টার যোগে মুক্তিসেনাদের অবস্থানের পিছনের ধলিয়া গ্রামে ছত্রীসেনা নামাতে শুরু করেন। ফলে পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান তুলে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়।

ফলাফল: ভাওয়ালিয়াবাজুর যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান শহিদ হন এবং আহত হন মুক্তিযোদ্ধা আফাজ উদ্দিন ভূঁইয়া, মোস্তফা কামাল, মনির উদ্দিন, মো. মজিবর রহমান। অন্যপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির নির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভালুকা শহর পাকিস্তানি সেনাদলের দখলে চলে যায়।

বল্লা অভিযান[২০০]

অভিযানের তারিখ ও সময় : ১২ মে দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাদলের ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও ৭০ উইং রেঞ্জার্স এর একটি অংশ টাঙ্গাইলের কালিহাতী থানার বল্লা বাজারে একটি ক্যাম্প স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল। তাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: বল্লা অভিযানে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে যৌথভাবে অংশ নিয়েছিলেন আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মো. আফসার উদ্দিন আহমেদ, মো. আমজাদ হোসেন, মো. আলী রতন, আব্দুল মান্নান, নারায়ণ চন্দ্র পাল, আব্দুর রহমান, নাজিম উদ্দিন, আশরাফুল আলম, রিয়াজ উদ্দিন। অস্ত্রের মধ্যে তাদের কাছে ছিল এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল ইত্যাদি।

অভিযানের বিবরণ: কাদেরিয়া বাহিনী ও আফসার বাহিনীর কাছে তাদের সিগনালম্যানের মাধ্যমে খবর আসে যে, ১২ মে টাঙ্গাইল থেকে পাকিস্তানি সেনাদলের একটি বহর কালিহাতী থানার বল্লা বাজারে আসবে সেখানে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য। এই খবর পেয়ে আফসার সাহেব কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করেন। পরে আলোচনার ভিত্তিতে উভয়পক্ষ যৌথভাবে অভিযান চালাতে পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয় বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ ১২ মে বল্লা বাজারের পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে অবস্থান নেন। দুপুর নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্যদল বল্লা বাজারে প্রবেশ করা মাত্র দুইদিক থেকেই যুগপৎ আক্রমণ শুরু হয়। পাকিস্তান সৈন্যদল ও প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকে। উভয়পক্ষে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে এ যুদ্ধ চলে।

ফলাফল: বল্লা যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদলের অন্যূন ১০ জন সৈন্য নিহত ও বেশ কজন আহত হন। এই যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদল পিছু হটে টাঙ্গাইল ফিরে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধশেষে শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া রাইফেল ও গোলাবারুদ হস্তগত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছিল না।

আমলীতলা-রসুলপুর রাজাকার ক্যাম্প অভিযান[২০১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৩১ অক্টোবর রাত আনুমানিক ৩টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ত্রিশাল রায়ের গ্রামে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজাকাররা ঐ গ্রামে থাকা আফসার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি সেনাদলের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পাকিস্তানি সেনাদলের আচমকা আঘাতে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে শহিদ হন। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে আফসার বাহিনীর যোদ্ধাগণ আমলীতলা-রসুলপুর রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ করেন। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উল্লিখিত এলাকায় গড়ে ওঠা শত্রুঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আফসার বাহিনীর অধিনায়ক আফরা উদ্দিন আহমদ, কোম্পানি কমান্ডার আনছার উদ্দিন মাস্টার, কোম্পানি কমান্ডার ফয়েজ উদ্দিন, কোম্পানি কমান্ডার সিরাজুল হক, কোম্পানি কমান্ডার আ. বারী মাস্টার প্লাটুন কমান্ডার এয়াকুব, হায়দার, রিয়াজ উদ্দিন, আ. হালিমসহ

প্রায় ১৭০ জন যোদ্ধা। এদের কাছে অস্ত্রের মধ্যে ছিল এলএমজি , এস এস জি, স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ইত্যাদি।

অভিযানের বিবরণ: ৩০ অক্টোবর ত্রিশালের আমিরাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের অস্থায়ী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে বসে আফসার সাহেবের নেতৃত্বে কোম্পানি ও প্লাটুন কমান্ডারগণ রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩১ তারিখ রাত আনুমানিক ৩টায় আমলীতলা রাজাকার ঘাঁটি চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলা হয়। একই সাথে ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে গফরগাঁও, ধল্লা ও ত্রিশাল হতে যাতে পাকিস্তানি সেনাদল পিছন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে না পারে। যাহোক অধিনায়কের এলএমজি 'র গুলিতে যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দফা আঘাতেই পাহারারত রাজাকারা নিহত হন। এরপর রাজাকারদের তরফ থেকে বিক্ষিপ্ত গুলি ছোঁড়া শুরু হয় ও তা এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মোনতাজ উদ্দিন দাঁড়িয়ে রাজাকারদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গেলে শত্রুর গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা ২য় দফায় রাজাকার ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। ২য় দফা আক্রমণ চালানোর কিছু সময়ের মধ্যেই রাজাকারগণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পর্যুদস্ত হয়ে ধরা পড়েন।

ফলাফল: এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের ১ জন সদস্য শহিদ হন। অন্যদিকে রাজাকারদের মধ্যে অর্ধশতাধিক যুদ্ধস্থলে নিহত হন এবং ধরা পড়া ত্রিশজন রাজাকার কালীগঞ্জ বাজারের স্থানীয় মানুষের গণপিটুনিতে নিহত হন। এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আমলীতলা-রসুলপুর রাজাকার ঘাঁটির পতন ঘটে এবং এই স্থানে আফসার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধাগণ ১টি স্টেনগানসহ ৬৫টি রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ হস্তগত করেন।

চাঁনপুর অভিযান[২০২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১০ অক্টোবর আনুমানিক দুপুর বেলা

অভিযানের উদ্দেশ্য: চাঁনপুর ভালুকার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই ছিল ভালুকার মল্লিক বাড়ি বাজার যেখানে পাকিস্তানি সেনাদলের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাদল মল্লিকবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুটপাট ও নির্যাতন চালাত। এখানে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি স্থাপনের পূর্বে মল্লিকবাড়ি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রিত মুক্ত এলাকা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকদিনের লক্ষ্য ছিল এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীদের চরম শিক্ষা দেওয়া।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আফসার বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার নাজিম উদ্দিন, মো. আলী (রতন), মো. ছমির উদ্দিন আব্দুল খালেক মাস্টার, আব্দুস সামাদ, মো. রিয়াজ উদ্দিন, সিরাজুল হক, শাসছউদ্দিন, মো. কাছিম উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিনসহ ৪০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, রোবটাগান, চাইনিজ রাইফেল ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: চাঁনপুর গ্রামটি মল্লিকবাড়ি বাজারের খানিকটা পশ্চিমে অবস্থিত। ১০ অক্টোবর দুপুরে মল্লিক বাড়ি ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল ডাকাতিয়ার চাঁনপুরের গ্রামে প্রবেশ করে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি ও মূল্যবান সম্পদ লুট করতে থাকেন, গ্রামের মানুষদের নির্যাতন করতে থাকেন ও বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন। সিগনালম্যানের নিকট থেকে এই খবর পেয়ে আফসার বাহিনীর পূর্বোক্ত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ পাকিস্তানি সেনাদেরকে সরাসরি আক্রমণ করে। উভয়পক্ষ একটানা ২ ঘণ্টা সম্মুখ যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে হানাদার বাহিনীর ১জন ঘটনাস্থলে নিহত হন ও বেশ কজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনিল চন্দ্র সাংমা শহিদ হন। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য দল

পরাজিত হয়ে মল্লিকবাড়ি ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে তারা মল্লিকবাড়ি ঘাঁটির উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চলাচল বন্ধ করে দেন।

কাশিগঞ্জ-আমিরাবাড়ি অভিযান[২০৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৬ অক্টোবর আনুমানিক বিকাল ৪. ৩০ মিনিট।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ত্রিশাল থানাধীন কালিগঞ্জ রাজাকার ঘাঁটি ছেড়ে রাজাকার দল ২৫ অক্টোবর ত্রিশাল সদরে পালিয়ে যায়। পরদিন এই দল আরো বেশি সদস্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাশিগঞ্জ বাজারে অবস্থান নেবে এমন খবর আফসার বাহিনীর যোদ্ধাদের কাছে আসে। রাজাকারদের এই সুযোগে উক্ত স্থানে ধরাশায়ী করতে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আফসার বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার আনসার উদ্দিন মাস্টার, কছিম উদ্দিন আহম্মেদ ও সহকারী কোম্পানি কমান্ডার আ. বারী মাস্টার সাহেবের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএমজি, স্টেনগান, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ইত্যাদি অস্ত্রসহ এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: কাশিগঞ্জ বাজার ত্রিশাল থানা সদর হতে দক্ষিণে ও ভালুকা থেকে উত্তরে অবস্থিত ত্রিশাল থানাধীন এলাকা। ২৬ অক্টোবর এই বাজারে অবস্থান নিতে শতাধিক রাজাকার ত্রিশাল হতে রওনা হন। তাদেরকে প্রতিহত করতে পরিকল্পনা মতো মুক্তিযোদ্ধারা কাশিগঞ্জ বাজার নিকটস্থ ছোট বানার নদীর দক্ষিণে ও আমিরাবাড়ি এলাকায় অবস্থান নেন। বিকাল ৫. ৩০ মিনিট নাগাদ কাশিগঞ্জ ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করেন। উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় চলে ২৭ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত ঐদিন সকাল ৯ টার দিকে রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে আনসার উদ্দিন মাস্টার ও আ. বারী মাস্টার রওনা দেন। আলোচনা স্থল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান প্রায় তিনশগত দূরে ছিল। এই সুযোগে রাজাকারবৃন্দ উল্লিখিত দু'জন মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দি করে ত্রিশালের দিকে রওনা দেন। এই খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের উপর সাড়াশি আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। এবং মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীকে এই খবর জানিয়ে দেন। ফলে, রাজাকাররা যখন রায়মনি গ্রামে পৌঁছান তখন গ্রামবাসী রাজাকারদের উপল আক্রমণ চালায়। এতে গ্রামীবাসীদের হাতেই বহু রাজাকার প্রাণ হারান ও বেশ ক'জন রাজাকার ত্রিশালের দিকে পালিয়ে যান।

ফলাফল: কাশিগঞ্জ-আমিরাবাড়ি যুদ্ধে রাজাকার দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। রায়মণি গ্রামবাসীল সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধারা ৫২টি রাইফেল ও গোলাবারুদ হস্তগত করেন। এছাড়া, ত্রিশাল ও ভালুকায় থাকা পাকিস্তানি সেনাঘাঁটি বাদে এই দুই থানার মধ্যবর্তী প্রায় ১২ মাইল এলাকা চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকে।

ভালুকা অভিযান[২০৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ভালুকা শহরে পাকিস্তানি সেনাদলের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিতে নভেম্বর মাসের ২০ তারিখ হতে আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ ক্রমাগত ছোট ছোট আক্রমণ করতে থাকেন। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে ভালুকা ঘাঁটিতে আফসার বাহিনী যে অভিযান চালায়, তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করে ভালুকা মুক্ত করা।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আফসার বাহিনীর প্রধান আফসার সাহেবের নেতৃত্বে বাহিনীর প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই অভিযানে এলএমজি , এস এস জি, এসএলআর, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, বোরটাগান, রকেট লাঞ্চার, গ্রেনেডসহ অংশগ্রহণ করেন।

অভিযানের বিবরণ: ভালুকা শহরের পাকিস্তানি সেনা ঘাঁটি ও রাজাকার ঘাঁটি উৎপাটন করতে আফসার সাহেবের পরিকল্পনামাফিক নভেম্বরের ২০ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ৪ তারিখ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালনা অব্যাহত থাকে। ডিসেম্বরে ৫ তারিখ মধ্যরাতে এই ঘাঁটিতে চূড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য, ভালুকা ঘাঁটির চারদিকে থেকে ঘিরে ফেলার উদ্যোগ হিসেবে মো. খলিলুর রহমানের যোদ্ধা দল ধামশুর গ্রাম হয়ে ভালুকা অভিমুখে, কাঁঠালী গ্রাম থেকে কোম্পানি কমান্ডার চান মিয়া এবং কোম্পানি কমান্ডার এমদাদুল হক দুলু, খারুয়ালী গ্রাম থেকে প্লাটুন কমান্ডার মনির উদ্দিন, ভান্ডার গ্রাম থেকে প্লাটুন কমান্ডার এয়াকুব হায়দার, ধামশুর ও বর্তাগ্রাম থেকে আফসার উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদল অবস্থান নেন। এরপর মধ্যরাতে অধিনায়কের এলএমজি 'র গুলি চালানার মাধ্যমে পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু করা হয়। ৫ ডিম্বেবর মধ্যরাত থেকে ৮ ডিসেম্বর ভোর রাত পর্যন্ত একটানা এই যুদ্ধ চলমান থাকে। ৮ ডিসেম্বর ভোরবেলা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদল রাজাকারদের সাথে নিয়ে ভালুকা ঘাঁটি ছেড়ে গফরগাঁওয়ে পালাতে শুরু করেন। মুক্তিযোদ্ধারাও শত্রুপক্ষকে তাড়া করে গফরগাঁ পর্যন্ত চলে আসেন। পাকিস্তানি সেনাদল গফরগাঁওয়ে রাজাকারদের ফেলে রেখে ময়মনসিংহে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: ভালুকা অভিযান ছিল আফসার বাহিনীর একটি সফল অভিযান। এই অভিযানের ফলে ভালুকা ও গফলগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা চূড়ান্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এছাড়া ভালুকা ও গফরগাঁও এলাকার বহু রাজাকার অস্ত্রসহ আফসার বাহিনীর নিকট ধরা পড়েন। মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে ভালুকায় নিয়ে আসেন।

ইতোমধ্যে বর্ণনাকৃত অভিযানসমূহ সহ এই বাহিনীর সফল যুদ্ধের এলাকাভিত্তিক উল্লেখ নিম্নে করা হলো:[২০৫] ভালুকা থানা আক্রমণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগতকরণ, দুইবার আক্রমণে ১৬টি রাইফেল, ৩০টি বেয়নেট ও ১৬০০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার (২১ মে ১৯৭১), পারুলদিয়া নদীপথে পাক দোসর পুলিশ আটক ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার (২৩ জুন ১৯৭১), ঐতিহাসিক ভাওয়ালিয়াবাজু সম্মুখ যুদ্ধ (১ম যুদ্ধ, ২৫ জুন ১৯৭১), ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী যুদ্ধে ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা খতম, ১জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ (আ. মান্নান) ও ৪ জন আহত, ভালুকা থানায় গ্রেনেড হামলায় ১৭ জন হানাদার সৈন্য নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত (২৯ জুন ১৯৭১), সিডস্টোর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে ২৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ৯ জন আহত হয় (১৯ জুলাই ১৯৭১), ডাকাতিয়া আংগারগাড়া বাজার যুদ্ধ (৪ আগস্ট ১৯৭১), ভায়াবহ ঘাটের যুদ্ধ (১৫ আগস্ট ১৯৭১), ভরাডোবা যুদ্ধ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), ধামশুর গ্রামের প্রথম যুদ্ধ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), পারুলদিয়া বাজারে পাকসৈন্যদের খাদ্য ও রসদ আটক (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), বাকশী নদীর ব্রিজের পাড় যুদ্ধ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), কুমারঘাট, মুচারঘাট ও নিঝুরী যুল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), বান্দিয়া যুদ্ধ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), রাজৈ বাজার যুদ্ধ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), পনাশাইল বাজারে যুদ্ধ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), বয়রার টেক হানাদার ও রাজাকার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১), বরাইদ যুদ্ধ (২১ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর ১৯৭১), সাগরদিঘীর পথে বাজুয়া ঝোড়ার (খালের) পাড় যুদ্ধ (১ অক্টোবর ১৯৭১, তালার যুদ্ধ (৩ অক্টোবর ১৯৭১), বাগেরপাড়া যুদ্ধ (৩ অক্টোবর ১৯৭১), বিরুনীয়া যুদ্ধ, (৫ অক্টোবর ১৯৭১), মল্লিকবাড়ি পাক ক্যাম্প আক্রমণ (মোট ৩৫ বার আক্রমণ করে, শেষবার ৭ অক্টোবর ১৯৭১),. কুল্লাব যুদ্ধ (৮ অক্টোবর ১৯৭১), চাঁনপুর যুদ্ধ (১০ অক্টোবর ১৯৭১)। অত্র যুদ্ধে প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা অনিল সাংমা শহিদ হন। মেদুয়ারী রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ (১৩ অক্টোবর ১৯৭১), ধলিয়া গ্রামের যুদ্ধ (২৫ অক্টোবর ১৯৭১), পনাশাইল চুল্লার কালপাড় যুদ্ধ (২৭ অক্টোবর ১৯৭১), ভালুকা পাকসেনা ঘাঁটি আক্রমণ, ৯ জন পাকসেনা ও ৬ জন রাজাকার নিহত (২৮ অক্টোবর ১৯৭১), রাজৈ গ্রামে হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ, একজন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও কয়েকজন আহত (২ নভেম্বর ১৯৭১), ভান্ডার যুদ্ধ, এ যুদ্ধে ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন (১৭ নভেম্বর ১৯৭১), চান্দের

আটি যুদ্ধ (১২ নভেম্বর ১৯৭১), ডা. শমসের আলীসহ এই যুদ্ধে ৪ জন মুক্তিসেনা শহিদ হন, সাতেঙ্গা যুদ্ধ (১৬ নভেম্বর ১৯৭১), মামারিশপুর যুদ্ধ (২০ নভেম্বর ১৯৭১), এ যুদ্ধে নিগুয়ারির জহির শহিদ হন, কাঠালী বড় রাস্তায় যুদ্ধ (২ ডিসেম্বর ১৯৭১), ভাওয়ালিয়াবাজু ২য় যুদ্ধ (৩ ডিসেম্বর ১৯৭১), বাশিল যুদ্ধ (৪ ডিসেম্বর ১৯৭১), ভালুকা সদর পাকসেনা ক্যাম্প আক্রমণ পূর্ব-দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে ২০ জন পাকসেনা ও বহু রাজাকার নিহত হয় (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১), ভালুকা পাকিস্তানি সেনা ঘাঁটি আক্রমণ ও দখল (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১), মধুপুর হতে ঢাকার উদ্দেশে পলায়নরত পাকসৈন্যদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ, উল্লিখত যুদ্ধে কোম্পানি ক. নাজিম উদ্দিন (নন্দিপাড়া) আহত হন (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১), পাড়াগাঁও জঙ্গলে যুদ্ধ (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১), উক্ত যুদ্ধে মেজর আফসার উদ্দিন আহমেদের তৃতীয় ছেলে নাজিম উদ্দিন আহমেদ ও ডাকাতিয়া আউলিয়া চালার গফুর সরকারের দ্বিতীয় ছেলে নুন্নেছ আলী পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহিদ হন।

গফরগাঁও এলাকায় যুদ্ধ

দেউল পাড়া টহল ট্রেন আক্রমণ (১৭ জুলাই ১৯৭১), গফরগাঁও থানার আইতখালা বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (৮ অক্টোবর ১৯৭১), দলা-গফরগাঁও রেলের পারপাড়াপুর আক্রমণ (১০ অক্টোবর ১৯৭১), দেউলপাড়া রেলওয়ে ব্রিজ আক্রমণ (৯ অক্টোবর ১৯৭১), মশাখালি রেলওয়ের ফরচঙ্গী পুলের পাড় যুদ্ধ (১৫ অক্টোবর ১৯৭১), উক্ত যুদ্ধে মাইন বিস্ফোরণ করতে গিয়ে ব্রিজসহ উড়ে গিয়ে অল্প বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান (ছোট বড়াই, গফরগাঁও) শহিদ হন, শীলা নদী পুল আক্রমণ (১৬ অক্টোবর ১৯৭১), রেলওয়ে ফরচঙ্গী পুলের দক্ষিণে পাঁচগড়িয়ে পুল আক্রমণ (১৬ অক্টোবর ১৯৭১), প্রসাদপুর বাজার যুদ্ধ (১৮ অক্টোবর ১৯৭১)। এ যুদ্ধে ৪ জন পাকিস্তানি সেনা ও ৪ জন রাজাকার নিহত হয়, ফরচঙ্গী পুলের বাঙ্কার দখল যুদ্ধ (১৯ অক্টোবর ১৯৭১), শীলা নদীল পাড় যুদ্ধ (২২ অক্টোবর ১৯৭১), প্রসাদপুর গ্রামের যুদ্ধ (২৩ অক্টোবর ১৯৭১), রসূলপুর আমতিতলা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও দখল (৩১ অক্টোবর ১৯৭১) এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মোমতাজ উদ্দিন শহিদ হন, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইনে মশাখালী যুদ্ধ (৫ ডিসেম্বর ১৯৭১), ভাইরাল গ্রামের যুদ্ধ (৮ ডিসেম্বর ১৯৭১), গফরগাঁও পাকিস্তানি ঘাঁটি আক্রমণ ও দখল (৯ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

ত্রিশাল এলাকায় যুদ্ধ

কানিহারী গ্রামের অপারেশন (৩ আগস্ট ১৯৭১), সাকুয়া গ্রামের অপারেশন (৫ আগস্ট ১৯৭১), ধানীখোলা, কাঁঠাল, কালীবাজার গ্রামে অপারেশন (১৬ আগস্ট ১৯৭১), রায়ের গ্রাম যুদ্ধ (১৩ আগস্ট ১৯৭১), ৭ ঘণ্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে ১৬ পাকসেনা ও ৫ রাজাকার খতম, ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন, পোড়াবাড়ি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (তারিখ ৫ অক্টোবর ১৯৭১), অলহরীর বানার নদীর পুল ধ্বংস (৫ অক্টোবর ১৯৭১), কাশিগঞ্জ-আমিরাবাড়ি যুদ্ধ (২৬ অক্টোবর ১৯৭১), এ যুদ্ধে ৬৫ জন রাজাকার খতম, ৫২টি রাইফেলসহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার, ১৭ জন রাজাকার জীবিত ধৃত হয়, মেজর আফসার উদ্দিনের ছোট ভাই আশ্রাব উদ্দিনের নিকট পোড়াবাড়ির রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকাররা ১টি এলএমজি, ৭০টি রাইফেল ও অজস্র গোলাবারুদ নিয়ে আত্মসমর্পণ করে (২৭ অক্টোবর ১৯৭১), সাকুয়া শেখ বাজার রাজাকার ক্যাম্প হইতে ৮টি রাইফেলসহ ৮ জন রাজাকার আশ্রাব উদ্দিনের আত্মসমর্পণ করে (৩ নভেম্বর ১৯৭১), ত্রিশাল পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প আক্রমণ ও দখল (১০ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর এলাকায় যুদ্ধ

শালদাহপাড়া অপারেশন (২৮ আগস্ট ১৯৭১), কালিয়াকৈর পাকসেনা ঘাঁটি আক্রমণ (৯ অক্টোবর ১৯৭১), কালিয়াকৈর থানায় রাজাকার দলের সাথে যুদ্ধ (১২ অক্টোবর ১৯৭১), কাচিঘাটা গ্রামের

পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ (২৮ অক্টোবর ১৯৭১), ফুলবাড়িয়া রাজাকার ঘাঁটি আক্রমণ ও দখল এবং ১১ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ (৩০ অক্টোবর ১৯৭১), কালিয়াকৈর থানা পাকঘাঁটি ৪ ট্রাক ভর্তি হানাদার পাকিস্তানি সেনার উপর আক্রমণ (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)।

ঢাকা জেলার শ্রীপুর এলাকায় যুদ্ধ

বিধাই গ্রামে অপারেশন (৩ জুলাই ১৯৭১), এ যুদ্ধে তিনটি রাইফেল উদ্ধার হয়, মাওনা অপারেশন (২৬ জুলাই ১৯৭১), বলদিঘাট অপারেশন (৩১ জুলাই ১৯৭১), ভিটিপাড়া যুদ্ধ (তারিখ অজ্ঞাত), কাপাসিয়া যুদ্ধ (তারিখ অজ্ঞাত), কমান্ডার হারুন-অর-রশিদ (সুতিয়াখালী, ময়মনসিংহ)–এর সাথে যোথভাবে।

অন্যান্য স্থানে সংগঠিত যুদ্ধ

টাঙ্গাইল জেলায় বল্লা যুদ্ধ (১২ মে ১৯৭১), ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার মোক্ষপুর অপারেশন (৬ আগস্ট ১৯৭১), ময়মনসিংহের নান্দাইল যুদ্ধ (২৩ নভেম্বর ১৯৭১)। উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র যুদ্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাওয়ালিয়াবাজু যুদ্ধ, আমতিতলা যুদ্ধ। বল্লা যুদ্ধ, চাঁনপুর যুদ্ধ, মামারিশপুর যুদ্ধ, রায়ের গ্রামের যুদ্ধ, সিডস্টোর যুদ্ধ, এছাড়াও আক্রমণ করা হয় ফুলবাড়িয়া রাজাকার ঘাঁটি, মল্লিকবাড়ি পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি, কালিগঞ্জ-আমিরবাড়ি রাজাকার ক্যাম্প।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে আফসার বাহিনীর কল্যাণে মুক্তাঞ্চল ভালুকার ডাকাতিয়া এলাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপত্র *জাগ্রত বাংলা* পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে লেখা ছিল। এরপর পত্রিকার সম্পাদক জনাব এস. এ. কালাম (যিনি 'বাঙালি' ছদ্মনামে) লিখতেন ও সম্পাদনা করতেন) বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ও আফসার সাহেবের নিকট থেকে দুটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন উপহার পেয়ে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলো সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকাটি এপ্রিল থেকে পরবর্তী ৮/৯ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এক মাসে সর্বোচ্চ ১২টি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। এসব সংখ্যায় ময়মনসিংহসহ সারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর পাওয়া যেত। তবে, *জাগ্রত বাংলা* পত্রিকার খবরের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল আফসার বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও যুদ্ধাভিযান ও বিজয়ের সংবাদ।

জাগ্রত বাংলা পত্রিকা পরিচালনা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা ছিলেন আফসার বাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দিন আহমেদ। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এস. এ. কালাম, ডাকাতিয়া, ভালুকা; সহকারী সম্পাদক ছিলেন ফজলুল হক বেগ, বাটাজোর, ভালুকা; বার্তা সম্পাদক ছিলেন রেজাউল করিম, হারাগাছ, রংপুর; আবদুল আলীম, ডাকাতিয়া, ভালুকা; আ. বারী, ডাকাতিয়া, ভালুকা ও শামছুল হক। পত্রিকাটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেণ আবদুল খালেক, সহকারী নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আবদুল খালেক, সহকারী নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন চিত্রকর মো. মাসুদ আলী (ছাত্র, আর্ট কলেজ, ঢাকা), ডাকাতিয়া, ভালুকা; চিত্রকর মহিউদ্দিন সাকের, দীঘা, গফরগাঁও; চিত্রকর মফিজুল ইসলাম ধীতপুর, ভালুকা; প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন রমিজ উদ্দিন, দীঘা, গফরগাঁও। এই পত্রিকায় সংবাদদাতা ছিলেন শরফুদ্দিন আহমেদ, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা; আবুল কাশেম আজহার, চান্দরাটা, ভালুকা; নওশের আলী, মোজাম্মেল হক বেগ, বাটাজোর, ভালুকা; মো. খলিলুর রহমান, ধামশুর, ভালুকা। এছাড়া পত্রিকাটি বিক্রয় ও বিতরণের সাথে যুক্ত ছিলেন শহিদ আবদুল ছোবহান, উথুরা, ভালুকা; মো. সোহরাব উদ্দিন মুন্সী, মশাখালী, গফরগাঁও; মো. হোসেন আলী চৌধুরী, পাইলার, ভালুকা; মো. শহীদুল্লাহ, পাড়াগাঁও, ভালুকা।[২০৬]

তবে এই প্রত্রিকার সূচনাপর্বে সম্পাদক হিসেবে হাফিজ উদ্দিন আহমেদের নামও জানা যায়। এবং পত্রিকার সহকারী কার্যনির্বাহী সম্পাদক হিসেবে হযরত আলী, চিত্রকর হিসেবে মহিউদ্দিন জাকের, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে হাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক হিসেবে মতিউর রহমান, সংবাদদাতা হিসেবে শহিদ নাজিম উদ্দিন আহমেদের নামও জানা যায়।[২০৭] সংবাদপত্র ছাপিয়ে ও প্রচার করে মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের মনোবল বৃদ্ধিকরণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আফসার সাহেবের পরিকল্পনায় ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় ভালুকা থানার মুক্তাঞ্চলে বেশ কয়েখটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল।[২০৮] এসব জনসভায় বক্তারা জনগণের নৈতিক বল বৃদ্ধির জন্য মুক্তিযুদ্ধ কেন ন্যায়যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ কেন প্রয়োজনীয়- সে বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। এ ধরনের জনসংযোগের ফলে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করতেন। এছাড়া, আফসার বাহিনীর উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা গ্রামগুলোতে রক্ষীবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। এই রক্ষীবাহিনীই ছিল জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান সংযোগ উৎস।

যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে আফসার বাহিনীর ৪৭ জন সদস্য শহিদ হয়েছেন ও যুদ্ধাহত হয়েছেন অনেকে। এই শহিদদের মধ্যে আছেন আফসার সাহেবের তৃতীয় পত্র শহিদ নাজিম উদ্দিন আহমেদ। নাজিম উদ্দিন আহমেদ ১৪ ডিসেম্বর ভালুকার পাড়াগাঁও জঙ্গলের যুদ্ধে আরো একজন যোদ্ধাসহ শহিদ হন। এই বাহিনীর শহিদের তালিকা নিম্নরূপ।[২০৯]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

আফসার বাহিনীর গঠনের শুরু থেকে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। এই বাহিনীর প্রধান আফসার উদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব থেকে ভালুকা থানা সংগ্রাম কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন ছিলেন। এছাড়া, তিনি মধ্য আগস্টে আগরতলায় গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দায়িত্বভুক্ত ৩ নং সেক্টরে কর্মরত মেজর এ এন এম নূরুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মেজর নূরুজ্জামান আফসার সাহেবকে কিছু অস্ত্রও সাহায্য হিসেবে প্রদান করেন। এটি পরোক্ষভাবে এই বাহিনীর জন্য স্বীকৃতি হিসেবে দেখা যায়। তাছাড়া, আগরতলায় থাকাকালে আফসার সাহেবের কর্মকান্ডের কথা জেনে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার সান্‌থ সিং বাবাজী তাকে 'মেজর' উপাধি প্রদান করেন এবং ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) ও ঢাকা সদর (উত্তর) এর 'অধিনায়ক' হিসেবে নিযুক্ত করেন।[২১০] এছাড়া, আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ তাদের কার্যাঞ্চলে সরকার স্বীকৃত অন্য কোনো মুক্তিযোদ্ধা দল বা গোষ্ঠীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন নি। বরং, আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যৌথভাবে পাকিস্তান বাহিনী ও রাজাকারদের মোকাবেল করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী ও কালিয়াকৈর, শ্রীপুর অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর সাথে আফসার বাহিনীর যোগাযোগ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের কথা।

মুক্তিযুদ্ধে আফসার বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা-শহিদ নাজিম উদ্দিন আহমেদ, ধামশুর, ভালুকা; শহিদ আ. মান্নান, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা; শহিদ ডা. শমসের আলী, পাড়াগাঁও, ভালুকা; শহিদ মোমতাজ উদ্দিন খান, বান্দিয়া, ভালুকা; শহিদ অনিল সাংমা, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা; শহিদ আ. খালেক, বাটগাঁ, ভালুকা; শহিদ আ. জব্বার (পাশা), ভালুকা; শহিদ মতিউর রহমান আকন্দ, ধামশুর, ভালুকা; শহিদ সিরাজুল হক মোল্লা, কংসেরকুল, ভালুকা; শহিদ আমজাত আলী মুন্সি, কাঁঠালী, ভালুকা; শহিদ শামসুদ্দিন, বরাইদ, ভালুকা; শহিদ মিজানুর রহমান, আসকা, ভালুকা; শহিদ আসাদুজ্জামান মীর, আসকা, ভালুকা; শহিদ আহেদ আলী কারী, আসকা, ভালুকা; শহিদ মফিজ উদ্দিন খান, আসকা, ভালুকা; শহিদ ছিদ্দিকুর রহমান, মনোহরপুর, ভালুকা; শহিদ কামরুল আলম, মেদিলা, ভালুকা; শহিদ

আজিম উদ্দিন, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা; শহিদ মোহাম্মদ আলী, ভয়াবহ, ভালুকা; শহিদ তমুর উদ্দিন, বালিজুড়ি, ভালুকা; শহিদ আ. ছোবান মল্লিক, উথুরা, ভালুকা; শহিদ আনোয়ার হোসেন, মল্লিকবাড়ি, ভালুকা; শহিদ এম. এ ছালাম মিয়া, ডাকাতুিয়া, ভালুকা; শহিদ খোরসেদ আলম, ডাকাতিয়া, ভালুকা; শহিদ সরাফত আলী, ডাকাতিয়া, ভালুকা; শহিদ ছাদেক আলী মিয়া, ডাকাতিয়া, ভালুকা; শহিদ এ কুদ্দুস, ডাকাতিয়া, ভালুকা; শহিদ মুন্নেছ আলী, আউলিয়ার চালা, ভালুকা; শহিদ জয়নাল আবেদীন, মুক্ষপুর, ত্রিশাল; শহিদ আলতাব বাজারী, সানকিভাঙ্গা, ত্রিশাল; শহিদ মোমতাজ, গোপালপুর, ত্রিশাল; শহিদ আক্কাছ আলী, আমিরাবাড়ি, ত্রিশাল; শহিদ নাজিম উদ্দিন, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর; শহিদ আব্দুল মান্নান (ফরচঙ্গীর পুলে শহিদ হন); শহিদ আ. রহমান, মুখী, গফরগাঁও; শহিদ জহিরুল হক, নিগুয়ারী, গফরগাঁও, শহিদ মোখলেছুর রহমান, রায়ের গ্রাম, ত্রিশাল; শহিদ গিয়াস উদ্দিন, বিএ, ওলকামান্দি, ফুলপুর; শহিদ আলী নেওয়াজ, চরখরিচা, ময়মনসিংহ; শহিদ আ. কাইয়ুম, ফুলপুর; শহিদ মফিজ উদ্দিন (পকু), গাদুমিয়া, ধামশুর; শহিদ ডা. আ. ছামাদ, ভান্ডাব, ভালুকা; শহিদ ছফির উদ্দিন মুন্সী, ভান্ডাব; শহিদ রেজাউল করিম, ভান্ডাব, ভালুকা; শহিদ আব্দুল জব্বার, হুগলা, পূর্বধলা; শহিদ আলী নেওয়াজ, পাগলাকান্দা, পূর্বধলা ও পরিমল দ্রং (গারো সম্প্রদায়ভুক্ত)।

গণমাধ্যমে আফসার বাহিনী

আফসার বাহিনীর যোদ্ধাদের কয়েকটি যুদ্ধের খবর প্রচারিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। এছাড়া, অবরুদ্ধ দেশে প্রকাশিত রণাঙ্গন, সোনার বাংলা, জাগ্রত বাংলা পত্রিকাতে এই বাহিনীর সফল কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।[২১১]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

আফসার বাহিনীর কোনো সদস্যই বাংলাদেশ সরকার কৃর্তক প্রদত্ত বীরত্বসূচক খেতাব বা অন্য কোন পুরস্কার পান নি।[২১২] উল্লেখ্য, আফসার বাহিনীর শতাধিক সদস্য নিজ নিজ থানায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এখনও পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হতে পারেননি।[২১৩]

অস্ত্র সমর্পণ

১৯৭১ সালে ডিসেম্বররের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে আফসার বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ ত্রিশাল, ভালুকা, গফরগাঁও ইত্যাদি এলাকা দখলদারমুক্ত করে ময়মনসিংহ সদরের দিকে অবস্থান নিতে থাকেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে আফসার সাহেব তার বাহিনীর সমস্ত সশস্ত্র যোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্র যাতে অপব্যবহৃত না হয় তার দিকে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত কড়া নজর রাখেন। এরপর ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আফসার বাহিনীর সকল অস্ত্র জমা দেওয়া হয়। এই অস্ত্র জমা দেওয়া হয় ময়মনসিংহের রাবেয়া গার্লস কলেজ (বর্তমানে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ) মাঠে। এই মাঠে আফসার বাহিনীর প্রধান আফসার উদ্দিন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা সান্থ সিং বাবাজীও উপস্থিত ছিলেন।[২১৪]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণের ভালুকা থানার মল্লিকবাড়ি এলাকাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন সৈনিক আফসার উদ্দিন আহমেদ একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন স্থানীয় জনমানুষের সহযোগিতায়। এই দল আত্মপ্রতাশ করে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। সেদিন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এদিন থেকে বিজয় অর্জন অবদি সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সামর্থ্যের ভিত্তিতে এই দল পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত ছিল। দখলদার পক্ষের

বিরুদ্ধে শতাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এ বাহিনীর প্রায় অর্ধশত সদস্য শহিদ হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। আফসার সাহেবের নিজ পুত্র (যুদ্ধকালীন কমান্ডার) নাজিম উদ্দিন আহমেদও এ বাহিনীর একজন শহিদ সদস্য। অপর পক্ষে উল্লিখিত যুদ্ধসমূহে ২৯৫ জন পাকিস্তানি সৈনিক ও ৮০ জন রাজাকার প্রাণ হারায়। আফসার বাহিনীর সদস্যরাই মূলত ভালুকা, ত্রিশাল ও শ্রীপুর থানা শত্রুমুক্ত করেন।

আফসার বাহিনী ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও, টাঙ্গাইলের একাংশ ও গাজীপুরের একাংশে সক্রিয় ছিল। তার মধ্যে ভালুকা, ত্রিশাল ও গফরগাঁও এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক ছিলেন এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। এসব এলাকায় বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত যোদ্ধাদল ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আগমনের বহু পূর্বেই আফসার বাহিনী সুসংগঠিত ছিল। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্লিখিত এলাকায় ভারত প্রত্যাগত যোদ্ধাদের আশ্রয়সহ অন্যান্য সহযোগিতার আধার ছিল আফসার বাহিনী। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধের মূল কৃতিত্ব আফসার বাহিনীর সদস্যদের।

আফসার বাহিনী দল গঠনের পর থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও, শ্রীপুর ইত্যাদি এলাকার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দালাল-রাজাকার এবং চোর-ডাকাত-লুটেরা-নারী নির্যাতনকারীদের অনেককে সরাসরি শাস্তি প্রদান করেছিল। এই কাজে আফসার বাহিনীর রক্ষীদলের সদস্যদের খুব সাহসী ও কার্যকর ভূমিকা ছিল। স্বেচ্ছাসেবী এই মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা নিয়েই মূলত ডকাত-লুটেরা-নির্যাতনকারী-দালালদের অনেককে চরম শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়। এর ফলে, অত্র এলাকার অবরুদ্ধ জনতা এক ধরনের নিরাপত্তা পেয়েছিল। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের এই সাফল্যে সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও সহযোগিতা করেছিলেন সর্বাত্মকভাবে। সুতরাং বলা যায় যে, আফসার বাহিনীই এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধকে গড়ে তুলেছিল জনযুদ্ধ হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির কর্মকাণ্ডের বিপরীতে স্থানীয় বা অবরুদ্ধ জনতার মনোবল ধরে রাখতে বা বৃদ্ধি করতে আফসার বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাগ্রত বাংলা' নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়েছিল। এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত এই পত্রিকা অত্র এলাকায় একটি উৎসাহ ও চাঞ্চল্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাশপাশি ভালুকার মুক্তাঞ্চলে এই বাহিনী কমপক্ষে দুটি জনসভা, পথসভা, উঠানবৈঠক ইত্যাদি। মাধ্যমে জনসংযোগ বজায় রেখে সাধারণের মনে মুক্তির স্বপ্ন জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থে এ কাজের একটি বিরাট গুরুত্ব ছিল।

আফসার বাহিনী ভালুকার একটি বড় অংশে (আক্ষরিক অর্থে না হলেও) মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন। এই মুক্তাঞ্চলের সাধারণ প্রশাসন এই বাহিনীর সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। আফসার বাহিনীর কর্মকাণ্ডে (আক্রমণ এ্যাম্বুশ ইত্যাদি) ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদল কোথাও কোথাও সাধারণ জনতার ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। আফসার বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনা ও দোসর কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ও নির্যাতনের পরোক্ষ দায় আফসার বাহিনীর ওপর বর্তায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভালুকাসহ উল্লিখিত এলাকাসমূহে কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখা আফসার বাহিনীর কোনো সদস্যই আজ পর্যন্ত বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা রাষ্ট্রীয় কোনো পুরস্কার পাননি। এ বাহিনীর শতাধিক সদস্য আজও মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি। আফসার বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক সদস্যবৃন্দ (রক্ষী বাহিনীর সদস্য) মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি ও পাননি। আর, এই বাহিনীর ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে স্থান পায়নি।

হেমায়েত বাহিনী

গোপালগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধকালে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার উত্তরাংশে ব্যক্তি প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী সেনাসদস্য হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিনের প্রচেষ্টায় এছাড়া, এই বাহিনী গড়ে তোলার পেছনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হেমায়েত উদ্দিনের নামানুসারে এই আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর পরিচিতি গড়ে ওঠে 'হেমায়েত বাহিনী' নামে।

হেমায়েত উদ্দিন গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানাধীন কান্দি (টুপুরিয়া) গ্রামে ১৯৪১ সালের ৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী আব্দুল করিম শেখ ও মাতার নাম সখিনা বেগম। হেমায়েত উদ্দিন ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে হাবিলদার পদ মর্যাদায় তিনি অ্যাবোটাবাদ ক্যান্টনমেন্টের আর্মি স্কুল অব মিউজিকে ড্রিল ইন্সট্রাক্টর পদে কর্মরত ছিলেন।[২১৫] তিনি ১৪ মার্চ, ১৯৭১ সপরিবার ঢাকায় আসেন এবং গাজীপুরের জয়দেবপুরস্থ ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তিনি জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিজ এলাকায় চলে আসেন এবং মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। ২০১৬ সালের ২২ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

হেমায়েত উদ্দিন ১৯৫৯ সালে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে এই রেজিমেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি হয়ে গেলে তিনিও সেখানে চলে যান। এরপর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুনরায় বদলি হয়ে ঢাকার জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে আসলেও তিনি ডেপুটেশনে এ্যাবোটাবাদে থেকে যান। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাকালীন বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের প্রতি পশ্চিমা সৈনিক ও অফিসারদের তাচ্ছিল্য ও দুর্ব্যবহার হেমায়েত উদ্দিনকে ব্যথিত করেছিল।[২১৬] ১৯৭১ এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্র গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি ছুটি ও সপরিবার পূর্ব পাকিস্তানে আসার ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৪ মার্চ সপরিচারে ঢাকা পৌঁছান এবং পরিবারকে নিজ গ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ঐদিনই জয়দেবপুরে তার প্যারেন্ট রেজিমেন্টে যোগ দেন। এখানে এসে তিনি জানতে পারেন যে, এই রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিকদের নিরস্ত্র করার নানা ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন পাঞ্জাবি সেনাকর্মকর্তারা। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে হেমায়েত উদ্দিন মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

১৯ মার্চ ১৯৭১ ব্রিগেডিয়ার জাহান বাজের নেতৃত্বে একটি দল জয়দেবপুরস্থ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে রওনা হন। এই খবর পেয়ে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈনিক সাধারণ পোশাকে জয়দেবপুর চৌরাস্তার মোড়ে প্রতিরোধের জন্য অবস্থান নেন। এখানে উভয়পক্ষের সংঘর্ষে ৪ জন বাঙালি শহিদ ও ১৫/১৬ জন আহত হন।[২১৭] এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিলেন। এ ঘটনার পর বাঙালি রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার আর কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদল গণহত্যা শুরু করলে তার প্রতিক্রিয়ায় ২য় বেঙ্গলের অধিকাংশ সাধারণ সৈন্য বিদ্রোহ করার পক্ষপাতি থাকলেও বাঙালি কর্মকর্তারা কোনো সিদ্ধান্ত জানান নি। ২৮ মার্চ হাবিলদার হেমায়েত ও হাবিলদার আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে ৩৬ সদস্যের একটি টিমকে ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়কের রথখোলা নামক স্থানে পেট্রোল ডিউটিতে পাঠানো হয়।[২১৮] তাদেরকে বলা যে, কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোঁড়া হলে তা বিদ্রোহের ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নিয়ে রাণীরঘাট এলাকায় একত্রিত হতে হবে। ঐদিন রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হলে পেট্রোল ডিউটিতে থাকা হেমায়েত ও অন্যান্য সৈন্যরা ভেবেছিলেন যে, ক্যান্টমেন্টে পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছেন। এ অবস্থায় তারা রথখোলা শ্মশান ঘাটে অবস্থান নেন ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ২৯ মার্চ ভোরবেলা তারা ক্যান্টমেন্টে প্রবেশ করে দু'জন বাঙালি ও কয়েকজন পাঞ্জাবি সৈন্যকে আহত অবস্থায় দেখেন। এরপর তারা কয়েকজন পাঞ্জাবি সৈন্যকে হত্যা করে ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্রাগার ও খাদ্য গুদাম খুলে দেন। হেমায়েত ও অন্যান্য সৈনিক নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অবশিষ্ট অস্ত্র স্থানীয় জনসাধারণের মাছে বিতরণ করে দেন যাতে তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারেন। এ কাজে হেমায়েত উদ্দিনকে সহযোগিতা করেন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মোতাল্লিব।[২১৯] যাহোক, ৯ এপ্রিল ১১ জন সৈনিকসহ হেমায়েত উদ্দিন ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৭ এপ্রিল তিনি ৯ জন সহাযোগীসহ ফরিদপুর শহরে এসে পৌছান। এখানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে হেমায়েত তার সঙ্গীসহ ফরিদপুর প্রতিরক্ষার কাজে যুক্ত হন।[২২০] কিন্তু ২১ এপ্রিল ফরিদপুর শহর পাকিস্তানি সৈন্যদলের দখলে চলে গেলে তিনি সঙ্গীসহ গোপালগঞ্জের দিকে চলে যান। ২৫ এপ্রিল তিনি ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা হয়ে চান্দার বিলে সুবেদার আজিজের সাথে সাক্ষা' করেন। সুবেদার আজিজ এই এলাকায় মুক্তিবাহিনী পরিচালনা করছিলেন।[২২১] সুবেদার আজিজ ও হেমায়েত একসাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর হেমায়েত ২৮ এপ্রিল নিজ গ্রাম কান্দিতে (টুপুরিয়া) পৌছান।

হাবিলদার হেমায়েত এসময় জানতে পারেন যে, কোটালীপাড়া ডাক বাংলোয় ৩৬ জন আওয়ামী লীগ নেতাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল তিনি ডাক বাংলোর তালা ভেঙে উল্লিখিত নেতাদেরকে মুক্ত করেন।[২২২] এই কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় থানা পুলিশ ও পাকিস্তানি সমর্থকরা ৩ মে হেমায়েতের গ্রামের বাড়ি ভাঙচুর করেন। এই অবস্থায় তিনি পরিবারসহ পার্শ্ববর্তী পিঠাবাড়ি গ্রামে অবস্থান নেন। ৫ মে তিনি তার সঙ্গীসহ কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ করেন ও দখল করেন।[২২৩] কিন্তু ৭ মে পাকিস্তানি সৈন্যরা পুনরায় থানা দখল করে নেন।

কোটালীপাড়া থানা হাতছাড়া হয়ে গেলে হেমায়েত তার ছোট দলসহ বরিশালের দিকে চলে যান। এসময় তিনি গ্রামাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম বিস্তৃত করার চেষ্টা করেন। ৮ মে তার দলের সাথে যুক্ত হন বরিশালের সুপরিচিত আইনজীবী অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন। এছাড়া, একই দিনে বরিশাল উজিরপুরের এম পি এ হরনাথ বাইন ও মাদারিপুর থানার এম পি এ আচমতক আলী খান হেমায়েতের দলে যুক্ত হন।[২২৪] উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ হেমায়েতের দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন জেনে ও নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বরিশাল উত্তর এলাকা ও গোপালগঞ্জ-মাদারিপুর এলাকার অবসরপ্রাপ্ত, ছুটিতে থাাক, পক্ষত্যাগকারী ই বি আর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা হেমায়েতের দলে যোগ দিতে থাকেন। পাশাপাশি অত্র এলাকার ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য পেশার মানুষ দলে দলে এই বাহিনীতে যোগ দেন। এই মুক্তিবাহিনী সংগঠনের শুরুর দিকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করেন কোটালীপাড়ার রাধাগঞ্জের চন্দ্র গোসাই।[২২৫]

১৫ মে ১৯৭১ বরিশালের গৌরনদী থানাধীন বাটরা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২২৬] এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হরনাথ বাইন এম পি এ, আচমত আলী খান এম পি এ, অ্যাডভোকেট

হেমায়েত উদ্দিন, ন্যাপনেতা মিহির দাশগুপ্ত (গৈলা)সহ অসংখ্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মী। এই সভাতেই হাবিলদার হেমায়েতের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীকে ‘হেমায়েত বাহিনী’ হিসেবে ও হাবিলদার হেমায়েতকে ‘মেজর’ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।[২২৭] এই সভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।

সংগঠন

১৫ মে ১৯৭১ বরিশালের গৌরনদী থানার বাটরা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে হেমায়েত বাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রারম্ভ হয়। মে মাসের শেষ নাগাদ অত্র অঞ্চলে (বৃহত্তর ফরিদপুর ও উত্তর বরিশাল) সক্রিয় ছোটো ছোটো মুক্তিযোদ্ধা দল হেমায়েত বাহিনীতে যুক্ত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আব্দুল হাকিম বিশ্বাস গ্রুপ, মন্মথ সিকদার গ্রুপ, মণীন্দ্রনাথ রায় গ্রুপ, কায়েক কমান্ডার গ্রুপ, নূর মোহাম্মদ গোমস্তা গ্রুপ। এসব গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাসহ হেমায়েত বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩৫০০ জন। এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ৪২টি কোম্পানিতে বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫৫৮ জন।[২২৮] অবশ্য, কোনো কোনো উৎসে এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬৮৯০ উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৯] এই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভারতে প্রশিক্ষিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।[২৩০] বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধাদেরকে মোট ৪২টি কোম্পানিতে বিভক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যেক কোম্পানিতে ১০১ থেকে ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে যুক্ত করা হয়। প্রত্যেক কোম্পানিতে একজন কোম্পানি কমান্ডার ও একজন সহকারী কমান্ডার ছিলেন। একটি কোম্পানিতে ৪টি প্লাটুন ও প্রত্যেক প্লাটুনে ৩টি সেকশন ছিল। প্লাটুন ও সেকশনে একজন প্লাটুন ও সেকশন কমান্ডার ছিলেন। উল্লেখ্য, হেমায়েত বাহিনীতে ৩৬৫ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।[২৩১] হেমায়েত বাহিনীর ৪২টি কোম্পানির কমান্ডারগণের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

নং	মূল পদবি	হেমায়েত কর্তৃক প্রদত্ত পদবি	কোম্পানি কমান্ডারের নাম	পরিচিতি ও ঠিকানা
০১	হাবিলদার	মেজর	মেজর হেমায়েত উদ্দিন (হিমু) (বাহিনীর প্রধান নিজে)	আর্মি (অধিনায়ক), কোটালীপাড়া
০২	সিপাহী	হাবিলদার	মকবুল হোসেন দাড়িয়া	প্রাক্তন আনসার, কোটালীপাড়া
০৩	পি সি	কমান্ডার	ফরু মিয়া	প্রাক্তন আনসার, কোটালীপাড়া
০৪	নায়েক	ক্যাপ্টেন	সাহেব আলী	প্রাক্তন পুলিশ, গোপালগঞ্জ
০৫	নায়েক	ক্যাপ্টেন	আব্দুল বারী সরদার	আর্মি, গোপালগঞ্জ
০৬	সুবেদার	ক্যাপ্টেন	কলিমউল্লাহ	ইপিআর, কোটালীপাড়া
০৭	সুবেদার	ক্যাপ্টেন	লুৎফর রহমান	ইপিআর, কোটালীপাড়া
০৮	নায়েক	সুবেদার	ছাহেব আলী	প্রাক্তন পুলিশ, কোটালীপাড়া
০৯	নায়েক	ক্যাপ্টেন	ইউসুফ আলী সিকদার	আর্মি, কোটালীপাড়া
১০	ল্যা. নায়েক	সুবেদার	আব্দুস ছাত্তার মৃধা	প্রাক্তন আর্মি, উজিরপুর (শহিদ)
১১	নায়েক	ক্যাপ্টেন	আব্দুল জব্বার	প্রাক্তন আর্মি, কালাফনী
১২	নায়েক	ক্যাপ্টেন	বজলুর রহমান	প্রাক্তন আর্মি, বাগেরহাট
১৩	-	কমান্ডার	আফজাল হোসেন	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত
১৪	-	কমান্ডার	আ. হাকিম বিশ্বাস	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত
১৫	-	কমান্ডার	বেলায়েত হোসেন	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, টুঙ্গীপাড়া (শহিদ)

১৬	-	কমান্ডার	মন্মথ সিকদার	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত
১৭	নায়েক	ক্যাপ্টেন	আব্দুল গফুর মিয়া	প্রাক্তন আর্মি, কালকিনি
১৮	নায়েক	ক্যাপ্টেন	নওশের আলী	প্রাক্তন আর্মি, গোপালগঞ্জ
১৯	-	কমান্ডার	মোহন সরদার	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, গোপালগঞ্জ
২০	ল্যা. নায়েক	সুবেদার	আলম	আর্মি, স্বরুপকাঠি
২১	-	কমান্ডার	মো. রফিক সেরনিয়াবাত	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিং (পরে ভারতে), গৌরদনী
২২	লেফটেনেন্ট এসিসি	ক্যাপ্টেন	আহসান হাবিব	আর্মি, উজিরপুর
২৩	নায়েক	ক্যাপ্টেন	শামছুল হক	আর্মি, গোপালগঞ্জ
২৪	ওসি	ক্যাপ্টেন	কাঞ্চন আলী (দারোগা)	পুলিশ, গোপালগঞ্জ
২৫	-	কমান্ডার	নুরু মোহাম্মদ মোস্তফা	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, আগৈলঝড়া
২৬		কমান্ডার	সেকেন্দার আলী	প্রাক্তন আনসার, কোটালীপাড়া
২৭		কমান্ডার	ফরমান আলী	আনসার, কোটালীপাড়া
২৮	-	কমান্ডার	শেখ আকরাম	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, টুঙ্গীপাড়া
২৯	-	কমান্ডার	বাহার তালুকদার	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, টুঙ্গীপাড়া
৩০	সুবেদার	ক্যাপ্টেন	আবুল হাসেম	আর্মি, গৌরনদী
৩১	-	কমান্ডার	তাহের মিঞা	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, বাবুগঞ্জ
৩২	হাবিলদার	কমান্ডার	আব্দুল আজিজ	আনসার, তেলকৈড়, যশোর
৩৩	-	কমান্ডার	কাজী আশরাফ উদ্দিন	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, কোটালীপাড়া
৩৪	নায়েক	ক্যাপ্টেন	শেখ সোলেমান	প্রাক্তন আর্মি, গোপালগঞ্জ
৩৫	-	কমান্ডার	কমলেশ বেদজ্ঞ	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, কোটালীপাড়া
৩৬	নায়েক	সুবেদার	হাতেম আলী	পুলিশ, উজিরপুর
৩৭	-	কমান্ডার	জেমস্ আর কে হাজারী	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, কোটালীপাড়া
৩৮	ফ্লাইট সার্জেন্ট	ক্যাপ্টেন	শেখ জাবেদ আলী	বিমানবাহিনী, কোটালীপাড়া
৩৯	ফ্লাইট সার্জেন্ট	ক্যাপ্টেন	আ. হালিম সরদার	বিমানবাহিনী, গোপালগঞ্জ
৪০	সুবেদার	ক্যাপ্টেন	হাসান সরনামত	আর্মি, কোটালীপাড়া
৪১	ফ্লাইট সার্জেন্ট	ক্যাপ্টেন	এ. কে. এম সরোয়ারজান বিশ্বাস	প্রাক্তন বিমানবাহিনী, গোপালগঞ্জ
৪২	হাবিলদার	ক্যাপ্টেন	আব্দুল আজিজ	আর্মি, ফরিদপুর
৪৩	নায়েক	ক্যাপ্টেন	ইউসুফ আলী	আর্মি, উজিরপুর
৪৪	হাবিলদার	ক্যাপ্টেন	আ. আজিজ	আর্মি, কাশিয়ানী
৪৫	-	কমান্ডার	জাহাঙ্গীর বাহাদুর	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, স্বরূপকাঠি
৪৬	-	কমান্ডার	আ. হাকিম	সিভিল, ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, মূলাদি

৪৭	নায়েক	ক্যাপ্টেন	কবির আহম্মদ	আর্মি, কালকিনি
৪৮	সিপাহী	সুবেদার	আব্দুস সালাম	ইপিআর, কালকিনি (শহিদ)
৪৯	নায়েক	ক্যাপ্টেন	মকবুল হোসেন	ইপিআর, কালকিনি (শহিদ)
৫০	নায়েক	ক্যাপ্টেন	শামছুল হক	প্রাক্তন ইপিআর, মোল্লাহাট
৫১	-	কমান্ডার	আব্দুল মকিত	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, টুঙ্গীপাড়া
৫২	-	কমান্ডার	সৈয়দ আলী	সিভিল, ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, টুঙ্গীপাড়া
৫৩	সিপাহী	সুবেদার	মজিবুর রহমান	আর্মি, গোপালগঞ্জ
৫৪	নায়েক	ক্যাপ্টেন	আহম্মদ আলী	আর্মি, গোপালগঞ্জ
৫৫	-	কমান্ডার	শামসু কাজী	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, গোপালগঞ্জ
৫৬	ল্যা. নায়েক	সুবেদার	সাহাবুদ্দিন	আর্মি, গোপালগঞ্জ
৫৭	-	কমান্ডার	আতিয়ার রহমান মোল্লা	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, কোটালীপাড়া
৫৮	মুজাহিদ হাবিলদার	ক্যাপ্টেন	মো. ইব্রাহীম	মুজাহিদ বাহিনী (শহিদ) কাপাসিয়া, ঢাকা
৫৯	সুবেদার	ক্যাপ্টেন	সুবেদার আলী আহম্মদ	প্রাক্তন আর্মি, কোটালীপাড়া
৬০	নায়েক	ক্যাপ্টেন	সিদ্দিকুর রহমান	পুলিশ, গৌরনদী
৬১	সিপাহী	সুবেদার	মিলু সরকার	আর্মি, কোটালীপাড়া
৬২	-	কমান্ডার	বদিউজ্জামান	সিভিল, স্থানীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত, কোটালীপাড়া

উৎস : রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-৭২

হেমায়েত বাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট ছিলেন জেসিও আহসান হাবিব। এই বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুবেদার আলী আহম্মেদ।[২৩২] হেমায়েত বাহিনীর সামরিক সদর দপ্তর হিসেবে প্রথমদিকে ব্যবহার করা হতো বরিশালের আগৈলঝাড়া থানাধীন পয়সার হাটের রাজাপুর গ্রাম।[২৩৩] এরপর থেকে সামরিক সদর দপ্তর সর্বদা ভ্রাম্যমান ছিল। হেমায়েত বাহিনীতে সামরিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেসামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত এই বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন প্রায় ৩৫০ জন সংগঠক। আর বেসামরিক প্রশাসক, সংগঠক, বিভিন্ন কমিটি/উপ-কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকসহ হেমায়েত বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

হেমায়েত বাহিনী সমস্ত কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মুন্সি আবুল কাশেম, আব্দুল ওহাব খান ও অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়।[২৩৪] বাহিনী গঠনের শুরুর দিকে গঠিত এই কমিটির দায়িত্ব ছিল সাধারণ প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাদ্র ও নৌকা সংগ্রহ, গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড পরিচালনা, বার্তাবাহকদের কর্মকাণ্ড তদারকি, সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম তদারকি, মেডিক্যাল টিমের কর্মকাণ্ড তদারকি ও সমন্বয় করা।

হেমায়েত বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার বিস্তৃতির সাথে সাথে ঐসব এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখভাল করার জন্য লিয়াজোঁ কমিটি বাদেও এলাকা ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক ছিলেন। কোনো কোনো এলাকাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে এক একটি অংশের এক একজনকে দেওয়া হয়েছিল।

এইসব প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট অংশের বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান ছিলেন। এলাকা ভিত্তিক প্রশাসনিক প্রধানদের তালিকা নিম্নরূপ[২৩৫]

ক্রমিক নং	**নাম ও রাজনৈতিক দল**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা**
১.	আচমত আলী খান এম পি এ (আওয়ামী লীগ)	মাদারিপুর থানা
২.	হরনাথ বাইন এম পি এ (আওয়ামী লীগ)	উজিরপুর থানা
৩.	মুন্সি আবুল কাশেম (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
৪.	সরদার রহমত জান (আওয়ামী লীগ)	গোপালগঞ্জ থানা
৫.	আব্দুল ওহাব খান (আওয়ামী লীগ)	গোপালগঞ্জ থানা
৬.	আব্দুল গফুর (আওয়ামী লীগ)	গোপালগঞ্জ থানা
৭.	লক্ষী কান্ত বল (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
৮.	চিত্তরঞ্জন গাইন (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
৯.	গণেশ চন্দ্র কমিউনিস্ট পার্টি	কালকিনি থানা
১০.	দ্বিজেন ঘটক ন্যাপ, ভাসাী	গৌরনদী থানা
১১.	কাজী শাহ আলম (আওয়ামী লীগ)	গৌরনদী থানা
১২.	সুনীল সরকার কমিউনিস্ট পার্টি	কালকিনি থানা
১৩.	শেখ আব্দুল আজিজ (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
১৪.	শেখ আকরাম হোসেন (আওয়ামী লীগ)	টুঙ্গিপাড়া থানা
১৫.	বাদশা তালুকদার (আওয়ামী লীগ)	টুঙ্গিপাড়া থানা
১৬.	অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন (আওয়ামী লীগ)	বানারিপাড়া থানা
১৭.	ডা. আব্দুল গফুর (আওয়ামী লীগ)	উজিরপুর থানা
১৮.	ডা. শ্যামাচরণ বৈদ্য (আওয়ামী লীগ)	মাদারিপুর থানা
১৯.	সরদার সারোয়ার জান (আওয়ামী লীগ)	গোপালগঞ্জ থানার
২০.	সামছুল হক মিয়া (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
২১.	মোজাম সরদার (আওয়ামী লীগ)	গোপালগঞ্জ থানা
২২.	তরণী অধিকারী (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থাা
২৩.	আবুল হোসেন (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
২৪.	আব্দুল মজিজ (আওয়ামী লীগ)	কোটালীপাড়া থানা
২৫.	প্রফেসর আব্দুল হালিম, ন্যাপ, ভাসানী	গোপালগঞ্জ থানা

হেমায়েত বাহিনীতে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কমিটির অধীন আবার অনেকগুলো উপ-কমিটি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য, অর্থ, রেশন, ওষুধ, পোশাক, নৌকা সংগ্রহ, মুক্তাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, দালাল চিহ্নিতকরণ, পাকিস্তানি সেনাদলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন কাজ এসব উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্পাদন করতেন। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক কমিটির কার্যপরিধি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হেমায়েত বাহিনীর একটি অর্থ বিভাগ ছিল। এ বিভাগের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের হাতে। এই বাহিনীর সকল আয়-ব্যয় এর হিসাব রাখার জন্য আছাদুজ্জামান (হাবিব), জালাল আহমেদ, সাজাহান তালুকদারসহ হেমায়েতের কয়েকজন সহযোগী ছিলেন। এই দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে বাহিনীর গরীব মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ৯৫ টাকা করে বেতন দেওয়া হতো। এ বাহিনীতে বেতনভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার।[২৩৬]

হেমায়েত বাহিনীতে একটি বিচার বিভাগ গড়ে উঠেছিল। মূলত উত্তর বরিশাল এলাকার এই বিভাগের তৎপরতা বেশি লক্ষণীয় ছিল। এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল বাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অপরাধের বিচার করা। মুক্তিযুদ্ধকালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার অপরাধের ভিত্তিতে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি ৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।[২৩৭] মুক্তিযোদ্ধা বাদে এই বিচার বিভাগ বন্দি রাজাকারদেরও বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতো। এই আদালতের মাধ্যমে ৬০ জন রাজাকার ও ৩ জন দালালের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এই বিচার আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন হরনাথ বাইন এম পিএ ও সদস্য সচিব ছিলেন অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন। এই বিভাগের সদস্য ছিলেন আব্দুর রাকিব সেরনিয়াবাত (গৌরনদী), ডা. আব্দুর গফুর (সাতলা), নূর মোহাম্মদ গোমস্ত (গৌরনদী), মিহির দাশগুপ্ত (গৈলা), রাফায়েল ব্যাপারী (গৌরনীদ), সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, দ্বিজেন ঘটক (বাসাইল), ডা. সুনীল সরকার (বাহাদুরপুর)।[২৩৮]

হেমায়েত বাহিনীতে একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। এই বিভাগ খোলা হয়েছিল বাহিনী গঠনের শুরুর দিকে ১০ মে তারিখে। প্রায় ৪০০ সদস্যের[২৩৯] এই দলের প্রধান পরিচালক ছিলেন হেমায়েত উদ্দিন নিজেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন করপালার আব্দুল কুদ্দস হালদার।[২৪০] এই গোয়েন্দা বিভাগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ন্যাপ নেতা মন্টু দাসগুপ্ত ও রাফায়েল ব্যাপারী। কাজ ছিল বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ও পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগী শক্তির গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক খবরাদি বাহিনী প্রধানকে জানানো।

হেমায়েত বাহিনীর প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ রাখতে দুইজন করে বার্তাবাহক রাখা হতো। এছাড়া, প্রতিটি কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হেমায়েত উদ্দিন একজন করে গাইড রাখতেন। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এ বাহিনীর প্রায় চারশ নৌকাকে সদা প্রস্তুত রাখা হতো।[২৪১]

হেমায়েত বাহিনীর নিজস্ব স্বাস্থ্য বিভাগ ছিল। যার প্রধান ছিলেন ডা. শ্যামাপদ বৈদ্য।[২৪২] এই বিভাগে ১৪ জন ডাক্তার ও প্রায় ১৫ জন নার্সের সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়। এছাড়া, গৌরনদীর আসকর গ্রামের মিহির দাশগুপ্তের মাধ্যমে গড়ে তোলা হাসপাতাল ও এই বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।[২৪৩] এই হাসপাতালে হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও সাব-সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমরের দলের মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়া হতো।[২৪৪] এছাড়া, স্থানীয় জনগণও এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিতেন। মিহির দাশগুপ্তের সাথে এই হাসপাতাল পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বাগধার শহীদুল্লাহ তালুকদার, পয়সার হাটের ডা. রণজিৎ ও ভবরঞ্জনের।

হেমায়েত বাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসক হিসেবে ভূমিকা রাখেন ডা. সুনীল কুমার মজুমদার, ডা. লালমোহন বিশ্বাস, ডা. রণজিৎ, ডা. বকুল মজুমদার, ডা. নির্মল চন্দ্র, ডা. প্রফুল্ল কুমার, ডা. শ্যামাচরণ বৈদ্য, ডা. নওশের আলী, ডা. সুরেন্দ্রনাথ, ডা. ফিলিপ্স প্রমুখ।[২৪৫] চিকিৎসক ছাড়া এই বিভাগে সেবিকা হিসেবে ভূমিকা রাখেন আশালতা বৈদ্য (লাটেঙ্গ), শান্তিলতা বৈদ্য (লাটেঙ্গা), তাহমিনা খানম (কুশলা), কুসুমরাণী বাগচী (সোনাইলবাড়ি), হেমপ্রভা হালদার (জহরের কান্দি), গীতা রাণী ওবনা (কোণের ভিটা), সুলেখা রায় (নারিকেলবাড়ি), কুসুমরাণী জয়ধর (ভুতুরিয়া), সুষমা রাণী জয়ধর (ভুতুরিয়া), লীলা রাণী (নারিকেলবাড়ি), লীলাবতী ভক্ত (পূর্বপপাড়া), সুষমা বাড়ৈ (সুয়াগ্রাম), স্মৃতিকণা বাড়ৈ (বদরতলা) প্রমুখ। সেবিকাদের মধ্যে স্বর্ণলতা রায় নার্সিং ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছিলেন। স্বর্ণলতা রায় ও ডা. ফিলিপ্স এর নিকট থেকে অন্যান্য সেবিকারা প্রাথমিক চিকিৎসা ও

সেবাকর্মের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল দুটি। একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল কোটালীপাড়ার নারিকেলবাড়ি মিশন এলাকায় আর অপরটি ছিল জহরের কান্দি স্কুলে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আব্দুল আজিজ ও ডা. লালমোহন বিশ্বাস।[২৪৬] উল্লিখিত বিভাগগুলো বাদেও হেমায়েত বাহিনীতে খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন নায়েক গোলাম মোস্তফা ও হাবিবুর রহমান যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুবেদার আব্দুর রশিদ, কুরিয়ার কোম্পানির দায়িত্বে ছিলেন এনামুল হক, শরণার্থী ব্যবস্থাপনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আব্দুস সাত্তার মৃধা ও সদর দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুবেদার আব্দুর রশিদ।[২৪৭]

হেমায়েত বাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ বাহিনীতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সমাজ-সেবকদের সমন্বয়ে দশ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি ছিল। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে এ বাহিনী বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নরূপ[২৪৮]:

(১) আচমত আলী খান এ পি এ (মাদারিপুর থানা)
(২) হরনাথ বাইন এম পিএ (উজিরপুর থানা)
(৩) মুন্সি আবুল কাশেম (কোটালীপাড়া থানা)
(৪) সরদার রহমত জান (গোপালগঞ্জ থানা)
(৫) আব্দুল ওহাব খান (গোপালগঞ্জ থানা)
(৬) আব্দুল গফুর পাইক (কোটালীপাড়া থানা)
(৭) লক্ষীকান্ত বল (কোটালীপাড়া থানা)
(৮) চিত্ত রঞ্জন গাইন (কোটালীপাড়া থানা)
(৯) সুনীল সরকার (কালকিনি থানা)
(১০) মন্টু দাশগুপ্ত (গৌরনদী থানা)

উল্লিখিত বিভাগ ও কমিটি ছাড়াও হেমায়েত বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে বরিশাল এলাকায় মিহির দাশগুপ্ত, রাফায়েল ব্যাপারী, হায়দার আলী হাওলাদার ও গোপালগঞ্জ এলাকায় কমলেশ বেদজ্ঞ, শেখ আব্দুল আজিজ প্রমুখ খুব কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলেন। রামশীলের যুদ্ধে হেমায়েত আহত হলে বাহিনীর সামরিক শাখা পরিচালনা করতেন কমলেশ বেদজ্ঞ। তাছাড়া, তিনি হেমায়েত বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।[২৪৯] মুক্তিযুদ্ধে কমলেশ বেদজ্ঞের ভূমিকা সম্পর্কে ৯ নং সেক্টর কমান্ড প্রেরিত ফরিদপুরের দায়িত্ব পালনকারী ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল উল্লেখ করেন, 'হেমায়েতের দুর্ধর্ষ সাহস ও অস্ত্রজ্ঞান এবং কমলেশের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সম্মিলিত শক্তিই হেমায়েতের বাহিনীর মূল চালিকা শক্তি'।[২৫০]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহ

হেমায়েত বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয় মে মাসের মাঝামাঝি থেকে। শুরুর দিকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল গোপালগঞ্জের 'বাঘিয়ার বিল' এলাকায়। বাঘিয়ার বিল অবস্থিত মাদারিপুরের রাজৈর, মাদারিপুর থানা, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদরের নিচু এলাকায়। এই এলাকার বিভিন্ন ক্যাম্পে বাহিনীর স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। তবে, কোটালীপাড়ার জহরের কান্দি হাইস্কুলে এই বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।[২৫১] এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি নারী মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এই কেন্দ্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার জোবেদ আলী ও চিফ ইন্সফেক্টর আব্দুল খালেকসহ[২৫২] (ইঞ্জিনিয়ার কোর) আরো ২৫ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতেন। তাদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।[২৫৩]

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	গ্রাম
১	হিংগুল আলী হাজরা	পুলিশ হাবিলদার	দক্ষিণপাড়
২	উকিলদ্দিন শেখ	আনসার সেনাসদস্য	সোনাটিয়া
৩	আঃ মালেক সরদার	আনসার সেনাসদস্য	ডহরপাড়া
৪	জয়নাল আবেদীন	যোদ্ধা (আনসার)	আলিঠাপাড়া
৫	আবু বকর শেখ	(ব্যাংকার)	ডহরপাড়া
৬	আলি আহম্মেদ	সাবেক সেনা সদস্য	হিরণ
৭	আশরাফ আলী		হিরণ
৮	মুনিরুজ্জামান	সেনাসদন্য	বর্ষাপাড়া
৯	মইয়ার আলী		হিরণ
১০	সাহেব আলী মিয়া	পুলিশ হাবিলদার	ডহরপাড়া
১১	আ: ছাত্তার মোল্লা		সোনাটিয়া
১২	আহজেদ হোসেন টুকু		ডহরপাড়া
১৩	আবুল হাসান সেরনিয়াবাদ	সেনাসদস্য	হরিনাহাটি
১৪	বিশাই মোল্লাহ		বান্ধাবাড়ি
১৫	আ: রউফ শাহ	আনসার	মদনপাড়
১৬	আহম্মদ আলী	সেনাসদস্য	বনগ্রাম
১৭	মনির হোসেন		
১৮	মজিবুর মল্লিক	সেনাসদস্য	বান্ধাবাড়ি
১৯	কুদ্দস হাওলাদার		কুরপালা
২০	নজরুল ইসলাম		কাজুলীয়া
২১	শাজাহান শিকদার	সেনাসদস্য	কাকডাংগা
২২	আলতাব হোসেন		আশুতিয়া
২৩	আলম হাওলাদার		স্বরুপকাঠি
২৪	জাবেদ মিয়া		বিরামের কান্দি
২৫	হাবিবুর রহমান	নেতা	সোনাটিয়া

এই জহরের কান্দি হাই স্কুলের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিমান হামলা থেকে রক্ষা পেতে বিমান হামলা প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে একটি আলাদা প্রশিক্ষণ ইউনিট চালু করা হয়েছিল। এই ইউনিট থেকে ৪৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[২৫৪] এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালক ছিলে লক্ষীকান্ত বল। জহরের কান্দি স্কুল কেন্দ্রের বাইরে কোটালীপাড়ার নারিকেলবাড়ি চার্চ মিশনে বাহিনীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। এই কেন্দ্র হতে ৩৬৫ জন সশস্ত্র নারী মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেন। এই মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিলেন আশালতা বৈদ্য ও প্রমিলা দেবী। এছাড়া, চার্চ মিশনের ডা. ফিলিপ্‌সের তত্ত্বাবধানে একটি সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়।[২৫৫] এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষা নিয়ে বেশ ক’জন সেবিকা হেমায়েত বাহিনীর আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সেবা প্রদান করেছিলেন।

উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ব্যতীত এই বাহিনীর বেশ কিছু অস্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল গৌরনদী, উজিরপুর, কালকিনি, রাজৈর প্রভৃতি এলাকায়। এই বাহিনীতে প্রায় ৩৪০ জন সদস্য ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী থেকে আসা। এদের মাধ্যমেই পূর্বোল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সামরিক

প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বাহিনীর পুরো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এ বাহিনীর প্রায় চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।[২৫৬]

হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্রভান্ডারের প্রাথমিক উৎস ছিল হেমায়েত উদ্দিন ও তার সহযোগীদের সাথে থাকা অস্ত্রশস্ত্র। এসব অস্ত্র তারা জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিয়ে এসেছিলৈন। এরপর ৫ মে কোটালীপাড়া থানা দখল করে হেমায়েত উদ্দিন ও তার দল ৩০৩ রাইফেলসহ বেশকিছু হালকা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন। ১৪ মে গৌরনদীর দোনারকান্দি এলাকায় অনিল মল্লিকের (এ যুদ্ধে শহিদ) নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সৈন্যকে আক্রমণ করে ৪ জনকে খতম করা হয় ও প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র হেমায়েত বাহিনীতে জমা করা হয়।[২৫৭] এছাড়া, হেমায়েত বাহিনীতে পাকিস্তানের পক্ষত্যাগকারী যেসব ই বি আর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্য যোগ দিয়ে ছিলেন, তাদের সাথে থাকা অস্ত্র এ বাহিনীর অস্ত্রসামর্থ্য বৃদ্ধি করেছিল। এই অস্ত্রসামর্থ্যের ভিত্তিতে হেমায়েত বাহিনী বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশালের উত্তরাংশের বিভিন্ন থানা দখল করে বহু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে। মূলত থানা দখল ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাপ্ত অস্ত্রই এ বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের প্রধান উৎস ছিল। তবে, ভারত হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে হেমায়েত বাহিনীতে যোগ দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রও এ বাহিনীর অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করেছিল।

আওতাভুক্ত এলাকা

হেমায়েত বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা ছিল বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার উত্তরাংশ। ফরিদপুরের নগরকান্দী, ভাঙ্গা, সদরপুর, চরভদ্রাসন, পুরো মাদারিপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং বরিশালের গৌরনদী, উজিরপুর, বানারিপাড়া এলাকায় এ বাহিনী অপেক্ষাকৃত বেশি সক্রিয় ছিল। এছাড়া, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা বোয়ালমারী নড়াইলের পূর্বাংশ, বাগেরহাটের পূর্বাংশ, পিরোজপুরের কিয়দংশ, পটুয়াখালীর কিয়দাংশে এ বাহিনীর তৎপরতা দেখা যায়।[২৫৮] হেমায়েত বাহিনীর প্রচেষ্টায় অবরুদ্ধ দেশের মধ্যে ই বরিশালের উত্তর-পশ্চিমের আগৈলছাড়া-উজিরপুর থানার পয়সারহাট, বাগদা, সাতলাসহ পার্শ্ববর্তী প্রায় ২০ মাইল এলাকা জুড়ে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। জুন[২৫৯] মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল ঠিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। হেমায়েত বাহিনীর কর্মতৎপরতা সে সমস্ত এলাকায় বিদ্যমান ছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভক্ত ১১টি যুদ্ধ সেক্টরের মধ্যে ২, ৮ ও ৯ নং সেক্টরে হেমায়েত বাহিনী সক্রিয় ছিল।

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

হেমায়েত বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে শতাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।[২৬০] যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এ বাহিনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি তথা ‘আঘাত কর ও সরে পড়’ কৌশল অবলম্বন করেছিল। তাছাড়া, বেশ কয়েকটি যুদ্ধে এ বাহিনী লিপ্ত হয়েছিল সম্মুখ যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে। হেমায়েত বাহিনী কমপক্ষে আঠারটি আক্রমণ পরিচালনা করেছিল পাকিস্তানি সেনাদলের বিরুদ্ধে।[২৬১]

হেমায়েত বাহিনী যেসব এলাকায় সক্রিয় ছিল, সেখানে এ বাহিনীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ১০৭ ব্রিগেড (যশোর) এর একাংশকে মোকাবেলা করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ৯ম পদাতিক ডিভিশনের ১০৭ পদাতিক ব্রিগেডের একাংশকে এ বাহিনী মোকাবেলা করে। এদের সাথে ছিল ইপিসিএফ এর ৫ নং উইং এর একাংশ।[২৬২] যুদ্ধের শেষ দিকে (নভেম্বর) এ সেনাবিন্যাসে কিছুটা বদল হয়ে ৫৭ ব্রিগেড (মেহেরপুর দর্শনা-ফরিদপুর এলাকা) এর একাংশকে হেমায়েত বাহিনী মোকাবেলা করে।[২৬৩] উল্লেখ্য এদের সাথে পূর্বোক্ত ইপিসিএফ এর একাংশ ছিলই পাকিস্তানি সেনাদল ও এর সহযোগী শক্তির উল্লিখিত সেনা বিন্যাস এবং অবস্থানের বিপরীতে হেমায়েত বাহিনীর প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলো ছিল রাজাপুর, রাজাপুর কদমবাড়ি, শৈলদহ চলবল পাড়ে, বার্থী তালুকদার বাড়ি, রথিয়ার পাড়, পোলটানা বাইন বাড়ি, রাধাগঞ্জ সাহা বাড়ি, মাঝবাড়ি হাইস্কুল[২৬৪] এসব ও অন্যান্য ঘাঁটি থেকে হেমায়েত বাহিনী যেসব অভিযান পরিচালনা করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

পয়সার হাট অভিযান[২৬৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২১ মে ভোর ৬টা

অভিযানের উদ্দেশ্য: পয়সার হাটের রাজাপুর গ্রামে হেমায়েত বাহিনীর অস্থায়ী সদর দপ্তর ছিল। পাকিস্তানি সেনাদলের একটি অংশ এই সদর দপ্তর তথা মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করতে এসেছিল। পাকিস্তানি সেনাদলের এই সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করতে মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লিখিত অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রায় অর্থ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি , এসএমজি, চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: রাজাপুর বরিশালের আগৈলঝাড়া থানার পয়সার হাট ইউনিয়নের একটি গ্রাম। পয়সার হাট আগৈলঝাড়ার পশ্চিমে অবস্থিত। পয়সার হাট রাজাপুর এলাকার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নদীর একটি শাখা প্রবাহিত ছিল। এই নদীপথে রাজাপুরের দক্ষিণ দিক থেকে ২১ মে ভোর বেলা একটি গানবোট ও তিনটি লঞ্চে করে শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্যের একটি দল রাজাপুর ঘাঁটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসে। পাকিস্তানি সৈন্যদলের অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে হেমায়েত উদ্দিন তার দলকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। এদের একদল রাজাপুর ঘাঁটির বাঙ্কারে এবং অন্যদল ঘাঁটি থেকে আরো দক্ষিণে গিয়ে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যদল যখণ ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছান তখন ঘাঁটির বাঙ্কার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদেররকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ে থাকেন। এতে পাকিস্তানি সৈন্যদল তাৎক্ষণিক অবস্থান নিয়ে ঘাঁটি লক্ষ করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এভাবে, দুই পক্ষে কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। এই সুযোগে হেমায়েত উদ্দিনের সাথে থাকা অন্য যোদ্ধাদের নিয়ে তিনি পিছন দিক দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ করেন। দুইদিক দিয়ে আক্রান্ত হয়েও গানবোটের সাহায্যে পাকিস্তানি সৈন্যদল প্রায় দেড় ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এরপর থেমে থেমে, আগানো-পিছানো, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ করে উভয় পক্ষ দীর্ঘসময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। বিকাল নাগাদ এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

ফলাফল: পাকিস্তানি সৈন্যদল সাতলা গ্রামের বাঁক ঘুরে পলায়ন করে। তাদের পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব জানা যায় নি। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হন নি। ঘাঁটি সুরক্ষার জন্য সাতলা নদীর বাঁকে একটি পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

কোদাল ধোয়া অভিযান[২৬৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৬ জুন রাত আনুমানিক ১০টা ও ১৭ জুন বিকাল আনুমানিক ৫টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: হেমায়েত বাহিনীর মূল ঘাঁটি কিছুদিন পরপর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো হতো কৌশলগত কারণে। এরই অংশ হিসেবে ১৬ জুন সন্ধ্যা থেকে ঘাঁটি সরিয়ে আনা হয় বর্তমান আগৈলঝাড়ার থানাধীন কোদাল ধোয়া গ্রামে। মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থানান্তরের খবর পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যের একটি দল মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য কোদাল ধোয়া অভিমুখে রওনা হয়। এই অগ্রবর্তী দলকে মুক্তিযোদ্ধারা কোদাল ধোয়া পয়সার হাট এর মাঝামাঝি প্রত্যাঘাত করলে তারা ঐদিন ফিরে যান। কিন্তু পরদিন বিকালে আরো সংহত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদল কোদাল ধোয়া ঘাঁটি আক্রমণের জন্য আসে। তাদেরকে প্রতিহত করতেই মুক্তিবাহিনী কোদাল ধোয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে বাছাইকৃত শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএমজি, স্টেনগান, চাইনিজ রাইফেল ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: কোদাল ধোয়া বর্তমানে বরিশালের আগৈলঝাড়া থানাধীন বাকাল ইউনিয়নের একটি গ্রাম যার পূর্বে আগৈলঝাড়া, পশ্চিমে কোটালীপাড়া, উত্তরে মাদারিপুর ও দক্ষিণে উজিরপুর। এই গ্রামের পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কীর্তনখোলা নদীর একটি খাল বয়ে গেছে। ১৬ জুন এই গ্রামে হেমায়েত বাহিনীর একটি ঘাঁটি স্থাপন করার খবর পেয়ে পাকিস্তানি সেনাদলের একটি অংশ পয়সার হাট-কোদাল ধোয়া পথে অগ্রসর হয়। এই খবর পেয়ে হেমায়েত উদ্দিন কোদাল ধোয়ার মূল ঘাঁটি সংহত করে বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ পয়সার হাটের দিকে কিছুটা এগিয়ে যান। পথিমধ্যেই তার দলের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর আচমকা দেখা হয় এবং বেশ সময় ধরে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যদল স্থান ত্যাগ করলে হেমায়েতের অগ্রবর্তী দলটি মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসে। পরদিন ১৭ জুন বিকালে পাকিস্তানি সেনাদলের চারটি স্পিডবোট কোদাল ধোয়া গ্রামের চারদিক থেকে আক্রমণ চালায়। এই অবস্থায় পূর্ব থেকেই খালের উভয় পাড়ে অবস্থান নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা হেমায়েত উদ্দিনের নির্দেশমতো উত্তর দিক থেকে আসা স্পিডবোটকে প্রথমে আক্রমণ করেন। এতে স্পিড বোটটি অতি দ্রত মাদারিপুরের দিকে চলে যায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ মূল ঘাঁটি থেকে এগিয়ে খালের পাড়ে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি স্পিড বোট এরপর যেদিক দিয়েই ঘাঁটি লক্ষ করে এগিয়ে এগিয়ে ছিল, মুক্তিযোদ্ধারা সেদিক থেকেই অপর পক্ষকে আক্রমণ করেছিলেন। এভাবে দু'পাশে প্রায় দুই ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলে।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলী আক্রমণে দুই দফায় পাকিস্তানি সেনাদল যুদ্ধস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে নয়জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের তরফে কোনো ক্ষতি হয়নি।

টুঙ্গিপাড়া শেখ বাড়ি অভিযান[২৬৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১১ জুলাই ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: টুঙ্গিপাড়া শেখ বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাসদস্য ও মিলিশিয়া রাজাকার মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জনের একটি দল অবস্থান নিয়েছিল মে এর দ্বিতীয় অর্ধের প্রথম দিকে। এই দলের কাছে বন্দি অবস্থায় ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বৃদ্ধ মাতা-পিতা। হেমায়েত বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা শেখ মুজিবের মাতা-পিতাকে মুক্ত করতে ও শেখবাড়ির পাকিস্তানি ক্যাম্প গুড়িয়ে দিতে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে এই বাহিনীকে আটটি কোম্পানির (প্রায় সাড়ে ৮০০) মুক্তিযোদ্ধাগণ এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: টুঙ্গিপাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানাধীন একটি এলাকা ছিল। টুঙ্গিপাড়ার উত্তরে গোপালগঞ্জ সদর ও কোটালীপাড়া, পশ্চিমে ও দক্ষিণে মধুমতি নদী ও পূর্বে কোটালীপাড়া থানার অবস্থান। এই টুঙ্গিপাড়ার সুপরিচিত শেখবাড়ি ১৯৭১ এর ১৯ মে'র পর প্রথম দিকে রাজাকার ক্যাম্প ও ধীরে ধীরে পাকিস্তানি সেনা-মিলিশিয়া-রাজাকার সম্বলিত পাকিস্তানি শক্তিশালী ক্যাম্প পরিণত হয়। এই ক্যাম্প দখলের জন্য হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে শেখবাড়ির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে থেকে প্রায় সাড়ে আটশ মুক্তিযোদ্ধা ১১ জুলাই ভোর বেলা শেখবাড়ির ঘাঁটির আক্রমণ করেন। আচমকা এবং শক্তিশালী আক্রমণে অপর পক্ষ বিচলিত হয় এবং প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক প্রতিরোধের পর পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার দল শেখবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: শেখবাড়ির যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি হয়নি। অপরপক্ষে প্রায় হতাহত হয় এবং প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করেন। যুদ্ধ শেষে শেখ মুজিবের মাতা-পিতাকে নিরাপদে মাদারিপুরের শিবচর ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে শেখবাড়িতে পরের দিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা পুনরায় ক্যাম্প তৈরি করে।

রামশীল অভিযান[২৬৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৪ জুলাই বেলা আনুমানিক ১২টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: গোপন সূত্রে হেমায়েত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আসে যে, ১৪ জুলাই মুক্তিবাহিনীর নতুন সদর দপ্তর মাদারিপুরের কালকিনি থানার চলবলে পাকিস্তানি সৈন্যদল আক্রমণ চালাবেন। এই অবস্থায় হেমায়েত উদ্দিন চলবল ঘাঁটি রক্ষা করতে কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। প্রথমত, চলবল ঘাঁটির মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি থেকে কয়েক মাইল দূরে দূরে ছড়িয়ে দেন। দ্বিতীয়, চলবল ঘাঁটিতে বাছাইকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে চারদিকে বাঙ্কার খুঁড়ে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, ১৩ জুলাই ভোরে টুঙ্গিপাড়ার শেখবাড়ি ও পাটগাতির নূরু চেয়ারম্যানের বাড়িতে থাকা পাকিস্তানি ক্যাম্পে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে অপর পক্ষের প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চলবল ঘাঁটির ওপর পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণের ধার ও শক্তি কমানো। চতুর্থত, চলবল ঘাঁটির উত্তরম দক্ষিণ ও পশ্চিমে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী দল স্থাপন যাতে পথে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদলকে এ্যাম্বুশ করা যায়। এরকমই একটি দল চলবল ঘাঁটির ১ মাইল দক্ষিণে রামশীল গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল কোটালীপাড়া, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী, উজিরপুর হতে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদলকে প্রতিহত করা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে মোট ১৩ জন যোদ্ধা দুটি এলএমজি, পাঁচটি এসএমজি, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: রামশীল গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানাধীন কোটালীপাড়ার পূর্ব সীমান্তে অবস্তিত একটি গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরে মাদারিপুরের কালকিনি, দক্ষিণে বরিশালের আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর। পূর্বে বরিশালের গৌরনদী থানা। এই গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে বয়ে গেছে বিষারকান্দি নদী ও পূর্ব-পশ্চিমে একটি ছোটখাল। এই খাল বেয়ে রামশীল হতে পূর্বে গৌরনদীর বাসাইল গ্রাম হয়ে উত্তরে চলবলের দিকে যাওয়া যায়। এই খাল বেয়ে গৌরনদী থেকে পাকিস্তানি সেনারা আসতে পারে ভেবে পূর্ব দিকে মুখ করে ৩ জন, দক্ষিণ দিকে মুখ করে ৩ জন এবং সংকেত দেবার জন্য বাইরে একজনকে বসানো হলো। এছাড়া, হেমায়েত অবশিষ্ট ৬ জনকে সাথে নিয়ে পশ্চিম মুখী হয়ে বসেছিলেন। কোটালীপাড়া থেকে কান্দাবাড়ি খালের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদল রামশীল আসতে পারে ভেবে তিনি এই অবস্থান নিয়েছিলেন। অত:পর কিছুক্ষণের মধ্যেই

এই পথে অপর পক্ষের অগ্রবর্তী দলকে দেখা গেল। দ্বিতল লঞ্চ যোগে প্রায় শতাধিক সৈন্য হেমায়েতের দলের কাছাকাছি আসামাত্র হেমায়েত এলএমজি থেকে গুলি ছোঁড়েন। এবার দুপক্ষে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়। হেমায়েতের দলের আঘাতে বেশ কয়েক জন পাকিস্তানি সৈন্য তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানি সৈন্যের একটি গুলি হঠাৎ হেমায়েতের সহযোদ্ধা মকবুলের মাথার খুলি ভেদ করে চলে যায়। এতে মকবুল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মকবুলের লাশ টানতে যেতেই একটা শেলের টুকরো হেমায়েতের গালের বাম পাশ দিয়ে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। এতে হেমায়েতের জিহ্বার খানিকটা কেটে যায় ও ১১টি দাঁত পড়ে যায়। তারপরও তিনি পাকিস্তানি সৈন্যের গুলির জবাব দিয়ে যায়। উভয়পক্ষে দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর পাকিস্তানি সৈন্যদল পিছু হটে।

ফলাফল: রামশীল যুদ্ধে ৪০ জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যান এবং তাদের নিকট থেকে ১টি এলএমজি , ১টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, ১২টি চাইনিজ রাইফেল ১ পেটি ৩৬ নং গ্রেনেড, ৩০০০ রাউন্ড গুলিসহ আরো অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা লাভ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ১জন মারা যান ও কয়েকজন আহত হন। গুরুতর আহত হেমায়েতকে কয়েক দফা চিকিৎসা প্রদানের পর মোকসেদপুর থানার বানিয়ার চর চার্চ হাসপাতালে ফাদার ম্যারিনো বিগনের কাছে অস্ত্রোপচার করানো হয়। এই অস্ত্রোপচারের পর তিনি সুস্থ হয়ে যুদ্ধে ফিরে যান।

উল্লিখিত অভিযানগুলো বাদে হেমায়েত বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল কোটালীপাড়া থানা আক্রমণ (মোট পাঁচবার), টেকেরহাট যুদ্ধ, জলিলপাড়ের যুদ্ধ, দিগনগর যুদ্ধ, বাখুন্ডা ব্রিজ যুদ্ধ, কামারখালী ঘাট যুদ্ধ, কটকস্থল যুদ্ধ, মস্তফাপুর যুদ্ধ, পাটগাতি যুদ্ধ, মেয়ারহাট খোলা যুদ্ধ, টিহাটি যুদ্ধ, রাজাপুর যুদ্ধ, হরিণাহাটি যুদ্ধ, ফেনাখালীর করফা যুদ্ধ, বাঁশবাড়িয়া-ঝনঝনিয়া যুদ্ধ, কুরপালা যুদ্ধ, সাতলা-বাগধা যুদ্ধ, নেয়ার বাড়ি যুদ্ধ, মধুমতি নদীর যুদ্ধ, রাজবাড়ির যুদ্ধ, কালিয়া যুদ্ধ, আটঘর কুড়িয়ানার যুদ্ধ, মীরের হাট যুদ্ধ, মাটিভাঙ্গা যুদ্ধ, টরকী গরুর হাট যুদ্ধ, বাটাজোর যুদ্ধ, মাহিলারা যুদ্ধ, নারাট্যকচর যুদ্ধ, মমিয়াগারচর যুদ্ধ, বোয়ালমারী যুদ্ধ, আলফাডাঙ্গা যুদ্ধ, পাংশা যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়া যুদ্ধ, কাশিয়ানী যুদ্ধ, মোকসেদপুর যুদ্ধ, রাজৈর যুদ্ধ, কালকিনি যুদ্ধ, গোসাইর হাট যুদ্ধ, ডামুড্য যুদ্ধ, ভৈদরগঞ্জ যুদ্ধ, সাত পাড়ের যুদ্ধ, চৌধুরী হাটের যুদ্ধ, রার্ধাগঞ্জের যুদ্ধ, কলাবাড়ির যুদ্ধ, মোল্লাহাট নদীপথের যুদ্ধ, বরদিয়া নদীপথেল যুদ্ধ, শিবচর যুদ্ধ, গৌরনদী যুদ্ধ, ভুরঘাটা যুদ্ধ, কসবা যুদ্ধ, উজিরপুর যুদ্ধ, নাজিরপুর যুদ্ধ, চিতলমারী যুদ্ধ প্রভৃতি। এসব যুদ্ধ ছাড়াও এ বাহিনীর যোদ্ধাগণ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় অসংখ্য ডাকাত-লুটেরাকে প্রতিরোধ করেন। আর রাজাকার-দালালদের সাথে খন্ডযুদ্ধ তো প্রায় প্রতিদিনই চলত। এই বাহিনীর আক্রমণের মাধ্যমে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা, টুঙ্গিপাড়া থানা, ভাটিয়াপাড়া থানা, বরিশালের গৌরনদী থানা, মাদারিপুরের কালকিনি থানা ও রাজৈর থানা, নড়াইলের কালিয়া থানা পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত করা সম্ভব হয়। এছাড়া, হেমায়েত বাহিনীর আক্রমণের চাপে ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যগণ গোপালগঞ্জ ত্যাগ করেন।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে হেমায়েত বাহিনীর তরফে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা বা পত্রিকা ছিল না। তবে, এ বাহিনীর সংগঠকগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়মিত জনসংযোগ চালিয়ে যান। এ বাহিনীর সংগঠকদের তৎপরতায় কোটালীপাড়া ও গৌরনদী এলাকায় কয়েকটি জনসভাও আয়োজন করা হয়েছিল।[২৬৯] জনসভা আয়োজন ও বাহিনীর পক্ষে জনসংযোগ চালিয়ে যেতে হরনাথ বাইন এম পি এ, আসমত আলী খান এম পি এ, অ্যাডভোকেট হেমায়েত উদ্দিন, মিহির দাশগুপ্ত, কমলেশ বেদজ্ঞ প্রমুখ কার্যকর ভূমিকা রাখেন। আর তৃণমূল পর্যায়ে বাহিনীর পক্ষে জনসংযোগ বজায় রাখতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বেচছাসেবকগণ।[২৭০]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর শতাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর ২৪ জন সদস্য আহত হন এবং ১৮ জন সদস্য শহিদ হন। এ বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোটালীপাড়া উপজেলার ৭ জন (গোলাম আলী, বেলায়েত আবু তালেব, আবুল খায়ের, মোক্তার হোসেন, রতন কুমার, মোয়াজ্জেম হোসেন), টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ১ জন (বেলায়েত হোসেন), মকসুদপুর উপজেলার ১ জন (আবুল বাশার), বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৪ জন (ছাত্তার মৃধা, সেকেন্দার, নুর বেপারী, পরিমল শীল), আগৈলঝাড়া উপজেলার ১ জন (তৈয়ব আলী), নলছিটি উপজেলার ১ জন (ওসমান), মাদারিপুরের কালকিনি উপজেলার ২ জন (মকবুল হোসেন, আ. ছাত্তার) এবং গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ১ জন (মো. ইব্রাহিম খান) ছিলেন।[২৭১] হেমায়েত বাহিনীর আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম, (কোটালীপাড়া), আলাউদ্দিন (কোটালীপাড়া), আলীউজ্জামান (কোটালীপাড়া), আ. ছাত্তার শাহ (কোটালীপাড়া), সরদার আ. মালেক মিলু (কোটালীপাড়া), মুজিবুল হক (কোটালীপাড়া), সিরাজুল ইসলাম (কোটালীপাড়া), আজিজ বিশ্বাস (কোটালীপাড়া), মনিরুল ইসলাম সেন্টু (ছিন্টু) গৌরনদী)[২৭২]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

হেমায়েত বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এ বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিন ও অন্যান্য শীর্ষ সংগঠকদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের (অঞ্চলভিত্তিক) যোগাযোগ ছিল। যদিও হেমায়েত উদ্দিন মুক্তিযুদ্ধকালে একবারও ভারতে প্রবেশ করেননি, তবুও তিনি সরকারি নির্দেশামতো বাহিনী পরিচালনা করেন। এ বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় ভারতে প্রশিক্ষিত অসংখ্য যোদ্ধা জুলাইয়ের শেষভাগ হতে প্রবেশ করছিল এবং তারা হেমায়েত বাহিনীর সঙ্গে আত্মীকৃত হয়ে গিয়েছিল। নভেম্বর মাসের শেষ নাগাদ এ বাহিনীতে যুক্ত হওয়া এফ এফ কোম্পানি শঙ্কা দাঁড়ায় ১৮টি। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত এসব এফ এফ যোদ্ধাদের হেমায়েত বাহিনীর সাথে মিশে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল। সুতরাং, বাংলাদেশ সরকারের এরকম মনোভাব হেমায়েত বাহিনীর প্রতি পরোক্ষ স্বীকৃতিকে ইঙ্গিত করে। তাছাড়া, হেমায়েত বাহিনীতে ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ দলীয় আচমত আলী খান এম পিএ, বরিশালের উজিপুরের আওয়ামী লীগ নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হরনাথ বাইন এম পিএ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ হেমায়েত বাহিনী সংগঠনের জড়িত ছিলেন। এর ফলে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে হেমায়েত বাহিনী 'হিমু' সাংকেতিক নামে আস্থায় ছিল।

গণমাধ্যমে হেমায়েত বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনীর কর্মকাণ্ড বিশেষ করে যুদ্ধসাফল্য স্বাধীন বাংলা বেতার, বাংলাদেশ সরকারের পত্রিকা, *সোনার বাংলা* ও আরো কয়েকটি পত্রিকায় (পশ্চিম বাংলা রাজ্যের) প্রচারিত হয়। জুলাই মাসের শেষ দিকে এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক হেমায়েত উদ্দিনের সাক্ষাৎকার নেন এবং এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ পত্রিকা 'দি সান' এ ৪ আগস্ট ১৯৭১ হেমায়েত উদ্দিনের ছবিসহ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

হেমায়েত বাহিনীর মাত্র একজন সদস্য বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হেমায়েত উদ্দিন মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। আর এ বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আচমত আলী খানকে (রাজৈর, মাদারিপুর) মুক্তিযুদ্ধসহ সমাজসেবায় অবদানের জন্য ২০১৬ সালে স্বাধীনতা পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয়।[২৭৩]

অস্ত্র সমর্পণ

হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিন প্রায় পাঁচ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট থেকে দখলকৃত ৩টি বড় জাহাজ ও অনেকগুলো লঞ্চে করে ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ ঢাকায় নিয়ে আসেন। এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিউ মার্কেট ও কমলাপুরে রেল স্টেশনের কাছে দুটি ক্যাম্পে করে থাকতে দেওয়া হয়। অবশেষে ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে তারা বঙ্গবন্ধুর নিকট বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ১২ হাজার অস্ত্র জমা দেন।[২৭৪]

মূল্যায়ন

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষত্যাগকারী বাঙালি হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিনের প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া, বরিশালের আগৈলঝাড়া গৌরনদী ও মাদারিপুরের কালকিনি-রাজৈর এলাকায় মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। অতঃপর এ বাহিনী বিস্তৃত হয় বৃহত্তর ফরিদপুর ও উত্তর বরিশালে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই বাহিনী সংগঠনে অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর (আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি) নেতৃবৃন্দ কার্যকর ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের কোনোরূপ সহযোগিতা ছাড়াই সম্পূর্ণ স্থানীয় জনসাধারণের সামর্থ্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে মে মাসের শুরু থেকেই এ বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদল ও তার আঞ্চলিক দালালগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। অবশ্য, জুলাই এর শেষ ভাগ হতে নভেম্বর পর্যন্ত অসংখ্য ভারতে প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা এ বাহিনীতে যোগ দেন। তবুও হেমায়েত বাহিনী অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধের মূল কারিগর। ৩০ এপ্রিল কোটালীপাড়া ডাক বাংলোতে আটক অবস্থায় থাকা ৩৬ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকে মুক্ত করে হেমায়েত তার সঙ্গীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাদের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেন। একাজের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানপন্থি প্রশাসন ও স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। ফলে, উভয়পক্ষে শুরু হয় আঘাত-প্রত্যাঘাত।

হেমায়েত বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে অত্র অঞ্চলের অসংখ্য ডাকাত ও লুটেরাকে হত্যা করার পাশাপাশি বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করেছিল। এর ফলে অত্র এলাকার জনজীবন শঙ্কামুক্ত হয়। এছাড়া, স্থানীয় নানা ধরনের বিবাদ হেমায়েত বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসকদের হস্তক্ষেপে মীমাংসা করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হেমায়েত বাহিনীর বিচার বিভাগ খুব সক্রিয় ছিল এবং একাজে স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের নিরাপত্তার জন্য হেমায়েত বাহিনীর সদস্যরা মে এর শুরু থেকেই স্ব স্ব এলাকার রাজাকার, শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ ও চিহ্নিত এবং নেতৃস্থানীয় দালালদের অনেককে হত্যা করেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত এসব দালালদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল গফুর, সাখাওয়াত হোসেন, আফতাব উদ্দিন। এর ফলে বৃহত্তর ফরিদপুরের দক্ষিনাংশ ও বরিশালের উত্তরাংশে দালালদের তৎপরতা স্থিমিত হয়ে আসে। পাশাপাশি অত্র এলাকায় নতুন সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি করতে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাধাগ্রস্ত হয়। অপর দিকে প্রকাশ্যে বা গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করতে সর্বস্তরের জনতা অনুপ্রাণিত হয়।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সশস্ত্র সহযোগী (এদেশীয় পুলিশ, রাজাকার ও অন্যান্য) শক্তির বিরুদ্ধেও হেমায়েত বাহিনী শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দুই পক্ষে। এতে মুক্তিবাহিনীর প্রায় চল্লিশ জন সদস্য হতাহত হয়। অপরদিকে পাকিস্তানি সেনাসদস্য মিলিশিয়া-পুলিশ-রাজাকার মিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য অপরপক্ষে হতাহত হয়। হেমায়েত বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকায় এমনভাবে আতঙ্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যে,

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফরিদপুরের দক্ষিণ ও বরিশালের উত্তরাংশে দায়িত্ব পালনকারী পাকিস্তানি সেনাসদস্য মিলিশিয়া সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ত্যাগ করে জেলা শহরে চলে আসেন। ফলে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, মাদারিপুরের কালকিনি ও রাজৈর, বরিশালের গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, উজিরপুর এবং নড়াইলের কালিয়া থানা পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত করে। এসব থানা মুক্ত করার পুরো কৃতিত্ব হেমায়েত বাহিনীর।

হেমায়েত বাহিনী নিজ সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করেছিল স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি বিরাট অবদান। কেননা, অবরুদ্ধ দেশে এতো বড় সংখ্যক প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করার ফলে তারা নিজ নিজ এলাকায়ই থেকে যান এবং জনগণের মধ্যেই মিশে থাকেন। এর ফলে নিজ নিজ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা ও যোগাযোগ অবকাঠামোর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে তারা পাকিস্তানি সেনাদলের বিরুদ্ধে তা পুরোদমে কাজে লাগান। এটি দীর্ঘমেয়াদে হেমায়েত বাহিনীর তথা মুক্তিযুদ্ধের জন্য সহায়ক হয়েছিল। এর পাশাপাশি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা জুলাই এর মাঝামাঝি হতে হেমায়েত বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় এসেছিলেন, তারা সবাই শুরু থেকেই একটি নিরাপদ আশ্রয় পান, পান স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন। এ দুটি বিষয়ই সম্ভব হয়েছিল হেমায়েত বাহিনীর কর্মকাণ্ডের কারণে।

হেমায়েত বাহিনীতে প্রায় ছয় হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব ছিল বহুমুখী। বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, আশ্রয়, যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়াদি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাহিনী সৃষ্ট বেসামরিক প্রশাসনের বিবিধ দায়িত্ব মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ। স্বেচ্ছাসেবকগণই ছিলেন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সাথে জনগণের সম্পর্ক নির্মাণের মূল সেতু। এদের প্রচেষ্টাতেই অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত জনযুদ্ধে রূপ পায়।

হেমায়েত বাহিনীর সংগঠকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ জনগণের (মুক্তিযুদ্ধপন্থি) মনোবল ধরে রাখতে কয়েকটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন। এছাড়া, এলাকাভিত্তিতে পথসভা ও উঠানবৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এসব সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ কেন প্রয়োজন, এখানে জনতার ভূমিকা কী হওয়া উচিত, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও সাফল্য, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম, বিদেশীদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বাহিনীর সংগঠকগণ বক্তব্য রাখতেন। এর ফলে জনসাধারণের বড় অংশের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করা সম্ভব হয় এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করাও সম্মব হয়। এরই সাথে হেমায়েত বাহিনীর প্রতি জনগণের সহযোগিতাও বৃদ্ধি পায়।

বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশালের উত্তরাংশের মৃক্তিযুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হেমায়েত বাহিনী যথোপযুক্তভাবে মূল্যায়িত হয়নি বলা যায়। এই বাহিনীর মাত্র একজন মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হেমায়েত উদ্দিন বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। অথচ, এ বাহিনীর আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা খেতাব পাওয়ার উপযুক্ত। এমন অনেকে আছেন যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত নন। এ বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকগণ তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিটুকুও পাননি। এছাড়া, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে এ বাহিনীর উল্লেখ মিলেছে মাত্র। এ বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস সেখানে অনুপস্থিত।

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী

নরসিংদী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ঢাকা বিভাগের নরসিংদী মহকুমার শিবপুরকে ঘিরে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে স্থানীয়ভাবে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন বাহিনী ধীরে ধীরে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[২৭৫] আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার জন্ম ১৯৪৩ সালের ৩ জানুয়ারি বর্তমান নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার মাসিমপুর গ্রামে। তার পিতার নাম আব্দুল হাই ভূঁইয়া ও মাতার নাম রহিমা খাতুন। মান্নান ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ পাস করে পুরোদস্তুর রাজনীতিতে যোগ দেন। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে তিনি খুবই সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। এছাড়া গোপনে তিনি অন্যান্য কমিউনিস্ট আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজ এলাকা শিবপুর ও পার্শ্ববর্তী রায়পুরা-মনোহরদী এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেন। এই মুক্তিদলে শুরুর দিকে বামপন্থি দের আধিক্য থাকলেও তারা কোনো দলীয় আদর্শের অধীন বা নিয়ন্ত্রণে থেকে নয় বরং জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। মান্নান ভূঁইয়া ছিলেন এই মুক্তিদলের বেসামরিক ও রাজনৈতিক প্রধান।[২৭৬] ছাত্রাবস্থায় মান্নান ভূঁইয়া পূর্বোল্লিখিত অঞ্চলে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবকদের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। ঐ নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করেই তিনি ১৯৭১ এ মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।[২৭৭]

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ-কাপাসিয়া আসনে তাজউদ্দিন আহমেদ (এমএনএ), শিবপুর-মনোহরদী আসনে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান (এমএনএ), নরসিংদী-রায়পুরা আসনে আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া (এমএনএ), কালীগঞ্জ আসনে ময়েজ উদ্দিন আহমেদ (এমপিএ), নরসিংদী আসনে মোছলেহ উদ্দিন ভূঁইয়া (এমপিএ), মনোহরদী আসনে শাহাবুদ্দিন আহমদে (এমপিএ), রায়পুরা আসনে রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু (এমপিএ) শিবপুর আসনে শামসুদ্দীন ভূঁইয়া (এমপিএ) আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন।[২৭৮] এ নির্বাচনে পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে সারাদেশের মানুষের মত নরসিংদীর জনগণও সন্দিহান ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭১-এর মার্চের ৩ তারিখ থেকে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তা নরসিংদীতেও প্রভাব ফেলে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী নরসিংদী থানায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন প্রবীণ ন্যাপ নেতা আবুল হাসিম মিয়া ও সদস্য সচিব ছিলেন মোছলেহ উদ্দিন ভূঁইয়া (এমপিএ)। পরিষদের সদস্য হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া, মতিউর রহমান ভূঁইয়া , ন্যাপ নেতা আতাউর রহমান ভূঁইয়া, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২৭৯] মওলানা ভাসানীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ন্যাপ-এর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত শিবপুর থানার সার্বিক প্রস্তুতি চলতে থাকে ন্যাপ নেতা আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে। পাশাপাশি জনাব শামসুদ্দিন ভূঁইয়া (এমপিএ), রবিউল আউয়াল কিরণ ও ফটিক মাস্টারের নেতৃত্বে চলতে থাকে আওয়ামী লীগের তৎপরতা।[২৮০]

যদিও আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি ছিল শিবপুরসহ পুরো নরসিংদী এলাকা, তবুও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সকল সিদ্ধান্ত এসব এলাকায় সর্বসম্মতভাবে পালিত হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিরোধিতাকারী ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় স্বাধীনতার আহ্বান জানান।[২৮১] তারও পূর্বে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি' গঠন করা

হয় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুব উল্লাহ, মান্নান ভূঁইয়া, হায়দার আকবর খান রনো, প্রমুখ এই সংগঠনের নেতাকর্মী। কাজী জাফরের নেতৃত্বে আর একটি সংগঠন 'বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রায় ২ লক্ষ জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের ঘাঁটি গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।[২৮২] এই সভায় যোগদানকারী শ্রমিক-কৃষকের স্লোগান ছিল, 'শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধরো-পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো', 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করো, কায়েম করো'।[২৮৩] সে মতে মান্নান ভূঁইয়া শিবপুরে নানা কর্মসূচি পালন করতে থাকেন।

১৯৭১-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক চলছিল। 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র মূল নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক' সময় ক্ষেপণমাত্র। সে কারণে তারা একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। পরিকল্পনা মোতাবেক যুদ্ধ শুরু হলে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া নরসিংদীর শিবপুরে অবস্থান করে সমন্বয় করবেন। রনো, মেনন, মাওলানা ভাসানীর নির্দেশনা আনতে টাঙ্গাইল যাবেন। কাজী জাফর যাবেন নিজ এলাকা কুমিল্লার চিওড়ায় এবং হায়দার আনোয়ার খান জুনো যাবেন মৌলভীবাজারের হাওর অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে। পরে সবাই একত্রিত হবেন শিবপুরে।[২৮৪] এদিকে ঢাকায় ফেব্রুয়ারিতে যখন পুরোদমে পাকিস্তানি শোষণবিরোধী আন্দোলন চলছে তখন শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়া, মান্নান খান, আওলাদ হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, রশিদ মোল্লা, আবুল হারিছ রিকাবদার, প্রমুখের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় শিবপুর হাই স্কুল মাঠে চলছে তাদের দলের কর্মীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। এসময় স্থানীয় থানার পুলিশের নিকট থেকে অস্ত্র এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, প্রশিক্ষণের পর সেগুলো আবার থানায় ফেরত পাঠানো হতো।[২৮৫] আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া মার্চের ২৩ তারিখ রাতে ঢাকা থেকে শিবপুরে চলে আসেন। ২৫ মার্চ শিবপুর হাই স্কুল মাঠের জনসভায় তিনি স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[২৮৬] ঐ ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা প্রচারিত হওয়ার পর সংগ্রাম কমিটির অধিকাংশ নেতা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।[২৮৭] এ অবস্থায় শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

সংগঠন

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া শিবপুরে এসে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র নেতৃবৃন্দ ও 'কৃষক সমিতি'র নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়।[২৮৮] ২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে মর্মে খবর প্রচারিত হলে শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় ও মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৮৯] ২৭ মার্চে ও পরের কয়েকদিনে মান্নান ভূঁইয়ার আশ্রয়ে অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পৌঁছলে পুনরায় সভা করে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য করণীয় ঠিক করা হয়। উল্লিখিত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড করা হয়:[২৯০]

(ক) আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার একক রাজনৈতিক নেতৃত্বে শিবপুরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

(খ) ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে এই প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য কর্মীদের ভারতে প্রেরণ করা হবে।

(গ) বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারের সদস্য যারা ছুটিতে বা অবসরে বাড়িতে আছেন, তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা হবে, ইত্যাদি।

এভাবেই ধীরে ধীরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুরা অঞ্চলে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে উঠেছিল। অনেকের মতে এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার। এ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক হিসেবে যাদের কথা জানা যায় তার তালিকা নিম্নরূপ: [২৯১]

সংগঠকগণের নাম

নং	ইাম	দায়িত্ব	গ্রামের নাম
১.	আবদুল মান্নান ভূইয়া	প্রধান সংগঠক	মাছিমপুর
২.	মো. ফজলুর রহমান (ফটিক মাস্টার)	সংগঠক	গোবিন্দপুর
৩.	মো. আব্দুর রব খান	সংগঠক	চক্রধা
৪.	আবু হারিছ রিকাবদার	সংগঠক	ধানুয়া
৫.	ইদ্রিছ আলী মাস্টার	সংগঠক	বৈলাব
৬.	তোফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া	সংগঠক	আশ্রাফপুর দিঘির পাড়
৭.	আবদুল মান্নান	সংগঠক	সাধারচর
৮.	আলী আকবর খলিফা	সংগঠক	যোশর
৯.	আ. ওহমান	সংগঠক	ছুটাবন্দ
১০.	কফিল উদ্দিন ডাক্তার	সংগঠক	সৃষ্টিগড়
১১.	মতিউর রহমান	সংগঠক	গোবিন্দপুর
১২.	সাজু খান	সংগঠক	মানিকদি
১৩.	মোজাম্মেল হক	সংগঠক	হরিয়া
১৪.	বাসির উদ্দিন ভূঁইয়া	সংগঠক	দত্তের গাঁও
১৫.	আ. খালেক	সংগঠক	বিলসরণ
১৬.	শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া	সংগঠক	চৈতন্যা
১৭.	রকিব উদ্দিন মোল্লা	সংগঠক	সৃষ্টিগড়
১৮.	মেজবাহ উদ্দিন চেয়ারম্যান	সংগঠক	চৈতন্যা
১৯.	হাবিবুর রহমান	সংগঠক	সাধারচর
২০.	আবছার আলী সরকার	সংগঠক	ধানুয়া
২১.	তোফাজ্জল হোসেন	সংগঠক	কুতুবের টেক
২২.	বাবু রবীন্দ্র চন্দ্র দাস	সংগঠক	কামরাব
২৩.	মোখলেছুর রহমান	সংগঠক	... ...
২৪.	মতিউর রহমান	সংগঠক	মানিকদি
২৫.	চুন্নু মাস্টার	সংগঠক	... ...
২৬.	আ. জলিল	সংগঠক	চাঁদপাশা
২৭.	মো. সামসুদ্দিন ভূঁইয়া	সংগঠক	জয়নগর
২৮.	মো. রবিউল আউয়াল খান কিরণ	সংগঠক	মজলিশপুর

মান্নান ভূঁইয়া ছিলেন এ দলের বেসামরিক প্রধান। তার অধীনই সামরিক শাখা পরিচালিত হয়েছিল। মান্নান ভূঁইয়ার হেড কোয়ার্টার ছিল শিবপুরের বিলশরণ গ্রামের খালেকের বাড়ি বা খালেকের ট্যাক। তবে কৌশলগত প্রয়োজনে হেড কোয়ার্টার মাঝে মাঝে পাল্টাতো।[২৯২] ভূঁইয়া বাহিনীর বেসামরিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো, অত্র

অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা, একটি কার্যকর সরকারের অনুপস্থিতিতে এলাকার বেসামরিক প্রশাসন চালু রাখা, মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রভৃতি। মান্নান ভূঁইয়া উল্লিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন যুদ্ধের পুরো সময় ধরে।[২৯৩] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর একটি চিকিৎসক দল ছিল। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থক ডা. রমিজ। এছাড়া চিকিৎসা সহকারীর ভূমিকায় ছিলেন ডা. জামাল উদ্দিন। এছাড়াও ডা. আজিজ এবং ডা. সুলতানা (পলি ক্লিনিক, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা) ও শিবপুর থানা চিকিৎসা কেন্দ্র থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল।[২৯৪]

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করা হতো। স্থানীয় অথবা ক্যাম্পের মাধ্যমে কোন প্রকার চাঁদা বা সহযোগিতা সংগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। এসব প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব পালন করতেন মান্নান ভূঁইয়া ও তার কয়েকজন নির্দিষ্ট সহযোগী।[২৯৫] এছাড়া, শিবপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মুক্ত এলাকার প্রশাসন, বিচার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ছিল মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে। এসব অঞ্চলের মানুষকে ডাকাতি ও অন্যান্য উপদ্রব থেকে রক্ষা করার কাজ করেছিল মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী।[২৯৬] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সামগ্রিক যোগাযোগের প্রয়োজনে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জহির রায়হানের মালিকানাধীন গাড়িটি ব্যবহৃত হতো।[২৯৭]

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সামরিক সংগঠনটি ছিল মান্নান ভূঁইয়ার সার্বিক পরিচালনায়। শিবপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে সামরিক সংগঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মূলত অঞ্চলটি নদী বিধৌত। শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনা ও কলাগাছিয়া নদী অত্র অঞ্চলকে জালের মতো ঘিরে রেখেছে। ফলে, তখন এ অঞ্চলে যাতায়াতের প্রধান পথই ছিল নদীপথ। এছাড়া নরসিংদী সদর হতে রায়পুরার উপর দিয়ে চলে গেছে রেলপথ। এখানে শিবপুর ও বেলাবো অঞ্চলটি ছোটো ছোটো টিলা ও বন-জঙ্গলময়।[২৯৮] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অত্র এলাকায় নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বিভাজন করা হয়েছিল।[২৯৯]

কমান্ডের নাম	**ক্যাম্প**	**কমান্ড এলাকা**
আবদুল মান্নান খান	প্রথমে যোশরে পরে-কোদালকাটা। অবশেষে-কামরাবো	যোশর, রাধাগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা; পরে শিবপুর পূর্ব
মজিবুর রহমান	দরিপুরা, কামরাবো পরে সাধারচর	শিবপুর পশ্চিম ও কালীগঞ্জ থানার অংশবিশেষ
মজনু মৃধা	কামরাবো	শিবপুর দক্ষিণ ও অন্যান্য থানায় সম্মিলিত অপারেশনে
তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক	দত্তের গাঁও, মিয়ার গাঁও	শিবপুর পশ্চিম
আওলাদ হোসেন বিএসসি	সৃষ্টিঘর, বিরাজনগর	শিবপুর দক্ষিণ
আবদুর রশীদ মোল্লা	কামরাবো	শিবপুর পূর্ব ও রায়পুরার কিয়দংশ
আবদুল আলী মৃধা	ঘুর্ণায়মান	রায়পুরা ও শিবপুর
বদরুজ্জামান সেন্টু মোল্লা	ঘুর্ণায়মান	রায়পুরা ও শিবপুর
নূরুল ইসলাম কাঞ্চন	ঘুর্ণায়মান	যোশর ও রাধাগঞ্জ

উল্লেখ্য এই বিভাজনে কোন সুস্পষ্ট এলাকা বা সীমানা অনুসরণ করা হয়নি। অনেকটা অবস্থাগত কারণে এবং কাজের ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে তা করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সব গ্রুপ একত্রে কাজ করেছে এবং এক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হয়েছে। এই কমান্ড ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ[৩০০]:

কমান্ড হাইয়ারার্কি

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া — সার্বিক দায়িত্ব ও পরিচালনা

↓

আবদুল মান্নান খান — শিবপুর থানা কমান্ডার ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ

↓

মুজিবুর রহমান — ডেপুটি কমান্ডার

↓

গ্রুপ-কমান্ডারগণ

↓

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
মজনু মৃধা	সেন্টু মোল্লা	আওলাদ হোসেন খান বিএসসি	ঝিনুক খান	আব্দুর রশিদ মোল্লা	আবদুল আলী মৃধা	নুরুল ইসলাম কাঞ্চন

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর অধীন অন্যান্য গ্রুপ কমান্ডারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মো. হায়দার আনোয়ার খান ঝুনো (গ্রুপ কমান্ডার ধানমন্ডি, ঢাকা), মো. নুরুল হক (গ্রুপ কমান্ডার, হারিসাঙ্গান), মো. ইয়াসিন (গ্রুপ কমান্ডার, লালখার টেক), মো. মিজানুর রহমান (গ্রুপ কমান্ডার, লালখার টেক), মো. আ. হাই (গ্রুপ কমান্ডার, জয়মঙ্গল), মো. সাদেকুর রহমান (গ্রুপ কমান্ডার, সাতপাইকা), মো. মোক্তার হোসেন (গ্রুপ কমান্ডার, পুটিয়া), মো. মতিউর রহমান মজনু (গ্রুপ কমান্ডার, জয়মঙ্গল), মো. জহিরুল ইসলাম ভূইয়া (গ্রুপ কমান্ডার, চৌপট), এ বি এম ওসমান গণি (সেকশন কমান্ডার, দুর্বাটি), আজিজুল হক কাঞ্চন (সেকশন কমান্ডার), মো, মিন্নত আলী (সেকশন কমান্ডার), মো, আব্দুল মান্নান (সেকশন কমান্ডার, খিলপাড়া), মো. নজরুল্ ইসলাম (সেকশন কমান্ডার, ভোলাব)[৩০১]

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের অবস্থান ছিল দড়িপুরা (ফৈজার ট্যাক, মহির ট্যাক, নাজিম উদ্দিনের বাড়ি), জয়নগর (দত্তের গাঁও), যোশর (মুরগীবেড়), কামরাবো (নৌকাঘাটা), কোদালকাটা (সাধার চর), ইটনা (চান্দার ট্যাক),আশ্রাফপুর, সোনাই মুড়িরটেক, চৈতন্যা, জয়মঙ্গল, সৃষ্টিগড়, কুন্দারপাড়া, শিবপুর হাই স্কুল ইত্যাদি স্থানে।[৩০২] এসব ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেন আব্দুর রব খান, তোফাজ্জল হোসেন, আবু হারিছ রিকাবদার (কালা মিয়া), শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, ডা. রমিজ উদ্দিন, যোশরের খালেক, নূরুল ইসলাম মাস্টার, আবদুল ফকির, কামরাবোর রণজিৎ, বাসু, জয়নগরের মোতালিব, সুলতান মোল্লা প্রমুখ।[৩০৩] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী ছাড়াও নরসিংদীতে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদস্য সিরাজউদ্দিন আহমেদের প্রচেষ্টায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে ৩ নং সেক্টর থেকে তাকে নরসিংদী সদর থানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার এরিয়া কমান্ডার করা হয়। নেভাল সিরাজ ও তার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা দল যদিও সেক্টর কর্তৃপক্ষের সামরিক নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, তবে এই মুক্তিদল প্রকৃতপক্ষে মান্নান ভূঁইয়ার রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের অধীন ছিল।[৩০৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নরসিংদীর শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী, বেলাবো, পলাশ এলাকায় ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মহকুমায় মান্নান ভূঁইয়ার দল বাদেও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দল সেপ্টেম্বর মাস থেকে কার্যক্রম চালিয়েছিল। তবে ৪ এপ্রিল থেকে নরসিংদী অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান যিনি ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৩০৫] কিন্তু নরসিংদীতে প্রকৃত অর্থে অন্যান্য বাহিনী তথা এফএফ, বিএলএফ যোদ্ধাদের আগমন ঘটে সেপ্টেম্বর মাসে।[৩০৬] এসব দলের যোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজনে মান্নান ভূঁইয়ার সাথে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলের আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।[৩০৭] পরবর্তীকালে ৩নং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সফিউল্লাহ আব্দুল মান্নান খানকে শিবপুর থানার কমান্ডার নিয়োগ করায় অত্র অঞ্চলে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর কার্যক্রম চালানো আরও সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে।[৩০৮]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই শিবপুর পাইলট হাই স্কুল মাঠে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা মান্নান খানের নেতৃত্বে হারিস মোল্লার নিকট যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে।[৩০৯] এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হত শিবপুর থানার রাইফেল ব্যবহার করে। থানার ওসি বজলুল হক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩১০] কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আশ্রাফপুরে। এখানে আব্দুর রব খান, তোফাজ্জল হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন ভূঁইয়া, আবু হারিছ রিকাবদার (কালা মিয়া), আওলাদ হোসেন খান প্রমুখ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৩১১] এছাড়া, মান্নান ভূঁইয়া তাঁর বাহিনীর দুটি দলকে মে এর মাঝামাঝি ও জুন মাসের প্রথমদিকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মেলাঘরে পাঠান। অবশেষে হায়দার আনোয়ার খান জুনোর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নির্ভয়পুর ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুবের সহায়তায় মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি সহজ হয়।[৩১২] এই ধারাবাহিকতায় জুন মাসের মাঝামাঝি বারো জনের আরেকটা দল নির্ভয়পুর ক্যাম্পে আসে। এই দলে ছিলেন নুরুল হক, জসীমউদ্দিন, সুলতান উদ্দিন, মাহবুব মোর্শেদ, রমিজউদ্দিন, আকিল, গিয়াসউদ্দিন, ফজলুল হক, সাহাবউদ্দিন, প্রমুখ।[৩১৩] ভারতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনী মূলত নিজেদের গড়ে তোলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিত। মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে স্থানীয়ভাবে এ বাহিনী সহস্রাধিক প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ শিবির ছিল দড়িপুরার মাহির ট্যাক গ্রামে। এছাড়া, ফৈজার ট্যাক, নাজিম উদ্দিনের বাড়ি ছিল দড়িপুরার অন্য দুটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। এর বাইরে দত্তেরগাঁও, জয়নগর, যোশর, কামবারো, নৌকা ঘাটা, কুদালে কাটা, সাধারচর, ইটনা, চান্দার ট্যাক, সৃষ্টিঘর, বিরাজনগর ইত্যাদি গ্রামে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের কমান্ডারগণ প্রশিক্ষণ কার্য সম্পন্ন করতেন।[৩১৪] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের প্রথম উৎস ছিল শিবপুর থানার অস্ত্র। প্রশিক্ষণের জন্য শিবপুর থানা থেকে ইতোমধ্যে সংগৃহীত রাইফেলগুলোর বেশিরভাগ যুদ্ধ শুরু হলে মান্নান ভূইয়া বাহিনীর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৩১৫] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী আরো অস্ত্র পেয়েছিল সিরাজউদ্দিন আহমেদ বা ন্যাভাল সিরাজের নিকট থেকে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই ডেমরা ও পাঁচদোনার প্রতিরোধ যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য ও ইপিআর সদস্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের একটি অংশ ন্যাভাল সিরাজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি এলএমজি, ৩০/৪০ রাইফেল, বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ স্টেনগান, অসংখ্য গ্রেনেড, প্রচুর গোলাবারুদ মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনীর হাতে আসে।[৩১৬] এছাড়া, মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সদস্য মজনু মৃধা একজন ই পি আরের নিকট থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটি এসএমজি ও ২টি গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন কিনে এনেছিলেন।[৩১৭] এছাড়া, মান্নান ভূঁইয়া স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাকাতদের নিকট থাকা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন।[৩১৮] তাছাড়াও যুদ্ধকালে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর পালিয়ে আসা সদস্যদের কাছে থাকা অস্ত্রশস্ত্রও এ বাহিনীর অস্ত্রসম্ভার গড়ে

তুলতে সহায়ক হয়েছিল। এর বাইরে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সদস্য যারা প্রশিক্ষণ নিতে ভারত গমন করেছিলেন, তারাও ফেরার পথে কিছু কিছু অস্ত্র এনেছিলেন। মেলাঘর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসন বামপন্থি দের প্রতি একটি নেতিবাচক মনোভঙ্গী পোষণ করলেও এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন মাহবুবের সহায়তায় কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।[৩১৯] তাছাড়া, বাহিনীর অস্ত্রের একটি অন্যতম উৎস ছিল শত্রুপক্ষের অস্ত্র। দুই পক্ষের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিল।

আওতাভুক্ত এলাকা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নরসিংদীতে মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থে সংগঠিত হয় আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার হাত ধরে শিবপুরে। কিন্তু অচিরেই শিবপুর বাদেও মনোহরদী, রায়পুরা, কালীগঞ্জ, নরসিংদী এলাকার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু লোকজন মান্নান ভূঁইয়ার সাথে যোগাযোগ শুরু করেন।[৩২০] মান্নান ভূঁইয়াও তার বাহিনীর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করতে থাকেন। ১৯৭১ এর আগস্ট পর্যন্ত এ বাহিনীর কর্মকাণ্ড ঢাকার তারাবো থেকে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩২১] কেননা, আগেই বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত সময়ের পূর্ব পর্যন্ত এসব অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত বা এফ এফ অথবা, বি এল এফ যোদ্ধাগণ এসে পৌঁছেনি। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর কার্যক্ষেত্র ছিল নরসিংদী সদর, শিবপুর, রায়পুরা, কালীগঞ্জ, বেলাবো, পলাশ, মনোহরদী এলাকা জুড়ে। তাছাড়া, মাঝে মধ্যেই এই বাহিনী কৌশলগত কারণে ঢাকার ডেমরা, গাজীপুরের কাপাসিয়া, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি, ভৈরব অঞ্চল পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিল।[৩২২]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

নরসিংদীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল নরসিংদী স্টেডিয়ামে। তাছাড়া, প্রত্যেক থানায় তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। তবে, রায়পুরা, বেলাবো ও পলাশ থানায় তাদের স্থায়ী ক্যাম্প ছিল। শিবপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদল পুটিয়া বাজার এলাকায় এবং শিবপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে।[৩২৩] পাকিস্তানি বাহিনীর যোগাযোগ ও পরিবহন ছিল মূলত রেলপথ ও সড়কপথে। পাকিস্তানি সৈন্যদল ঘোড়াশাল-ভৈরব ও নরসিংদী সদর রায়পুরা রেল রুটে রেলপথে ও নরসিংদী

থেকে অন্যান্য থানায় কাঁচা রাস্তা ব্যবহার করে যাতায়াত করত। এই প্রয়োজনে তারা সব রেলসেতু ও সড়কসেতুতে পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। এর মধ্যে, শিবপুর থেকে রায়পুরার সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল পাহাড়ি টিলা ও জঙ্গল। সাধারণভাবে, নদীপথই ছিল অত্র এলাকার যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ ও উপযুক্ত মাধ্যম।[৩২৪] অন্যদিকে শিবপুর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় মান্নান ভূঁইয়া বহিনীর যোদ্ধাগণ অবস্থান করতেন গ্রামে গ্রামে ও দুর্গম অঞ্চলে। মাটির কাঁচা রাস্তা ও নৌপথে চলাচল করতে তাদের অসুবিধা হত না। উপরন্তু, বেশিরভাগ যোদ্ধা স্থানীয় হওয়ায় এসব রাস্তাঘাট ও নৌপথ তাদের পরিচিত ছিল। তদুপরি, আগস্ট ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ করে শিবপুরে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এদেশীয় দালাল (রাজাকার-আল বদর) ও অন্যান্য সহযোগী শক্তি সক্রিয় হতে না পারায়, অত্র অঞ্চলে মান্নান ভূইয়া বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনা করতে ও এলাকায় অবস্থান করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।[৩২৫]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী স্থানীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে মূলত যুদ্ধ করেছিল। তাদের কৌশল ছিল শত্রুসৈন্যকে ছোটখাটো আক্রমণের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখা, তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা, চোরাগোপ্তা হামলা করে শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করা। শত্রুবাহিনীকে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী এই বোঝাতে চেয়েছিল যে, মুক্তিবাহিনী সর্বত্রই সক্রিয়।[৩২৬] তবে, প্রয়োজনে এ বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য মতে, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের সাথে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী প্রায় ত্রিশটি ছোট বড় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই সব যুদ্ধের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরা হল।

বান্দাইদ্যা অভিযান[৩২৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: এপ্রিলের ৭/৮ তারিখ দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি বাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদের (শিবপুরের) উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য এ অভিযান।

যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র: মজনু মৃধা, হারুন, সাঈদুর, এমএস ভূঁইয়াসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, ৩০৩ রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: পাকিস্তানি সৈন্যদল এদিন শিবপুরে এসে গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। এই দল চক্রধা গ্রামের যুবকদেরকে প্রচণ্ড নির্যাতন করে। এই খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা শিবপুরের বান্দাইদ্যার ব্রিজ এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদলকে এ্যাম্বুশ করার জন্য অবস্থান নেন। শিবপুর বাজার থেকে নরসিংদী ফেরার পথে বান্দাইদ্যার ব্রিজ এক কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন করা শেষে পাকিস্তানি সৈন্যগণ যখন নরসিংদী ফেরার জন্য বান্দাইদ্যা ব্রিজের কাছে পৌঁছে, তখন মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে এ্যাম্বুশ করেন। আচমকা এই আক্রমণে হতবুদ্ধ পাকিস্তানি সৈন্যরা কোনোরূপ প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাননি। তাদের পক্ষ থেকে সংগঠিত কোনো জবাব আসার পূর্বেই মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

ফলাফল: পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েক জন সদস্য আহত হন। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে, মুক্তিযোদ্ধাদের এই অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী দিন পাকিস্তানি সৈন্যরা বান্দাইদ্যা এলাকায় সাধারণ মানুষকে অকথ্যভাবে নির্যাতন করে এবং ‘পোড়ামাটি নীতি’ বাস্তবায়ন করে।

পুটিয়ার ব্রিজ অভিযান[৩২৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন ভোর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: নরসিংদী থেকে শিবপুর আগমনের পথে পুটিয়া নামক স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পুটিয়া ব্রীজটি অবস্থিত। পুটিয়া ব্রীজ এলাকায় দখলদার পক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা এবং ব্রিজ ধ্বংস করে তাদের যাতায়াত পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র : হাবিলদার মজনু মৃধা, আব্দুল মান্নান খানের নেতৃত্বে হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আমজাদ, মিলন, ফজলু, বেনু, আফতাব, ইয়াসিন, হাবিবুর রহমান, আব্দুল মান্নান খান, আবুল ফয়েজ, নূরুজ্জামান, মানিক, মাহতাব, ইদ্রিস, হয়রত আলী ও মিজানসহ সর্বমোট ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। তাদের কাছে ১টি এলএমজি, ২টি এসএমজি, আর ১৫টি ছিল ৩০৩ রাইফেল। সাথে ছিল ১টি এ্যান্টি ট্যাংক মাইন, কয়েকটা হ্যান্ড গ্রেনেড, কিছু প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ এবং ছিল কয়েক ফুট দীর্ঘ ফিউজ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিলদার মজনু মৃধার নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা সিদ্ধান্ত নেয় পুটিয়া ব্রিজ ধ্বংস করে পাকিস্তানি বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন করার। সাধারণত এ্যান্টি ট্যাংক মাইন দিয়ে ব্রিজ উড়ানো যায় না। তারপরেও এই মাইনটার ফিউজ খুলে ভিতরে ঢুকানো হলো প্লাষ্টিক এক্সপ্লোসিভ্‌স এবং ডেটোনেটর এর সাথে ফিউজ দিয়ে বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। মাইনটি ব্রিজের নিচের দিকে একটা পিলারে বসানো হয় এবং তারপর দেয়া হয় অগ্নিসংযোগ। কিন্তু দেখা গেল ফিউজ জ্বলে নাই। ফলশ্রুতিতে প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার অগ্নিসংযোগ করাতে প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ব্রিজটা সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যৎসামান্য এই ক্ষতি ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচলে কোনো প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিজ উড়ানোর দায়িত্ব ছিল ঝিনুক ও জুনোর এবং হাবিলদার মজনু মৃধা পুরো অপারেশনের নেতৃত্ব দেয়। ইতোমধ্যে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। বিস্ফোরণের শব্দে লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে গেলে আশেপাশের গ্রামের অসংখ্য লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিজটিকে পুরোপুটি অকেজো করার জন্য হাতুড়ি, কোদাল, শাবল, বল্লম নিয়ে ব্রিজটি ভাঙার কাজে লেগে যায়। আধা ঘণ্টার মধ্যেই সকলে ব্রিজটির মাঝ অংশ ভেঙ্গে বিছিন্ন করে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে গ্রামের লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আবেদন জানায় তাদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধারা জানতো সেতু ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে শত্রু ঘটনাস্থলে আসবে, সেজন্য তারা একই জায়গায় দ্বিতীয় অপারেশন পরিকল্পনা করে এবং অ্যামবুশ অবস্থান গ্রহণপূর্বক অপেক্ষা করতে থাকে। রাস্তার পশ্চিম পাশে এলএমজিসহ কয়েকজন একটি বট গাছের নীচে এবং রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে প্রায় ১২ জন যোদ্ধা এ্যাম্বুশে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধারণা অনুযায়ী সকাল দশটার দিকে নরসিংদী থেকে শত্রুর ৬টি ট্রাকের একটি শক্তিশালী সুসজ্জিত বহর পুটিয়ার দিকে আসতে থাকে। শত্রুরা চলন্ত গাড়ী থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে বিনা বাঁধায় এগিয়ে আসছিল। মুক্তিযোদ্ধারা নিঃশব্দ অপেক্ষায় এবং পূর্বেই নির্দেশ ছিল হাবিলদার মজনু মৃধা প্রথম ফায়ার ওপেন করবেন। পাকিস্তানি সেনারা পুরোপুরি এ্যাম্বুশ এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র মজনু মৃধা তার এলএমজি দিয়ে ফায়ার করেন। সাথে সাথে গর্জে উঠে পনেরোটা রাইফেলসহ দুটো এসএমজি। প্রায় আধাঘণ্টা গুলিবিনিময়ের পর যখন কিছুটা নিস্প্রভ মনে হয় ঠিক তখন মজনু মৃধা সহযোদ্ধাদের অবস্থান দেখার জন্য নীচু হয়ে এগুতে থাকে। ফজলুর নিকট যাওয়ার সাথে সাথে সে উত্তেজিত হয়ে লাঠিয়ে উঠে এবং দাড়িয়ে বলে, “মজনু মামু, আমি একাই তিনটাকে শেষ করছি।” আর তক্ষুণি একটি গুলি তার পিঠে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে ফজলু। আবারও গোলাগুলি তীব্র আকার ধারণ করে। মজনু মৃধার নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা মরণপণ লড়তে থাকে। ফজলুকে অনতিদূরে একটি স্কুলগৃহের বেঞ্চে শোয়ানো হয়। অবিরাম রক্ত পড়তে থাকে শহীদ আসাদ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ফজলুর

রহমানের দেহ থেকে। তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়ার পথে ফজলু মারা যায়। হাবিলদার মজনু মৃধার দলটি যখন গঠন করা হয়, ফজলুর রহমান ফজলুকে তখন এ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারেনি এ যুবক। অনেকটা জোর করেই নিজকে দলে ভেড়ায় ফজলু। অবশেষে ইচ্ছা পূরণ হল এ স্বেচ্ছা সৈনিকের। শিবপুরের সম্মুখ যুদ্ধের প্রথম শহীদ ফজলুর রহমান। পুটিয়া এ্যাম্বুশে পাকিস্তানি বাহিনীর এক জন অফিসার (ক্যাপ্টেন) ও একজন সুবেদারসহ একত্রিশ জন সৈন্য নিহত হয়। নিহত পাকিস্তানি অফিসার ক্যাপ্টেন সেলিম ও সুবেদার ইস্কান্দারের সামরিক ব্যাজ ও পরিচয়পত্র ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। শত্রুর অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে মুক্তিযোদ্ধারা।

ফলাফল: যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ৩১ জন সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর ১ জন নিহত হন।

দুলালপুর যুদ্ধ[৩২৯]

যুদ্ধের তারিখ ও সময়: আগস্টের শেষ দিকে সকাল বেলা।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য: শিবপুরে স্থাপিত পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প এর কর্মকাণ্ড বাঁধাগ্রস্ত করা।

যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র: মুক্তিবাহিনীর ২টি গ্রুপ হায়দার আনোয়ার খান জুনো ও মজিবর রহমানের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: শিবপুর-লাখপুর রাস্তা ও চরসিন্দুর-হাতিরদিয়া রাস্তায় মাইন বসিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদেরকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু, সময় মতো মাইন বিস্ফোরিত না হওয়ায় দুলালপুরে দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়।

ফলাফল: শিবপুরের দিকের ব্রিজটি ধ্বংস করা হয় এবং যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর কি্ছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাগণ অক্ষত ছিল।

ভরতের কান্দি সেতু অভিযান[৩৩০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: সেপ্টেম্বর মাসের কোনো একদিন ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: নরসিংদী-শিবপুর রুটের ভরতের কান্দি ব্রিজটি ধ্বংস করা ও পাহারারতদের নিকট থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করা।

যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র: কমান্ডার হাবিলদার মজনু মৃধার নেতৃত্বে দলটিতে ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন । অস্ত্র ছিল ২টা এলএমজি, ২টা স্টেন গান, ১টা এসএমজি এবং রাইফেল ৭টা। আরও ছিল কয়েকটা হ্যান্ড গ্রেনেড ও কিছু বিস্ফোরক।

অভিযানের বিবরণ: শিবপুর থানার সর্ব দক্ষিণে ভরতের কান্দি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত। নদীর ওপারে নরসিংদী সদর। এই নদীর উপরেই ভরতের কান্দি সেতু। চলাচলের জন্য পাকিস্তান বাহিনীর কাছে সেতুটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ভরতের কান্দি সেতুর উভয় পার্শ্বে ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান। হাবিলদার মজনু মৃধার নেতৃত্বে শুরু হলো অপরপক্ষের গতিবিধির উপর লক্ষ রাখা। সংগ্রহ করা হলো ডিউটি পরিবর্তন এর সময়। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন যে, সেতুর দুইপাশ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দু'গ্রপে ৬ জন করে ২টি দলে ভাগ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা রাতের অন্ধকারেই নিজস্ব অবস্থান নিশ্চিত করেন। সকলেই নিঃশব্দ অবস্থান নেওয়ার ফলে শত্রুবাহিনী একটুও বুঝতে সক্ষম হয় নাই মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান সম্পর্কে। এবার শুরু হয় অপেক্ষার পালা। হাবিলদার মজনু মৃধার সামনে অবস্থিত বাঙ্কার থেকে শত্রু প্রহরী বের হয়ে আসে। কিন্তু সেতুর অপর পাশের বাঙ্কার

থেকে তখনও কেউ বের হয় নাই। তারপরও হাবিলদার মজনু মৃধা এলএমজি দিয়ে গুলি শুরু করেন। এতে সাথে সাথে চারজন পাকিস্তানি সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেতুর অপর পাড়েও শুরু হয় শত্রুর উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। প্রায় ২০/২৫ মিনিট ধরে চলে তুমুল গোলাগুলি। গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংকারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা এরই মধ্যে বাঙ্কার ও ব্রিজ লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। ব্রিজে অবস্থিত প্রহরী এরই মধ্যে পলায়ন করে। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের পলায়নের পর মুক্তিযোদ্ধারা সেতুতে বিস্ফোরক লাগানোর কাজ শুরু করেন। তারপর সম্পূর্ণ বিস্ফোরক ফাটিয়ে সেতুটি মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংস করে দেন।

ফলাফল: এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধারা কার্যকরীভাবে ভরতের কান্দি সেতু ধ্বংস করেন। এখানে ৬ জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়। বাঙ্কার থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রহ করেন ৩টি চায়নিজ রাইফেল ও ৪ বাক্স গুলি। আহত অবস্থায় ১ জন পাকিস্তানি সৈন্য ধরা পড়ে।

চন্দনদিয়া অভিযান[৩৩১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সাল।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাদল মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র মোকাবেলায় তটস্থ এবং দিশেহারা হচ্ছিলেন আগস্ট থেকেই। তারা তাদের রসদ সরবরাহ রাস্তা ঠিক রাখতে ব্যস্ত ছিলেন। রসদ সরবরাহের এরকম একটা রাস্তা ছিল নরসিংদী-শিবপুর-দুলালপুর-মনোহরদী রুট। এই রুটে চন্দনদিয়া গ্রামের সম্মুখ অংশে এ্যাম্বুশ স্থাপন করে পাকিস্তানি সৈন্যদের বড় ধরনের ক্ষতি করে তাদের মনোবলের উপর চরম আঘাত হানা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: মান্নান খান, মজনু মৃধা, আবদুল আলী মৃধা, তাজুল ইসলাম, আমজাদ, মানিক, ইদ্রিস, নজরুল ও অন্যান্য কয়েকজনের একটি বড় দল এলএমজি, স্টেন গান, এসএমজি, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেডসহ এ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: নরসিংদী থেকে শিবপুর আসার পথে পুটিয়া বাজারের দেড় কিলোমিটার উত্তরে শাশপুর চৌরাস্তার দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বের গ্রামটির নাম চন্দনদিয়া। কমান্ডার মান্নান খান-এর নেতৃত্বে একটা এ্যাম্বুশ এর পরিকল্পনা করা হয়। স্থান নির্ধারণ করা হয় চন্দনদিয়া গ্রামের সম্মুখ অংশ। প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পর মান্নান খানের নেতৃত্বে একটা বড় দল শাশপুর চৌরাস্তার দুই প্রান্তে সারারাত অবস্থান নিয়ে বসে থাকে। মান্নান খানের দলকে সাহায্য করার জন্য হাবিলদার মজনু মৃধার নেতৃত্বে আর একটা দল চন্দনদিয়া পুলের কাছে অবস্থান নেয়। এই দলের দায়িত্ব ছিল দুটো। প্রথমত: মান্নান খানের দল বিপদে পড়লে পাকিস্তানিদের পেছন থেকে আক্রমণ করা, দ্বিতীয়ত: যদি শত্রু আক্রান্ত হয়ে চন্দনদিয়া দিয়ে পালাতে থাকে তাহলে তাদেরকে সেখানে আক্রমণ করা। আবদুল আলী মৃধার নেতৃত্বে অপর একটি দল মজনু মৃধার পূর্বদিকে জাঙ্গালিয়া বটগাছের নিকট অবস্থান নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী দু-দলই যার যার অবস্থানে সারারাত অবস্থান করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলাম-এর ভাষ্যমতে স্থানীয় রাজাকারদের মাধ্যমে এই এ্যাম্বুশের অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ পাকিস্তানি বাহিনী পূর্বেই জেনে যায়। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী শাশপুরের রাস্তায় না এসে ভোর বেলা হঠাৎ করে চন্দনদিয়ায় অবস্থানরত মজনু মৃধার দলকে পেছন থেকে আক্রমণ করে। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও মজনু মৃধা, আবদুল আলী মৃধা, আমজাদ, মানিক, ইদ্রিস, নজরুল ও অন্যান্যরা সাহসের সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করতে থাকে। আমজাদের রাইফেলের গুলি পাকিস্তানি একটা ট্রাকের ড্রাইভারকে বিদ্ধ করে। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাকটি রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে এবং চারজন সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজনু মৃধার দলের উপর শত্রুর আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে। এ সময় মজনু মৃধা তার দলকে পিছু হটতে নির্দেশ দেন। পেছনে গমনের সময় প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হন মানিক। কিছুক্ষণ পরেই মাথায় গুলি লাগে ইদ্রিসের। মজনু মৃধার দল আক্রান্ত হয়েছে

শুনে মান্নান খান তার দলসহ দৌড়ে চলে আসেন চন্দনদিয়ায়। সহযোদ্ধাদের সাহায্য পেয়ে মজনু মৃধা সাহসিকতার সাথে গুলি করতে করতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দিকে এগিয়ে যায়। তাকে পেছন থেকে ফায়ার সমর্থন দিতে থাকে মান্নান খান, আমজাদ আর আবদুল বারী মৃধা। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। রাস্তার এপারে মুক্তিযোদ্ধা এবং ওপারে পাকিস্তান বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুপক্ষ চিৎকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "সবকো জিন্দা পাকড়ো, মজনুকো পাকড়ো।" অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মজনু মৃধাসহ বেশ কয়েকজনের গুলি শেষ হয়ে আসতে থাকে। সে সময় আমজাদ নজরুল ও আবদুল আলী মৃধা একটা, দুটো করে গুলি করে কভারিং ফায়ার দিতে থাকে। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা এই সুযোগে পেছনে অবস্থান নিতে থাকে। এরই মধ্যে এক পর্যায়ে আমজাদের পায়ে গুলি লাগে। আবদুল আলী মৃধার সাহায্যে আমজাদ পালিয়ে আসতে পারলেও নজরুল শত্রুর হাতে ধরা পড়ে।

ফলাফল: এই যুদ্ধে আনুমানিক সাতজন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে নাই। চন্দনদিয়ার যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা মানিক ও ইদ্রিস দুই সাহসী মুক্তিযোদ্ধাকে হারায়। নজরুল একটি রাইফেলসহ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

ঘাসিরদিয়া অভিযান[৩৩২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন দুপুরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সৈন্যদলের মনোবলের উপর আঘাত হানা এবং নিয়মিত টহলের রাস্তা হিসাবে নরসিংদী-ঘাসিরদিয়া-শিবপুর রাস্তা ব্যবহারে তাদেরকে বিরত রাখা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: হাবিলদার মজনু মৃধার নেতৃত্বে ছোট একদল মুক্তিযোদ্ধা এ্যান্টি-ট্যাংক মাইন, এলএমজি, ৩০৩ রাইফেলসহ ঘাসিরদিয়া অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের বিবরণ: ঘাসিরদিয়া গ্রাম শিবপুর থানা সদর থেকে মেঠো পথে ৪ কি.মি. এবং রাস্তা দিয়ে আগমন করলে ৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। শিবপুর থানা সদর থেকে দক্ষিণে আইয়ুবপুর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নেরই একটি গ্রাম ঘাসিরদিয়া। নরসিংদী-শিবপুর থানায় যেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়, সেজন্য পাকিস্তানি সেনারা শিবপুর এলাকাতে নিয়মিত টহলে যেতো। নরসিংদী থেকে শিবপুর যাতায়াতের রাস্তাটা ছিল কাঁচা-পাকা। এ রাস্তাটি আইয়ূবপুর ইউনিয়নের ঘাসিরদিয়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। রাস্তাটা পারিপার্শ্বিক অবস্থান থেকে ৪/৫ ফুট উঁচু। মজনু মৃধার দল এই রাস্তায় এন্টি-ট্যাংক মাইন পুঁতে রাখেন। পাকিস্তানি সৈন্যবাহী একটি ভ্যান নরসিংদী থেকে পুটিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ঘাসিরদিয়া গ্রামের রাস্তায় মাইন বিস্ফোরণে বিদ্ধস্ত হয়। এতে ভ্যানে থাকা বেশিরভাগ সৈন্যই হতাহত হন। কৌশলগত কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ এলাকা ছেড়ে যান।

ফলাফল: দখলদার বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য হতাহত হন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ঘাসিরদিয়া গ্রামে গণহত্যা চালায়।

এছাড়াও, এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা শিবপুর থানা অভিযান, নরসিংদীর টিএন্ডটি অফিস অভিযান, ব্রাহ্মণদী স্কুল অভিযান, পুটিয়া শেষ অভিযান, কটিয়াদী অভিযান, ইটনা সরদার বাড়ি যুদ্ধ, আমিরগঞ্জ রেল সেতু অভিযান, জিনারদী অভিযান, নরসিংদী মুক্তকরণে স্বতন্ত্রভাবে ও ন্যাভাল সিরাজের দলের সাথে যৌথভাবে সাঁড়াসি আক্রমণ পরিচালনা প্রভৃতি যুদ্ধে মান্নান বাহিনী অংশ নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনী সাফল্য লাভ করেছিল।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোনো পত্রিকা বা প্রকাশনা বের করা সম্ভব হয়নি।[৩৩৩] তবে মান্নান ভূঁইয়ার ব্যক্তিগত পরিচিতি ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে এই বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শিবপুর ও নিকটবর্তী এলাকায় জনমানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। মান্নান ভূঁইয়া এবং এই মুক্তিবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে এই অসম যুদ্ধে বিজয়ের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান সহায় হতে পারে অবরুদ্ধ জনগণ। সেকারণে জনতাকে পাশে পেতে এই দল এপ্রিলের শুরু থেকেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বোঝাতেন। এই প্রয়োজনে তারা গ্রামে গ্রামে উঠানবৈঠক, আলোচনাসভা, মতবিনিময় সভার আয়োজন করতেন।[৩৩৪] এছাড়া শত্রুকবলিত এলাকায় জনতার মনোবল বৃদ্ধি করা ও মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড জনগণকে জানানোর জন্য এই মুক্তিদলের ব্যবস্থাপনায় শিবপুরের নৌকাঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়।[৩৩৫] মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর এহেন জনসংযোগ প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের শেষাবধি চলমান ছিল।

শহিদ ও যুদ্ধাহত যোদ্ধা

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীতে প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ ঘটেছিল। যুদ্ধের পুরোটা সময় এই বাহিনীর সদস্যবৃন্দ অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেছিল। কিন্তু, সে হিসেবে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দালালদের মাধ্যমে এ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সামান্যই। প্রাপ্ত তথ্য মতে, মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা প্রায় ১০ জন। এদের মধ্যে একজন শহিদ যোদ্ধার নাম ফজলুর রহমান ফজলু। তিনি শিবপুরের কানোহাটা গ্রামের সন্তান। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি শিবপুর, শহিদ আসাদ কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি পুটিয়া বাজার ব্রিজ ধ্বংস করতে যেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে শহিদ হন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা মানিক ও ইদ্রিস চন্দনদিয়া অভিযানে শহিদ হন। এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধা নজরুল একটি রাইফেলসহ পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন। পরবর্তীকালে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ বাহিনীর মজনু মৃধা, আমজাদসহ অনেকেই যুদ্ধাহত ছিলেন। এছাড়া যুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দোসরদের সহযোগিতায় মজনু মৃধা, ঝিনুক খান, রব খানের বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।[৩৩৬]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

ন্যাপ ও বামপন্থি কয়েকটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ '৭১-এর মে মাসের মাঝামাঝিতে কলকাতায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[৩৩৭] এবং কমিটির পক্ষ থেকে কাজী জাফরসহ কয়েকজন প্রতিনিধি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে একই প্রস্তাব তুলে ধরেন। কিন্তু প্রবাসী সরকার সম্মত না হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে ন্যাপ সমর্থক বামপন্থি ও শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।[৩৩৮] এমনকি মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিদলকে পর্যবেক্ষণ করার ও প্রয়োজনে প্রতিহত করার নির্দেশনাও ৩ নং সেক্টরভুক্ত এফএফ যোদ্ধাদেরকে দেওয়াহয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৩৯] মতো এদিকে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী শুরু থেকেই প্রবাসী সরকারের সাথে যোগাযোগ ও স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এজন্য মান্নান ভূঁইয়া ও সমন্বয় কমিটি নিম্নোক্ত দুটি কৌশল অবলম্বন করেন।

(ক) স্বাধীন মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা

(খ) সরকার সমর্থিত মুক্তিবাহিনীতে যোদ্ধা পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া। এই প্রয়োজনে কাজী জাফর, মেনন, রনো প্রমুখ সেক্টর কমান্ডারগণের সাথে যোগাযোগ রাখবেন

তবে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সাথে প্রবাসী সরকারের সম্পর্ক কিছুটা ভাল হয় যখন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ফটিক মাস্টার ও গয়েস মাস্টারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা দল অত্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য প্রবেশ করেন। মান্নান ভূঁইয়া, ফটিক মাস্টার ও গয়েস মাস্টার যোশর কাচারিতে সর্বদলীয় সভা করে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটান।[৩৪০] তাছাড়া মান্নান ভূঁইয়া ও তার বাহিনী আয়োজিত জনসভায় মান্নান ভূঁইয়া ও অন্যান্য বক্তাগণ প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।[৩৪১] এছাড়া মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর শিবপুর থানা কমান্ডার আব্দুল মান্নান খানকে প্রবাসী সরকারের সেনাবাহিনীর ৩ নং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সফিউল্লাহ শিবপুর থানার কমান্ডার নিযুক্ত করায় মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর সাথে প্রবাসী সরকারের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়।[৩৪২]

গণমাধ্যমে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী

মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে খুব কম গণমাধ্যমে এসেছিল। শুধু বাহিনী হিসেবে গণমাধ্যমে এদের কর্মকাণ্ড প্রায় অনুপস্থিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান প্রচার করা হয়েছিল।[৩৪৩] এছাড়া এ বাহিনীর মনোহরদী যুদ্ধের খবর অবরুদ্ধ দেশের *নতুন বাংলা* পত্রিকায় ২১ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল। মনোহরদী যুদ্ধ সম্পর্কে এ পত্রিকায় বলা হয়:

> সম্প্রতি মনোহরদী কাছারী হইতে চালাকচরে আসার পথে প্রায় ১ শত পাক সৈন্যর একটি দলের সহিত মুক্তিফৌজের তীব্র সংঘর্ষ হয়। মুক্তিফৌজ তাহাদের আগমনের খবর পূর্বেই জানিতে পারিয়া খবর পূর্বেই জানিতে পারিয়া 'পজিশন' লইয়া বসিয়া থাকে। এই খবরটি আবার দালালরা পাক বাহিনীকে জানায়। ফলে, পাক বাহিনী ২ ভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু মুক্তিফৌজ এই চালাকীও ধরিয়া ফেলে। তাহারা আরও দূরে চালাকচরের নিকটে গিয়া 'পজিশন' নেয়। ফলে মুক্তিফৌজকে ঘেরাও করার জন্য পাক সৈন্যরা যে ব্যূহ রচনা করে, পাক সৈন্যরা উল্টা সেই ফাঁদেই পড়ে। ৭ জন পাক সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, ৪ জন আহত হয়। ইহাছাড়া, ২০/১২ জন গ্রামবাসীও শহীদ হয়। মুক্তিফৌজ ঐ এলাকার কুখ্যাত দালাল হাছেন গুণ্ডাকেও খতম করিয়াছে। তাহাকে হত্যা করায় স্থানীয় জনমনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর পুটিয়া ব্রিজ ধ্বংসকরণের খবর আকাশবাণী (কলকাতা) ও বিবিসি থেকে প্রচার করা হয়েছিল।[৩৪৪] মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকাতেও এই মুক্তিদলের যুদ্ধসাফল্যের খবর প্রচার করা হয়।[৩৪৫]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর প্রত্যক্ষ কোনো সদস্য সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক খেতাব বা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাননি। এই বাহিনীর সাথে মানসিকভাবে যুক্ত বা মান্নান ভূঁইয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রভাবিত নেভাল সিরাজ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত। অথচ এ বাহিনীর অনেক শহিদ বা যুদ্ধাহত বা নেতৃস্থানীয় সদস্যই মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য উল্লিখিত পুরস্কার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই বাহিনীর অসংখ্য সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজও তালিকাভুক্ত হতে পারেননি। এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নরসিংদী শিল্পাঞ্চলে আসা মিল শ্রমিকদের একটি বড় অংশ যুদ্ধ শুরু হলে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল। যুদ্ধের পর তাদের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এমন লিখিত প্রমাণ বা দলিল তাদের কাছে না থাকায় মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় এদের অনেকেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।

অস্ত্র সমর্পণ

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে দশ ট্রাক বোঝাই অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন।[৩৪৬]

মূল্যায়ন

আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রধানত শিবপুরকে ঘিরে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ও জনযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী, বেলাবো ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মার্চ মাস থেকেই এই বাহিনী সক্রিয় ছিল। এর ফলে এ অঞ্চলে রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী শক্তিশালী হতে পারেনি। বিশেষ করে শিবপুর এলাকায় শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের কোনো কার্যক্রমই ছিল না বলা যায়। এই বাহিনীর সময়োপযোগী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী উপাদান নির্মূল কর্মসূচির ফলে অত্র এলাকায় লুটপাট, নির্যাতন, সম্পদ বিনষ্ট, গণহত্যা খুব কম হয়েছিল। সেকারণে অত্র এলাকায় তুলনামূলক শৃঙ্খলা বিরাজ করেছিল। তাছাড়া মান্নান ভূঁইয়া দলগতভাবে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করায় জনগণ তাতে স্বস্তি পেয়েছিল। স্থানীয় জনতাও পাকিস্তানি প্রশাসনের বিপরীতে এই মুক্তিদল পরিচালিত প্রশাসনকে গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার একটি স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে দাবি করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধের জন্য তথা জনযুদ্ধের জন্য জনতাকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। দখলদার পূর্ণ নরসিংদীর প্রেক্ষাপটে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী এই প্রয়োজনের সিংহভাগ পূরণ করতে সচেষ্ট ছিল। অত্র এলাকায় বেশ কয়েকটি যুদ্ধ তথা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই মুক্তিদল যেমন সামরিক ফ্রন্টে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদেরকে মোকাবেলার জন্য একটি যোদ্ধাদল তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল, তেমনি অবরুদ্ধ জনতাকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ (জনসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচির সাহায্যে) প্রদান করে এই দল মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ফ্রন্টেও যোদ্ধা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল।

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর একটি কৌশল ছিল বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় করে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের সম্ভাবনাকে আরো গতিশীল করা। শুরু থেকেই এই দলের আওতাভুক্ত এলাকায় ভারত প্রত্যাগত যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে অথবা দেশের ভেতরে তাদের অবস্থানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য লাভের ক্ষেত্র তৈরিতে তারা বেম সজাগ ছিল। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি বা চোরাস্রোত এই দলের সংগঠকদেরকে তাদের প্রকৃত দেশসেবার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অন্যদিকে এই দলের প্রধান সংগঠকের রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধকালেই স্বার্থবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ কর্তৃক তাকে প্রতিহত করার চেষ্টাও দেখা যায়।

মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিদল মুক্তিযুদ্ধকালে শিবপুরের একটি বৃহৎ অংশে মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলেছিল। মুক্তিবাহিনীর চেষ্টায় এখানে একটি বেসামরিক প্রশাসন কার্যকর ছিল। পাশাপাশি পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-দালাল কর্তৃক নির্যাতিত বা সন্ত্রস্ত জনগণের বড় অংশ এই মুক্তাঞ্চলে আশ্রয় ও নিরাপত্তা পেয়েছিল। শরণার্থীদের জন্য এই মুক্তাঞ্চল যেমন খুবই উপকারী হয়েছিল, তেমন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বৈধতার প্রশ্নটি মীমাংসার ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল নিশ্চিতভাবেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়।

মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সারা বছর যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, যুদ্ধকালে নরসিংদীর জনগণের মনোবল ধরে রেখে ও প্রভূতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু সে তুলনায় এই মুক্তিদল অনালোচিত। এই কারণে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে উপযুক্তভাবে মূল্যায়িত হওয়ার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

---

[১] *East Pakistan District Gazetteers Dacca*, East Pakistan Govt. Press, Dacca, 1969, p. 1

[২] শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৩৬

[৩] *bn.banglapedia.org*, প্রবেশের তারিখ: ৬ জুন, ২০২০, বিকাল ৫টা

[৪] এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩২

[৫] সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, ২০/৩০ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধ্যা ৮টা

[৬] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ*, চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬

[৭] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৪-১৫; এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশে নির্বাচন* (১৯৭০-২০০১), বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা , ২০০৩, পৃ. ৬০, ৭০

[৮] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

[৯] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬

[১০] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

[১১] আনোয়ার উল আলম শহীদ, *একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২৬

[১২] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, ষষ্ঠ অনন্যা সংস্করণ, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৪

[১৩] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৮

[১৪] *ঐ*, পৃ. ৭৯-৮০

[১৫] *ঐ*, পৃ. ৮৭

[১৬] সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, প্রাগুক্ত

[১৭] এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৪

[১৮] আনোয়ার উল আলম শহীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭

[১৯] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩

[২০] সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, প্রাগুক্ত

[২১] *ঐ*

[২২] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-৫৪

[২৩] মামুন তরফদার, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৩৯-৪১

[২৪] আনোয়ার উল আলম শহীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬

[২৫] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-৪৪

[২৬] প্রকৃতপক্ষে আফসার উদ্দিন আহমেদ ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর অনুরূপ স্বতন্ত্র একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন যা বিস্তারিত আলোচিত 'আফসার বাহিনী' শিরোনামে। এই বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে সমঝোতা ও সমন্বয় করে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সমন্বয়ের অংশ হিসেবে আফসার উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে কাদের সিদ্দিকী ভালুকা এলাকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ভার দেন। (সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *প্রাগুক্ত*)

[২৭] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

[২৮] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, অনন্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২-৪৩

[২৯] আনোয়ার উল আলম শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-৫৪

[৩০] *ঐ*, পৃ. ২৪৫

[৩১] 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা', টাঙ্গাইল জেলা, ১ মার্চ ২০১২, www.tangail.gov.bd প্রবেশের তারিখ, ১৫ এপ্রিল ২০২০, সন্ধ্যা ৯.৩০ মিনিট

[৩২] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

[৩৩] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

[৩৪] সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, প্রাগুক্ত

[৩৫] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

[৩৬] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৩৭] *ঐ*, পৃ. ৪৮-৪৯

[৩৮] মামুন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৩৯] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, অনন্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

[৪০] কাদের সিদ্দিকী, *বীরোত্তম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

[৪১] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[৪২] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[৪৩] এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, এরিয়া সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ময়মনসিংহ, ২০০১, পৃ. ২১

[৪৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *৯ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০০৯, পৃ. ৬৩৮

[৪৫] সাক্ষাৎকার: আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, প্রাগুক্ত

[৪৬] অরণ্য ইমতিয়াজ, 'গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৩ মার্চ ২০১৬

[৪৭] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

[৪৮] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২০৮

[৪৯] *ঐ*, পৃ. ২২০-২২

[৫০] *ঐ*, পৃ. ৩০৯-২০

[৫১] *ঐ*, পৃ. ৩৫৪-৬৩

[৫২] *ঐ*, পৃ. ৩৮০-৯০

[৫৩] *ঐ*, পৃ. ৬২৮-৬৩৪

[৫৪] *ঐ*, পৃ. ৭৩৪-৩৭

[৫৫] *ঐ*, পৃ. ৭৮৪

[৫৬] *ঐ*, পৃ. ৭৮২

[৫৭] কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

[৫৮] হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, আইসিবিএস, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৯

[৫৯] মোহাম্মদ মোদাব্বের, *মুক্তিসংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী*, শিরিন প্রেস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ৭৭

[৬০] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[৬১] বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৩

[৬২] *ঐ*, পৃ. ২৬৬

[৬৩] *ঐ*, পৃ. ৪২২

[৬৪] আনোয়ার উল আলম শহীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১১-১৫

[৬৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *১১তম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, ১৯৮৪, পৃ. ৭৫৪

[৬৬] এম আর আখতার মুকুল, *চরমপত্র*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৯০, ১২৮-২৯

[৬৭] *ঐ*, পৃ. ২৩৮-৩৯

[৬৮] *বাংলাদেশ গেজেট*, মার্চ-১১ ২০০৪, প্রজ্ঞাপন নং মুবিম/প্রঃ ৩/মুক্তিযোদ্ধা/গেজেট/২০০৩/৪৭৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; অনলাইন সার্চ: গেজেটভুক্ত খেতাবপ্রাপ্ত

মুক্তিযোদ্ধা, সর্বশেষ হালনাগাদ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ওয়েবসাইট: *www.molwa.gov.bd*

[৬৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২

[৭০] বিস্তারিত জানতে দেখুন: বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-৮২

[৭১] বিস্তারিত দেখুন: লে জেনারেল জে এফ আর জেকব, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : একটি জাতির জন্ম*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, নবম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৪০-৫৮

[৭২] বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬, ৬৭৭

[৭৩] *ঐ*, পৃ. ৩২১, ৫৭৫

[৭৪] সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, ন্যাম ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ২০১৮, বিকাল ৫ টা

[৭৫] বিজয়ী সদস্যদের তালিকা 'কাদেরিয়া বাহিনী'র প্রেক্ষাপট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে

[৭৬] সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

[৭৭] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

[৭৮] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৫

[৭৯] সংগ্রাম পরিষদের বিস্তারিত জানতে 'কাদেরিয়া বাহিনী'র প্রেক্ষাপট অংশ দেখুন

[৮০] সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

[৮১] *ঐ*

[৮২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৩ মার্চ ২০১৬

[৮৩] সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, গ্রাম: কোনড়া, উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাঙ্গাইল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, নাগরপুর, ৭ ডিসেম্বর ২০১৬, বিকাল ৩.৩০ মি.

[৮৪] সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৫ মে ২০১৮, সকাল ১১.৩০ মি.

[৮৫] মামুন তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[৮৬] সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

[৮৭] *ঐ*

[৮৮] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

[৮৯] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

[৯০] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, প্রাগুক্ত

[৯১] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[৯২] *ঐ*, পৃ. ১৩৭-৩৮

[৯৩] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[৯৪] সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, প্রাগুক্ত

[৯৫] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

[৯৬] *ঐ*, পৃ. ১০৫-০৬

[৯৭] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

[৯৮] সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ডেপটি ডিরেক্টর (তদন্ত), আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিচার আদালত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ডেপুটি ডিরেক্টর (তদন্ত) এর অফিস, ধানমন্ডি, ১১/এ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকাল ৫টা

[৯৯] সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

[১০০] মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

[১০১] সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, প্রাগুক্ত

১০২ আখতারুজ্জাহান, 'মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনী', অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (চতুর্থ পর্ব), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২০৭

১০৩ সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত; তপন কুমার দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-০৬

১০৪ আখতারুজ্জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮-৯৯; সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

১০৫ তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-০৮; আখতারুজ্জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯-২০০

১০৬ আখতারুজ্জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-০৬, সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, প্রাগুক্ত

১০৭ তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬; সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, প্রাগুক্ত

১০৮ তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১০৯ সাক্ষাৎকার: খন্দকার আব্দুল বাতেন, প্রাগুক্ত

১১০ সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাহাদা, প্রাগুক্ত

১১১ মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

১১২ সাক্ষাৎকার: মীর শামসুল আলম শাহজাদা, প্রাগুক্ত

১১৩ মো. হাবিবুল্লাহ বাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

১১৪ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৩ মার্চ ২০১৬

১১৫ বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, *bn.banglapedia.org*, প্রবেশের তারিখ: ২৭ এপ্রিল, ২০২০, বেলা ১.৩০ মিনিট

১১৬ তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, প্রাগক্ত, পৃ. ১১০

১১৭ এম আই কে কামাল, 'মুক্তিযুদ্ধে ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী', অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৬১

১১৮ এম আই কে কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

১১৯ মানিকগঞ্জ জেলা গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, *www.manikgonj.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ২৭ এপ্রিল ২০২০, সন্ধ্যা ৮.৩০ মি.

১২০ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, প্রকাশক: জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ, ১৯৮৭, পৃ. ৭০৬

১২১ *ঐ*

১২২ এম আই কে কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

১২৩ মানিকগঞ্জ জেলার গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, প্রাগুক্ত

১২৪ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৮

১২৫ *ঐ*, পৃ. ৭০৯

১২৬ *ঐ*, পৃ. ৭১০-১১

১২৭ এম আই কে কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

১২৮ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১২

১২৯ তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

১৩০ এম আই কে কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৭

১৩১ *ঐ*, পৃ. ৪৬৭ ও *মানিকগঞ্জ জেলার গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত

১৩২ তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

১৩৩ *মানিকগঞ্জ জেলার গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, এম আই কে কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

১৩৪ এম আই কে কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২

১৩৫ মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১১

১৩৬ মীর ফেরদৌস হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : মানিকগঞ্জ জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৪

১৩৭ সাক্ষাৎকার: তোবারক হোসেন লুডু, পারিল, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল অফিস, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, ৭ জুলাই, ২০১৭, বিকাল ৪টা

[১৩৮] সাক্ষাৎকার: মফিজুল ইসলাম খান কামাল, দাশড়া, মানিকগঞ্জ শহর, মানিকগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৭ জুলাই, ২০১৭ বেলা ১২টা

[১৩৯] মীর ফেরদৌস হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

[১৪০] এম আই কে কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৬

[১৪১] মীর ফেরদৌস হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

[১৪২] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-দুই*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৬, পৃ. ৪৯৯

[১৪৩] *মানিকগঞ্জ জেলার গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত

[১৪৪] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৩৪১

[১৪৫] লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০, ১৬৫

[১৪৬] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৩য় খণ্ড*, বাংলাদেশে সেনাবাহিনী, সেনা সদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬৭ ও ও এম আই কে কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯-৭০

[১৪৭] *ঐ*, পৃ. ৭৬-৭৭; *ঐ*, পৃ. ৪৬৮

[১৪৮] মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৭-৭১৮; সাক্ষাৎকার: তোবারক হোসেন লুডু, প্রাগুক্ত

[১৪৯] মীর ফেরদৌস হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১; এম আই কে কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩

[১৫০] এম আই কে কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪

[১৫১] *ঐ*, পৃ. ৪৬৫

[১৫২] হাসিনা আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

[১৫৩] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[১৫৪] 'মানিকগঞ্জ মুক্ত হয়েছিল আজ', *বাংলানিউজ, ২৪. কম*, ১৩ ডিসেম্বর ২০১১, http.//m.banglanews24.com, প্রবেশের তারিখ: ২৯ এপ্রিল ২০২০ রাত ৮টা

[১৫৫] মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৪

[১৫৬] *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-দুই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯

[১৫৭] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[১৫৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭৮

[১৫৯] মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২৬

[১৬০] সাক্ষাৎকার: তোবারক হোসেন লুডু, প্রাগুক্ত

[১৬১] সাক্ষাৎকার: মো: কাজিম উদ্দিন আহমেদ, পিতা: আফসার উদ্দিন আহমেদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, জুন ১১, ২০১৮, বিকাল ৫টা

[১৬২] মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আফসার ব্যাটালিয়ান*, প্রকাশক হাবীবুর রহমান, ময়মনসিংহ, পনেরো আষাঢ়, '৭৯, দেখুন: ভূমিকা

[১৬৩] মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, দেখুন: ভূমিকা

[১৬৪] এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬১ ও ৬৯

[১৬৫] আমিনুর রহমান সুলতান, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬৮

[১৬৬] আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[১৬৭] *ঐ*, পৃ. ৭৪

[১৬৮] সোহেল মাজহার, *ময়মনসিংহ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯

[১৬৯] *দৈনিক পাকিস্তান*, ১২ মার্চ ১৯৭১

[১৭০] আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[১৭১] *ঐ*, পৃ. ৭৮

১৭২ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চতুর্থ খণ্ড*, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪২

১৭৩ *ঐ*

১৭৪ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

১৭৫ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

১৭৬ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

১৭৭ সোহেল মাজহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

১৭৮ *ঐ*, পৃ. ১৬১

১৭৯ *ঐ*

১৮০ *ঐ*

১৮১ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, দেখুন: ভূমিকা

১৮২ *ঐ*, পৃ. ১১ ও ১৬

১৮৩ *ঐ*, পৃ. ৩৫-৩৭

১৮৪ *ঐ*, পৃ. ৩৬

১৮৫ আমিনুর রহমান সুলতান, 'মুক্তিযুদ্ধে আফসার বাহিনী', অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব)*, পৃ. ৩৩১

১৮৬ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩১-৩৩

১৮৭ গাজী মো. খলিলুর রহমান (সম্পা.), *জাগ্রত বাংলা*, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ভালুকা উপজেলা কমান্ড, ভালুকা, ময়মনসিংহ, ২০০৯, পৃ. ৬৪

১৮৮ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, দেখুন: ভূমিকা

১৮৯ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

১৯০ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫

১৯১ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭ ও সাক্ষাৎকার; মো. ফজলুল ওয়াহাব, অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি জুন, ১২, ২০১৮, সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.

১৯২ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৩

১৯৩ সাক্ষাৎকার: মো. জামাল উদ্দিন খান, খুর্দ্দ, ভালুকা, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: খুর্দ্দ বাজার, জুন ১১ ২০১৮, সন্ধ্যা ৮টা

১৯৪ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, দেখুন: ভূমিকা

১৯৫ *ঐ*, পৃ. ১-৪

১৯৬ সাক্ষাৎকার: মো. জালাল উদ্দিন খান, প্রাগুক্ত

১৯৭ আফসার বাহিনীর অফিস ইন-চার্জ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের যুদ্ধকালীন ডায়রিতে লিপিবদ্ধ যুদ্ধের বিবরণ বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই ডায়রিটির ভিত্তিতেই মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে আফসার ব্যাটালিয়ন (ময়মনসিংহ, ১৯৭৯) গ্রন্থটি লিখেছেন

১৯৮ গাজী মো. খলিলুরর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, প্র. ৪১-৪৩

১৯৯ এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১১০

২০০ গাজী মো. খলিলুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

২০১ *ঐ*, পৃ. ৭৮-৭৯

২০২ *ঐ*, পৃ. ৮৪-৮৫

২০৩ আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫

২০৪ *ঐ*, পৃ. ৩৪৭

২০৫ *ঐ*, পৃ. ৩৩৬-৩৯

২০৬ মো. খলিলুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০

[২০৭] মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২; হাসিনা আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[২০৮] *ঐ*, দেখুন: আফসার উদ্দিন আহমেদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

[২০৯] আমিনুর রহমান সুলতান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭-৪৮

[২১০] মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, দেখুন: ভূমিকা

[২১১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, ১১ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২, ৭২৬-২৭, ৩৭৬, ৮১৪, ৮৫৮-৬১, ৮৬৩-৬৪

[২১২] সাক্ষাৎকার: শাহজাহান মিয়া (সাংবাদিক এবং যুদ্ধকালে আফসার বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা, পিতা: আলহাজ্ব আব্দুল আউয়াল, ১০২/৬, মেজর ভিটা, ভালুকা পৌরসভা, ভালুকা, ময়মনসিংহ; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : রোজ গার্ডেনব হোটেল (আবাসিক), মগবাজার, ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, রাত ৮টা

[২১৩] *ঐ*

[২১৪] *ঐ*; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

[২১৫] Md. Sarwar Hossain, *Liberation War of Bangladesh-1971 (A Study on the Armed Struggle : 25 March to 16 De*cember, PhD Thesis, Dept. of History, University of Dhaka, 2016, p. 194

[২১৬] লে. কর্নেল এস আই এম নুরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১

[২১৭] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২০ মার্চ ১৯৭১

[২১৮] *মাসিক গণমন*, ডিসেম্বর ১৯৭৭, সংকলিত: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬৭১

[২১৯] *ঐ*, পৃ. ৬৭২

[২২০] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক, *একাত্তরের রণাঙ্গন: গেরিলা যুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৬

[২২১] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'বরিশাল অঞ্চলে হেমায়েত বাহিনী গঠন ও তৎপরতা', অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *চতুর্থ খণ্ড (দ্বিতীয় পর্ব)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

[২২২] *http.//hemayetbahini.com,* প্রবেশের তারিখ, ৫ জুন ২০১৮

[২২৩] *ঐ*

[২২৪] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

[২২৫] *ঐ*, পৃ. ৫২

[২২৬] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

[২২৭] *ঐ*, পৃ. ৩৭

[২২৮] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২১ মার্চ ২০১৬

[২২৯] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩

[২৩০] বাহিনীতে ছিলেন ৩৪০ জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৬

[২৩১] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬

[২৩২] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

[২৩৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৪

[২৩৪] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[২৩৫] তপন বাগচী, *মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২৫

[২৩৬] দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ২১ মার্চ ২০১৬

[২৩৭] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮-৬৯

[২৩৮] *ঐ*

[২৩৯] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[২৪০] মুজিবুল হক, *একাত্তরের হেমায়েত বাহিনী ও আমার মুক্তিযুদ্ধ*, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৫৩
[২৪১] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮
[২৪২] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬
[২৪৩] সাক্ষাৎকার: মিহির দাশগুপ্ত, (অন্তর্গত: মুহাম্মদ লুৎফুল হক, (সম্পা.), বরিশাল, *১৯৭১ : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১২৬
[২৪৪] *ঐ*, পৃ. ২৭
[২৪৫] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩-৮৪
[২৪৬] তপন বাগচী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩
[২৪৭] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭
[২৪৮] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
[২৪৯] তপন বাগচী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
[২৫০] *ঐ*, পৃ. ৮১
[২৫১] মুজিবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[২৫২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২১ মার্চ ২০১৬
[২৫৩] মুজিবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১
[২৫৪] রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭
[২৫৫] তপন বাগচী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
[২৫৬] হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৬
[২৫৭] অজয় দাশগুপ্ত, *একাত্তরের ৭১*, *আগামী প্রকাশনী*, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫
[২৫৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭৬
[২৫৯] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২১ মার্চ ২০১৬
[২৬০] *ঐ*
[২৬১] *ঐ*
[২৬২] লে. জেনারেল এফ আর জেকব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪-৬৫
[২৬৩] জগলুল আলম, *১৯৭১ পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পাকিস্তানি মূল্যায়ন*, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, টপ সিক্রেট, বাংলা গবেষণা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ৯১
[২৬৪] মুজিবুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
[২৬৫] কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ, বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৬
[২৬৬] *ঐ*, পৃ. ১০৮-০৯
[২৬৭] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২; *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর আট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-১৭; বাংলাপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ, bn.banglapedia.org, প্রবেশের তারিখ: ১৩ মে ২০২০, সন্ধ্যা ৭.৪০ মি.
[২৬৮] সাক্ষাৎকার: সৈয়দ মনিরুল ইসলাম ছিন্টু (বুলেট ছিন্টু), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ বিকাল ৪টা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, গৌরনদী, বরিশাল; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬, বেলা ৩টা; *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *৯ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৪৭৭; প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৭
[২৬৯] সাক্ষাৎকার: সামছুল হক, কমান্ডার, কোটালীপাড়া, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, গোপালগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ বিকাল ৪টা
[২৭০] সাক্ষাৎকার: মুজিবল হক, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার, কোটালীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, কোটালীপাড়া, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকাল ৪টা
[২৭১] 'মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত বাহিনীর স্মৃতিফলক', স্থাপনের তারিখ: ২৬ মার্চ ২০১০, স্থান: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয় (পশ্চিম পাড়), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

২৭২ *ঐ*

২৭৩ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, মার্চ ১০ ২০১৬

২৭৪ সাক্ষাৎকার: সৈয়দ মনিরুল ইসলাম ছিন্টু, প্রাগুক্ত

২৭৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *পঞ্চদশ খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০০৯, পৃ. ১৩৭

২৭৬ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *একাত্তরের রণাঙ্গন শিবপুর*, ঢাকা, সংহতি, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১১

২৭৭ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *সংগ্রামের নয় মাস শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, মুক্তদেশ প্রকাশন, ২০১৪, পৃ. ৮০

২৭৮ এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, *বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬২, ৭১; মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রকাশক: আজিজুন নাহার মঈন, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১১, পৃ. ৫৪

২৭৯ মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

২৮০ *ঐ*

২৮১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-৩৫

২৮২ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

২৮৩ *ঐ*, পৃ. ১৪

২৮৪ *ঐ*, পৃ. ২২

২৮৫ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২৮৬ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

২৮৭ মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

২৮৮ সৈয়দ মো. শাহান শাহ্, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী (১৯৪৭-১৯৭১)*, এম.ফিল. থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৫, পৃ. ৫৮

২৮৯ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

২৯০ সৈয়দ মো. শাহান শাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

২৯১ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭; মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

২৯২ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

২৯৩ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১ ও সৈয়দ মো. শাহান শাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

২৯৪ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

২৯৫ *ঐ*, পৃ. ৫৬

২৯৬ *ঐ* পৃ. ৫৬-৬১

২৯৭ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

২৯৮ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০

২৯৯ সিরাজ উদ্দিন সাথী, *মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী: কিছুস্মৃতি কিছুকথা*, প্রকাশক: সেলিনা সিরাজ পপী, নরসিংদী, ১৯৯২, পৃ. ১১০

৩০০ *ঐ*. পৃ. ১১১

৩০১ মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭, ১২২

৩০২ সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭; মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৩০৩ মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৩০৪ সাক্ষাৎকার: সিরাজ উদ্দিন সাথী, মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ ফ্ল্যাট, ৮৬, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা, ১৫ জুলাই ২০২০, সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

৩০৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

৩০৬ মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৩০৭ বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১, ১৩০

৩০৮ হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[৩০৯] *ঐ*, পৃ. ১৯
[৩১০] সৈয়দ মো. শাহান শাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[৩১১] *ঐ*
[৩১২] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২
[৩১৩] সৈয়দ মো. শাহান শাহ্‌, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[৩১৪] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
[৩১৫] *ঐ*, পৃ. ৬৬
[৩১৬] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[৩১৭] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[৩১৮] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪-২২৫
[৩১৯] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫
[৩২০] *ঐ*, পৃ. ৩৮
[৩২১] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
[৩২২] *ঐ*, দেখুন, প্রাককথন ও পৃ. ৮২; সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
[৩২৩] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩২৬
[৩২৪] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[৩২৫] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[৩২৬] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭২
[৩২৭] *ঐ*, পৃ. ৮৪-৮৫
[৩২৮] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১৮; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪-৮৭
[৩২৯] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৯০ ও হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০
[৩৩০] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪-১৬
[৩৩১] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১৯; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তৃতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬-২৯
[৩৩২] মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-২০; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তৃতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯-৪০
[৩৩৩] সাক্ষাৎকার: সিরাজ উদ্দিন সাথী, প্রাগুক্ত
[৩৩৪] *ঐ*
[৩৩৫] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[৩৩৬] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
[৩৩৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
[৩৩৮] *ঐ*, পৃ. ১৩৬
[৩৩৯] বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
[৩৪০] *ঐ*, পৃ. ১০০
[৩৪১] হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩
[৩৪২] *ঐ*, পৃ. ৬০
[৩৪৩] শহিদুল হক সুমন, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: নরসিংদী জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯১
[৩৪৪] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[৩৪৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *একাদশ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ১৯৮৪, পৃ. ৭৯২-৯৩
[৩৪৬] সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ জানুয়ারি ২০১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক বাহিনী : চট্টগ্রাম বিভাগ (যুদ্ধকালীন)

বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বিভাগ চট্টগ্রামের উত্তরে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ; পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা এবং মায়ানমারের চীন প্রদেশ এবং পশ্চিমে ভোলা, শরিয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলা। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন ১১টি জেলা (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের শুরুতে ১৭৬০ সালে 'চিটাগাং' নামে এই এলাকাটি ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীন হয়।[১] ১৭৬১ সালের ৫ জানুয়ারি ইংরেজ কর্মকর্তা হ্যারি ভেরলস্ট চট্টগ্রামের শাসনভার বুঝে নেন।[২] ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস পরগণা, সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে একটি ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা প্রশাসন নামক প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] এরপর থেকেই খুব সম্ভবত এটি চট্টগ্রাম জেলা নামে অভিহিত হয়। ১৮২৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।[৪] ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগের পর চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলা) একটি বিভাগ হিসেবেই রয়ে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন পাঁচটি জেলা যথা- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট ছিল।[৫]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে ১১টি সেক্টরে সমগ্র দেশকে ভাগ করেছিল, চট্টগ্রাম বিভাগভুক্ত উল্লিখিত পাঁচটি জেলা (পুরোপুরি বা আংশিকভাবে) ঐ ১১টি সেক্টরের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫নং সেক্টরভুক্ত ছিল। সেক্টরভুক্ত ঐসব এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের অধীন সেনাবাহিনী ও যথাযথ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় ভারতে প্রশিক্ষিত ও আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের দোসরদের মোকাবেলা করেন। বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানকৃত এসব মুক্তিযোদ্ধা দল ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই চট্টগ্রাম বিভাগের (মুক্তিযুদ্ধকালীন) কুমিল্লা জেলাধীন চাঁদপুর মহকুমায়[৬] 'পাঠান বাহিনী' এবং নোয়াখালী জেলায় 'লুৎফর বাহিনী' নামে দুটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত দুটি আঞ্চলিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পাঠান বাহিনী

চাঁদপুর

মুক্তিযুদ্ধকালীন চট্টগ্রাম বিভাগাধীন কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে ১৯৭১ সালে সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। এই বাহিনীর প্রধান পরিচালক ও সামরিক নেতা ছিলেন জনাব জহিরুল হক পাঠান। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের অলিপুর গ্রামের মরহুম আবদুল গণি পাঠান ও মরহুমা তাহেরুন নেছা এর পুত্র জনাব জহিরুল হক পাঠান পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীটি তার নামের শেষাংশ নিয়ে 'পাঠান বাহিনী' হিসেবে পরিচিতি পায়।

বাহিনী প্রধান জনাব জহিরুল হক পাঠান চাঁদপুর জেলার (তৎকালে মহকুমা) হাজীগঞ্জ থানাধীন অলিপুর গ্রামের মরহুম আবদুল গণি পাঠান এবং মরহুমা তাহেরুন নেছার সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অনারারি ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর নেন। তিনি ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। একজন বক্সার হিসেবেও তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৭]

মুক্তিযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি সুবেদার হিসেবে যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এর আগে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে লাহোরের খেমখেরান ফ্রন্টে যুদ্ধ করে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'টিজে' (তখমায়ে জুরাত) উপাধি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি চাঁদপুর এলাকায় গঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রধান সামরিক পরিচালক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ কারণেই এই বীরযোদ্ধার নামেই এই মুক্তিবাহিনীর নাম হয় পাঠান বাহিনী।

পাঠান বাহিনীর আরেকটি ভিত্তি হলো বাহিনীর অন্যতম সংগঠক, বীরযোদ্ধা ও সমর কুশলী কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া। আপাদমস্তক একজন মুক্তিযোদ্ধা কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া হাজীগঞ্জের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার কাসিমাবাকের রামচন্দ্রপুর গ্রামের হায়দার আলী ভূঁইয়ার পুত্র ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ (বিএম কলিমউল্লাহ) ঢাকার জগন্নাথ কলেজ হতে বিকম পাস করে বাম রাজনীতিতে যোগ দেন।[৮] ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে তিনি কুমিল্লা জেলার ভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেন।[৯] ব্যক্তিজীবনে প্রগতিশীল এই ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে জড়িত সবগুলো আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তিনি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানায় কয়েকজনের সহযোগিতায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেন মতলবের সুবেদার আব্দুল হক, হারেস, অলিপুরের নায়েক সুবেদার আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারি প্রমুখ।[১০]২৬ মার্চ, ১৯৭১-এর পর চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে তিনি এই পরিষদের সদস্য হন। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী চাঁদপুরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার পর হাজীগঞ্জে যে পাঠান বাহিনী গঠিত হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রধান সংগঠক। মূলত তার যোগ্য নেতৃত্বে ও প্রণোদনায় পাঠান বাহিনী গড়ে ওঠে। তবে তিনি সর্বদা সামরিক নেতা হিসেবে জহিরুল হক পাঠান সাহেবকে মেনে চলতেন এবং পাঠান সাহেবও কলিমউল্লাহ ভূঁইয়াকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এ দুজনের মিলিত জুটিই পাঠান বাহিনীর মূল ভিত্তি।[১১] রাজনৈতিক জীবনে তিনি ন্যাপ (ভাসানী)-এর কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০-এর পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে চাঁদপুর থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও নওজোয়ান ওয়ালিউল্লাহ জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে এবং আব্দুল করিম পাটোয়ারী, এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট আবু জাফর মাঈন উদ্দিন, ডা. আব্দুস সাত্তার, রাজা মিঞা,

এ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়াল প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১২] কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে জটিল ও অনিশ্চিত হতে শুরু করলে, সচেতন বাঙালি মাত্রই একটি অস্থিরতা ও অচলাবস্থার আশঙ্কায় দিন যাপন করতে থাকেন। সারা দেশ ১৯৭১ এর জানুয়ারি থেকেই এই আলোচনা শুনতে পায় যে, আওয়ামী লীগের হাতে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক ও সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দেবে কিনা? ছাড়লে কীভাবে এবং কবে? চাঁদপুর ঢাকা থেকে (স্থলপথে ১৬৯ কি.মি., রেলপথে ২৪১.৫০ কি.মি. এবং জলপথে ৬৭.৬২ কি.মি.) নিকটবর্তী হওয়ায় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি যেমন অপেক্ষাকৃত দ্রুত বোঝা যাচ্ছিল, তেমনই এই আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানি সামরিক সরকারের কোনো ধরনের সামরিক পরিকল্পনা (শক্তি প্রয়োগের) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকলে চাঁদপুর অতি দ্রুতই আক্রান্ত হবে। সে বিবেচনা থেকেই চাঁদপুরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে গোপন বা প্রকাশ্যে প্রতিরোধ তৎপরতা শুরু হয়েছিল। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানায় ন্যাপ নেতা কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার সাংগঠনিক তৎপরতায় ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ ও দল গঠন করার চেষ্টা চলতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্বে হাজীগঞ্জ থানায় 'হাজীগঞ্জ সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।[১৩] জনাব তোফাজ্জল হায়দার (নসু) চৌধুরী, আব্দুল মতিন বাচ্চু (পরে হাজীগঞ্জ থানার রাজাকার কমান্ডার) সহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা খুব সম্ভব ১৩ জন ছিল।[১৪] এদের সাথে পরবর্তীসময়ে যোগ দেন মতলবের ফ্লাইট সার্জেন্ট সিদ্দিক সরকারসহ বেশ কয়েকজন। থানা কমিটির সদস্য ও অন্যান্য সদস্য মিলে প্রায় ৬০ জনের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন।[১৫] এই দলের প্রশিক্ষক ছিলেন মতলবের সুবেদার আব্দুল হক ও হারেস, অলিপুরের নায়েক সুবেদার আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারীসহ আরো অনেকে।

১৯৬৯ সালের গঠিত কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শাখা চাঁদপুর মহকুমা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন।[১৬] ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ভাসানী ন্যাপের নেতৃবৃন্দের তৎপরতায় চাঁদপুরের নতুন বাজার বালির মাঠে কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে পরিষদ আহ্বায়ক জনাব রবিউল আওয়াল কিরণ, জনাব আব্দুল মোমেন খান মাখন, জনাব আবু তাহের দুলালসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মী চাঁদপুর আনসার ক্লাবকে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে থাকেন।[১৭] এসময় ছাত্রগণ বিভিন্ন সরকারি গাড়িতে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে এবং ইতোমধ্যে সংগৃহীত হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহলের ব্যবস্থা করেন।[১৮] পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালিয়েছে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে এমন খবর পাওয়ার পর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা জোরদার করার চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু দখলদার বাহিনী ৮ এপ্রিল চাঁদপুর দখল করে নিলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।[১৯]

এদিকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫ মার্চ থেকে গণহত্যা হচ্ছে জেনে চাঁদপুর আনসার ক্লাবে 'চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় মার্চের শেষেই। পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুর রব (হাজীগঞ্জ)। তিনি ভারতে চলে গেলে জনাব আব্দুল করিম পাটোয়ারী (এমপিএ) সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিষদের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম (এমপিএ)। তিনিও ভারতে চলে গেলে এ্যাডভোকেট আবু জাফর মাঈন উদ্দিন (এমপিএ) সে দায়িত্ব লাভ করেন।[২০] এছাড়া পরিষদের সংগঠক ও অন্যান্য ভূমিকায় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী (এমএনএ ও কেন্দ্রীয় নেতা, আওয়ামী লীগ), ডা. আব্দুস সাত্তার (এমপিএ), ন্যাপ নেতা কমরেড কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব নসু চৌধুরী, জনাব নওজোয়ান ওয়ালিউল্লাহ (এমএনএ) জনাব রাজা মিঞা (এমপিএ), এ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়াল (এমপিএ), জনাব আব্দুল মান্নান, ফ্লাইট সার্জেন্ট সিদ্দিক সরকার, জনাব জীবন কানাই চক্রবর্তীসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সক্রিয় ছিলেন।[২১] সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচেষ্টায় ঢাকা ও অন্যান্য

এলাকা থেকে আগত ভীত, পলায়নপর অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য-বস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়।[২২] কিন্তু পরিষদ নেতৃবৃন্দ এপ্রিলের শুরুতেই কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরে অবস্থান নিলে সংগ্রাম পরিষদের প্রতিরোধ ধ্বসে পড়ে। তবে উল্লেখ্য যে, সংগ্রাম পরিষদ একটি মুক্তিবাহিনী গঠনের চেষ্টা শুরু করেছিল মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকেই। চাঁদপুরে অবস্থানরত প্রাক্তন ও বর্তমান ও ছুটিতে থাকা বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স, পুলিশ, আনসার সদস্যসহ বেসামরিক (মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ইচ্ছুক ও উপযুক্ত ছাত্র-যুবক ও অন্যান্য পেশার লোকজন) সদস্যের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করেছিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার জহিরুল হক পাঠানকে বাহিনীর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ।[২৩] কিন্তু পাঠান সাহেব সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে, "আমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে দেখি সেখানে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ছাত্ররা সব মেজর, ক্যাপ্টেন, এরিয়া কমান্ডার হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র নিয়ে টহল দিচ্ছে... আমি করিম পাটোয়ারীকে বললাম, "অসম্ভব, এদের কন্ট্রোল করা আমার পক্ষে সম্ভব না... আমি হাজীগঞ্জে চলে আসি।"[২৪] যাহোক, এভাবেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংগ্রাম কমিটির সমন্বিত প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে।

চাঁদপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটির প্রতিরোধ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ে গেলে সংগ্রাম কমিটির কিছু সদস্য হাজীগঞ্জে ফিরে এসে পুনরায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। হাজীগঞ্জের সন্তান কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয় পাইকপাড়া হাই স্কুলকে কেন্দ্র করে। জনাব করিম পাটোয়ারী প্রশাসন বিভাগ, জনাব আবু জাফর মাঈন উদ্দিন অর্থ বিভাগ, জনাব কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং ডি এন হাই স্কুলের শিক্ষক জীবন কানাই চক্রবর্তী কমিটির সচিবের দায়িত্ব পান।[২৫] এই কমিটির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনাব আলী আহম্মদ, জনাব আবুল খায়ের, জনাব সালে আহম্মদ বিএসসি, জনাব আলী আজম মজুমদার, জনাব নসু চৌধুরীসহ প্রমুখ সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।[২৬] এই কমিটির প্রচেষ্টায় শতাধিক সামরিক ও আধা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা (যারা বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই পি আর, পুলিশ, আনসার এর সদস্য ছিলেন) ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া স্কুলে সমবেত হন।[২৭] এই দলকে নেতৃত্ব দিতে বেসামরিক প্রশাসনের জনাব করিম পাটোয়ারী, জনাব আবু জাফর মাঈন উদ্দিন, জনাব সিরাজুল ইসলাম পুনরায় সুবেদার জহিরুল হক পাঠানকে (যিনি তখন ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন) আহ্বান জানান।[২৮] সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই তিনি পাইকপাড়ায় উপস্থিত হন এবং প্রকৃত অর্থে সামরিক আইনানুযায়ী একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এপ্রিলের শেষ ভাগ হতে এবং যুদ্ধের পুরো সময়টি এই বাহিনীর প্রধান সামরিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সংগঠন

পাঠান বাহিনীর সামরিক প্রধান জহিরুল হক পাঠান স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা বেসামরিক প্রশাসনের অধীন থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। বেসামরিক প্রশাসনের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান জনাব কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া পাঠান সাহেবের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে দু'জন আলোচনা করেই ঠিক করেছেন করণীয়।[২৯] এর কারণ, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, মানুষজন চিনতেন এবং ন্যাপ নেতা হিসেবে প্রায় সব জায়গায় তার দলীয় লোকজন ছিল।[৩০] প্রকৃতঅর্থে, পাঠান বাহিনী গঠন পর্যায়ে নিউক্লিয়াস ছিল কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন ৬০ জনের একটি দল যা '৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসেই গঠিত হয়েছিল[৩১] এবং সংগ্রাম কমিটির সংগৃহীত শতাধিক প্রশিক্ষিত সেনা। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান বেসামরিক প্রশাসনের সাথে নিম্নোক্ত শর্তে বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সম্মত হয়েছিলেন[৩২]:

ক) সিভিল প্রশাসন খাদ্য সংগ্রহ করবে এবং খাদ্য এক জায়গা থেকেই সরবরাহ করা হবে।

খ) খাদ্য সংগ্রহের সোর্স হিসেবে প্রাথমিকভাবে সরকারি খাদ্য ভাণ্ডারগুলো আমাদের আয়ত্তে আনতে হবে। খাদ্য সংগ্রহে ডিফেন্সের প্রয়োজন হলে মুক্তিযোদ্ধারা সাহায্য করবে।

গ) মুক্তিযুদ্ধ বা গেরিলা আক্রমণ সামরিক রীতিনীতি অনুযায়ী হবে।

ঘ) সংগৃহীত খাদ্য ও অর্থ সংগ্রাম কমিটি বা সিভিল প্রশাসনের কাছে থাকবে।

ঙ) একটি নির্দিষ্ট অংকে প্রতি মাসে মুক্তিযোদ্ধাগণ সামান্য হলেও ভাতা এবং সপ্তাহে ৫ প্যাকেট সিগারেট পাবে। যাতে মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি দুঃশ্চিন্তায় না থাকে এবং এসব কারণে দল ছেড়ে বাহিরে যেতে না হয়।

> উপর্যুক্ত বিষয়ে সংগ্রাম কমিটির নেতা-কর্মীগণ আমাদের সাথে একমত হন। আমি তাদের বুঝাতে সক্ষম হই যে, এই ধরনের প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন না থাকলে এরা এক সময় খাদ্য ও অর্থের প্রয়োজনে ডাকাত বা লুটার হতে পারে। চরিত্র খারাপ হলে যা হয় সব ধরনের অপকর্মের সংস্পর্শে আসতে পারে। খুব সম্ভব তখন আমাদের আলাপ আলোচনায় জনাব কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া সাহেব আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন।[৩৩]

পাঠান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার শুরুতে পাইকপাড়া হাই স্কুলে স্থাপন করা হলেও পরে এটা ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণে নোয়াখালীর রামগঞ্জের পানিআলা গ্রামের ঠাকুর বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়।[৩৪] এখানেই আবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই গ্রামেই চলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাকর্ম। ডা. বদরুন্নাহার চৌধুরী (পরে সিভিল সার্জন, চাঁদপুর জেলা সদর হাসপাতাল ও ডা. জয়নাল আবেদিন (পরে সোরসাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি) এই দায়িত্ব পালন করেন হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করেই।[৩৫]

পাঠান বাহিনীতে শুরুতে প্রায় ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এদেরকে এলাকাভিত্তিক ৫টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করা হয়। এলাকাভিত্তিতে বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার ছিলেন:

১. নায়েক সুবেদার আলী আকবর পাটওয়ারী (রামগঞ্জ), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- হাজীগঞ্জ, রামগঞ্জ, চাটখিল, রায়পুর ও লাকসামের কিছু অংশ।
২. নায়েক সুবেদার জহুরুল ইসলাম (বরিশাল), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- মতলব থানা।
৩. সার্জেন্ট জয়নাল আবেদিন চৌধুরী (চাঁদপুর), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- চাঁদপুর ও হাইমচর।
৪. নায়েক সুবেদার আবদুর রব (ফরিদগঞ্জ), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- ফরিদগঞ্জ ও রামগঞ্জের কিছু অংশ ও রায়পুরের কিছু অংশ।
৫. হাবিলদার সিরাজুল ইসলাম (কচুয়া), দায়িত্বভুক্ত এলাকা- কচুয়া থানা।
৬. নায়েব সুবেদার মফিজ (শাহরাস্তি)- দায়িত্বভুক্ত এলাকা- হেড কোয়ার্টার (ট্রেনিং)।[৩৬]

ধীরে ধীরে পাঠান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৮৯৭ জনে পৌঁছায়। এছাড়াও যুদ্ধের শেষ দিকে এ সংখ্যা আরো বাড়ে।[৩৭] ফলে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনে কমান্ডের পরিবর্তন করা হয়েছিল।

সামরিক নিয়মানুযায়ী গঠিত মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর বাইরে পাঠান বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। এটি জহিরুল হক পাঠান এবং কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনকে গোয়েন্দা হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে।[৩৮]

অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ

পাঠান বাহিনীর অস্ত্রের উৎস ছিল মূলত চাঁদপুরের বিভিন্ন থানা দখল করে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র। এ কাজে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া শুরু থেকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে হাজীগঞ্জ থানা (২ বার), মতলব থানা, কচুয়া থানা বিভিন্ন গেরিলা কৌশলে দখল করে প্রচুর রাইফেল, গোলাবারুদ এবং বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়।[৩৯] এর বাইরে বাহিনী গঠনের শুরুর দিকে পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা যে অস্ত্রশস্ত্র এবং গুলি এনেছিলেন তা বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। এছাড়া পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে সংঘর্ষের পর তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রের চাহিদা অনেকটা পূর্ণ করে।[৪০] পাশাপাশি পাঠান বাহিনী ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নিকট থেকে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ৫০০০০ গুলি ও কিছু গ্রেনেড পেয়েছিল যখন জনাব পাঠান প্রবাসী সরকারের আমন্ত্রণে ভারতে গিয়েছিলেন।[৪১]

পাঠান বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয় ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া হাই স্কুল মাঠে। এছাড়া বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পানিআলা গ্রামের ঠাকুর বাড়ির নিকট অবস্থিত আরেকটি ঠাকুরবাড়িও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত।[৪২] ওস্তাদ গফুর, ওস্তাদ ওয়াহাব, হাবিলদার আব্দুল মান্নান মতিন, মুহাম্মদ আলী (টিকে), সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হকসহ আরো বেশ কয়েকজন পেশাদার সৈনিক যারা বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন, তারা পাঠান বাহিনীর প্রশিক্ষক ছিলেন। এ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছিল টোরাগড় বাজার, নরিংপুর বাজার, লোটরা বাজার, উগারিয়া বাজার, সোরসাগ বাজার, নোয়াপাড়া আপগ্রেড স্কুল মাঠ, বটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, হাসনাবাদ বাজার, আলী নকীপুর হাই স্কুল মাঠ, কাদরা প্রাইমারি স্কুল মাঠ, রামো প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ, গৃদকালিন্দিয়া হাই স্কুল মাঠ, চররামপুর হাইস্কুল মাঠ, কালির বাজার, দক্ষিণ সাহেবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠসহ চাঁদপুরের বিভিন্ন থানার বিভিন্ন স্থানে।[৪৩] যদিও পাঠান বাহিনীর প্রায় নব্বই ভাগ সদস্য সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সৈনিক ছিলেন, তবুও অত্র এলাকার দেশপ্রেমিক প্রায় তিনশ ছাত্র-যুবক এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।[৪৪]

আওতাভুক্ত এলাকা

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী একমাত্র বাহিনী ছিল পাঠান বাহিনী। ২নং সেক্টরভুক্ত চাঁদপুর সাব-সেক্টর এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহবুব এবং তার অধীন মুক্তিযোদ্ধাগণ জুলাইয়ের পূর্বে এই এলাকায় কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই।[৪৫] এছাড়া বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাগণও সেপ্টেম্বরের পূর্বে চাঁদপুরে কোনো কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল না।[৪৬] আগস্ট মাসে চাঁদপুরে সক্রিয় ছিলেন শুধু নৌ কমান্ডোগণ।[৪৭]

পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাগণ চাঁদপুরের মতলব, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাইমচর, সদর, নোয়াখালীর রামগঞ্জ, চাটখিল, লক্ষীপুরের রায়পুরের উত্তর-পূর্বাংশ, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, দাউদকান্দির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও লাকসাম এলাকায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।[৪৮] সে অর্থে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত না হলেও এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রায় ১০০০ বর্গমাইল এলাকা। যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত এই বাহিনীই উল্লিখিত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বে ছিল। অন্যান্য দলের মুক্তিযোদ্ধাগণ বিভিন্ন স্থানে পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাদের সহযোগিতা নিয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।[৪৯]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

পাঠান বাহিনী সাধারণত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। ‘হিট এন্ড রান’ পদ্ধতি ছিল বাহিনীর মূল যুদ্ধকৌশল। শত্রুর অস্ত্রেই শত্রুকে ঘায়েল করা ছিল বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।[৫০] শুরু থেকেই এই পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া। তিনি বলেছিলেন, “আমাদের যুদ্ধ করতে হবে গণচীন বা ভিয়েতনামের কায়দায়। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে এবং গেরিলা পদ্ধতিতে।”[৫১] প্রকৃতপক্ষে, পাঠান বাহিনী সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের সামরিক প্রজ্ঞা এবং কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার রণকৌশল ও প্রত্যুপন্নমতিতার সম্মিলনে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হয়।

ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে চাঁদপুর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্থান ছিল। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, ফেনী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ থেকে শুরু করে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সৈন্য সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য চাঁদপুরকে রিয়ার হেড কোয়ার্টার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৯তম ডিভিশনের সদর দপ্তর ছিল চাঁদপুর যার অধিনায়ক মে. জে. আবদুর রহিম খাঁন পূর্ব পাকিস্তানের উপ-সামরিক প্রশাসক ছিলেন। ১৬০০০ নিয়মিত সৈন্যের বাইরে প্রায় ২৫০০০ (পাকিস্তান রেঞ্জারস, আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্স, পাকিস্তান পুলিশ, রাজাকার-দালাল প্রভৃতি) সদস্য মিলে চাঁদপুর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।[৫২] শত্রুবেষ্টিত চাঁদপুরের বিভিন্ন থানায় পাঠান বাহিনী শত্রুর বিপক্ষে প্রায় ৬৪টি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৫৩] বাহিনী প্রধানের মতে 'জুনের পর চাঁদপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের সাথে পাকিস্তানিদের যুদ্ধ হয়েছিল।"[৫৪] এ বাহিনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযানের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বলাখাল রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাট অভিযান[৫৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৭ মে ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাদল লঞ্চে করে হাজীগঞ্জের রামচন্দ্রপুর নদীতে মাঝে মাঝেই টহল দিত এবং এপথ ব্যবহার করে মুন্সির হাট পর্যন্ত যেত। এই টহল দলকে ব্যবহার করে পাকিস্তান বাহিনী রামচন্দ্রপুর নদীর পাড়ে ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছিল বেশ কিছুদিন থেকে। তাদের এই আকস্মিক টহল ও ঘাঁটি স্থাপনে বাধা সৃষ্টির জন্য এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার জহিরুল হক পাঠানের নেতৃত্বে বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়া, সুবেদার আব্দুল হক, সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী, নায়েক বজলু, সিপাহী করিম, নায়েক সুবেদার নূর আহমদ গাজী, হাবিলদার গোলাম মাওলা, হাবিলদার আবদুর রশিদ, নায়েক মো. আলী, নায়েক সিদ্দিক, আবদুর রশিদ, নায়েক ফারুক, হাবিলদার আব্দুল মান্নান, হাবিলদার লোকমান, আহম্মদ উল্লাহ, রতন, আবু তাহের, শাহজাহান (২), গফুর, আবু বকর, শফিকুর রহমান, নিখিল চন্দ্র সাহা, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। এদের কাছে ৫টি এলএমজি, ২টি ২ ইঞ্চি মর্টার ও কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল ছিল।

অভিযানের বিবরণ: চাঁদপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) হাজীগঞ্জ থানার হাজীগঞ্জ ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে প্রবহমান রামচন্দ্রপুর নদীর তীরে বলাখাল খেয়াঘাট অবস্থিত। এই ঘাটে পাকিস্তানি সৈন্যবাহী লঞ্চকে এ্যাম্বুশ করার জন্য সুবেদার জহিরুল হক পাঠান তিনটি ভাগে (নদীর পাড় ধরে) প্রায় আধা কি. মি. ব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়াকে মাঝখানে রেখে বামে সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারীর দল ও ডানে সুবেদার পাঠান সৈন্যসহ অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যবাহী দুটি লঞ্চ যখন বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়ার দলের বরাবর পৌঁছে যায়, তখন সুবেদার পাঠান লঞ্চ বরাবর গুলি ছোঁড়েন। এরপর বাকি মুক্তিযোদ্ধারাও আক্রমণ চালান। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে কয়েকজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যবাহী একটি লঞ্চ মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে পিছিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আক্রান্ত সৈন্যদেরকে উদ্ধার করতে কয়েকটি ট্রাকে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বিপরীতমুখে রাস্তার ধারে ও ওয়ারলেস বিল্ডিং এর ছাদে অবস্থান নেন। এরপর উভয়পক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলেছিল। অবশেষে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটে যায়।

ফলাফল: বলাখাল রামচন্দ্রপুর খেয়াঘাটের যুদ্ধে ৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন এবং বেশ কয়েখজন সৈন্য আহত হন। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হাবিলদার লোকমান গুলিবিদ্ধ হন এবং কালু হাওলাদার নামের একজন সাধারণ মানুষ নিহত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদল পিছু হটায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় হয়েছিল বলা যায়।

নরিংপুর অভিযান[৫৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৬ জুলাই ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে নরিংপুর বাজারে পাকিস্তানি সেনাদল একটি ক্যাম্প স্থাপন করে । এ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সেনারা আশপাশের গ্রামগুলোতে প্রায় অত্যাচার করতেন ও যুবতী নারী ধরে ধরে এনে ঐ ক্যাম্পে নির্যাতন করতেন। পাকিস্তানি সেনাদলের এই অপকর্মের জবাব দিতে মুক্তিযোদ্ধারা নরিংপুর সেনা ক্যাম্পে অভিযান চালান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়া, সুবেদার রব, সুবেদার আলী আকবর, হাবিলদার রশিদ, নায়েক ছিদ্দিক, হাবিলদার লোকমান, হাবিলদার মান্নান, আব্দুল মতিন পাটোয়ারী, বজলু, বোরহান চৌধুরী, হাফিজুর রহমান মন্টু, লতিফ, হাবিলদার বাশার, কাওসার, গোলাম রাব্বানী, আহাম্মদ উল্লাহ ভূঁইয়া, শাহ লতিফুর রহমান, নেছার পাটোয়ারী, শাহজাহান (১), শাহজাহান (২), ফিরোজ, আলাউদ্দিন, জয়নাল চৌধুরী নয়ন, ল্যান্স নায়েক হানিফ, নায়েক মোহাম্মদ আলী, ডা. দেলোয়ার হোসেন খানসহ মোট একশত দশজন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নরিংপুর অভিযানে অংশ নেন। এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ২টি এলএমজি, ১টি ২ ইঞ্চি মর্টার, ২টি স্টেনগান, বেশ কতকগুলো ৩০৩ রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল।

অভিযানের বিবরণ: চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার অন্তর্গত সূচিপাড়া (দক্ষিণ) ইউনিয়নে নরিংপুর বাজার অবস্থিত। এই বাজারে পাকা পরিখা তৈরি করে পাকিস্তানি সৈন্যদল একটি ক্যাম্প গড়ে তোলে যার ৭/৮ কি. মি. পূর্বে চিতসী বাজারে দখলদারদের আরেকটি ক্যাম্প ছিল। দুই ক্যাম্পের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা ছিল।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জহিরুল হক পাঠান ও বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়া টানা পাঁচদিন নরিংপুর সেনা ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকা রেকি করে এসে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার পাঠান ও বি এম কলিম উল্লাহর নেতৃত্বে একটি দল বাজারের নিকটে, সুবেদার রবের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ ক্যাম্পের নিকটে এবং সুবেদার আলী আকরের নেতৃত্বে আরেকটি গ্রুপ ওগারিয়া বাজারের দক্ষিণের খালের পাড়ে অবস্থান নেন। ১৬ জুলাই ভোর ৪টার দিকে ওগারিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে সেতি নারায়ণপুর গ্রামের মোল্লা বাড়ির নিকটে টেলিফোনের তার কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভোরবেলা এই পথে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রায় ২২ জনের একটি দল টহল দিতে আসে। এই দল ওগারিয়া বাজারের যে স্থানে টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, সেখানে পৌঁছানো মাত্র সুবেদার আলী আকবর গুলি করা শুরু করেন। সেই সাথে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও গুলি করা শুরু করলে তাৎক্ষণিক আনুমানিক সাত/আট জন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুই জন মারা যায়। এরপর দুই পক্ষে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। নরিংপুর বাজারে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে আক্রমণ করেছে জানতে পেরে কয়েকটি ট্রাকে করে আরো অধিক সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধস্থলে পৌঁছায়। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যদের মেশিনগান, এলএমজি, ৩ ইঞ্চি মর্টারের আক্রমণের জবাব দিতে দিতে মুক্তিযোদ্ধারা খেড়িহর ও বগৌড় গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসে। এদিকে নরিংপুর বাজার আক্রান্ত হয়েছে জেনে নরিংপুর সেনা ক্যাম্প ছেড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা চিতসীর দিকে চলে যায়।

ফলাফল: নরিংপুর সেনা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। এই ক্যাম্প থেকে ১৬ জন নারীকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি এই ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত বেশ কিছু লুট করা সামগ্রী প্রমাণ সাপেক্ষে জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। তবে, নরিংপুর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানি সেনাদল ওগারিয়া বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে তছনছ করে।

অফিস চিতসি অভিযান[৫৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা (আনুমানিক)।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ফরিদগঞ্জ মুক্ত করতে পারলে মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর নিকট থেকে লাকসাম, নোয়াখালী ও চাঁদপুরের বিরাট এলাকা মুক্ত করতে পারবে এই উদ্দেশ্যেই অফিস চিতসির অভিযান চালানো হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, বি এম কলিম উল্লাহ ভূঁইয়া, নায়েক সুবেদার রব, ডা. মো. দোলোয়ার হোসেন খান, নায়েক এরশাদ, হাবিলদার গোলাম মাওলা, বজলু ওস্তাদ, হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার মতিন, বোরহান চৌধুরী, নেছার আহম্মদ, আলা উদ্দিন, নূর মোহাম্মদ, আহাম্মদ উল্লাহ ভূঁইয়া, হেদায়েত উল্লাহ প্রমুখ। এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, স্টেন গান, চায়নিজ রাইফেল, ব্রিটিশ এলএমজি, ৩০৩ রাইফেল হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে চিতসি অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: অফিস চিতসি চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার অন্তর্গত একটি স্থান যার পূর্বে লাকসাম ও দক্ষিণে নোয়াখালীর চাটখিল অবস্থিত। চিতসি বাজার সংলগ্ন স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল যেখানে তাদের সাথে অনেক রাজাকার থাকতেন। এই অবস্থানে আঘাত হানার জন্য সুবেদার পাঠান পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবেদার রব ও কলিম উল্লাহ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে পাকিস্তানি ঘাঁটির দক্ষিণে কাছাকাছি স্থানে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। আর এক সেকশন মুক্তিযোদ্ধা ২টি এলএমজি নিয়ে চান্দাইল নাগেশ্বর দিঘির পারে অবস্থান নেন। এরপর সুবেদার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে এক সেকশন মুক্তিযোদ্ধাকে সূচিপাড়ায় রেখে বাকি সবাইকে অফিস চিতসি চলে আসার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো মুক্তিযোদ্ধারা সেনা ক্যাম্প ঘিরে অবস্থান নেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রস্তুতি লক্ষ করে চিতসি ক্যাম্প হতে সকাল সকাল পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের ঘাঁটিতে রেখে উত্তর দিকে রেল স্টেশনের দিকে চলে যায়। এরপর সকাল ৭ টার দিকে রাজাকাররা প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে আঘাত হানে। প্রত্যুত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা এলএমজি ও চায়নিজ রাইফেল দিয়ে জবাব দিতে থাকেন। এভাবে থেমে থেমে উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় চলতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিন ৩ জন রাজাকার রাইফেল ও প্রচুর গুলিসহ আত্মসমর্পণ করেন। এদিন রাতে পালাবার সময় ৭/৮ জন রাজাকার চিতসির পাশের গ্রামের জনতার হাতে ধরা পড়েন। এদেরকে জনতা ধোলাই দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রাখেন। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প দুইদিন ঘেরাও করে রাখলে রাজাকার দল পাকিস্তানি সৈন্য বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সহায়তা ও সরবরাহ পায়নি। ফলে তাদের যুদ্ধরসদ প্রায় শেষের দিকে ছিল। এমন অবস্থায় রাজাকাররা ২য় দিন গভীর রাতে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: অফিস চিতসি সেনা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং এখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্প থেকে ১২ জন হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য এ বাহিনীর ডাক্তার বদরুন্নাহারের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়। সেনা ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত লুট করা প্রচুর সামগ্রী জনগণের মাঝে প্রমাণ সাপেক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ও দান করা হয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প

থেকে ২টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, ২টি চায়নিজ এলএমজি, ২০টি চায়নিজ রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ হস্তগত করেন।

সুচিপাড়া অভিযান (দ্বিতীয়)[৫৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন সকাল বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ২৯ সেপ্টেম্বর মুক্তিবাহিনী দখলদার বাহিনীর অফিস চিতসি ক্যাম্প দখল করে নেয় এবং এর ফলে ফরিদগঞ্জের একটি বড় অংশ মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। গোয়েন্দা মারফত মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার সুবেদার পাঠানের কাছে খবর আসে যে, পাকিস্তানি সৈন্যদল পুনরায় ফরিদগঞ্জের মুক্তাঞ্চল দখল করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত করে মুক্তাঞ্চল ধরে রাখার জন্য সুচিপাড়ার দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, হাবিলদার মোহাম্মদ আলী (টিকে), হাবিলদার নূরুল ইসলাম, আসলাম মোল্লা, সৈয়দ আহম্মদ, ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন খান, আব্দুল লতিফ ভূঁইয়াসহ প্রায় দুই সেকশন মুক্তিযোদ্ধা ৩টি এল এম জি, ১৯টি চায়নিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে সূচিপাড়ার অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার সুচিপাড়া ইউনিয়নভুক্ত (ডাকাতিয়া নদীর) খেয়াঘাটে পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে পাঠান বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এদিন ভোর বেলা শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য খেয়াঘাটের উত্তর দিক হতে নদীর অপর পারে মুক্তাঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে। এই খবরে সুবেদার পাঠান সুবেদার মোহাম্মদ আলী ও সুবেদার নূরুল ইসলামের সেকশন দুটিকে খেয়াঘাট থেকে ৬০০ গজ দূরে অবস্থান নিতে নির্দেশ দেন। কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অপর পক্ষ খেয়াঘাট পার হয়ে ডিফেন্স নেওয়ার পূর্বেই তাদেরকে নিঃশেষ করে দিতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রায় ৮০ জন পাকিস্তানি সৈন্য ঘাট পার হয়ে পাড়ে অবস্থান নেওয়ার পূর্বেই সুবেদার মোহাম্মদ আলী ও নূরুল ইসলামের মুক্তিযোদ্ধা দল একসাথে এলএমজি ও চায়নিজ রাইফেল থেকে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করেন। অবস্থানগত দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা নদীর উচু পারে কিছুটা আবডালে ও সুবিধানজক অবস্থানে ছিল। অন্যদিকে খেয়া পার হয়ে আসা সৈন্যরা নদীর নিচু তীরে অবস্থান নেয় এবং তাদের উত্তরে ছিল নদী। তাছাড়া, নদীর অপর পারে থাকা সৈন্য ও রসদের কোনো সরবরাহই তারা পাওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তারপরও পাকিস্তানি সৈন্যরা ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা অনবরত ছুঁড়তে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের পূর্বে-উত্তর দিকও নদীঘেরা থাকায় এ পথেও দখলদার বাহিনী প্রবেশ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে নোয়াপাড়ায় এক সেকশন মুক্তিযোদ্ধা রেখে কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ব উত্তর ও দক্ষিণের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করেন। অপরদিকে মুক্তাঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যদল সারাদিন মর্টারের গোলাসহ মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকেন। অবশেষে রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদল তাদের নিহত ও আহত সৈন্যদের একাংশকে তুলে নিয়ে অবস্থান ত্যাগ করেন।

ফলাফল: সুচিপাড়া খেয়াঘাটের যুদ্ধে ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনার লাশ পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। মুক্তাঞ্চল যাতে ধরে রাখা যায় সেজন্য কমান্ডার সুচিপাড়ার আশেপাশে ডিফেন্স প্রস্তুত রাখেন।

গাজীপুর অভিযান (চতুর্থ বার)[৫৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৭ নভেম্বর দুপুর বেলা (আনুমানিক)।

অভিযানে উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাদলের ফরিদগঞ্জ ক্যাম্প অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে অবরোধ করে রাখায় এই ক্যাম্পে কোনো উপায়েই চাঁদপুর থেকে যুদ্ধ রসদ ও খাদ্য সামগ্রী পাঠানো যাচ্ছিল না। এর মধ্যে খবর আসে যে, খাদ্য ও রসদবাহী একটি কার্গো লঞ্চ চাঁদপুর হতে চান্দ্রাবাজার ও টুবগী হয়ে গাজীপুরের ভেতর দিয়ে ফরিদগঞ্জ ক্যাম্পে যাবে। এই খবর পেয়ে সুবেদার জহিরুল হক পাঠান কার্গো লঞ্চটি এ্যাম্বুশ করার পরিকল্পনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: পাঠান বাহিনীর সুবেদার জহিরুল হক পাঠান, সুবেদার রব, সুবেদার আবদুল হক, আলী হোসেন ভূঁইয়া, মাহবুবুর রহমান, খাজা আহমদ, ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন খান, আমজাদ হোসেন পাটোয়ারী, আলম বস, রুহুল আমিন, আনোয়ার হোসেন, মো. শফিকউল্লাহসহ প্রমুখ এই অভিযানে অংশ নেন। এই অভিযানে এফএফ ও বিএলএফ এর দুটি দলও অংশ নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ৭টি এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, প্রচুর এসএলআর ও রাইফেল এবং হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল।

অভিযানের বিবরণ: গাজীপুর ফরিদগঞ্জ থানার উত্তরে অবস্থিত ও চাঁদপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ডাকাতিয়া নদী চাঁদপুর হতে ফরিদগঞ্জে গেছে গাজীপুরের ভেতর দিয়ে। গাজীপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের কার্গো এ্যাম্বুশ করার জন্য সুবেদার পাঠান এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটি সেকশনকে ফরিদগঞ্জের কাছে রূপসা রাস্তার ওপর, একটি সেকশন কেবরার চর ও একটি সেকশন গাজীপুরে রাখেন। কেবরার চর ও গাজীপুরে সেকশন কমান্ডার হিসেবে ছিলেন সুবেদার আব্দুল হক ও সুবেদার রব এবং ফরিদগঞ্জের দক্ষিণে বিএলএফ ও পশ্চিমে এফএফ যোদ্ধাগণ অবস্থান নিয়েছিলেন। পাঠান সাহেবের নির্দেশনা মোতাবেক সুবেদার হকের গ্রুপ গাজীপুর শহীদ মেম্বারের বাড়ি হতে গাজীপুর বাজারের বামপাশ পর্যন্ত প্রস্তুত থাকেন। অপরদিকে গাজীপুরের ঈদগাহ হতে শেখের ডোন পর্যন্ত প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন এফ এফ মুক্তিযোদ্ধারা। কমান্ডারের নির্দেশ ছিল যে, কার্গোটি যখন গাজীপুরের কাছাকাছি আসবে তখন আক্রমণ শুরু হবে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝখানের অবস্থান থেকে।

পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দুপুর নাগাদ রসদবাহী কার্গোটি একটানা রাজাপুর পর্যন্ত আসে এবং গতি কমিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে আবার গতি বাড়িয়ে ফরিদগঞ্জের দিকে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে কার্গোটি যখনই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জের ভেতর আসে ও মুক্তি অবস্থানের মাঝামাঝি পৌঁছায়, তখনই সেকশন কমান্ডার হক গুলি করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো তিন দিক দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা কার্গো লক্ষ করে গুলি ছোঁড়েন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই আচমকা আঘাতে কার্গোর চালকসহ অনেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে ও অনেকে আহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছুটা সামলে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা ও এলএমজি দিয়ে গুলি চালাতে থাকেন। মর্টারের গোলার আঘাতে মাহবুবুর রহমান নামের একজন এফএফ যোদ্ধা পায়ে আঘাত পান। অন্যদিকে, উভয়পক্ষে কয়েক ঘণ্টাগুলি বিনিময় চলে। এক পর্যায়ে দখলদার সৈন্যরা কার্গো ছেড়ে নদী সাঁতরিয়ে অপর পারে ওঠেন এবং যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে ফরিদগঞ্জের দিকে চলে যান।

ফলাফল: কার্গো লঞ্চটি মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। লঞ্চ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি জনতা ভাগাভাগি করে নিয়ে যান। এই যুদ্ধের পর ফরিদগঞ্জে আর কখনো পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার দল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে জড়ায়নি।

উল্লিখিত অভিযানগুলো ছাড়াও এ বাহিনী ফরিদগঞ্জ, খাজুরিয়া, কড়াইতলী, গাজীপুর, চান্দ্রা, নানুপুর, ইছলি, নরিংপুর, পানিআলা, উটতলী, মুন্সীরহাট, শোল্লা বলাখাল, রাগৈবাঁকিলা, খোদাই বিল, সুচিপাড়া, খেতের পাড়, ঠাকুর বাজার, আয়নাতলী, লাউকোরা, রামগঞ্জ, মুদাফ্ফরগঞ্জ, রঘুনাথপুর,

বৈশেরহাট, গোবিন্দপুর, মুকুন্দসার, ভাটিরগাঁও, বাঁসারা, শাসিয়ালী, পাইকপাড়া, খিলী, চৌমুহনী, চিতলী, লাঙ্গলকোট, হাসনাবাদ, রূপসী, বিঘা, পালিকারা, মেহের কালিবাড়ি, চৌধুরী বাজার প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার-দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে পাঠান বাহিনীর মাধ্যমে কোনো পত্রিকা বা কোনো পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি। তবে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জনসংযোগ কর্মসূচি চালিয়ে যান। যুদ্ধের শুরুর দিকে তিনি এ কাজে খুব একটা সাফল্য পাননি। এ পর্যায়ে তিনি হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ এলাকার কুখ্যাত ডাকাত, লুটেরা ও কয়েকজন দালালকে গণআদালতের মাধ্যমে চরম শাস্তি দেন। এরপর থেকে সাধারণ মানুষ পাঠান বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে শুরু করেন। "যুদ্ধকালে প্রধানত কলিমুল্লাহ ভূঁইয়ার প্রচেষ্টায় হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ থানায় এ বাহিনী কয়েকটা সভা করতে সক্ষম হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ এ বাহিনীর সদস্যদের কর্মকাণ্ডের ওপর আস্থা রাখতে শুরু করে এবং তখন থেকে যুদ্ধটাকে জনযুদ্ধে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়।"[৬০]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

পাঠান বাহিনীর সদস্য হিসেবে নায়েক সুবেদার নূর আহম্মেদ গাজী (বিশকাঠালি) পূর্ব চান্দ্রাবাজার বাখরপুর মজুমদার বাড়িতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন। এছাড়া, শাসিয়ালির যুদ্ধে শহিদ হন হুগলির নায়েক ফারুক। এছাড়া তৎকালীন ই পি আর সৈনিক আবুল হোসেন হাসনাবাদে পাকিস্তানি সেনার গুলিতে শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাসার হাজীগঞ্জে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে শহিদ হন।[৬১] এ বাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য বেশ কয়েকজন। এদের মধ্যে হাবিলদার লোকমান ও আব্দুল লতিফ সম্মুখ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই এই বাহিনী তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। এই বাহিনী গঠন পর্যায় থেকেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সংগ্রাম কমিটি ও বেসামরিক প্রশাসনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাহিনী প্রধান জহিরুল হক পাঠান অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ প্রবাসী সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতা গমন করেন। সেখানে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করে তিনি বাহিনীর কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরেছিলেন। সেক্টর কমান্ডার জনাব পাঠানকে চাঁদপুর সাব-সেক্টর এর কমান্ডার (সেক্টর কোড নাম মধুমতি ও কোড নম্বর ১২০৪) নিযুক্ত করেন।[৬২] উল্লেখ্য যে, চাঁদপুর মহকুমার ৫টি থানা ও পার্শ্ববর্তী রায়পুর, রামগঞ্জ ও লাকসাম নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন আব্দুর রব, প্রধানমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, অর্থমন্ত্রী এ্যাডভোকেট আবু জাফর মাঈনউদ্দিন, আইন ও বিচারমন্ত্রী আব্দুল করিম পাটোয়ারী, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী বি এম কলিমউল্লাহসহ প্রমুখ বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন।[৬৩] এই সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ইন-চার্জ হিসেবে সুবেদার আব্দুর রব, ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চার্জ হিসেবে সুবেদার জহিরুল হক পাঠানকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর সুবেদার জহিরুল হক পাঠান কমান্ডার ইন-চার্জ এর দায়িত্ব পান। এরকম একটি বিকল্প সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে প্রবাসী সরকারের সাথে প্রথমদিকে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভুল বোঝাবুঝি নিরসনে প্রথমে জনাব আব্দুর রব এবং পরে সুবেদার পাঠান ভারতে যান এবং প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করেছিলেন।[৬৪]

গণমাধ্যমে পাঠান বাহিনী

যুদ্ধকালে পাঠান বাহিনীর কর্মকাণ্ড দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যমের দৃষ্টি খুব কম আকর্ষণ করেছিল। এ বাহিনীর মাত্র একটা যুদ্ধের খবর অবরুদ্ধ দেশ থেকে প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধ* পত্রিকায় ১০ অক্টোবর ১৯৭১-এ নিম্নোক্তভাবে ছাপা হয়:

> ১০ই সেপ্টেম্বর হাজীগঞ্জে একটি গেরিলা দলের সঙ্গে পাক বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। গেরিলা বাহিনী পাক-হানাদারদের হঠাৎ দুই দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দেয় ও আনুমানিক ৩০ জন পাক-সৈন্যকে হত্যা করে। গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের মুখে পাক-দস্যু বাহিনী টিকিতে না পারিয়া নিহতদের ফেলিয়া পালাইয়া যায়। গেরিলারা হানাদারদের ফেলিয়া যাওয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করে।[৬৫]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ তৎকালীন সরকার পরিচালিত কোনো গণমাধ্যমেই এ বাহিনীর কার্যক্রমের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে পাঠান বাহিনীর পাঠান সাহেবসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার অনুমান এই যে, ন্যাপনেতা কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার উপস্থিতির কারণেই মূলত এই বাহিনীকে প্রবাসী সরকার প্রথম দিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এই বাহিনীতে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি 'কমরেড গ্রুপ' ছিল। এটি প্রবাসী সরকারের মধ্যে একটি অবিশ্বাস তৈরি করে বলে জনশ্রুতি আছে। এছাড়া প্রচারণা ছিল যে, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী হত্যা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া মতলবের করিম কন্ট্রাক্টরকে হত্যা করেছিলেন যিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। এসব রাজনৈতিক কারণে ও বিবিধ অভিযোগে (ভূঁইয়া সাহেবের ভাষায় প্রোপাগান্ডা) পাঠান বাহিনীকে প্রবাসী সরকার ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেননি। সে কারণেই এই বাহিনীর কার্যক্রম গণমাধ্যমে অনুপস্থিত।[৬৬]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

পাঠান বাহিনীর সদস্য নায়েক সুবেদার নূর আহম্মেদ গাজী (বিশকাটালি) বীর বিক্রম ও সুবেদার আলী আকবর পাটোয়ারী মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই বাহিনীর বেশ কিছু সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজো স্বীকৃতি পাননি। এদের মধ্যে প্রকৌশলী শহীদ আহমদ, হাজী শাহজাহান, মো. আব্দুল মান্নান জমাদার (মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য যার বাবাকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে), কাজী নূর মোহাম্মদ, নজির আহমদ, মো. ওসমান গণিসহ আরো অনেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া, মফিজুল ইসলাম ফরিদগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি।[৬৭]

অস্ত্র সমর্পণ

পাঠান বাহিনী যুদ্ধকালে সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্র চাঁদপুর টেকনিক্যাল হাই স্কুল মাঠে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করে।[৬৮] উল্লেখ্য যে, শুধু বাহিনীর অস্ত্রই শুধু নয়, চাঁদপুর এফএফ এবং বিএলএফ যোদ্ধাদের অস্ত্রও এরিয়া কমান্ডার জহিরুল হক পাঠানের মাধ্যমে সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[৬৯]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়াই চাঁদপুর মহকুমায় স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে। সুবেদার জহিরুল হক পাঠান স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সহাযোগিতায় এই মুক্তিযোদ্ধা দল পরিচালনা করেন এপ্রিলের শেষ ভাগ হতে। এই মুক্তিযোদ্ধা দলই যা স্থানীয় মানুষের কাছে 'পাঠান বাহিনী' নামে খ্যাত হয়েছিল, তারা যুদ্ধের পুরো সময়ে চাঁদপুরে মুক্তিযুদ্ধকে চলমান রেখেছিল। স্থানীয় সমাজবিরোধী চোর-ডাকাত-লুটেরা-দালাল-রাজাকারদেরকে মোকাবেলা করার পাশাপাশি অত্যন্ত শক্তিশালী (সমরাস্ত্রে ও সৈন্য সংখ্যায়) পাকিস্তানি সৈন্যদলকে মোকাবেলা করেছিল। ৮ এপ্রিল চাঁদপুর শহর পাকিস্তানি সেনাদলের দখলে চলে যাবার পর থেকে প্রধানত হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ এলাকায় অবস্থান

করে এই মুক্তিদল পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদেরকে মোকাবেলা করেছিল। পাঠান বাহিনীর অভিযান ২০ এপ্রিল (ফরিগঞ্জের খাদ্য গুদাম অভিযান) শুরু হয় এবং তা চাঁদপুর মহকুমা মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। এই সময়ে পুরো চাঁদপুর মহকুমায় পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৪টি যুদ্ধ/সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল। এর মধ্যে শুধু পাঠান বাহিনীর সাথে অপর পক্ষের প্রায় ৬৪টি যুদ্ধ/সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছিল। এসব যুদ্ধে বা সংঘর্ষে দখলদার পক্ষের প্রচুর সৈন্য ও রসদহানি ঘটে। সেই তুলনায় পাঠান বাহিনীর জীবনহানি ঘটে মাত্র চার/পাঁচ জনের ও আহত হয়েছিলেন আরো কমসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা।

চাঁদপুরে বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত প্রশিক্ষিত (ভারতে) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবেশ ঘটে জুনের শেষে মতলবে।[৭০] এরপর বি এল এফ যোদ্ধারা আগস্ট মাসে চাঁদপুরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। পাশাপাশি চাঁদপুরে ১০ম সেক্টরভুক্ত নৌ-কমান্ডোগণও আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাঁদপুর নদীবন্দর এলাকায় অবস্থান নেন।[৭১] এদের আগমনের পর পাঠান বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ভারত হতে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করে অত্র এলাকায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভারত ফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজনের পাঠান বাহিনীর আওতাভুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অবস্থান নিতে হয় এমনকি পাঠান বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে তাদেরকে অভিযানও পরিচালনা করতে হয়।[৭২] এ বিবেচনায় চাঁদপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি ছিল পাঠান বাহিনীর সদস্যরা। উল্লেখ্য, ১০ম সেক্টরের ‘অপারেশন জ্যাকপট’ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাঠান বাহিনীর খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।[৭৩]

পাঠান বাহিনীর একটি বড় কৃতিত্ব ছিল চাঁদপুরের অভ্যন্তরেই প্রশিক্ষিত যোদ্ধা তৈরির ক্ষেত্রে। এ বাহিনীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় তিনশ মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি অসংখ্য যুবক এই বাহিনীর সহায়তায় ভারতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পান।[৭৪]

পাঠান বাহিনীর সক্রিয়তায় চাঁদপুরের বিস্তির্ণ এলাকায় মোটাদাগে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে কারণে এই বাহিনী স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে সবধরণের সহযোগিতা পেতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, জনবেষ্টনীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে জনগণই পাঠান বাহিনীকে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সে অর্থে, জনগণই ছিল চাঁদপুরের জনযুদ্ধের নির্মাতা, পাঠান বাহিনী ছিল অংশীদার মাত্র।[৭৫]

পাঠান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের (বিশেষত সামরিক অভিযানের) জন্য জনগণকেও প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। পাঠান বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়দান, সহযোগিতা দানের অভিযোগে ও এ বাহিনীর কয়েকটি সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসররা চাঁদপুরে অনেকগুলো গণহত্যা সংঘটিত করে, নারী নির্যাতন করে ও অসংখ্য বাড়িঘর-দোকান জ্বালিয়ে ছাড়খার করে।[৭৬]

পাঠান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে চূড়ান্ত পর্যায়ে বলা যায় যে, চাঁদপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কারিগর পাঠান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। কিন্তু, এই অবদানের উপযুক্ত প্রতিদান এই বাহিনীর সদস্যগণ পাননি। এ বাহিনীর অনেক সদস্য এখনও পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। এ বাহিনীর কয়েকজন রাষ্ট্রের তরফ থেকে বীরত্বসূচক খেতাব পেলেও বাহিনীর প্রধানসহ আরো কয়েকজন বীরত্বসূচক বা অন্য রাষ্ট্রীয় খেতাব/পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এ বাহিনীর কর্মকাণ্ডের যথাযথ মূল্যায়ন করা জাতির কর্তব্য।

লুৎফর বাহিনী

নোয়াখালী

লুৎফর বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে বর্তমান নোয়াখালী জেলায় গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি আঞ্চলিক দল। দলটি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টি যুদ্ধ করেছিল। এই বাহিনীর প্রধান সামরিক নেতা ছিলেন সুবেদার লুৎফর রহমান। লুৎফর রহমানের নামানুসারে যুদ্ধকালেই এই বাহিনীর পরিচিতি হয় 'লুৎফর বাহিনী' নামে।[৭৭] উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের অন্যতম ২নং সেক্টরাধীন রাজনগর সাব সেক্টরে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ যে 'গণবাহিনী'র উল্লেখ করেছেন, এই 'গণবাহিনী'ই প্রকৃতপক্ষে লুৎফর বাহিনী।[৭৮]

সুবেদার লুৎফর রহমান (পরবর্তীকালে অনারারি ক্যাপ্টেন উপাধি প্রাপ্ত) ১৯২৫ সালে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার ১নং জয়াগ ইউনিয়নভুক্ত আনন্দীপুর গ্রামের সুপরিচিত হামিদ উল্লাহ মুন্সী পণ্ডিত বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম বশির উল্লাহ মুন্সী। লুৎফর রহমান ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চলে আসেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি ১০৭ ব্রিগেডের সদস্য হিসেবে যশোরে ছিলেন।[৭৯] যুদ্ধ শুরু হলে তিনি সেনানিবাস থেকে পালিয়ে ৩০ অথবা ৩১ মার্চ নোয়াখালীতে চলে আসেন ও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।[৮০]

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। শহিদ জহুরুল হকের বাড়ি নোয়াখালীর সুধারাম থানাধীন সোনাপুরে। নোয়াখালীর সর্বস্তরের মানুষ সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যাকাণ্ডের জন্য তৎকালীন সরকারকে দায়ী করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ সর্বদলের উদ্যোগে ও নির্দেশনায় 'শোক মিছিল, গায়েবানা জানাজা ও কালো পতাকা উত্তোলন' করা হয়।[৮১] জহুরুল হকের এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গণঅসন্তোষ ধীরে ধীরে নোয়াখালীসহ সারাদেশে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই ঘটনার রেশ শেষ হতে না হতেই নোয়াখালীবাসী আবারও তৎকালীন প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের তরফ থেকে পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব ও দুর্যোগ উত্তর ত্রাণ তৎপরতা এবং উদ্ধার অভিযানে সরকারের দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার কারণে নোয়াখালীর জান ও মালের বিরাট ক্ষয় স্থানীয় জনগণকে সরকার বিদ্বেষী করে তোলে।[৮২]

১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীকালে নোয়াখালীর সাধারণ জনতা আরো একবার চরম আঘাত পায় সরকারের ১ মার্চ ১৯৭১ এর ঘোষণায়। এদিন সরকার প্রধান ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী জাতীয় পরিষদের সদস্যদের ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন বাতিল ও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। সরকারের এই পদক্ষেপে সারাদেশের মানুষের মতো নোয়াখালীবাসীও বুঝলেন যে, তারা দেশের শাসক হিসেবে যাদেরকে রায় দিয়েছেন, সরকার সে রায় গ্রহণ না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। সরকারের এই ক্ষমতা লিপ্সু মানসিকতায় নোয়াখালীর সর্বস্তরের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়। সরকারের এই হঠকারি সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতা

শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালনের ডাক দেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবের ডাকে ৩ মার্চ থেকেই 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়ে যায়।

নোয়াখালীতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব লক্ষিত হয় দ্রুতই। এবং আন্দোলন হয়ে ওঠে সর্বদলীয়। ৩ মার্চ নোয়াখালী টাউন হলে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারবিরোধী সর্বদলীয় সভায় ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ[৮৩]:

১. শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার	আহ্বায়ক
২. আব্দুল মালেক উকিল	সদস্য
৩. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ	সদস্য
৪. অধ্যাপক মো. হানিফ	সদস্য
৫. জয়নাল আবেদীন	সদস্য
৬. মমিন উল্লাহ	সদস্য
৭. সারোয়ার ই-দ্বীন	সদস্য
৮. মৃণাল কান্তি মজুমদার	সদস্য
৯. জয়নাল আবেদীন	সদস্য

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশনানুযায়ী নোয়াখালী জেলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মাহমুদুর রহমান বেলায়েত ও মোমিন উল্লাহ মিয়ার নেতৃত্বে এই পরিষদ কাজ করতে থাকে।[৮৪]

আওয়ামী লীগের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ ছিল দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে দলের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার দিন। নোয়াখালীর নেতৃবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় এ দিন নোয়াখালীর প্রতিটি থানা থেকে ২টি করে বাসভর্তি লোক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় উপস্থিত হয়।[৮৫] শেখ মুজিবের 'অহিংস আন্দোলন' এর ডাকে সাড়া দিয়ে নোয়াখালীর নেতৃবৃন্দ জেলাব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ পালন করতে শুরু করেন। এছাড়া ৮ মার্চে ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল:

১. খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত রাখা।
২. সরকারি, আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও আদালতে হরতাল পালন।
৩. স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ রাখা।
৪. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা।
৫. কালো পতাকা উত্তোলন করা।
৬. প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার প্রস্তুতি নেয়া।[৮৬]

নোয়াখালী জেলা ন্যাপ ১৮ মার্চ ১৯৭১ এ চৌমুহনী রেলওয়ে ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে। সভায় ন্যাপ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র ইউনিয়নের জেলা নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় -

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত ৬ দফাকে সমর্থন করেন
(খ) শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের আহ্বান জানান
(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য কমানোর দাবি জানান
(ঘ) মণি সিংহ, মির্জা আব্দুল হাই এর মুক্তির দাবি জানান

(ঙ) বাংলার মুক্তি সংগ্রামে নিহতদের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দাবি করার পাশাপাশি কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৮৭]

নোয়াখালীর বসুরহাট থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঐ একই দিন একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তাগণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, এ মাসেই (১৩-১৯ মার্চ) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ঢাকায় চলছিল। এ সভা থেকে প্রত্যেক জেলাতে বাংলাদেশের নতুন পতাকা পাঠানো হয়। নোয়াখালীতে ১৯ মার্চ এই পতাকা নিয়ে আসেন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোমিন উল্লাহ। ২০ মার্চ ট্রাংক রোডে এই পতাকা প্রথমবারের মতো উত্তোলিত হয় ফেনীর তৎকালীন এম পি খাজা আহমদের হাতে।[৮৮] ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস'-এ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলনের ডাক দেয়া হয়। নোয়াখালীতে এদিন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দুটি পতাকায় উত্তোলন করা হয়।[৮৯]

২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যদল গণহত্যা শুরু করেছে এমন খবর ২৬ মার্চ ভোরবেলা নোয়াখালীতে পৌঁছে জেলা প্রশাসক জনাব মনযুর উল করিমের কাছে। এই খবরটি একইসাথে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবেও আসে।[৯০] পুলিশ ভি এইচ এফ থেকে খবরটি জানা এবং তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ার পর নোয়াখালী সার্কিট হাউজ লাউঞ্জে সর্বদলীয় গণমানুষের একটি বৈঠক আহ্বান করেন জনাব মনযূর উল করিম। ২৬ মার্চ সকাল ৮টায় শুরু হওয়া এই সভায় জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল, শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার কচিসহ মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, ন্যাপ, ছাত্র ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[৯১] সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে জেলা প্রশাসকসহ পুলিশ সুপার আব্দুল হাকিম, এ ডি সি ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমান, সদর মহকুমা প্রশাসক আইয়ুব আলী, আনসার এ্যাটজুটেন্ট সিরাজুল হক, আর আই সাদেক খান চৌধুরী, সুধারাম থানার ওসি নুর মোহাম্মদ চৌধুরী, এন এস আই ইন্সপেক্টর হায়দার আলীসহ অনেকে উপস্থিত হন। এই সভায় আরও ছিলেন মাহবুবুল আলম চাষী, সাংবাদিক এম এ কামাল (ইংলিশ কামাল), সমবায় কর্মী নুরুন্নবী চৌধুরী, প্রমুখ। উল্লেখ্য এই দিন সার্কিট হাউজে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল অবস্থান করছিলেন।[৯২]

সার্কিট হাউজের এই সভায় আব্দুল মালেক উকিলসহ বক্তাগণ স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সভা শেষে আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে একটি জঙ্গি মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে নোয়াখালী টাউন হলের পাবলিক লাইব্রেরিতে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেন।[৯৩] এখানেই নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়[৯৪]:

নাম	পদবি
আব্দুল মালেক উকিল	আহ্বায়ক
নুরুল হক মিয়া	সদস্য সচিব
আজিজুল হক এম এ	সদস্য
শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার কচি	সদস্য
অধ্যাপক মো. হানিফ	সদস্য
শাখাওয়াৎউল্লা	সদস্য
আব্দুর রশিদ	সদস্য
হাজী ইদ্রিস	সদস্য
আবু সাঈদ	সদস্য
খাজা আহম্মদ	সদস্য

সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে সেনাসদস্য, আনসার, পুলিশ, ইপিআর, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগসহ সর্বদল ও শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরি শুরু হয়। ২৭ মার্চ নোয়াখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য আরেকটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়। ২৬ মার্চেই সংগ্রাম কমিটি প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারি অস্ত্রাগার থেকে গোলাবারুদ ও রাইফেল পেয়ে যায় এবং মাইজদী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়। স্মর্তব্য যে, নোয়াখালী জেলা সংগ্রাম কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হওয়ার পরপরই এ জেলার সব থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। নোয়াখালী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত হানাদারমুক্ত ছিল।[৯৫] কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে লাকসাম হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৩ এপ্রিল নোয়াখালীতে অবস্থান নেয়। ইতোমধ্যে ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ায় এবং কৌশলগত কারণে জেলার আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম কমিটির নেতাদের অধিকাংশই ভারতে গমন করেন।[৯৬] নেতৃবৃন্দের এলাকা ত্যাগের ফলে নোয়াখালীতে নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটে সুবেদার লুৎফর রহমান নোয়াখালী এলাকায় প্রধান সমর নেতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় যুক্ত হন।

সংগঠন

নোয়াখালীর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে জেলা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় মুক্তিযোদ্ধাদের যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছিল, তা আরও বেশি জোরদার হয় এপ্রিলের শুরুতে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী এলাকার কৃতি সন্তান সুবেদার লুৎফর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের মধ্য দিয়ে। এরপর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও জেলা প্রশাসক মনযূর উল করিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নোয়াখালীর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুবেদার লুৎফর রহমানের উপর।[৯৭]এই দায়িত্ব পেয়ে সুবেদার লুৎফর নোয়াখালীকে শত্রুমুক্ত রাখতে পরিকল্পনা শুরু করেন। এজন্য, তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশের ৭৬ জন নিয়মিত সৈন্যের সমন্বয়ে নোয়াখালীর প্রবেশ মুখগুলোতে অবস্থান নেন।

১০ এপ্রিল কুমিল্লার লাকসামে প্রথমবার লুৎফর বাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দলের সংঘর্ষ হয়। পরবর্তীকালে ২০ এপ্রিল নোয়াখালীমুখি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দলকে তারা নাথেরপেটুয়াতে বাধা দেন। ২১ এপ্রিল পুনরায় এই অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যকে সোনাইমুড়ী রেলস্টেশনে এ্যাম্বুশ করা হয়। কিন্তু, লুৎফর বাহিনীর সদস্যগণ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। ২২ এপ্রিল রাতে তারা সোনাইমুড়ী দখল করে ২৩ এপ্রিল চৌমুহনী দখল করেন। এদিনই তারা বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং মাইজদী পি টি আইতে ক্যাম্প স্থাপন করেন।[৯৮]

পাকিস্তানি সৈন্যরা অতি দ্রুত নোয়াখালীর অধিকাংশ দখল করে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ২৪ এপ্রিল খান সেনাদের একটি দল চৌমুহনী থেকে লক্ষীপুরের দিকে অগ্রসর হলে ফেনাঘাটার জয়নারায়ণপুর ব্রিজের নিকট লুৎফর বাহিনীর একটি দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণ পরিচালিত হয় লুৎফর বাহিনীর একটি গ্রুপের কমান্ডার সফি উল্লাহের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২ জন যোদ্ধা শহিদ হন এবং স্থানীয় চন্দ্রগঞ্জ বাজারে পাকিস্তানি সৈন্যদল আগুন ধরিয়ে দেয়।[৯৯] এর পরদিনই বগাদিয়ার বিপুলাশহরে লুৎফর বাহিনীর পরিকল্পনায় শত্রুসৈন্যের একটি দলকে এ্যাম্বুশ করা হয়।[১০০] কিন্তু, এ ধরনের ছোটো এবং অসংগঠিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাহীন প্রতিরোধের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। তারা অচিরেই নোয়াখালী শহরসহ অধিকাংশ থানা শহর ও এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এমন অবস্থায় ২৯ এপ্রিল আবির পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুবেদার লুৎফর রহমানের সহযোগিতায় ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করা হয় এবং সুবেদার অলিউল্লাহ, সুবেদার শামছুল হক, হাবিলদার মমতাজ, হাবিলদার রুহুল আমীন, হাবিলদার জামালকে গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ২ মে

আবিরপাড়ায় আওয়ামী লীগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সংগ্রাম কমিটিকে পুনরায় পুনর্গঠন করা হয় এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বাধীন দলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন খালেদ মোহাম্মদ আলী, সম্পাদক ছিলেন আবুল খায়ের ভূঞা, সদস্য হিসেবে ছিলেন শহিদ রুহুল আমীন, গাজী আমিন উল্লাহ, আলী আহাম্মদ চৌধুরী, ক্বারী করিম উল্লাহ, আব্দুর রবসহ প্রমুখ।[১০১]

নবগঠিত সংগ্রাম কমিটি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণেই সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। সুবেদার লুৎফর ছিলেন এই বাহিনীর প্রধান সামরিক নেতা। তার নেতৃত্বে নোয়াখালীতে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন উপদলের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। ২৬ মে লুৎফর রহমানের নির্দেশে তাঁর বাহিনীর একটি দল সোনাইমুড়ীর দেওয়ানজীর হাট রেলওয়ে পুলের নিকট শত্রুদলকে আক্রমণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা আক্রমণ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা নোয়াখালীর উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।[১০২] ২৬ মে'র এই অভিযানের পর আবিরপাড়ায় গঠিত সংগ্রাম কমিটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ অবস্থায় নান্দিয়াপাড়ার ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা কামালের বাড়িকে লুৎফর বাহিনীর হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে।[১০৩] সুবেদার লুৎফর রহমানের বাহিনীর সামরিক পরিকল্পনায় নোয়াখালীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে কয়েকজন গ্রুপ কমান্ডারকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় ২৯ এপ্রিল আবিরপাড়ার সভাতেই।[১০৪] ৩ মে ক্বারী করিম উল্লাহর ছয়ানীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নোয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য জনাব মোশাররফ হোসেনকে গ্রুপ কমান্ডার করে একটি দল রাখার সিদ্ধান্ত হয়।[১০৫]

লুৎফর বাহিনী বেসামরিক নেতৃবৃন্দ ও সামরিক নেতৃবৃন্দের সমন্বিত সিদ্ধান্তে পরিচালিত হতো। বিভিন্ন সময় নেতৃবৃন্দ নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে বৈঠকে মিলিত হয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন। এভাবেই এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত লুৎফর বাহিনী নোয়াখালীর মুক্তিযুদ্ধে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।[১০৬] ইতোমধ্যে প্রবাসী সরকারের প্রত্যক্ষ তৎপরতায় জুলাই মাসে বাংলাদেশের সমগ্র রণাঙ্গনকে যে ১১টি সেক্টর ভাগ করা হয়, নোয়াখালীর বৃহত্তম অংশ এই বিভাজনে ২নং সেক্টরের রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীন হয়ে যায়।[১০৭] এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এর অধীন লুৎফর বাহিনী ১৩নং কোম্পানি হিসেবে এবং সুবেদার লুৎফর রহমান ১৩নং কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পান।[১০৮] সুবেদার লুৎফরের বাহিনীকে এসময় ৫টি জোনে বিভক্ত করে নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা শুরু হয়। জোন ও জোন কমান্ডারগণ হলো[১০৯]:

জোন 'এ' (আলফা)	নায়েক সুবেদার ওয়ালি উল্লাহ ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া
জোন 'বি' (ব্রেভো)	সুবেদার শামছুল হক
জোন 'সি' (চার্লি)	মোশাররফ হোসেন
জোন 'ডি' (ডেল্টা)	রফিক উল্লাহ
জোন 'ই' (ইকো)	আবুল কালাম আজাদ

নোয়াখালীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নতুনভাবে বিভাজিত করার পর সুবেদার লুৎফরের উপর নোয়াখালী সদর এলাকা প্রতিরক্ষার ভার পড়ে।[১১০] সুতরাং, তার বাহিনীর কার্যক্রম আরো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু একই সাথে এই দায়িত্ব আরো চ্যালেঞ্জিং হয়। কারণ, নোয়াখালী সদর ততোদিনে পাকিস্তানি সেনাবহিনী ও তাদের সহযোগীদের আয়ত্তের মধ্যে। এই কারণে সুবেদার লুৎফর তার বাহিনীকে সেপ্টেম্বরে চার ভাগে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করেন। বিভাজনটি ছিল নিম্নরূপ[১১১]:

সদর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ	সুবেদার লুৎফর
সদর পূর্ব-দক্ষিণ	সুবেদার ওয়ালিউল্লাহ
সদর পূর্ব-উত্তর	নায়েক সুবেদার শামসুল হক
সদর পশ্চিম-উত্তর	নায়েক সুবেদার ইসহাক

উল্লিখিত সামরিক সংগঠনের বাইরে লুৎফর বাহিনীর অধীন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রুপস ছিল। নায়েক আবুল হোসেনের নেতৃত্বে এই ট্রুপস বিভিন্ন অভিযান চালাত।[১১২] অসুস্থ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বেসামরিক জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এ বাহিনীর একটি স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক দল ছিল। চিকিৎসকগণ লুৎফর বাহিনীসহ যেকোনো মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিতেন। ডা. আনিসুজ্জামান, ডা. নুরেজ্জামান চৌধুরী, ডা. কৃষ্ণ গোপাল, ডা. নগেন্দ্র কুমার সাহা, ডা. লুৎফর রহমান চিকিৎসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[১১৩] এছাড়াও লুৎফর বাহিনী যুদ্ধকালে বিঘ্নিত আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। লুৎফর রহমান ও তার বাহিনী তাদের আয়ত্তাধীন এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ডাকাত, দুষ্কৃতকারী ও রাজাকার-দালালদের শাস্তি দিয়ে, প্রয়োজনে হত্যা করে অপরাধীদের হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। এর ফলে, অতিশীঘ্রই লুৎফর বাহিনীর উপর স্থানীয় জনগণের আস্থা তৈরি হয়েছিল।[১১৪] প্রকৃত অর্থে, যুদ্ধকালে লুৎফর রহমানই ছিলেন এই এলাকার প্রধান প্রশাসক।[১১৫]

অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ

২৬ মার্চেই নোয়াখালী সংগ্রাম কমিটির ব্যবস্থাপনায় মাইজদী পি টি আই-তে প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয় মাইজদী কোর্টে।[১১৬] এছাড়া নোয়াখালীর বিভিন্ন থানা সংগ্রাম কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন থানার বহু স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। ৩০৩ রাইফেল, ডামি রাইফেল দিয়েই এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চলতে থাকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত। ২৩ এপ্রিল নোয়াখালী শত্রুবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের লুৎফর রহমান সংগ্রাম কমিটির কয়েকজনের তৎপরতায় পুনরায় সংগঠিত করতে শুরু করেন। স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য লুৎফর বাহিনী নোয়াখালী সদর মহকুমাসহ বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হল ১নং পিতাম্বরপুর জব্বার কন্ট্রাক্টরের বাড়ি, ২নং উলুপাড়া পরানপুর ভূঁইয়া বাড়ি, পাল্লা বাজার, চাঁটখিল পাটোয়ারী বাড়ি, খিলপাড়া স্কুল মাঠ, কড়িহাঁটি স্কুল মাঠ, আবিরপাড়া স্কুল মাঠ, কালিকাপুর, দেওটি, জয়াগ, নান্দিয়াপাড়া স্কুল মাঠ, বদল কোর্ট চেয়ারম্যান বাড়ি, পাঁচগাও কাচারি বাজার ইত্যাদি।[১১৭]

প্রতিরোধ পর্বে নোয়াখালীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল খুবই হালকা ধরনের। প্রথমদিকে অস্ত্র বলতে ছিল ১টি এসএমজি, ২টি স্টেনগান, কিছু ৩০৩ রাইফেল, কয়েকটি হাত বোমা ও ৪/৫টি গাদা বন্দুক।[১১৮] এসব অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। সুতরাং অস্ত্রের প্রয়োজনে সংগ্রাম কমিটিসহ সুবেদার লুৎফর তৎপর হন। এসময় সুবেদার লুৎফরকে ২৩টি রাইফেল সংগ্রহ করে দেন জনাব মোশাররফ হোসেন।[১১৯] এছাড়া মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জনাব আলী আহমদ চৌধুরীর সহযোগিতায় নোয়াখালী খালের দক্ষিণের চর এলাকা থেকে ৫১টি রাইফেল পাওয়া যায়।[১২০] এসব অস্ত্রের বাইরেও বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনী থেকে অস্ত্রসহ পালিয়ে আসা সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্রও লুৎফর বাহিনীর অস্ত্র চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, লুৎফর বাহিনীর অস্ত্রের মূল উৎস হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাসদস্য ও রাজাকার দালালদের অস্ত্রশস্ত্র। মে ১১ তারিখে লুৎফর বাহিনীর সাথে শত্রুসৈন্যর সংঘর্ষ বাধে। এ যুদ্ধ শেষে লুৎফর বাহিনী বেশকিছু অস্ত্র পায়। অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছিল ৫টি স্বয়ংক্রিয় চায়নিজ রাইফেল, ৬টি চায়নিজ স্টেনগান, ১টি

রকেট লাঞ্চার, ১টি এলএমজি এবং অনেক বোমা ও গোলাবারুদ।[১২১] এরকম অসংখ্য সংঘর্ষ ও যুদ্ধ থেকে পাওয়া শত্রুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুৎফর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, লুৎফর বাহিনী ২নং সেক্টর কমান্ডারের নিকট থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দফায় বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিল।[১২২] সুবেদার লুৎফর সংগৃহীত এসব অস্ত্রশস্ত্র রাখার জন্য নির্দিষ্ট এবং একক কোনো স্থান ব্যবহার করেননি। তবে, অস্ত্রাগার হিসেবে সুবেদার লুৎফর তার নিজ বাড়ি (আনন্দীপুর), সুবেদার শামছুল হকের উলুপাড়ার বাড়ি, কানকিরহাটের হাজি ইদ্রিসের বাড়ি, কাদিরপুরের সেকান্দার উকিলের বাড়ি, উলুপাড়ার দরবান বাড়ি, আব্দুল লতিফ বিলাতির বাড়ি ইত্যাদি স্থান ব্যবহার করতেন।[১২৩]

আওতাভুক্ত এলাকা

এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত লুৎফর বাহিনী তৎকালীন বৃহত্তর নোয়াখালী তথা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী অঞ্চলের বৃহত্তম অংশে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা কার্যক্রম বজায় রাখে। প্রকৃতপক্ষে, নোয়াখালী সংগ্রাম পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় এই বাহিনীর ভ্রূণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২৯ এপ্রিল আবিরপাড়ায় গঠিত সংগ্রাম কমিটির প্রচ্ছন্ন ও সর্বাত্মক সহযোগিতায় এবং সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে এই বাহিনী নোয়াখালী ও লক্ষীপুরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

কিন্তু আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ২নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার সুবেদার লুৎফর রহমানের উপর নোয়াখালী সদর এলাকা রক্ষার ভার অর্পণ করে।[১২৪] এরপর থেকে লুৎফর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা আরো নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে জুলাই পর্যন্ত এই বাহিনী কুমিল্লার লাকসাম, পুরো নোয়াখালী, লক্ষীপুরের রামগঞ্জ, রায়পুর ও ফেনীর পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশে সক্রিয় ছিল এবং আগস্ট থেকে বিজয় অবধি এই বাহিনীর কার্যপরিধি ছিল নোয়াখালী সদর এলাকা। এছাড়া, যুদ্ধ কৌশল ও সাব-সেক্টরের নির্দেশ মোতাবেক সুবেদার লুৎফর তার বাহিনী নিয়ে নোয়াখালী সদরের বাইরেও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

লুৎফর বাহিনী যুদ্ধের প্রায় পুরো সময় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। শত্রুসৈন্যের গমনাগমন পথে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে হতাহত করা এবং তাদের যাতায়াত যাতে নির্বিঘ্ন, ভীতিহীন ও চ্যালেঞ্জহীন না হয়, সেটিই এই বাহিনীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া কখনো কখনো বিশেষ করে যুদ্ধের শেষ দিকে এ বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, লুৎফর বাহিনীর যোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মুজিব বাহিনীসহ অন্যান্য এলাকার

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেও সমন্বয় করে শত্রুর মোকাবেলা করেছে। উল্লেখ্য, অত্র এলাকায় লুৎফর বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৩ পদাতিক ব্রিগেডের ২৯ বেলুচ রেজিমেন্ট ও ২১ আজাদ কাশ্মীর রিজার্ভ ফোর্স-এর একাংশ এবং ১১৭ পদাতিক ব্রিগেডের ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট-এর একাংশকে মোকাবেলা করেছিল।[১২৫] যুদ্ধকালীন নয় মাসে লুৎফর বাহিনী নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার দালালদের সাথে ছোট বড় অসংখ্য যুদ্ধে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এসব যুদ্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

লাকসাম অভিযান[১২৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়ঃ ১০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা।

অভিযানের উদ্দেশ্যঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে লাকসাম হয়ে নোয়াখালী প্রবেশ করতে পারে ভেবে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাকসামের একটু উত্তরে বাঘমারা-লাকসাম সড়কে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল পাঠানো হয়। মূলত শত্রুসৈন্যকে বাধা দেওয়াই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্রঃ সুবেদার লুৎফর রহমানসহ ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা ২টি এলএমজি এবং বাকি সব ৩০৩ রাইফেল নিয়ে এ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণঃ পাকিস্তানি সৈন্যদল সন্ধ্যা ৬টার পর লাকসামে প্রবেশ করে। লাকসামের একটু উত্তরে বাঘমারা-লাকসাম সড়কে তারা সুবেদার লুৎফর বাহিনীর গুলির রেঞ্জে পড়ে যায়। সাথে সাথে সুবেদার লুৎফর ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা একসাথে পাকিস্তানি সেনাদেরকে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আঘাতে অপর পক্ষের ২ জন লেফটেন্যান্টসহ ২৬ জন সদস্য নিহত হন ও বেশ কিছু সদস্য আহত হন। এই ধাক্কা সামলে নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যগণও ভারী অস্ত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করেন। দুই পক্ষেই প্রচুর গোলাগুলি চলতে থাকে। শত্রুপক্ষের ২টি ট্রাকে মুক্তিযোদ্ধারা আগুন ধরিয়ে দেন। প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী এই সম্মুখ যুদ্ধ চলে। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা স্থান ত্যাগ করেন।

ফলাফলঃ শত্রুদলের ২৬ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়। লুৎফর বাহিনীর গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে তারা পিছু হটে। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদল লাকসাম দখল করে নেয়।

নাথেরপেটুয়া অভিযান[১২৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়ঃ ১১ এপ্রিল ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

অভিযানের উদ্দেশ্যঃ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী লাকসাম থেকে নোয়াখালী দখলের উদ্দেশ্যে এদিন রওনা হয়। শত্রুসৈন্য যাতে নোয়াখালীতে প্রবেশ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই লাকসাম-নোয়াখালী রুটের নাথেরপেটুয়া স্টেশনের নিকটে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্রঃ লুৎফর বাহিনীর ৩ প্লাটুন সৈন্য সুবেদার লুৎফর, সুবেদার সিরাজ ও সুবেদার জব্বারের নির্দেশনায় যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এলএমজি, এসএলআর ও ৩০৩ রাইফেল ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদলের নিকট মর্টার, নাপাম বোমা ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র ছিল। শত্রুপক্ষের বিমান সেনারাও এ যুদ্ধে যোগ দেন।

অভিযানের বিবরণ: সুবেদার লুৎফর রহমান-এর নেতৃত্বে একটি কোম্পানি নাথের পেটুয়ায় গিয়ে স্টেশনের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে অবস্থান নেয়। সুবেদার লুৎফর রহমান তার প্লাটুন নিয়ে রেলস্টেশনের পশ্চিম পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি তার প্লাটুনের প্রত্যেককে সেকশনের নিজ নিজ অবস্থান দেখিয়ে দেন এবং প্রতিরক্ষার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রতিরক্ষার জন্য যখন খনন কার্য চলছিল তখন হঠাৎ করেই নায়েক সিরাজ সতর্ক সংকেত দ্বারা লুৎফর রহমানকে দেখান যে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্রলিং করে মুক্তিযোদ্ধাদের পজিশনের দিকে এগিয়ে আসছে। সুবেদার লুৎফর রহমান দেখলেন সত্যি সত্যিই শত্রুরা ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে প্রায় এক কোম্পানি এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছে যা অবিশ্বাস্য। লুৎফর রহমান তা দেখামাত্র এস এল আর-এর সাহায্যে গুলি শুরু করেন। নায়েক সিরাজও এলএমজির সাহায্যে শত্রুর ওপর আক্রমণ করেন। এ অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যদল তাদের পেছনের কোম্পানি নিয়ে দ্বিগুণবেগে তাদের সাপোর্টিং বা সাহায্যকারী অস্ত্রের দ্বারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও তারা ব্যর্থ হয়। তারা কিছুক্ষণ পরেই মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর আর্টিলারি এবং মর্টারের গোলাবর্ষণ শুরু করেন। পূর্বদিক থেকে যখন শত্রুপক্ষের ওপর এলএমজি ফায়ার শুরু হয় তখন শত্রুরাও দুই নম্বর প্লাটুনের ওপর অনবরত শেলিং শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে একজন মুক্তিযোদ্ধা তৎক্ষণাৎ শহিদ হন এবং একজন গুরুতরভাবে আহত হন। সুবেদার লুৎফর রহমান সে মুহূর্তে বাধ্য হয়ে তার প্লাটুন নিয়ে দুইশত গজ পিছনের একটি ডোবায় পজিশন নেন। ততক্ষণে শত্রুর দুই প্লাটুনের মতো সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম পজিশনটি দখল করে ফেলে। এর মাঝে দ্বিতীয় প্লাটুনটি প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয় এবং পুনরায় শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এমন সময় হঠাৎ তিনটি যুদ্ধ বিমান মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ বিমান থেকে প্রচুর পরিমাণে গুলিবর্ষণ করা হয়। অবশ্য তাতে করে মুক্তিবাহিনীর সামনে বা পেছনে কোন ক্ষতি হয়নি। এভাবে ভোর থেকে শুরু করে বিকেল চারটা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি চলতে থাকে। এ অবস্থায় কারো পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। সুবেদার লুৎফর রহমান পূর্বদিকের মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তার একজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের খবর আনতে পাঠান। ততক্ষণে পূর্বদিকের গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। সেই মুক্তিযোদ্ধা ফিরে এসে জানায় যে, তাদের দুই প্লাটুন স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ কথা শোনার পর সুবেদার লুৎফর রহমান (চতুর্মুখী প্রতিরক্ষা অবস্থান) অলরাউন্ড ডিফেন্স গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা রেকি পেট্রলিং (অনুসন্ধান) শুরু করে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান লক্ষ্য করে পেট্রোল পাঠায়। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে দু'ঘণ্টা যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের যাবতীয় অস্ত্র দিয়ে গোলাগুলি শুরু করে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখান থেকে অবস্থান পরিবর্তন করে চলে যায়।।

ফলাফল: মুক্তিবাহিনী অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তবে মুক্তিবাহিনীর ২ জন সদস্য শহিদ হন। শত্রুবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চিত জানা যায়নি।

ফেনাঘাটা অভিযান[১২৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৪ এপ্রিল আনুমানিক দুপুর ১২টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৩ এপ্রিল নোয়াখালী শহর দখল করে চৌমুহনী টেকনিক্যালে ঘাঁটি স্থাপন করে। ২৪ এপ্রিল টেকনিক্যাল হতে লক্ষ্মীপুর অভিমুখে হানাদারদের একটি গ্রুপ রওনা হয়। ফেনাঘাটার জয়নারায়ণপুর পুলে এদেরকে আক্রমণ করা হয় মূলত এই উদ্দেশ্যে যাতে লক্ষ্মীপুর এলাকা পাকিস্তানি দখলদারিত্বে পরিণত না হয় ।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: লুৎফর বাহিনীর কমান্ডার শফিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন একদল মুক্তিযোদ্ধা এই যুদ্ধে অংশ নেন। এদের কাছে এল এম জিসহ ৩০৩ রাইফেল ছিল।

অভিযানের বিবরণ: ফেনাঘাটা বেগমগঞ্জ থানায় অবস্থিত। ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি অংশ টেকনিক্যাল থেকে লক্ষীপুরের দিকে রওয়ানা দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যদলের সামনে একটি লাল জীপ ছিল। প্রায় দু' শতাধিক পদাতিক বাহিনী মিলিটারি পুলিশের পেছনে সারিবদ্ধভাবে রওয়ানা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদলের রওনা হওয়ার খবর পেয়ে তাদের অবস্থানের উদ্দেশ্যে সুবেদার লুৎফর রহমান গ্রুপের কমান্ডার শফিউল্লাহর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধাকে প্রেরণ করেন। মুক্তিবাহিনীর এ দলটি ফেনাঘাটার পশ্চিমে জয়নারায়ণপুর সাঁকোর গোড়ায় ওৎ পেতে থাকে। আনুমানিক দুপুর তিনটার সময় পাকিস্তানি সৈন্যদলের জিপটি সাঁকোর গোড়ায় পৌঁছলে মুক্তিবাহিনীর জিপটির ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। তৎক্ষণাৎ জিপটি অকেজো হয়ে যায়। পদাতিক পাকিস্তানি সৈন্যদল মুক্তিবাহিনীর উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর গুলির মজুদ শেষ হয়ে যায় ও পেছনের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর গুলি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদল ত্বরিত গতিতে খাল পার হয়ে ধানক্ষেত ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানি সৈন্যদল ধান ক্ষেতে দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে ফেলে এবং সাথে সাথে গুলি করে তাদের হত্যা করে। পাকিস্তানি সৈন্যদল জয়নারায়ণপুর গ্রামের আবদুল হাই পাটোওয়ারী, ডা. সুলতান আহম্মদ, আনসার আলী, এবাদ উল্লাহ এই চার জনকে গুলি করে হত্যা করে এবং জয়নারায়ণপুর গ্রামের উনিশটি বাড়ি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। সিএন্ডবি পুলের পশ্চিম দিকে আমিন বাজারসহ মিয়াপুরের তিনটি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন তাদের লাশ স্থানীয় জনসাধারণ জয়নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নিয়ে রাখে। রাত আটটার সময় তাদের দুজনের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। শহিদ দুজনের নামই ছিল মোহাম্মদ ইসমাইল। এদেও একজনের বাড়ি বেগমগঞ্জ থানার ১০ নং আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর গ্রামে। অন্যজন সম্ভবত কুমিল্লার বাসিন্দা। শহিদ মুক্তিযোদ্ধা দুজনেই ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। তাদেরকে মিয়ার বাজারের সাথে মিজিবাড়ির কবর স্থানে দাফন করা হয়।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে শত্রুদলের একটি জীপ নষ্ট হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২ জন শহিদ হন এবং শত্রুবাহিনী চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজারসহ জগদীশপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়া ২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হানাদার দল হত্যা করে।

বগাদিয়া অভিযান

বগাদিয়া বেগমগঞ্জের একটি ইউনিয়ন যা সোনাইমুড়ী রেলস্টেশন থেকে ১ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে এখানে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছিল। এই অংশে বগাদিয়ার ২য় যুদ্ধটির বর্ণনা থাকবে।[১২৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৯ মে আনুমানিক দুপুর বেলা

অভিযানের উদ্দেশ্য: নোয়াখালীর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সোনাইমুড়ী এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদলকে বাধাগ্রস্ত ও ভীতিগ্রস্ত করাই ছিল এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার লুৎফর রহমান, সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ, সুবেদার জাবেদসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, কিছু হাতবোমা ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র নিয়ে এ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: সুবেদার লুৎফর রহমান বগাদিয়াতে অবস্থানকালে খবর পান যে, চৌমুহনীতে পাকিস্তানি সৈন্যদলের তৎপরতা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। বগাদিয়াতে অবাধে পাকিস্তানি সৈন্যদল

প্রবেশ করছে। এই দুটি এলাকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সুবেদার লুৎফর রহমানের ওপর। তিনি স্থির করেন চৌমুহনীর অবস্থান তার পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তিনি সুবেদার জাবেদকে সঙ্গে নিয়ে চৌমুহনীর দিকে রওনা দেন এবং সুবেদার ওয়ালীউল্লাহকে বগাদিয়াতে এ্যাম্বুশ করার দায়িত্ব দেন । চৌমুহনী থেকে ফেরার আগেই সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ খবর পান যে, পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি পিকআপ কয়েকজন সৈন্য এবং বেশকিছু রসদসহ বগাদিয়ার দিকে আসছে। তিনি সেটিকে এ্যাম্বুশ করার নির্দেশ দেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে একটি এ্যাম্বুশ সাইট ঠিক করে তিনি সেখানে অবস্থান নেন। যখন পিকআপটি তাদের এ্যাম্বুশ অবস্থানের মাঝে চলে আসে তখন তিনি ফায়ার করার আদেশ দেন। মুক্তিযোদ্ধারা একটানা গুলিবর্ষণ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই পাকিস্তানি সৈন্য বহনকারী গাড়িটি রাস্তায় উল্টে পড়ে যায় এবং তাদের একজন জেসিওসহ মোট দুজন সৈন্য নিহত হয়। তৎক্ষণাৎ সেখানে আরো দুটি পাকিস্তানি সৈন্য ভর্তি পিকআপ এসে উপস্থিত হয় এবং দুই বাহিনীর মাঝে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। এরই মধ্যে সুবেদার লুৎফর রহমান তার দল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং সুবেদার ওয়ালীউল্লাহর সাথে যোগ দেন। শুরু হয় উভয় পক্ষের আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ। অবশ্য এক্ষেত্রে পাকিস্তানি সৈন্যদল খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল না। কারণ তাদের ওপর চতুর্দিক থেকেই আক্রমণ আসতে থাকে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশেষে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের আহত এবং নিহত সৈন্যদের নিয়ে চৌমুহনীর দিকে চলে যায়।

ফলাফল: পাকিস্তানি সৈন্যদলের কয়েকজন সদস্য হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর সুবেদার ওয়ালিউল্লাহ আহত হন। এ যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা আর বগাদিয়ার দিকে আসেনি। বগাদিয়া পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়।

ফেনাকাটা অভিযান[১৩০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৬ মে আনুমানিক দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: চন্দ্রগঞ্জ-চৌমুহনী রুটে চলাচলরত পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঁধা দেওয়া এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: নায়েক সফির নেতৃত্বাধীন ১ সেকশন সৈন্য। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ছিল এলএমজি ও ৩০৩ রাইফেল।

অভিযানের বিবরণ: চৌমুহনী চন্দ্রগঞ্জের রাস্তার ওপর অবস্থিত ফেনাকাটার পুলটি। পাকিস্তানি সৈন্যদলের যানবাহনগুলো এই পথেই যাতায়াত করতো। যা চৌমুহনী ও চন্দ্রগঞ্জের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা এই রাস্তাটি দিয়ে অবাধ চলাচল করতে পারতেন না। ফলে মুক্তিবাহিনীর জন্য এই রাস্তায় ফাঁদ পেতে পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সুবেদার লুৎফর রহমান সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি সৈন্যদলের চলাচলে পথে এ্যাম্বুশ (ফাঁদ) করবেন। ৬ মে তিনি খবর পান পাকিস্তানি সৈন্যদলের রসদ বোঝাই তিনটি ট্রাক চন্দ্রগঞ্জ থেকে চৌমুহনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সুবেদার লুৎফর রহমান নায়েক শফির একটি সেকশনকে এ্যাম্বুশ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনটি পাকিস্তানি ট্রাক মুক্তিবাহিনীর দৃষ্টিগোচর হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পরিকল্পনা মতো পাকিস্তানি সৈন্যদলের ওপর অতর্কিত হামলা করে। এর ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পাকিস্তানি সৈন্যদল পাল্টা জবাব দেয়ার পূর্বেই তাদের কয়েকজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরমুহূর্তেই তারা তাদের

ভারী অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পাকিস্তানি সেনাদের মেশিন গানের গুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের দুজন শহিদ হন।

ফলাফল: বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য এই আক্রমণে নিহত হয়। এই যুদ্ধের পর থেকে চৌমুহনী-চন্দ্রগঞ্জের রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যদল আর অবাধে চলাচল করতে পারেনি। অন্যদিকে এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ২ জন যোদ্ধা শহিদ হন।

আমিনবাজার অভিযান[১৩১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৬ আগস্ট ১৯৭১ দুপুরের পর।

অভিযানের উদ্দেশ্য: নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আমিশাপাড়া ছিল লুৎফর বাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। এই ঘাঁটি নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই শত্রুবাহিনী পার্শ্ববর্তী আমিনবাজার হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার লুৎফর রহমান, সুবেদার ওয়ালীউল্লাহসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএলআর, এসএমজি ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: শত্রুবাহিনীর একটি বিরাট দল (রাজাকার ও মিলিশিয়া সমন্বয়ে) আমিনবাজার হয়ে আমিশাপাড়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। লুৎফর বাহিনী তাদেরকে আমিনবাজারেই চারদিক থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা মোতাবেক সুবেদার ওয়ালীউল্লাহর কমান্ড শত্রুপক্ষকে প্রথমে তিনদিক দিয়ে আক্রমণ করে। আর সুবেদার লুৎফর একদল যোদ্ধা নিয়ে শত্রুদলকে পিছন দিক দিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আঘাতেই বেশ কয়েকজন রাজাকার ও মিলিশিয়া নিহত ও আহত হন। এই আক্রমণের জবাবে রাজাকার-মিলিশিয়া দলও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে লক্ষ্য করে গোলাগুলি শুরু করে। ইতোমধ্যে দু'পক্ষের গোলাগুলিতে ভীত হয়ে গ্রামবাসী এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। এই সুযোগে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া রাজাকার ও মিলিশিয়া অস্ত্র ফেলে সাধারণ লোকজনের সাথে মিশে যায়।

ফলাফল: এ যুদ্ধে ৬ জন রাজাকার নিহত ও ৪০ জন রাজাকার আহত হয়। শত্রুদলের ২১টি চায়নিজ রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

সোনাইমুড়ী-চাটখিল অভিযান[১৩২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৯ অক্টোবর ভোরবেলা। হতে এ যুদ্ধ হয়।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল লুৎফর বাহিনীর শক্তিশালী সোনাইমুড়ী ঘাঁটি দখল করা। অপরদিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে অবস্থান ধরে রাখা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার লুৎফর রহমানসহ প্রায় পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধা এই অভিযানে অংশ নেন। এ অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর ও ৩০৩ রাইফেল ছিল।

অভিযানের বিবরণ: পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্টের ৪টি কোম্পানি লাকসাম থেকে এসে কামান ও রকেটের সাহায্যে গুলি করতে করতে সোনাইমুড়ী-চাটখিল রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রযাত্রা রুখতে সুবেদার লুৎফর রহমান সোনাইমুড়ী-চাটখিল রাস্তায় তাদেরকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা খানিকটা অগোছালোভাবে আক্রমণ করেন। এ সুযোগে

পাকিস্তানি সৈন্যরা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যান। তাদের আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে পিছু হটলেও সুবেদার লুৎফর রহমান এসে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান পুনর্গঠন করে খান সেনাদের উপর সাঁড়াসি আক্রমণ চালান। উভয়পক্ষে প্রায় ৭ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে।

ফলাফল: শত্রুপক্ষের প্রায় ৭০ জন রাজাকার ও সৈন্য হতাহত হয়। এদিকে মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে শত্রুপক্ষের শেলিং-এ সাধারণ নাগরিক মারা যায় বেশ কজন।

ওদারহাট অভিযান[১৩৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৩০ অক্টোবর দুপুর ১২টায় অভিযান শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের ওদারহাটে আক্রমণের মাধ্যমে।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য ছিল ওদারহাট (উভ সাধুর হাট) রাজাকার ক্যাম্প ধ্বংস করে ফেলা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: হাবিলদার সিরাজ, হাবিলদার মতিন, হাবিলদার খালেকের ট্রুপস (প্রায় ৪০ জন) এলএজি, এসএমজি ও ৩০৩ রাইফেলসহ এ অভিযানে অংশ নিয়েছিল।

অভিযানের বিবরণ: নোয়াখালী সদর থানার ওদারহাটে (উভ সাধুর হাট) রাজাকার ক্যাম্প অবস্থিত ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলে গুলি চালাতে শুরু করলে রাজাকাররাও প্রচুর গুলি চালাতে থাকেন। প্রায় তিন ঘণ্টা গোলাগুলির পর মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে গ্রেনেড ছোঁড়ার হুমকি দিলে রাজাকাররা আত্মসমর্পণে রাজি হয়।

ফলাফল: প্রায় ৪ ঘণ্টা অভিযানে ২৬ জন রাজাকার ধৃত হয় ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

উল্লিখিত যুদ্ধাভিযান বাদে লুৎফর বাহিনীর যোদ্ধাগণ নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে কমপক্ষে ৪০টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।[১৩৪] এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদল যাতে সহজে যাতায়াত করতে না পারে, সেজন্য তারা নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের সব ব্রিজ ও পুলে নিরাপত্তা চৌকি বসিয়েছিল। লুৎফর বাহিনী পরিকল্পিতভাবে এসব ছোট-বড় ব্রিজ অথবা পুল মে মাসের শুরু থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ে ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়।[১৩৫]

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে লুৎফর বাহিনীর নিজস্ব কোনো পুস্তিকা বা পত্রিকা বা প্রকাশনা ছিল না। তবে জনঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে এই বাহিনী গ্রাম পর্যায়ে মতবিনিময় সভা ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করতো। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সামছুল হক বলেন, "মানুষকে না বুঝিয়ে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে কি তাদের সাথে মিশে থাকা যেত? সাধারণ মানুষকে আমরা সবসময় আমাদের কাজের উদ্দেশ্য জানিয়েছি। আর এর প্রমাণ পেলে তারা আমাদেরকে তাদের সর্বস্ব দিয়েছে।"[১৩৬]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

লুৎফর বাহিনী গড়ে উঠেছিল শত্রুসৈন্যের পেটের ভেতর। একদিকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ও পাশেই চাঁদপুর শহরের শত্রুসৈন্যের বিরাট ঘাঁটি, এরই মধ্যে লুৎফর বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। লুৎফর বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ শত্রুসৈন্যের বহু ক্ষয়ক্ষতি করেছিল এবং অসংখ্য রাজাকার দালালদের শাস্তি দিয়েছিল। তাদের অনেকেই মুক্তিবাহিনীর বুলেটের শিকার হয়েছিল। সে তুলনায় এ বাহিনীর

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক কম। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাসে এই বাহিনীর ১০ জন যোদ্ধা শহিদ হয়েছিল এবং ৭ জন যোদ্ধা আহত হয়েছেন।[১৩৭]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

লুৎফর বাহিনী গঠনের শুরু থেকেই প্রবাসী সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। এই বাহিনী প্রকৃত অর্থে সুবেদার লুৎফর রহমানের নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলেও এটি একটি রাজনৈতিক প্রশাসনের অধীন দায়বদ্ধ ছিল। এই রাজানৈতিক প্রশাসন হল ২ মে আবিরপাড়ায় গঠিত সংগ্রাম কমিটি। এই সংগ্রাম কমিটি আবার প্রবাসী সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেই গঠিত। উল্লেখ্য যে, এই সংগ্রাম কমিটির সহযোগিতায় সুবেদার লুৎফর তার বাহিনীর জন্য কয়েকদফায় ২নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে অস্ত্র সাহায্য পেয়েছিল।[১৩৮] এছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সুবেদার লুৎফর রহমানকে ২নং সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ নোয়াখালী সদর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আগস্টের শুরুতেই।[১৩৯] সুতরাং, লুৎফর বাহিনী ছিল ২নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার স্বীকৃত একটি মুক্তিযোদ্ধা দল।

গণমাধ্যমে লুৎফর বাহিনী

যুদ্ধকালে গণমাধ্যমে লুৎফর বাহিনীর অভিযান বা বাহিনী সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। তবে, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক, সংগঠক সত্যেন সেন প্রকাশিত *প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ* (কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭১) এ লুৎফর বাহিনীর কয়েকটি অভিযান সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এছাড়া সুনির্দিষ্ট করে লুৎফর বাহিনীর নাম উল্লেখ না করেও নোয়াখালী এলাকার বিভিন্ন যুদ্ধসাফল্য (যেগুলো ছিল আসলে লুৎফর বাহিনীর যুদ্ধসাফল্য) যুদ্ধকালে *বাংলার বাণী* ও *জয় বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ *বাংলার বাণী* পত্রিকায় লুৎফর বাহিনীর একটি যুদ্ধের খবর নিম্নোক্তভাবে প্রচারিত হয়েছিল[১৪০] "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধারা নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুর এলাকায় হানাদার সেনাদের উপর মর্টারযোগে গোলাবর্ষণ করিয়া ৪ জনকে হত্যা করেন। তাঁহারা লক্ষীপুরে খান সেনাদের ৪টি বাঙ্কারও ধ্বংস করিয়া দেন।" একই তারিখে *জয় বাংলা* পত্রিকায় লুৎফর বাহিনীর ঐ যুদ্ধের খবরটি নিম্নোক্তভাবে প্রচারিত হয়েছিল[১৪১] "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর আমাদের দুঃসাহসিক যোদ্ধারা নোয়াখালীর একটি এলাকায় শত্রু অবস্থানের ওপর এক অতর্কিত অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে ১০ জনকে খতম ও ১৬ জনকে গুরুতর রূপে আহত করেছেন।"

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

লুৎফর বাহিনীর প্রধান সুবেদার লুৎফর রহমান সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা রাষ্ট্রীয় কোনো পুরস্কার পাননি। তবে প্রাপ্ত তথ্য মতে, এ বাহিনীর সুবেদার ওয়ালীউল্লাহ, হাবিলদার রুহুল আমিন, নায়েক নূরুজ্জামান, শহিদ নায়েক আজিজুল হক বীর বিক্রম উপাধি এবং হাবিলদার নূর মোহাম্মদ, শাহজালাল আহমেদ, আবদুল হালিম বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।[১৪২] এ বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আজো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারেননি।[১৪৩]

অস্ত্র সমর্পণ

লুৎফর বাহিনীর যোদ্ধাগণ যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে বিবিধ উপায়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এসব অস্ত্রের মধ্যে প্রবাসী সরকারের নিকট থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত। নোয়াখালী ৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হলে লুৎফর বাহিনী প্রধান সুবেদার লুৎফর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ১০

জানুয়ারির পূর্বেই এ বাহিনীর সমস্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ জনাব আব্দুল মালেক উকিলের মাধ্যমে মাইজদীতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির কাছে জমা দেওয়া হয়।[১৪৪]

মূল্যায়ন

নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে। তবে, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মুক্তিযুদ্ধ কিছুটা নেতৃত্বহীন হতে হতে মে মাসের শুরুতে পুনরায় তা একটি শক্তিশালী এবং সুগঠিত নেতৃত্বের অধীন পরিচালিত হতে শুরু করে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব আবার দুই ধরনের ছিল। এক ধরনের নেতৃত্ব তৈরি হয় আবিরপাড়া সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে এবং তা ছিল মূলত রাজনৈতিক। আর এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছায়ায় প্রধানত সামরিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে সুবেদার লুৎফর রহমানের হাতে।

নোয়াখালী জেলা সংগ্রাম কমিটির অধিকাংশ নেতা ভারতে চলে গেলে বৃহত্তর নোয়াখালী বিশেষ করে নোয়াখালী-লক্ষীপুর এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সামরিক নেতা হন সুবেদার লুৎফর রহমান। এবং তার হাতকে আরও শক্তিশালী ও তার কার্যক্রমকে আরও নিয়মানুগ করে তোলে আবিরপাড়ায় গঠিত সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটির সহযোগিতায় সুবেদার লুৎফর একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলেন। মে মাসের শুরু থেকে নোয়াখালী স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বাহিনীর মাধ্যমে নোয়াখালীতে মুক্তিযুদ্ধ চলে। এর মধ্যে মে থেকে জুলাই পর্যন্ত নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুর এলাকায় এবং আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নোয়াখালী সদর এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় লুৎফর বাহিনী প্রধান সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে।

সুবেদার লুৎফর রহমান তার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অন্যূন ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছিলেন। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র-যুবক, কৃষক, শ্রমিকসহ বিবিধ পেশার মানুষ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এদের একটি অংশ লুৎফর বাহিনীতেই যুক্ত হয়েছিলেন আর আরেকটি অংশ ভারতে উচ্চ প্রশিক্ষণ নিতে চলে যায়। সুতরাং দেশের ভেতর সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা তৈরি এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সকলকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার কাজটি লুৎফর বাহিনী দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ভারতে গমনেচ্ছু মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট হিসেবে এবং ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভেতরে অবস্থান নেওয়ার সুযোগটি করে দিয়েছিল এই লুৎফর বাহিনী। এ প্রসঙ্গে নোয়াখালী জেলা বিএলএফ কমান্ডার মাহমুদুর রহমান বেলায়েত বলেন:

> আমরা যারা বি এল এফ, এফ এফ বাহিনীর সদস্য ছিলাম, তারা ভারত থেকে স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে রণাঙ্গনে যুক্ত হই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। শুরুর দিকে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে নিরাপদ আশ্রয় পেতে লুৎফর বাহিনীর সদস্যগণ নানাভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের নোয়াখালীতে যুদ্ধ পরিচালনায় এফ এফ এবং বি এল এফসহ অন্যান্য বাহিনীর সাথে কোথাও সমন্বয়হীনতা ঘটেনি।[১৪৫]

অবরুদ্ধ নোয়াখালীর জনগণের মনোবল ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছিল লুৎফর বাহিনী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে লাকসামের যুদ্ধ থেকে পরবর্তী অভিযানগুলোর অধিকাংশতে জয় অথবা কৌশলগত নিরাপদ ও প্রায় ক্ষয়ক্ষতিহীন পিছিয়ে আসা সাধারণ জনমনে স্বস্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল প্রবলভাবে। এছাড়া শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে, রাজাকার ও দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দিয়ে লুৎফর বাহিনীর যোদ্ধাগণ জনমনে আস্থার জন্ম দেয়। এ কারণে জনগণ কখনো কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে পাকিস্তানি সৈন্য ও দালালদের আক্রোশের শিকারে পরিণত হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সমর্থন দিয়ে গেছে যুদ্ধের শেষ অবধি। আর এর মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃত জনযুদ্ধে রূপদান করেছিল লুৎফর বাহিনী।

যুদ্ধের ময়দানেও লুৎফর বাহিনী একটি সফল নাম। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কাছে লুৎফর বাহিনী ও সুবেদার লুৎফর একটি আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আর এ কারণে সুবেদার লুৎফরকে ধরিয়ে দিতে হানাদার দল পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।[১৪৬] "কথিত আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সুবেদার লুৎফর রহমানকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অফিসাররা 'বাজপাখী' নাম দিয়েছিল। কারণ তার বাহিনীর হাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা বহুস্থানে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিল"।[১৪৭] এছাড়া, প্রতিরোধ পর্ব থেকে শুরু করে বিজয় অর্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবহিনী ও তার দালালদেরকে যুদ্ধের ময়দানে প্রায়ই নাস্তানাবুদ করেছিল লুৎফর বাহিনী। এই বাহিনীর যোদ্ধাগণ নোয়াখালীর প্রায় সকল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেতু বা পুল ভেঙে ফেলে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করে শত্রুদলের চলাচল প্রায় বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।[১৪৮] এছাড়া গেরিলা পদ্ধতিতে ঝটিকা আক্রমণ, সম্মুখ যুদ্ধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে লুৎফর বাহিনী এতদ্ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধকে দিয়েছিল প্রাণ, নোয়াখালী মুক্ত করে এনেছিল স্বাধীনতার সূর্য।

তথ্যসূত্র

---

১ *East Pakistan District Gazetteers: Chittagong*, East Pakistan Government Press, Dacca, 1970, p. 1

২ আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৮

৩ শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৩৬

৪ *chittagongdiv.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২০, বিকাল ৫টা

৫ এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন: জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩২

৬ চাঁদপুর ১৮৭৮ সালে কুমিল্লা জেলার অধীন একটি মহকুমা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। [*Bangladesh District Gazetteers Comilla*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1977, p. 2] ১৯৮৪ সালে চাঁদপুর জেলায় উন্নীত হয়

৭ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, চাঁদপুর মুক্তিফৌজ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৫

৮ সাক্ষাৎকার: ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও সময়: ১৩/৫ আওরঙ্গজের রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১১টা

৯ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১০ *ঐ*

১১ *ঐ*

১২ এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬৩, ৭৩

১৩ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৪ *ঐ*, পৃ. ১৩

১৫ *ঐ*, পৃ. ১৩

১৬ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, প্রকাশক: বেগম সামছুন্নাহার খানম, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ২৯

১৭ *ঐ*, পৃ. ২৯-৩৩

১৮ *ঐ*, পৃ. ৩০

১৯ সাক্ষাৎকার: গোলাম রাব্বানী, পিতা: ছেরাজ উদ্দিন আহমেদ, ১৭/১৭, মিশন রোড, চাঁদপুর সদর (৩৬০০), চাঁদপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শাহবাগ, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৭, বিকাল ৫টা

২০ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২১ *ঐ*, পৃ. ৩১

২২ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩; আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

২৩ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

২৪ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নার্গিস ভিলা, ৫৯ রজব আলী সরদার রোড, পূর্ব জুড়াইন, কদমতলী, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১৭, বিকাল ৪.৩০ মি.

২৫ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৬ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

২৭ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

২৮ *ঐ*, পৃ. ২৬

২৯ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

30 *ঐ*

৩১ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৩২ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

৩৩ *ঐ*

৩৪ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৩৫ *ঐ*

৩৬ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

৩৭ *ঐ*

৩৮ সাক্ষাৎকার: শাহ আলম, পিতা: মো. আব্দুল হাই, ২২/৬, ঢাকেশ্বরী রোড, পলাশী, লালবাগ, ঢাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫, বিকাল ৪টা

৩৯ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

৪০ সাক্ষাৎকার: ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ; ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-২১৫-তে এ বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা দেখুন

৪১ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৪২ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৪৩ *ঐ*, পৃ. ৩২-৩৩

৪৪ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৪৫ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩২৬

৪৬ সাক্ষাৎকার: গোলাম রাব্বানী, প্রাগুক্ত

৪৭ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

৪৮ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩, ৫

৪৯ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৫০ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

৫১ আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৫২ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৫৩ *ঐ*, পৃ. ৩০১

৫৪ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

৫৫ শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-৩৪; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৩৫-৩৬

৫৬ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০-৪১; শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৯

৫৭ ডা. মো. দোলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-৪৮; শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১-৬৪

৫৮ *ঐ*, পৃ. ১৫৬; *ঐ*, পৃ. ১৬৪-৬৭

৫৯ *ঐ*, পৃ. ১৫৭-৫৯; *ঐ*, পৃ. ১১১-১১৪

৬০ সাক্ষাৎকার: গোলাম রাব্বানী, প্রাগুক্ত

৬১ ডা. দেলোয়ার হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩, ২১৭-১৮

৬২ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত

৬৩ সাক্ষাৎকার: ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, প্রাগুক্ত

৬৪ সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চাঁদপুরের ভূমিকা*, চাঁদপুর মুক্তিফৌজ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫১

৬৫ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *১১তম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৭৭৯

৬৬ সাক্ষাৎকার, জহিরুল হক পাঠান, গোলাম রাব্বানী ও কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত

৬৭ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চাঁদপুরের ভূমিকা*, চাঁদপুর মুক্তিফৌজ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৩, ৪৫

[৬৮] আহমেদ উল্লাহ ভূঁইয়া (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৬৯] *ঐ*
[৭০] শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬
[৭১] *ঐ*, পৃ. ৩৯৩
[৭২] *ঐ*, পৃ. ১৯৭
[৭৩] *ঐ*, পৃ. ১৯৮-২২২
[৭৪] সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, প্রাগুক্ত
[৭৫] সাক্ষাৎকার: গোলাম রাব্বানী, প্রাগুক্ত
[৭৬] বিস্তারিত জানতে চাঁদপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে কোন গ্রন্থ/প্রতিবেদন দেখুন
[৭৭] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২২৫; আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১, ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪৬-১৪৭
[৭৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দশম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
[৭৯] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
[৮০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *নবম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
[৮১] মো. আবদুস ছাত্তার, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা*, এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ৫১
[৮২] *ঐ*, পৃ. ৫১
[৮৩] জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৩
[৮৪] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
[৮৫] *ঐ*, পৃ. ৫৯
[৮৬] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
[৮৭] *ঐ*, পৃ. ৫৫
[৮৮] *ঐ*, পৃ. ৫৫
[৮৯] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[৯০] মনযূর উল করিম, *শিলালিপিতে একাত্তর*, তপু প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ. ২১
[৯১] *ঐ*
[৯২] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী*, প্রকাশক: আলহাজ্ব আঞ্জুমান আরা বেগম, নোয়াখালী, ২০১৪, পৃ. ৩২
[৯৩] মুহাম্মদ আবু তাহের মীর্জা, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী*, প্রিন্টার্স এ্যাড, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃ. ১৫৪
[৯৪] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
[৯৫] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[৯৬] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
[৯৭] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
[৯৮] *ঐ*, পৃ. ৭৭
[৯৯] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬
[১০০] *ঐ*, পৃ. ৬৬
[১০১] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
[১০২] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
[১০৩] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬
[১০৪] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
[১০৫] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
[১০৬] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
[১০৭] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫-১৪৬
[১০৮] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[১০৯] *ঐ*
[১১০] মো, আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
[১১১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
[১১২] এ.কে.এম গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫
[১১৩] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮; এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫
[১১৪] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[১১৫] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[১১৬] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
[১১৭] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬; আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
[১১৮] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
[১১৯] এ.কে.এম. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
[১২০] *ঐ*, পৃ. ৩৫
[১২১] মো. আবদুস ছাত্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
[১২২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২ ও *১০ম খণ্ড*, পৃ. ২৬৫, ২৬৭
[১২৩] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১: আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯
[১২৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
[১২৫] আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১
[১২৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯
[১২৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৯৬-৯৭
[১২৮] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৮-৯৯
[১২৯] জোবাইদা নাসরীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-০৩
[১৩০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৭-০৮
[১৩১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭
[১৩২] *ঐ*, পৃ. ২৬৮-৬৯; *ঐ*, পৃ. ৮৪-৮৫
[১৩৩] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫
[১৩৪] দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, পৃ. ১৯৭-২০৪ ও *১০ম খণ্ড*, পৃ. ২৬৩-৭১; আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৯৪
[১৩৫] *ঐ*
[১৩৬] সাক্ষাৎকার: সামছুল হক, পিতা: সুলতান মিয়া পাটোয়ারী, গ্রাম: উলুপাড়া, ইউনিয়ন: জয়াগ, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৩ অক্টোবর ২০১৬, বিকাল ৪টা
[১৩৭] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০৪ ও *১০ম খণ্ড*, পৃ. ২৬৩-২৭১
[১৩৮] বিস্তারিত জানতে এই বাহিনীর 'অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ' অংশ দেখুন
[১৩৯] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
[১৪০] *প্রাগুক্ত,১১তম খণ্ড*, পৃ. ৭৬৫
[১৪১] *ঐ*, পৃ. ৭৬৯

[১৪২] সাক্ষাৎকার: রুহুল আমিন বীর বিক্রম, পিতা: রহমত উল্লাহ আমিন, গ্রাম: দেউটি, ইউনিয়ন: জয়াগ, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, দেউটি, ১৩ অক্টোবর ২০১৬, রাত ৮টা

[১৪৩] *ঐ*

[১৪৪] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫তম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[১৪৫] সাক্ষাৎকার: মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, বি এল এফ কমান্ডার, নোয়াখালী জেলা ও সাবেক সাংসদ, নোয়াখালী-১০ আসন (বর্তমানে নোয়াখালী-৩) , সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নোয়াখালী জেলা সমিতি কার্যালয়, রূপায়ন তাজ (লেভেল ৬), ১/১, নয়া পল্টন, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬, সন্ধ্যা ৬টা

[১৪৬] আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[১৪৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৫ অক্টোবর ২০১২

[১৪৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭-২০৪ ও *১০ম খণ্ড*, পৃ. ২৬৩-২৭১

তৃতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক বাহিনী : রাজশাহী বিভাগ (যুদ্ধকালীন)

রাজশাহী বাংলাদেশের বর্তমান আটটি বিভাগের অন্যতম একটি বিভাগ। ১৮২৯ সালে রাজশাহী বিভাগের সূত্রপাত হয়।[১] ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানেও রাজশাহী বিভাগ হিসেবে থেকে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত রাজশাহী বিভাগের অধীন ছিল রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা।[২]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে, রাজশাহী বিভাগ (পুরোপুরি বা আংশিকভাবে) ঐ ১১টি সেক্টরের মধ্যে ৬, ৭ ও ১১নং সেক্টরভুক্ত হয়। সেক্টরভুক্ত ঐসব এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনী ও যথাযথ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় ভারতে প্রশিক্ষিত আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধাগণ দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হন। বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা দল ছাড়াও রাজশাহী বিভাগের রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমায় ‘আফতাব বাহিনী’, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ‘লতিফ মির্জা বাহিনী’ ও রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় ‘ওহিদুর বাহিনী’ নামে তিনটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। আলোচ্য বাহিনীগুলোর কর্মকাণ্ড এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

আফতাব বাহিনী

কুড়িগ্রাম

মুক্তিযুদ্ধকালে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমাধীন রৌমারী থানা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক ছিলেন আফতাব আলী। বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারেই এই মুক্তিদল স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছিল 'আফতাব বাহিনী' বা 'আলতাফ বাহিনী' নামে।[৩] মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে অবস্থান করেই এই বাহিনী আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এছাড়া এই বাহিনী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মুক্তাঞ্চল 'রৌমারী মুক্তাঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তা শেষাবধি রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

আফতাব বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হাজী ক্যাপ্টেন (অব.) আফতাব আলী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন ব্যাটেলিয়ন হাবিলদার মেজর ছিলেন ।[৪] তার পিতা মো. ইদ্রীস আলী ও মাতা জোবেদা খানম। সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ থানার ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ গ্রামে ১৯২৫ সালের ১ ডিসেম্বর তার জন্ম হয়। তিনি সাধারণ সৈনিক পদে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের অধীন গাইবান্ধার পলাশবাড়ীসহ রংপুরের নানা স্থানে দায়িত্ব পালন করেন।[৫] ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালাচ্ছিল, তখন সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান ছিল ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। সৈয়দপুর ক্যান্টমেন্টে যখন বাঙালি সৈন্যদের ওপর মার্চের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিতে হামলা চালালো, তখন সুবেদার (স্বঘোষিত)[৬] আফতাব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা কোম্পানির ১২ জন সৈনিক নিয়ে গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে রৌমারীতে এসে পৌঁছান ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। এই মুক্তিদলের কারণেই সেকালে দেশের ভেতরে একটি বৃহৎ মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

২৬ মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা চালালে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করা ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকেরা সতর্ক হয়ে পড়েন ও ভেতরে ভেতরে তারা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এই রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লে. কর্নেল ফজল মাহমুদ। রেজিমেন্টের অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি।[৭] এই রেজিমেন্টের মোট চারটি কোম্পানির মধ্যে একটি কোম্পানিকে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মেজর নিজামকে দিয়ে মার্চের শুরুর দিকে ঘোড়াঘাট-পলাশবাড়ী এলাকায় পাঠানো হয়। আরেক বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আশরাফকে এক কোম্পানি সৈন্যসহ পাঠানো হয় দিনাজপুর।[৮] এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি সৈনিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে শক্তি কমিয়ে ফেলা। এরই মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যরা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে শহরে নির্বিচারে গণহত্যা করেছে ২৩ ও ২৪ মার্চ।[৯] ২৬ ও ২৭ মার্চ সৈয়দপুর বিহারী অধ্যুষিত এলাকার অবাঙালিরা স্থানীয় বাঙালিদের ওপর অতর্কিত ও বীভৎস হত্যাযজ্ঞ চালায়।[১০] ফলে সৈয়দপুর সেনানিবাসের বাঙালি সৈন্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

সৈয়দপুর সেনানিবাসের অভ্যন্তরীণ একটি পুকুরের উত্তর পাশে অবস্থান ছিল ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের। আর এর দক্ষিণমুখী অবস্থান ছিল ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। ২৬ মার্চের পর ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট দক্ষিণমুখি হয়ে বাঙ্কার খনন করে। আবার ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের ঠিক পেছনে অবস্থিত ২৩ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরূপ কর্মকাণ্ড দেখে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার আফতাব আলী আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।[১১] এসময় জ্যেষ্ঠ বাঙালি সেনা কর্মকর্তাগণ ক্যান্টনমেন্টে অনুপস্থিত ছিলেন। বিধায় জুনিয়র বাঙালি কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যদের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া দূরহ হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় নিজ দায়িত্বেই সুবেদার আফতাব আলী নিজেদের অবস্থানস্থলে বাঙ্কার খনন করার নির্দেশ দেন তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে। তিনি নায়েক সুবেদার আলী আহমদকে দিয়ে সবার পরিবারকে পাঠিয়ে দেন ফুলবাড়ী। এরপর তিনি অস্ত্রাগারের চাবি চাইতে যান কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে। আর তা না পেয়ে তালা ভাঙতে বাধ্য হন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তার রেজিমেন্টকে তিনি প্রস্তুত করার চেষ্টা চালান।[১২]

৩০ মার্চ রাত প্রায় ৯টায় ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট থেকে সুবেদার আফতাব আলীকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। ইত্যবসরে ৩১ মার্চ রাত ২টা ৩০ মিনিটে ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট একত্র হয়ে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।[১৩] ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের পেছন থেকে আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করে ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট। এদিকে তৃতীয় বেঙ্গলে তখন একটিমাত্র মর্টার ছিল। এই মর্টার থেকে একে একে ১৯টি মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয়। শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। অনেকক্ষণ ধরে উভয় পক্ষে গোলাবিনিময়ের পর পাকিস্তানিরা গুলি করা বন্ধ করে। তারা তৃতীয় বেঙ্গলকে ঘেরাও করার ফন্দি আঁটে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। অন্যদিকে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে রক্ষা করতে জীবন-মরণ যুদ্ধ করেছেন বাঙালি সৈনিকরা। আর্টিলারি আক্রমণ থেকে রেজিমেন্টকে রক্ষা করতে এবং অবশেষে সেনানিবাস থেকে বের হয়ে আসতে প্রাণ দিতে হয়েছে রেজিমেন্টের ২৮ জন সৈনিককে।[১৪] এ যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছিলেন হাবিলদার আলী আকবর এবং ল্যান্স নায়েক হোসেন আলী। তাদেরকে সেনানিবাস থেকে বের করে নিয়ে আসাও সম্ভব হয়েছিল। এরপর প্রায় তিনশ' সৈনিক নিয়ে আফতাব আলী পৌঁছান ফুলবাড়ী। এ বিশাল বহর যখন ফুলবাড়ীতে পৌঁছায় তখন সেখানে উপস্থিত হন মেজর নিজাম উদ্দিন। সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে তার ওপরই অর্পিত হলো কমান্ড। মেজর নিজাম ভাগ করেন সৈন্যদের। গড়ে তোলেন কয়েকটি কোম্পানি। নিয়োজিত করেন একেক কোম্পানিকে একেক স্থানে। আফতাব আলীকে পাঠানো হলো গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে। তার সাথে ছিল এক কোম্পানি সৈন্য। রংপুর থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে গাইবান্ধা যেতে না পারে তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুবেদার আফতাব আলী ছুটে যান সেখানে। নিজের অধীনস্থ কোম্পানিকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একটি গ্রুপ রংপুর-গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী রাস্তায় আংরার সেতু ধ্বংস করে সেখানে অবস্থান নেন। আর দ্বিতীয় গ্রুপ এ্যাম্বুশ করে সটিবাড়ীতে। সুবেদার আফতাব আলী নিজে ছিলেন পলাশবাড়ীতে। পাকিস্তানি সৈন্যরা রংপুর থেকে পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা সড়ক ধরে অগ্রসর হলে বাঙালি সৈন্যরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় তাদের ওপর। এখানে শত্রুসৈন্যের ৬ জন সদস্য প্রাণ হারান। তারপর সুবেদার আফতাবের দল অগ্রসর হয় সটিবাড়ীর দিকে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই পরের দিন সকালে একটি খালের পাড়ে এ্যাম্বুশ করে সুবেদার আফতাব আলী এবং সুবেদার মনসুর। এখানে বাধা পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে পড়ে গণহত্যা চালায় ও পুড়িয়ে ছাইভস্মে পরিণত করে গ্রাম। আর সে গ্রাম থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আবার আফতাব বাহিনীর গুলির রেঞ্জে পড়ে যান। আফতাব বাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে আক্রমণ পরিচালনা করায় এখানেও ১৬/১৭ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে একজন মুক্তিসেনা

গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।[১৫] এরপর আওয়ামী লীগ নেতা এবং জনপ্রতিনিধি লুৎফর রহমানের আমন্ত্রণে পুরো দলকে নিয়ে আফতাব আলী ও সুবেদার মনসুর গাইবান্ধা চলে যান। কিন্তু তারা গাইবান্ধায় পাকিস্তানি ট্যাংক আক্রমণের শিকার হয়। এরপর আওয়ামী লীগ নেতাদের পরামর্শে আবার স্থান ত্যাগ করে তারা চলে যান আনন্দবাড়ী। এভাবে ঘুরে ঘুরে এ বাহিনী কুড়িগ্রামের আন্ধারচরে ডেরা স্থাপন করে।[১৬] প্রথমদিকে আনন্দবাড়ী বাজার থেকে বন্ধ দোকানের তালা ভেঙে চাল-ডাল নিতে হয়েছিল এ বাহিনীর। কিন্তু অচিরেই রাজিবপুর, বুড়িমারী প্রভৃতি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানরা খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব নেন। ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি চরে ধরলা নদীকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয় অবস্থান। এই জায়গাটিকে পাথরের চর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৭] পাথরের চরে থাকা অবস্থায় রাজিবপুর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব ছলিম উদ্দিন আহমদ সুবেদার আফতাবকে রৌমারীতে গিয়ে অবস্থান নেওয়ার প্রস্তাব দেন।[১৮] কিন্তু, অসুবিধা হল রৌমারীতে যাওয়ার জন্য ভারতের মানকার চর হয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। যা হোক শেষ পর্যন্ত ১৯৭০-এর নির্বাচনে রৌমারী থেকে নির্বাচিত এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম পাপু মিয়ার অনুরোধ ও মধ্যস্ততায় সুবেদার আফতাব ও তার ১২ জন সঙ্গী প্রথমে মানকার চর আসেন ও সেখান থেকে নৌপথে এপ্রিলের মাঝামাঝি রৌমারীতে পৌঁছান। রৌমারীতে এসে এ বাহিনী প্রথমে নটানপাড়া গ্রামে ও পরে রৌমারী চৌধুরী গহরুজ্জামান (সি.জি. জামান) উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করেন।[১৯] ইতোমধ্যে রৌমারীতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং, বাছাই, প্রশিক্ষণসহ নানা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছিল।[২০] সুবেদার আফতাবের দলের আগমনে এখানকার যুদ্ধপ্রস্তুতিতে তাৎপর্যপূর্ণ গতি আসে। তিনি রৌমারীতে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের ভ্রূণ সংগঠন ব্যবহার করে গড়ে তোলেন একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী যা আফতাব বা আলতাফ বাহিনী নামে অত্র এলাকায় পরিচিত হয়ে ওঠে।

সুবেদার আফতাব এদের বিভিন্ন প্লাটুনে বিভক্ত করে রৌমারী, যাদুর চর, টাপুর চর এবং রাজীবপুরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য পাঠিয়ে দেন। একই সাথে স্থানীয় ছাত্র যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইতোপূর্বে রৌমরী, যাদুরচর, টাপুরচর, রাজিবপুর, দাঁতভাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে গড়ে ওঠা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অস্ত্রের অভাবে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আফতাব বাহিনীর আগমনে সেই অভাব দূর হল। হাতে কলমে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পেলেন।

সংগঠন

রৌমারীতে এসে সুবেদার আফতাব প্রথমে নটানপাড়া গ্রামে ও পরে রৌমারী চৌধুরী গহরুজ্জামান (সি.জি. জামান) উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করেন।[২১] তিনি রৌমারীতে তার দলের প্রথম নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করেন রৌমারীর কর্ত্তিমারী বাজার সংলগ্ন শিক্ষক ও রাজনীতিক মতিউর রহমানের বাড়িতে।[২২] এসময় রৌমারীর অবসরপ্রাপ্ত, ছুটিতে আসা ও পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক বাহিনীর সদস্য, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার মিলে আফতাব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৫০ জনে।[২৩] তবে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ছয়শ জনে পৌঁছায় এবং এ সংখ্যার মধ্যে এমএফ সদস্য ছিলেন প্রায় ২০০ জন।[২৪] সুবেদার আফতাবের সাথে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন জেলার কিছু সেনাসদস্য ও কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মুক্তিযোদ্ধাগণ এই বাহিনীতে জড়ো হয়েছিলেন। আফতাব বাহিনীতে এমএফ (মুক্তিফৌজ) ও এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) উভয় প্রকার মুক্তিযোদ্ধারই সমন্বয় ঘটেছিল।

সুবেদার আফতাব আলী রৌমারী প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করে তার পুরো বাহিনীকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং নিমোক্ত স্থানে স্থায়ী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প করেন:[২৫]

১. রাজিবপুর ক্যাম্প : এই ক্যাম্পের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিলদার মনসুর আলী।
২. কোদালকাঠি ক্যাম্প : হাবিলদার রেজাউল হক এই ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।
৩. ছালীপাড়া ক্যাম্প : এই ক্যাম্পের দায়িত্ব বর্তায় নায়েক মনসুরের ওপর।
৪. ঠাকুরের চর ক্যাম্প : মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মফিজুর রহমান এই ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন।
৫. রৌমারী ক্যাম্প : সুবেদার আফতাব নিজেই এই ক্যাম্পের তত্ত্বাবধান করেন।

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সুবেদার আফতাব পুরো রৌমারী থানার সামরিক ও বেসামরিক বিষয়াদি দেখভাল করতেন। স্থানীয় এমএনএ জনাব সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিয়া এবং এমপিএ জনাব নুরুল ইসলাম পাপু মিয়াসহ ভারতীয় বিএসএফ এর শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ সুবেদার আফতাবকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[২৬] সুবেদার আফতাব রৌমারীতে অবস্থান করে দাঁতভাঙ্গা, টাপুরচর, যাদুরচর, রাজিবপুরে স্থাপিত ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। এ সময় স্থানীয় মানুষজন সুবেদার আফতাবের পক্ষে ছিলেন। তিনিই ছিলেন রৌমারী-রাজিবপুরের সর্বস্তরের জনগণের মুক্তিদাতা ও সর্বজনস্বীকৃত একমাত্র নেতা।[২৭]

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য বাহিনী প্রধান বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেন এবং শাস্তির বিধান করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেই ঐ স্থানের মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দলের নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ার করে দিতেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের তথ্যই সুবেদার আফতাবকে সরবরাহ করত।[২৮] আফতাব বাহিনীর বেসামরিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। সুবেদার আফতাব রৌমারীতে ক্যাম্প স্থাপন করেই স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মনসুর হাজীর পুত্র আজিজুর রহমানকে সপরিবার আটক করে নিয়ে আসেন। পরে তারা স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রমে সহায়তা করবে না এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করবে এ শর্তে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[২৯] এছাড়া তিনি তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। রাজিবপুওে মনসুর হাবিলদারের আওতাধীন এলাকার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে জড়িত ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রতি মণ পণ্যের জন্য ৩ টাকা হারে রাজস্ব আদায় করা হতো। এবং এজন্য মুক্তিযোদ্ধারা 'এম আলি' লিখিত একধরনের রসিদ ব্যবসায়ীদেরকে প্রদান করতেন। এই রসিদ দেখালে অন্যান্য স্থানের মুক্তিযোদ্ধাগণ এসব ব্যবসায়ীর নিকট থেকে আর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন না।[৩০] এভাবে এপ্রিল থেকেই এ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণ স্থানীয়ভাবে রাজস্ব আদায় করতেন এবং তাদের খাদ্য ও বেতনের ব্যবস্থা করতেন। উল্লেখ্য যে, সশস্ত্র বাহিনী থেকে আসা আফতাব বাহিনীর সদস্যরা বেতন পেতেন মাসিক ৭৫ টাকা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণ, বিশেষ করে এমএফ যোদ্ধাগণ পেতেন মাসিক ৫০ টাকা।[৩১] ক্যাপ্টেন নূরুন্নবী খান রৌমারী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই রীতি বজায় ছিল।

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহ

আফতাব বাহিনী প্রধান রৌমারী এসে ইতোমধ্যে স্থানীয় উদ্যোগে শুরু হওয়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এসময় পর্যন্ত রৌমারীতে শুধু সি.জি. জামান হাই স্কুলেই প্রশিক্ষণ প্রদান চলছিল।[৩২] সুবেদার আফতাব প্রশিক্ষণ কার্য বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এরপর তার বাহিনীর সেনাসদস্যদের সহযোগিতায় তিনি টাপুরচর উচ্চ বিদ্যালয়, যাদুরচর উচ্চ বিদ্যালয়, দাঁতভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়সহ রৌমারী-রাজিবপুর এলাকার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের মাঠে প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা শুরু করেন।[৩৩]

প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ও মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপনের সাথে সাথেই এইসব স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রিক্রুটিং ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন থানা অপারেশন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় আফতাব বাহিনীর সাথে যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা দিয়েই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পরিস্থিতেতে এই বাহিনী কামারজানি, সুন্দরগঞ্জ, জিগাবাড়ি,[৩৪] সাঘাটা, চিলমারী, উলিপুর, ফুলছড়ি প্রভৃতি স্থানের থানা আক্রমণ অথবা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।[৩৫]

আওতাভুক্ত এলাকা

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বাধীন বাহিনী সর্বশেষ রৌমারী থানা এলাকায় অবস্থান নেন। এই রৌমারী থানাধীন প্রত্যেকটি ইউনিয়ন, চিলমারী, বকসীগঞ্জ, উলিপুর ও কুড়িগ্রাম মহকুমার একটি বিরাট অংশে এই বাহিনীর কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। ঐসব এলাকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ, সব শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আফতাব বাহিনীর নেতৃত্বাধীন রৌমারী অঞ্চলের যুদ্ধ সত্যিকার অর্থেই একটি জনযুদ্ধে রূপ নেয়। উত্তরে কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্ত থেকে দক্ষিণে প্রায় ৭০ মাইল পর্যন্ত অন্যূন ছয়শ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয় সম্পূর্ণ মুক্ত অঞ্চল। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থানা, রাজিবপুর থানা, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, উলিপুর, চিলমারী ও কুড়িগ্রাম থানার বিরাট এলাকা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, সাঘাটা, ফুলছড়ি ও দেওয়ানগঞ্জের অংশবিশেষ নিয়ে এই রৌমারী মুক্তাঞ্চল গঠিত হয়। এই বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী কমপক্ষে ২০ লক্ষ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে এই অঞ্চলটিতে পাকিস্তানি বাহিনী কোন স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারেনি।[৩৬]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে ৪ আগস্ট কোদালকাঠি পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রৌমারী ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ছোটো-বড় যুদ্ধ, ডিফেন্স সমস্তই আফতাব বাহিনী প্রধান সুবেদার আফতাব আলী ও তার জ্যেষ্ঠ সহযোদ্ধাবৃন্দ ও রৌমারীর কৃতি সন্তান, আফতাব বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড জনাব এস কে মজিদ মুকুল বীরপ্রতীক এর পরিকল্পনা ও তাদের যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।[৩৭] কিন্তু, ১১ নং সেক্টর গঠিত হবার পর রৌমারী মুক্তাঞ্চল প্রতিরক্ষার দায়িত্ব চলে যায় ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার মেজর শাফায়াত জামিলের হাতে।[৩৮] এরপর থেকে সুবেদার আফতাব তার বাহিনীসহ রাজিবপুর এলাকা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পান এবং কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত হতে থাকেন।

রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যদলকে মোকাবেলা করতে আফতাব বাহিনী প্রধানত গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দলের যোদ্ধারা সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নেন। এই বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদলের ২৩ পদাতিক ব্রিগেডের ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও ৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একাংশ সক্রিয় ছিল।[৩৯] উল্লিখিত পাকিস্তানি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে এই বাহিনী প্রায় ২০টি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এপ্রিল থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদল কখনো চিলমারী থেকে, কখনো কখনো বকসীগঞ্জ থেকে অনেকবার রৌমারী দখল করার চেষ্টা চালায়। এর মধ্যে ১২ মে সংঘটিত মোহনগঞ্জ যুদ্ধ ছিল বেশ আক্রমণাত্মক ও দীর্ঘকালীন। এদিন পাকিস্তানি বাহিনী ৩টি গানবোট নিয়ে চিলমারী থেকে রাজিবপুর রৌমারীতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা চালায়। আফতাব বাহিনীর বীরযোদ্ধাগণ ক্যাপ্টেন আশফাকের নেতৃত্বে শত্রুসৈন্যকে সফলভাবে প্রতিহত করেন। যুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় ৪টি ফাইটার প্লেনও পাকিস্তানি বাহিনীকে আক্রমণ করে।[৪০] স্মর্তব্য যে, রৌমারী সদর থেকে দক্ষিণ দিকে কোমরভাঙ্গি, শিবেরডাঙ্গি গ্রামে ও পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পাড়ের ছালিপাড়া থেকে রাজিবপুরের মোহনগঞ্জ পর্যন্ত এলাকায় আফতাব বাহিনীর ছোটো ছোটো দল মে মাসের শুরু থেকে অবস্থান নিয়েছিল।[৪১] এই পথে পাকিস্তানি বাহিনীর আসার চেষ্টা মুক্তিবাহিনী প্রতিবারই প্রতিরোধ করে। এসব প্রতিরোধ বাদেই আফতাব বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কিছু অভিযান তুলে ধরা হলো:

চিলমারী অভিযান[৪২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১ আগস্ট সন্ধ্যা বেলা

অভিযানের উদ্দেশ্য: কুড়িগ্রামের থানা শহর চিলমারী। চিলমারী শহরে পাকিস্তানি সেনাদলের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি থেকেই শত্রুসৈন্য প্রায়ই রৌমারী এলাকায় হানা দেওয়ার চেষ্টা করত। তাই শত্রুসৈন্যের শক্ত অবস্থান গুড়িয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধশত মুক্তিযোদ্ধার একটি দল এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, গোলাবারুদ নিয়ে চিলমারী অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি সন্ধ্যানাগাদ চিলমারী শহরে প্রবেশ করে। তারা চিলমারীর বালাবাড়ীতে অবস্থিত পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর একটি ক্যাম্পে অতর্কিতে হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক আঘাতেই ক্যাম্পে পাহারারত হানাদার সৈন্যদের অধিকাংশ নিহত হন। এরপর শত্রু সৈন্যের তরফ থেকেও মর্টার, মেশিনগান ও গ্রেনেড সহযোগে প্রতি আক্রমণ চালানো হয়। মুক্তিযোদ্ধারা থেমে থেমে গুলি চালাতে থাকেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী গোলাগুলি চলার পর পাকিস্তানি সৈন্যের একটি বড় অংশ পশ্চাদপসরণ করে চিলমারীতে অবস্থিত শত্রুসৈন্যের মূল ঘাঁটিতে চলে যায়। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি সেনাদলের পরবর্তী আক্রমণ এড়াতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে রৌমারীতে ফিরে আসেন।

ফলাফল: এই অভিযানে মুক্তিবাহিনীর গুলির আঘাতে দশের অধিক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেউ হতাহত হননি। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের বালাবাড়ী ক্যাম্প স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়।

কোদালকাঠি অভিযান[৪৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: অক্টোবর মাসের ১ তারিখ সন্ধ্যা বেলা

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল রাজিবপুর থানার কোদালকাঠি ইউনিয়নে। কোদালকাঠি ইউনিয়ন পাকিস্তানি সেনাদল আগস্ট মাসের ৪ তারিখ দখল করে নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোদালকাঠি অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কোদালকাঠি পুনর্দখল করা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কোদালকাঠি অভিযানে সুবেদার আফতাবের নেতৃত্বে ৭২ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের এইচ এম জি প্লাটুনের সদস্য। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তাদের কাছে ছিল এলএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, গোলাবারুদ। রৌমারীতে অবস্থিত ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর শাফায়েত জামিলের নির্দেশে এই যোদ্ধাদলকে ৩ ইঞ্চি মর্টার এর কাভারেজ দেওয়া হয় তারাবর গ্রাম থেকে।

অভিযানের বিবরণ: আফতাব বাহিনীর নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীর প্রতীক অভিযানের পূর্বে কয়েক দফা কোদালকাঠি স্কুলে স্থাপিত পাকিস্তানি সেনাক্যাম্প রেকি করে আসেন। তার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুবেদার আফতাব ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা কোদালকাঠি অভিযানের পরিকল্পনা করেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা রাজিবপুর থেকে জিঞ্জিরাম নদী পার হয়ে শংকর মাধবপুর গ্রামের খালের পাড়ে বাঙ্কার খুঁড়ে অবস্থান নেন সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। ১ অক্টোবর বিকাল নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্যদের টহল দল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান দেখে ফেলেন। তারা কোদালকাঠি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতির খবর পাঠিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জীবিত ধরার কৌশল নিতে শুরু করেন। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা এ বিষয়টি বুঝে বাংকারেই ঘাপটি মেরে থাকেন। সন্ধ্যা নাগাদ প্রায় পাঁচ শতাধিক শত্রুসৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আটক করার জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে শত্রুসৈন্যের একটি অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জে চলে আসেন। উন্মুক্ত মাঠে এদেরকে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার থেকে একযোগে গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। প্রত্যুত্তরে বিপরীত পক্ষ থেকেও শুরু হয় প্রচন্ড গুলিবর্ষণ। উভয়পক্ষের মধ্যে ঘণ্টা কয়েক টানা গুলি বিনিময়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা কৌশল পাল্টে গুলি বিনিময় বন্ধ করেন। এর ফলে অপর পক্ষও গুলি করা বন্ধ করলে মুক্তিযোদ্ধারা বাংকার ছেড়ে ক্রলিং করে পিছিয়ে আসতে থাকেন ও বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা খাল পার হয়ে অবস্থান নেন। এর মধ্যে শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য ক্রলিং করে মুক্তিযোদ্ধাদের ছেড়ে আসা বাংকারগুলোতে আসেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে পুনরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা খালের অপর পাড়ে অবস্থান নিয়ে চুপচাপ থাকেন। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কয়েকজন তখনও খালের ওপাশে আছেন। যাহোক অন্ধকারে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুঁজে না পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যগণ যখনই হালকা মেজাজে চলাচল ও নিহত এবং আহত সৈন্যদের সরিয়ে নিতে শুরু করেন, তখনই খালের উভয় পাশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তাানি সৈন্যদের ওপর গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাকিস্তানি সৈন্যগণ শুধু খালের অপর পাড়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উদ্দেশ্য করেই গুলি ছুঁড়তে থাকেন। এই সুযোগে খালের ওপাড়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ভিন্ন পথে খাল পার হয়ে এসে মূল দলের সাথে যোগ দেন। এ পর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধারা দু'দফায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে সক্ষম হন। এর ফলে বিপরীত পক্ষের অন্তত আড়াইশো সৈন্য ঘটনাস্থলে নিহত ও আহত হন। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুই জন যোদ্ধা আহত হন। এই যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সৈন্যদল কোদালকাঠি ছেড়ে (৪ অক্টোবর) চলে যান। তবে, কোদালকাঠি ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে পাকিস্তানি সেনাদল শংকর মাধবপুর গ্রামে গণহত্যা সংঘটন করে।

তারাবর অভিযান[৪৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৩ আগস্ট আনুমানিক বিকাল ৫টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: চিলমারীর বালাবাড়ীতে পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকারদের মধ্যে হওয়া সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের পূর্বেই তারা রৌমারীতে পাকিস্তানের পতাকা ওড়াবে। এই বৈঠকে রাজাকার ছদ্মবেশী দু'জন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাধ্যমে এই খবরটি সুবেদার আফতাবের কাছে পৌঁছে। রৌমারীতে যাতে পাকিস্তানি সৈন্য প্রবেশ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে তিনি রাজিবপুরের তারাবর নামক গ্রামের খালপাড়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সৈন্যের রৌমারী অভিমুখে যাত্রা থামিয়ে দেয়া।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আফতাব বাহিনীর হাবিলদার কমান্ডার মুহিবের নেতৃত্বে নায়েক রেজাউল হক ও হাবিলদার জহুরুল হকের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা দল এই অভিযানে অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট ৩০৩ রাইফেল, এসএলআর, এসএমজি, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ:চিলমারী থেকে পাকিস্তানি সৈন্যের একটি দল গানবোটে করে ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে এসে তারাবর গ্রামের নিকট খাল (ব্রহ্মপুত্রের শাখা খাল) পাড়ে নামে। আনুমানিক বিকাল ৫টা নাগাদ তারা রাজিবপুর অভিমুখে অগ্রসর হতেই পূর্ব থেকে অবস্থান নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদল অতর্কিতে তাদেরকে আক্রমণ করে। এরপর উভয়পক্ষের মধ্যে প্রায় ২ ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলে। পাকিস্তানি সৈন্যদল নিহত ও আহত যোদ্ধাদেরকে তুলে নিয়ে পিছু হটে।

ফলাফল: তারাবর গ্রামের যুদ্ধে অন্যূন ২০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন ও বেশ কয়েকজন আহত হন। মুক্তিযোদ্ধারা এই যুদ্ধে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করেন। তবে পাকিস্তানি সৈন্যরা তারাবর ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ১৩ জন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেন।

সুন্দরগঞ্জ অভিযান[৪৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন রাত তিনটা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা জেলার একটি উপজেলা। তিস্তা নদী সুন্দরগঞ্জকে রৌমারী থেকে আলাদা করেছে। সুন্দরগঞ্জ এলাকায় গড়ে ওঠা রাজাকার দল স্থানীয় অবরুদ্ধ পরিবারগুলোর ওপর নানামুখী নির্যাতন চালাচ্ছিল। সুবেদার আফতাব এখবর জানতে পেরে উক্ত রাজাকারদেরকে শাস্তি দিতে এই অভিযান প্রেরণের অনুমতি দেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সুবেদার করম আলীর নেতৃত্বে ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল সুন্দরগঞ্জ অভিযানে অংশ নেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাদের নিকট ছিল ৩০৩ রাইফেল, এসএলআর ও গোলাবারুদ।

অভিযানের বিবরণ: রৌমারীর কর্তিমারী হয়ে সুবেদার করম আলীর দল ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদী পার হয়ে সুন্দরগঞ্জ এলাকায় প্রবেশ করে অক্টোবর শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন। সন্ধ্যা নাগাদ তারা সুন্দরগঞ্জ রাজাকার ক্যাম্প রেকি করে আসেন। পরিকল্পনার অনুযায়ী রাত তিনটায় মুক্তিযোদ্ধাদল রাজাকার ক্যাম্প ঘিরে ফেলে। টহলরত দুইজন রাজাকারকে তারা পিছন থেকে এসে বন্দী করে। এরপর ক্যাম্পের ভেতরে থাকা রাজাকারদেরকে বন্দী করা হয়।

ফলাফল: এই অভিযানে মুক্তিযোদ্ধা দল সুন্দরগঞ্জ রাজাকার ক্যাম্পে অবস্থান নেওয়া আটজন রাজাকারকে বন্দী করে। এদের কাছে থাকা সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করেন। এরপর সুন্দরগঞ্জের রাজাকার ক্যাম্পটি আর টিকে থাকেনি।

দুর্গাপুর ব্রিজ অভিযান[৪৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো এক দিন রাত আনুমানিক ১০টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: কুড়িগ্রাম সদর ও উলিপুরের মধ্যে অবস্থান দুর্গাপুরের। কুড়িগ্রাম হতে রেলপথে উলিপুর ও অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদল যাতায়াত করতো ও যুদ্ধ রসদ পরিবহন করতো। অপর পক্ষের এই সৈন্য ও রসদ বিনষ্ট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করাই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কোম্পানি কমান্ডার এ কে এম আকরাম হোসেনের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল ৩০৩ রাইফেল, এসএমজি, এসএলআর, গ্রেনেড ও এ্যান্টি ট্যাংক মাইন নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: দুর্গাপুর রেলস্টেশনের উত্তর পাশে অবস্থিত দুর্গাপুর রেল ব্রিজের নিকট মুক্তিযোদ্ধারা সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছান। এরপর সেখানে রেল লাইনের নিচের মাটি সরিয়ে গর্ত করা হয়। এরকম চারটি স্লিপারের নিচের মাটি সরিয়ে চারটি মাইন পুঁতে রাখা হয়। মাইন পোঁতার পর মুক্তিযোদ্ধারা রেল লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্বে মাঠের মধ্যে অবস্থান নেন। রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলগাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে রেল ইঞ্জিন ও ২টি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। এ ঘটনার পর মুক্তিযোদ্ধারা স্থান ত্যাগ করেন।

ফলাফল: মাইন বিস্ফোরনের ফলে বিধ্বস্ত ২টি বগিতে কমপক্ষে ২০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন ও বেশ কজন সৈন্য আহত হন। এছাড়া অপর পক্ষের মূল্যবান রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অভিযানের পর দীর্ঘদিন এই রুটে রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

উল্লিখিত অভিযানসমূহের বাইরে আফতাব বাহিনী ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার শাফায়াত জামিলের নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে চিলমারী অভিযানে (১৭ অক্টোবর) অংশ নেয়। এই অভিযান ১১ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের পরিচালনা করেছিলেন। তাছাড়া, সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে এই বাহিনী কামারজানি অভিযান পরিচালনা করেছিল। গাইবান্ধা মুক্ত করার জন্য প্রেরিত অভিযানে এই বাহিনীর সদস্যরা ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর পরিচালিত গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ মুক্তকরণ অভিযানে অংশ নেন।[৪৭] এটি ছিল আফতাব বাহিনীর শেষ সম্মুখ যুদ্ধ।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

আফতাব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে কোনো পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই এই বাহিনীর প্রধান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ রৌমারী ও নিকটস্থ এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেন। যেহেতু অত্র এলাকা মুক্তাঞ্চল ছিল, সেহেতু এখানে মুক্তিযোদ্ধা-জনতা প্রকাশ্যেই প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করতে সক্ষম হতো।[৪৮] এর ফলে জনগণকে আরো নিবিড়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানানোর সুযোগ পাওয়া যায়।

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

আফতাব বাহিনী গঠনের প্রথম দিক থেকেই এখানে বেশ কিছু সেন্যসদস্য, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর প্রশিক্ষিত সদস্য ছিল। এরা ছাড়াও ছিল তরুণ, যুবক যাদেরকে যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে নূন্যতম প্রশিক্ষণ নিয়েই পাকিস্তানি শত্রুসৈন্যের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে আফতাব বাহিনীর শহিদ সদস্য ছিলেন ৩৩ জন[৪৯] আর যুদ্ধাহত হয়েছিলেন অনেকে। যুদ্ধাহতদের মধ্যে ৫ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরা হলেন সুবেদার আফতাব আলী, আখের উদ্দিন (ধলার চর,

রৌমারী), নুরুল আমিন (কুমিল্লা), শওকত আলী সরকার (চিলমারী, কুড়িগ্রাম) ও সোলায়মান সরকার (শঙ্কর মাধবপুর, রাজিবপুর)।[৫০]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

প্রতিরোধ পর্ব থেকেই যেহেতু আফতাব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই বাহিনীর সরাসরি কোনো যোগাযোগ ছিল না। জুলাই মাসে সমগ্র দেশকে ১১টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত এই রৌমারী ও নিকটবর্তী এলাকাসমূহ সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট কোনো নেতৃত্বের অধীনও ছিল না। তারপরও বাহিনী প্রধান সুবেদার আফতাব ও তার সহকর্মীগণ সর্বদা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু তিনি দল গঠনের শুরুর দিকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এমএনএ সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিয়া এবং এমপিএ নুরুল ইসলাম পাপু মিয়ার প্রতি অনুগত ছিলেন না। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ, এমনকি নিকটবর্তী ভারতীয় বিএসএফ ক্যাম্পের শীর্ষ কর্মকর্তারাও চেষ্টা করে তাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। এ কারণে, আফতাব বাহিনীর সমান্তরালে সামাদ বাহিনী, মাহবুব বাহিনীসহ বেশ কয়েকটা বাহিনী তৈরি করা হয় যাতে অত্র এলাকায় আফতাব বাহিনীর আধিপত্য কমানো যায়।[৫১] যাহোক কোদালকাঠি পতনের পরই মূলত এই বাহিনী ১১নং সেক্টর কমান্ডের শর্ত মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এসময় সুবেদার আফতাব মেজর শাফায়াত জামিলের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করতে রাজি হওয়ায় তার বাহিনী আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়।[৫২] এরপর থেকে রৌমারী থানাধীন রাজিবপুর এলাকা প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পড়ে আফতাব বাহিনীর উপর। সুবেদার আফতাব তার বাহিনী মেজর জামিলের নির্দেশনা মতেই পরিচালনা করতে থাকেন।

গণমাধ্যমে আফতাব বাহিনী

আফতাব বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রম যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একাধিকবার রৌমারী মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যেখানে আফতাব বাহিনীর নাম উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশনে করা হয়। এছাড়া রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকা *অগ্রদূত* এ আফতাব বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানের বর্ণনা পাওয়া যেত। এ বাহিনীর সর্বাপেক্ষা সফল অভিযান ছিল কোদালকাঠি পুনরুদ্ধার অভিযান। সাপ্তাহিক *অগ্রদূত* পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (৬ অক্টোবর, ১৯৭১) এই সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা হয়।[৫৩]

এর বাইরে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমেও আফতাব বাহিনীর কার্যক্রম এসেছে। আমেরিকার প্রখ্যাত এনবিসি টেলিভিশনের বিখ্যাত সাংবাদিক ক্যাপ্টেন রজার্সের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর দুটি বিখ্যাত প্রামাণ্য চিত্র ‘The Country Made for Disaster’ এবং ‘Date Line Bangladesh’ তৈরি করা হয়। এই প্রামাণ্য চিত্র দুটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহনের চিত্র এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি যুদ্ধের যে চিত্র তুলে ধরা হয়, তা ছিল মূলত আফতাব বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রম।[৫৪]

খেতাবপ্রাপ্ত যোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধকালে আফতাব বাহিনী অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল। এ বাহিনীর যোদ্ধাগণ তাদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যদের অবদান প্রশ্নাতীত। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ বাহিনীর অন্তত ৭ জন সাহসী সেনা মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখায় নিম্নোক্ত খেতাবে ভূষিত হন[৫৫]

আফতাব বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	যুদ্ধকালীন পদবি/পরিচিতি	প্রাপ্ত খেতাব
১	আফতাব আলী	ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ গোলাপগঞ্জ, সিলেট	সুবেদার/২৬৫০৭	বীর উত্তম ও বীর প্রতীক
২	শওকত আলী সরকার	দক্ষিণ ওয়ারি চিলমারী, কুড়িগ্রাম	গণবাহিনী	বীর বিক্রম
৩	এ কে আব্দুল মজিদ	রৌমারী, কুড়িগ্রাম	এফএফ	বীর প্রতীক
৪	মোছাম্মত তারামন বেগম	শঙ্কর মাধবপুর, কোদালকাঠি, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম	এফএফ	বীর প্রতীক
৫	মনসুর আলী	সেনাসদর	নায়েক সুবেদার/৩৯৩২৩২৭	বীর প্রতীক
৬	আব্দুল মোতালিব	সেনাসদর	সুবেদার	বীর প্রতীক
৭	রুহুল আমিন	সেনাসদর	হাবিলদার/৩৯৩৪১৭৯	বীর প্রতীক

অস্ত্র সমর্পণ

আফতাব বাহিনীর যোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধকালে সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্র কুড়িগ্রাম মহকুমা প্রশাসনের কাছে জানুয়ারি মাসে (১৯৭২) জমা দিয়েছিলেন ।[৫৬] তবে এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ যেহেতু যুদ্ধের শেষ দিকে এসে আর একসাথে থাকতে পারেননি, সেহেতু যে মুক্তিযোদ্ধা শেষ পর্যন্ত যে কমান্ডারের অধীন যুদ্ধ করেছিলেন, সেই মুক্তিযোদ্ধা তার সেই কমান্ডারের কাছে অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। আবার বিজয়ের পরপরই যারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন, তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়নে অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন।[৫৭]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধে আফতাব বাহিনী অত্যন্ত সাহসী ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। রৌমারী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ৯ মাস মুক্তিবাহিনীর দখলে রাখা, বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার বা ভারতীয় সরকারের সাহায্য ছাড়াই বাহিনীর নিজ ক্ষমতায় রৌমারীকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ধরে রাখা ছিল এ বাহিনীর এক বিরাট কৃতিত্ব। এই রৌমারী মুক্তাঞ্চল প্রবাসী সরকারের বৈধ দাবিকে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের কাছে দেখাতে সক্ষম হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বিরাট এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পক্ষে একটি সার্থক ও কার্যকর বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। আর এই কৃতিত্বের দাবিদার নিঃসন্দেহে আফতাব বাহিনী ও রৌমারী এলাকার জনগণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই সুবেদার আফতাব ছিলেন প্রায় ছয়শ বর্গ কি.মি. এলাকার সামরিক সর্বাধিনায়ক ও প্রধান প্রশাসক। এই বাহিনীর মাধ্যমেই প্রায় পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধা দেশের অভ্যন্তরেই প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম হন। আর প্রশিক্ষিত এসব যোদ্ধাগণ শুধু আফতাব বাহিনীতেই নয়, অন্যান্য কমান্ডের অধীন থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রৌমারী মুক্তাঞ্চলের (আগস্ট থেকে) প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনকারী ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডেল্টা (ডি) কোম্পানির প্রধান লে. নূরুন্নবীর ভাষায়, "আর

আগ্নেয় অস্ত্রবিহীন সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকরা সুবেদার আলতাফের হাত গড়িয়ে যখন আমার কাছে এসেছে, ততোদিনে তারা প্রকৃত অর্থে হয়ে উঠেছিল এক একজন সমর্থ, দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা যারা দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য যথার্থই উপযুক্ত"।[৫৮] ১১ নং সেক্টর কমান্ড কাজ শুরু করলে তার মূল নিরাপদ হাউড আউট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই রৌমারী মুক্তাঞ্চল।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় মুক্তিযুদ্ধকে একটি পূর্ণাঙ্গ জনযুদ্ধে রূপ দেয়ার পূর্ণ কৃতিত্ব রৌমারী এলাকার সর্বস্তরের মানুষের। আর এই কৃতিত্বের নেপথ্য কারিগর আফতাব বাহিনীর নির্ভীক যোদ্ধাবৃন্দ। সে অর্থে পুরো নয় মাসে এখানে একজনও রাজাকার, আলবদর, আল শামস ছিল না। স্থানীয় মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ বাংলাদেশবিরোধী সব শক্তিকে সুবেদার আফতাব ও তার দুঃসাহসী সহযোদ্ধাবৃন্দ যুদ্ধের শুরুতেই কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেন এবং অনেককে শাস্তি প্রদান করেন। ফলে কেউই আর পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হতে পারেনি। পরিশেষে, মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ ভূমিকা রাখা এই বাহিনীর সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে এটা বলা যায় না। যদিও এই বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন, হাতে গোনা কয়েকজন (যেমনঃ আব্দুল মজিদ পাকা বাড়ি উপহার পেয়েছেন) অন্যভাবে উপকৃত হয়েছেন, তবুও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই বাহিনীর কার্যক্রম ও ভূমিকা উপযুক্তভাবে স্থান পায়নি। এমন অসংখ্য বীর যোদ্ধা রয়েছেন যারা রৌমারী বাইরে থেকে এসেছিলেন, তারা এখনো মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।[৫৯] স্মরণ রাখতে হবে যে, বিজয় অর্জনের পরে বিজয়ের নির্মাতার অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়েই সত্যিকার অর্থে বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়া যায়।

লতিফ মির্জা বাহিনী

সিরাজগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধকালে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার ভদ্রঘাট গ্রামকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই স্বতন্ত্র মুক্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ছিলেন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার লাহিরী মোহনপুর ইউনিয়নের বংকিরহাট গ্রামের মির্জা মিনহাজ উদ্দিন সরকার-লতিফা বেগম দম্পতির সন্তান ও সিরাজগঞ্জ কলেজ সংসদের এককালের সহ-সভাপতি (ভিপি) জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা। বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে এই বাহিনীর পরিচিতি হয় 'লতিফ মির্জা বাহিনী' নামে।[৬০]

এই বাহিনীর আরেকটি পরিচয় আছে। বাহিনীটি পলাশডাঙ্গা যুবশিবির নামেও খ্যাত। ১৯৭১ সালের ৬ জুন (মতান্তরে ১৪ জুন[৬১]) আব্দুল লতিফ মির্জা, সোহরাব আলী সরকার, লুৎফর রহমান মাখন, মনিরুল কবির, আজিজ সরকার, শফিকুল ইসলাম, লুৎফর রহমান অরুণসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সিরাজগঞ্জের জাঙ্গালিয়াগাঁতীতে বৈঠক করে তাদের মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের নাম চূড়ান্ত করেন পলাশডাঙ্গা যুবশিবির। সংগঠনটির নাম পলাশডাঙ্গা যুবশিবির প্রস্তাব করেন আব্দুল আজিজ সরকার।[৬২] বাহিনী প্রধান লতিফ মির্জার অক্লান্ত পরিশ্রম, সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতায় এই বাহিনী বা যুবশিবির (এরপর থেকে বা 'লতিফ মির্জা বাহিনী' বা 'মির্জা বাহিনী' হিসেবে উল্লিখিত হবে) প্রায় ২ হাজার সদস্যের একটি বাহিনীতে পরিণত হয় এবং বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর আসনে (পাবনা-১) মোতাহার হোসেন তালুকদার, রায়গঞ্জ-তাড়াশ আসনে (পাবনা-২) আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, বেলকুচি-চৌহালী আসনে (পাবনা-৩) আব্দুল মোমিন তালুকদার, শাহজাদপুর আসনে (পাবনা-৪) সৈয়দ হোসেন মনসুর এবং প্রাদেশিক পরিষদের কাজীপুর আসনে (পাবনা-১) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সিরাজগঞ্জ আসনে (পাবনা-২) সৈয়দ হায়দার আলী, রায়গঞ্জ-তাড়াশ আসনে (পাবনা-৩) রওশানুল হক, উল্লাপাড়া আসনে (পাবনা-৪) গোলাম হোসেন (প্রকৃতপক্ষে হাসনায়েন হবে), বেলকুচি আসনে (পাবনা-৫) ডা. কেবিএম আবু হেনা, শাহজাদপুর আসনে (পাবনা-৭) মো. আব্দুর রহমান নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬৩] পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার গড়িমসি ও নেতিবাচক মনোভাব বুঝতে পেরে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ এর ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচি যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ মির্জা সিরাজগঞ্জে ছাত্র-জনতার সম্মিলনে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে মার্চের প্রথম দিক থেকে সিরাজগঞ্জে প্রতিদিন সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হতো। এসব কর্মসূচিতে লতিফ মির্জা থাকতেন অগ্রভাগে। বাঙালি জনসাধারণকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে ও যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত করার কাজ তখন চলছিল পুরোদমে। আর লতিফ মির্জা ছিলেন এসব কাজের পুরোভাগে। তার নেতৃত্বেই সিরাজগঞ্জে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৬৪] একাজে লতিফ মির্জা ছাড়াও ছিলেন ইসমাইল হোসেন, আমিনুল ইসলাম

চৌধুরী, মো. আলমগীর, এসহাক আলী, গোলাম কিবরিয়া, সিরাজুল ইসলাম খান, বিমল কুমার দাস, আব্দুল আজিজ মির্জা, আজিজুল হক বকুল, আলী হোসেন, লুৎফর রহমান মাখন, আব্দুর রউফ পাতা প্রমুখ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পরপর লতিফ মির্জা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন এস ডি ও জনাব সামসুদ্দিন আহমেদের সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। তিনি সিরাজগঞ্জ বিএ কলেজ লাইব্রেরির কক্ষে বোমা ও বিস্ফোরক তৈরি করতেন ও চরাঞ্চলে তা পরীক্ষা করে দেখতেন। এর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক সংগ্রহ করে ইপিআর সদস্য রবিউল ইসলাম ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট সদস্য লুৎফর রহমান অরুণের সহযোগিতায় ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।[৬৫]

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এই বক্তব্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ৮ মার্চ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদের আহ্বায়ক হন মোতাহার হোসেন তালুকদার, সদস্য সচিব হন আনোয়ার হোসেন রতু এবং সদস্য হন আব্দুল মোমিন তালুকদার, সৈয়দ হায়দার আলী, দবির উদ্দিন আহমদ, রওশানুল হক, শহীদুল ইসলাম তালুকদার, ডা. আবু হেনা, গোলাম হাসনায়েন, আমীর হোসেন ভুলু, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী।[৬৬]

সিরাজগঞ্জ সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ৮ মার্চেই 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় সিরাজগঞ্জ বি.এ.কলেজকে কেন্দ্র করে। নয় সদস্য বিশিষ্ট এই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন মহিউদ্দিন আলমগীর ও সদস্য সচিব ছিলেন আজিজুল হক বকুল। সদস্য হিসেবে ছিলেন আব্দুল লতিফ মির্জা, আব্দুল হামিদ তালুকদার, আব্দুর রউফ পাতা, সিরাজুল ইসলাম খান, গোলাম কিবরিয়া, ইসহাক আলী ও রফিকুল ইসলাম।[৬৭] উল্লেখ্য, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস হিসেবে সে সময় ব্যবহৃত হতে থাকে সিরাজগঞ্জ কলেজ ছাত্র সংসদ অফিস।[৬৮]

২৫ মার্চের পর যেসব জেলা ও মহকুমা মুক্ত ছিল, সেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র আগ্রাসন শুরু করে। সিরাজগঞ্জে পাকিস্তানি আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য সিরাজগঞ্জ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও মহকুমা প্রশাসক জনাব সামসুদ্দিন সাহেব বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে থাকেন। এসময় সিরাজগঞ্জের সাথে বিভিন্ন সংযোগপথ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলতে থাকে। সিরাজগঞ্জ কওমী জুট মিলের কয়েকজন শ্রমিকের তৈরি ৬/৭টি কামান পেতে রাখা হয় যমুনা নদীর পাড়ে। সিরাজগঞ্জ প্রতিরক্ষার জন্য মহকুমা প্রশাসক জনাব সামসুদ্দিন লতিফ মির্জাকে বাঘাবাড়িতে পাঠান। লতিফ মির্জা তার সহকর্মীদের নিয়ে বাঘাবাড়ীতে বাঙ্কার খনন করে প্রস্তুতি নেন পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধের জন্য।[৬৯] এ প্রসঙ্গে তপন কুমার দে লিখেছেন:

> এস. ডি. ও. সামসুদ্দিনের নির্দেশে জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা প্রায় ১৫০ জনের একটি দল নিয়ে আসেন বাঘাবাড়ী ঘাটে। এ দলের মধ্যে ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, ই.পি. আর., পুলিশ, আনসার, সহ ছাত্র-যুবকেরা। তাদের নিকট প্রায় ১০০টি অস্ত্রছিল বিভিন্ন ধরনের। বাঘাবাড়ী ঘাটে পৌঁছে আব্দুল মির্জা তার সহযোগীদের নিয়ে বাংকার করে পাক সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান করার পর তিনি সংবাদ পান পাক-সেনারা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল নগরবাড়ী হয়ে এবং অন্য একটি দল পাবনা থেকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পাবার পর লতিফ মির্জা তার সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান নেন পাবনা জেলার বেড়া থানার কাশিনাথপুরের নারিকেলবাগানে। এখানে ছিল প্রচুর ডাবগাছ। এই ডাবগাছের বাগানে লতিফ মির্জা পাক-সেনাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৯ শে এপ্রিল দুপুর ১২টার দিকে পাক- সেনাদের প্রায় ৩০০ সৈন্যর একটি দল নারিকেলবাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা এখানে বিশ্রাম করছিল এমন সময় পাক-সেনারা হঠাৎ করে চারদিক

> থেকে মর্টার সহ বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। হঠাৎ আক্রমণ করলে মুক্তিসেনাদের আক্রমণ করতে তেমন দেরি হয়নি। শুরু হয় দুপক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ। এ যুদ্ধ চলে প্রায় ৩/৪ ঘণ্টার মত। পাক-সেনাদের কামান, মর্টার সহ আধুনিক অস্ত্রের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাধারণ রাইফেল দিয়ে বেশী সময় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। পাক-সেনাদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচুর ক্ষতি হয়। এখানে ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। অপর দিকে পাক-সেনাদের মারা যায় ৪/৫ জন। পাক-সেনাদের আক্রমণের চাপে এক পর্যায়ে আব্দুল লতিফ মির্জা তার সঙ্গীদের নিয়ে সরে আসেন।[৭০]

কাশিনাথপুরের নারিকেল বাগানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে লতিফ মির্জার নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী পুনরায় ঘাটিনা ব্রিজের নিকট পাকিস্তানি সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করেন। গবেষক তপন কুমার দে লিখেছেন:

> লতিফ মির্জা তার সহযোগীদের নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার ঘাটনা ব্রীজে পাক-সেনাদের সঙ্গে একযুদ্ধে লিপ্ত হন। ঘাটনা ব্রিজটি ছিল সিরাজগঞ্জ ও উল্লাপাড়ার মাঝামাঝি স্থানে। এই ব্রীজের উপর দিয়েই সিরাজগঞ্জ সহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেতে হতো পাক-সেনাদের। তাই এদের প্রতিরোধের জন্য আব্দুল লতিফ মির্জা প্রায় ৩/৪'শ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ওঁৎপেতে থাকে। এপ্রিলের শেষ দিকে পাক-সেনাদের বিরাট একটা দল ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয় রেল যোগে। ঐ দলটি তাদের সঙ্গে রাখে আকাশ পথে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ। পাক-সেনাদের দলটি সকাল ১১টার দিকে যখন ঘাটনা ব্রীজের কাছাকাছি আসে তখনই গর্জে উঠে আব্দুল লতিফ মির্জা ও তার সঙ্গীদের আগ্নেয় অস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে পাক-সেনারা হতচকিত হয়ে পড়ে। তাদের প্রস্তুতি নিতে বেশ কয়েক মিনিট কেটে যায়। এতে তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রস্তুতি নিয়ে পাক-সেনারা পাল্টা আক্রমণ চালায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুদ্ধ চলে প্রায় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ২২ জন পাক-সেনা নিহত হয়। মুক্তিসেনাদের এল এম জি'র গুলিতে শত্রুর রেল গাড়ীর প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রথম দিকে যুদ্ধে কুলাতে না পেরে পাক-সেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর। এবার পাক-সেনাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠা সম্ভব হবেনা বুঝতে পেরে আব্দুল লতিফ মির্জা তার সঙ্গীদের নিয়ে সরে পড়েন। এই যুদ্ধে আরো ছিলেন এ্যাডঃ বিমল কুমার দাস, লুৎফর রহমান অরুণ, মোস্তফা কামাল খান, আলাউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। ঘাটনা থেকে লতিফ মির্জা সহকর্মীদের নিয়ে উল্লাপাড়া যান। পরে উল্লাপাড়া থেকে পায়ে হেঁটে তিনি লোকজন নিয়ে সিরাজগঞ্জ আসেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পান সংগ্রাম পরিষদের লোকজন সবাই সিরাজগঞ্জ ছেড়ে গেছেন এবং শহরে সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। এ অবস্থায় তিনি সহকর্মীদের নিয়ে সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্রাবাসে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন এ্যাডঃ বিমল কুমার দাস, লুৎফর রহমান অরুণ, মোস্তফা কামাল খান, মোঃ আলাউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।[৭১]

ঘাটিনা ব্রিজের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিরোধ পর্ব সমাপ্ত হয়। এর পূর্ব থেকেই অবশ্য সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের একাংশ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছাড়তে শুরু করেছিলেন। ২৭ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ পাকিস্তানি শত্রুসৈন্যের দখলে চলে যায়। সিরাজগঞ্জ দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে সংগ্রাম পরিষদের অবশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এলাকা ছেড়ে চলে যান।[৭২]

সংগঠন

সিরাজগঞ্জ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার কারণে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সিরাজগঞ্জ ছেড়ে চলে গেলে লতিফ মির্জা প্রায় একক প্রচেষ্টায় এই এলাকায় মুক্তিবাহিনী সংগঠনের কাজ শুরু করেন। এই বাহিনীর ভ্রুণ গঠিত হয় একটি চাইনিজ রাইফেল ও একটি রামদা নিয়ে।[৭৩] এরপর লতিফ মির্জা সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানার ভদ্রঘাট নামক স্থানে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন

করেন।[৭৪] পাকিস্তানি সেনাদল এই ক্যাম্প জুন মাসের মাঝামাঝিতে আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। এই আক্রমণে ২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।[৭৫]

ভদ্রঘাট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লতিফ মির্জা তার বাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে উপস্থিত হন বেলকুচি থানার রান্দুনীবাড়ী। এখানে তিনি কয়েকশ নৌকা ও হাজারের মত লোকবল সংগ্রহ করে বাহিনী পুনর্গঠন করেন। তার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক নাম হয় 'পলাশডাঙ্গা যুবশিবির'।[৭৬] এই বাহিনী বা যুবশিবিরের সাংগঠনিক কাঠামোটি নিম্নরূপ:[৭৭]

মহাপরিচালক: আব্দুল লতিফ মির্জা (ছদ্মনাম: স্বপন কুমার)
সহকারী পরিচালক: আবদুস সামাদ ও মনিরুল কবির
কমান্ডার-ইন-চীফ: সোহরাব আলী সরকার (ছদ্মনাম: অশোক)
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার-ইন-চীফ: বিমল কুমার দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার-ইন-চীফ: স. আমজাদ হোসেন মিলন, প্রধান অস্ত্র প্রশিক্ষক, অপারেশন
পরিচালক ও ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার: লুৎফর রহমান খান (ছদ্মনাম: অরুণ), তৎকালীন ল্যান্স নায়েক, বেঙ্গল রেজিমেন্ট
১নং কোম্পানি কমান্ডার: আব্দুস সামাদ সরকার, বেঙ্গল রেজিমেন্ট সদস্য
২ নং কোম্পানি কমান্ডার: মোজাহারুল ইসলাম, ইপিআর সদস্য
৩ নং কোম্পানি কমান্ডার: আব্দুস সালাম, বেঙ্গল রেজিমেন্ট সদস্য
৪ নং কোম্পানি কমান্ডার: আব্দুল বাছেদ, ঐ
৫ নং কোম্পানি কমান্ডার: আব্দুর রহমান, ঐ
৬ নং কোম্পানি কমান্ডার: খলিলুর রহমান, ইপিআর সদস্য

লতিফ মির্জা বাহিনীর অসংখ্য সেকশন কমান্ডারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন আফজাল হোসেন, আমিরুজ্জামান খোকন, মোবারক হোসেন, আতাউর রহমান, ওয়াজেদ আলী আজাদ। এছাড়াও মো. খোরশেদ আলম, আব্দুল আজিজ মির্জা, সফিকুল ইসলাম সফি প্রমুখ বাহিনীর প্রয়োজনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন হন।[৭৮]

লতিফ মির্জা বাহিনীতে একটি অস্ত্রভাণ্ডার সেকশন ছিল। বিভিন্ন স্থান ও যুদ্ধ অথবা সংঘর্ষ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র এই সেকশনের কাছে জমা রাখা ও নতুন মুক্তিযোদ্ধাকে এখান থেকে অস্ত্র প্রদানের কাজটি সম্পন্ন হতো।[৭৯]

এই বাহিনীর বেসামরিক বিভাগ বা সেকশনের কমান্ডার ছিলেন আব্দুল আজিজ মির্জা ও আব্দুল আজিজ সরকার। মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়া ও নিয়মিত সাপ্তাহিক হাত খরচ প্রদানসহ যাবতীয় বেসামরিক বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তারা পালন করতেন। প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার বাবদ ১৩/১৪ মণ চাল ও অন্যান্য খরচ বাবদ দুই হাজার টাকার প্রয়োজন হতো। বাহিনীর বেসামরিক কমান্ডারদ্বয় এই প্রয়োজন মেটাতেন অত্র এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তির দান, মুষ্টি সংগ্রহ ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দান থেকে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাত খরচ বাবদ সপ্তাহে ১০ টাকা ও কমান্ডারদের ১৫ টাকা করে দেওয়া হতো।[৮০] বাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য বাহিনীর সাথে তাড়াশ থানানিবাসী চিকিৎসক গাজী সিরাজ উদ্দিন খান থাকতেন। একই সাথে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের ওষুধপত্র বিনামূল্যে মুক্তিযোদ্ধা ও অসহায় পরিবারের সদস্যদেরকে সরবরাহ করতেন।[৮১]

লতিফ মির্জা বাহিনীর কয়েকটি নির্দিষ্ট শেল্টার সেকশন ছিল। আর ছিল একটি রিক্রুটিং সেকশন। তাড়াশের ছাত্রনেতা আতাউর রহমান ছিলেন এই সেকশনের প্রধান। কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা কোথায়,

কত তারিখে যোগদান করেছেন, কার পোস্টিং কোথায়, কে কে কোন অপারেশনে যাচ্ছে, ইত্যাদি রেকর্ড সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব তা পালন করতো এই রিক্রুটিং সেকশন।[৮২]

সিরাজগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দালালদের যাবতীয় খবরা-খবর সংগ্রহের জন্য লতিফ মির্জা বাহিনীর একটি নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। শিশু-কিশোর ছেলে মেয়েরা এই বিভাগে কাজ করতো। তাদেরকে গোপন খবর আনার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হতো। তারা কুলি, মজুর, ভিখারি, বিভিন্ন বেশে সেজে সংগৃহীত গোপন খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিত।[৮৩]

এছাড়া, এই বাহিনীতে একটি রেকি পার্টি ছিল। তারা আক্রমণের পূর্বে শত্রুর অবস্থান ও অবস্থান স্থল রেকি করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের। মো. খলিলুর রহমান, মো. আতিকুর রহমান তোতাসহ কয়েকজন এই ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।[৮৪]

লতিফ মির্জা বাহিনীর মূল ঘাঁটি বা হেড কোয়ার্টার ছিল চলনবিলে। মূলত বর্ষা শুরু হওয়া থেকেই চলনবিলের বিভিন্ন অংশে ভ্রাম্যমান ছিল এই ঘাঁটি।[৮৫] মূল ঘাঁটি বা সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল একটি ছোটো বজরায়। এই বজরাতে অবস্থান করেই বাহিনীর সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন লতিফ মির্জা। সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জড়িত থাকতেন মহাপরিচালক লতিফ মির্জা, সামরিক শাখার অধিনায়ক সোহরাব আলী, কমান্ডার লুৎফর রহমান ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ। মুক্তিশিবিরের সঞ্চিত টাকা-পয়সা ও অতিরিক্ত রসদ মজুদ থাকত ঐ বজরায়।[৮৬]

সিরাজগঞ্জে প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পর লতিফ মির্জা যে বাহিনী গড়ে তুলছিলেন, সেখানে ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার ও অন্যান্য ছাত্র-যুবক শ্রেণি-পেশার মানুষকে বড় পরিসরে একত্রিত করার কাজ শুরু হয় জুলাই মাস থেকে। তখন ধীরে ধীরে বাহিনীর লোকবল বাড়তে থাকে এবং এদের জন্য নৌকা-বজরা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। চলনবিলের বিভিন্ন প্রান্তে বজরায় এদের অবস্থান ছিল। এক একটি বজরায় ১০/১২ জনের একটি সেকশন অবস্থান করত।[৮৭]

এদিকে জুলাই-আগস্ট থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীন এফএফ যোদ্ধাদের সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন থানায় পাঠানো শুরু হয়। এসব যোদ্ধাদল ছিল ছোটো ছোটো এবং এদের নিশ্চিত কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না বা কার্যক্রম চালাবার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। এ অবস্থায় অত্র এলাকায় আসা এফএফ যোদ্ধা দলের কয়েকটি অংশ লতিফ মির্জা বাহিনীর সাথে মিলে কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব দিলে লতিফ মির্জা বাহিনীর হাই কমান্ড তাতে রাজি হয়। এর ফলে এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাহিনীতে সিরাজগঞ্জের মাটিয়া মালিপাড়া, বুড়ঙ্গী, কান্দাপাড়া, ঝাঐল, দবিরগঞ্জ, গুর্কা, সলপ, কালিয়াকৈর, একডালা, চরভাঙ্গুরা, বংকিরহাট, চক সাইকোলা, নান্দিনামধু, সিটলাই, পিপুলবাড়িয়া, বন্দর, তাড়াশ, ফুলকুচা, রায় দৌলতপুর (পাবনা, সিরাজগঞ্জ), ধারাবারিষা (রাজশাহী), কচুয়াপাড়া (বগুড়া), তারাকান্দি (টাঙ্গাইল) সহ বহু জায়গার যুবক, কৃষক, তাঁতি, শ্রমিক, জেলে, মজুর ইত্যাদি পেশার মানুষ যোগ দেন।[৮৮] এমনকি শরণার্থীর স্রোত থেকেও অসংখ্য ছাত্র-যুবক লতিফ মির্জা বাহিনীতে যুক্ত হন।[৮৯]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মার্চের প্রথম থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলে সিরাজগঞ্জে লতিফ মির্জার নেতৃত্বে ছাত্রগণ সংগঠিত হতে শুরু করে। ৮ মার্চ ছাত্র ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর সিরাজগঞ্জ বিএ কলেজ ও হৈমবালা বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে লুৎফর রহমান অরুণ, তাড়াশের আব্দুর রহমান ও সয়াগোবিন্দের জাকির হোসেনের

মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।[৯০] প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন আব্দুল লতিফ মির্জা, আব্দুর রউফ পাতা, ইসহাক হোসেন ও ইসমাইল হোসেন। এছাড়া আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেও প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল ইসলামিয়া কলেজ মাঠে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সি-ইন-সি ছিলেন মোজাফফ্র হোসেন এবং ডেপুটি সি-ইন-সি ছিলেন মাসুদ। উভয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সদস্য লুৎফর রহমান অরুণ।[৯১] পরবর্তীকালে লতিফ মির্জার বাহিনী বা পলাশডাঙ্গা যুবশিবির গঠিত হলে এদের বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু ছিল সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পলাশডাঙ্গা, উল্লাপাড়ার গায়হাটা ও কালিয়াকৈর। এছাড়াও চলনবিলের আশেপাশের খোলা মাঠেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো।[৯২] তাছাড়া বজরায় থাকা সেকশনগুলোর মধ্যে যে সেকশন যে ঘাটে নোঙ্গর করতো সেখানে নিয়মিতভাবে অনুশীলন চলত। বিভিন্ন প্রকার শরীরচর্চা, শত্রু প্রতারণা বিদ্যা, অস্ত্র চালনা, অতর্কিত আক্রমণ, দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও সরিয়ে ফেলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়মিত অনুশীলনের অংশ ছিল।[৯৩]

এর বাইরে লতিফ মির্জা বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলত মূলত বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে। আব্দুল লতিফ মির্জা, অ্যাডভোকেট বিমল কুমার দাস, প্রমুখ যোদ্ধাদের সামনে অনুপ্রেরণামূলক নানা ধরনের আলোচনা বা বক্তৃতা রাখতেন। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাখা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।[৯৪]

লতিফ মির্জা বাহিনীতে প্রায় ১০ হাজার নানা রকম আগ্নেয়াস্ত্র ছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে এত বিরাট পরিমাণ অস্ত্র হঠাৎ করে বাহিনীর ভাণ্ডারে আসেনি। বাহিনীর যাত্রারম্ভ হয়েছিল একটি চাইনিজ রাইফেল ও একটি রাম দা নিয়ে।[৯৫] তারপর বাহিনীর হাতে আসে ১টি একনলা ও ১টি দোনলা বন্দুক।[৯৬] ২৭ মার্চ মহকুমা প্রশাসক সামসুদ্দিন আহমদ সিরাজগঞ্জের সকল থানাকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন ।[৯৭] ঐসব অস্ত্র দিয়ে সিরাজগঞ্জ প্রতিরোধের চেষ্টা হয়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু হাত বোমা। কিন্তু সিরাজগঞ্জ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ভেঙ্গে পড়লে বিক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্রের একটি অংশ লতিফ মির্জার নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগান। এছাড়া শত্রুপক্ষের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন থানা আক্রমণ, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে পাওয়া অস্ত্রই মূলত এই বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার পুষ্ট করেছিল। এছাড়া, যেসব এফএফ যোদ্ধা লতিফ মির্জা বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে থাকা অস্ত্রও বাহিনীর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৯৮] এসবের বাইরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গোলাবারুদের সাব-ডিপো বগুড়ার আড়িয়া বাজার সাব-ডিপো স্থানীয় জনগণ কর্তৃক লুট হওয়ার পর কিছু কিছু অস্ত্র সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এসেছিল।[৯৯]

আওতাভুক্ত এলাকা

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে লতিফ মির্জা বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল বৃহত্তর পাবনা, নাটোর ও বগুড়া জেলার কিয়দংশ জুড়ে।[১০০] জুলাই মাসের শেষ ভাগ নাগাদ বাহিনীর বিচরণক্ষেত্র ছিল শাহজাদপুর, চৌহালী থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোনাতলী, কৈজুরী, পুঠিয়া প্রভৃতি জায়গায়।[১০১] মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে এই বাহিনী সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল্লাপাড়া-তাড়াশ, শাহজাদপুরের কিছু অংশ, পাবনা সদর মহকুমা, সাথিয়ার কিছু অংশ, ফরিদপুর থানা, চাটমোহর থানার পূর্ব ও উত্তর অংশ, বগুড়ার শেরপুরের দক্ষিণ অংশ, নাটোরের গুরুদাসপুরের পূর্ব অংশ ও সিংড়ার কিছু অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।[১০২]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

লতিফ মির্জা বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে সিরাজগঞ্জসহ তৎপার্শ্ববর্তী যেসব এলাকায় সক্রিয় ছিল, সেসব স্থানে এ বাহিনীর যোদ্ধাদেরকে মোকাবেলা করতে হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৪ পদাতিক ব্রিগেডের কোম্পানি ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২৩ পদাতিক ব্রিগেডের ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও ইপিসিএএফ-এর ৭নং উইং এর একাংশকে।[১০৩] এদের পাশাপাশি অত্র এলাকায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে থাকা পুলিশ এবং রাজাকার দলকেও লতিফ মির্জা বাহিনী মোকাবেলা করেছিল। শত্রুপক্ষের

এই শক্তিশালী অবস্থানের বিপরীতে লতিফ মির্জা বাহিনীর প্রধান যুদ্ধকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ। অর্থাৎ 'আক্রমণ কর ও সরে পড়' পদ্ধতিতে যুদ্ধ। এ কারণে পলাশডাঙ্গা যুবশিবির সমগ্র উল্লাপাড়াকে তাদের 'হাইডআউট' (কৌশলগত আশ্রয়স্থল) হিসেবে রূপান্তরে মনোযোগী হয়। তবে আগস্টের পর এ বাহিনী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটি সম্মুখ সমরেও জড়িয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি এই বাহিনী অন্যতম আক্রমণক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করেছিল সিরাজগঞ্জ ঘাট থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০০ কি.মি. ব্যাপী রেলপথকে। তারা ভেবেছিল এই পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অকেজো করে রাখা গেলে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার বিরাট অংশের সঙ্গে ঢাকার রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হবে। এতে দখলদার বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল পরিবহণ কঠিন হয়ে পড়বে।[১০৪]

লতিফ মির্জা বাহিনী শত্রুসৈন্য ও তাদের এদেশীয় দালালদের সাথে প্রায় ৫০টি সমরে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এসব সংঘর্ষের বা যুদ্ধের কয়েকটিতে লতিফ বাহিনীর নিজস্ব যোদ্ধা বাদেও আগস্টের পর অত্র এলাকায় ভারত থেকে আসা কয়েকটি দলের সদস্যরাও অংশ নিয়েছিলেন।[১০৫] লতিফ মির্জা বাহিনীর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাভিযানগুলো হল ভদ্রঘাট যুদ্ধ, ফরিদপুর থানা অভিযান, তাড়াশ থানা অভিযান, ব্রক্ষগাছা যুদ্ধ, সলঙ্গা বাজারের রাজাকার ক্যাম্প পোড়ানো, জামতৈল ব্রিজ অভিযান, ছাইকোলা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, বেলকুচি থানা অভিযান, ভাটপেয়ারীর যুদ্ধ, বরইতলীর যুদ্ধ এবং নওগাঁ যুদ্ধ। নিম্নে এ বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো:

ফরিদপুর থানা অভিযান[১০৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: জুনের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন বেলা ৫ টায়।

অভিযানের উদ্দেশ্য: শত্রুপক্ষের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা ও তাদের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল লতিফ মির্জা তার দলের ১২ জন সদস্যকে সাথে নিয়ে থানা অভিযানে অংশ নেন। এ অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কয়েকটি ৩০৩ রাইফেল ও হাত বোমা ছিল।

অভিযানের বিবরণ: ফরিদপুর পাবনা জেলা সদর হতে প্রায় ৫৫ কি.মি. উত্তর-পূর্বে চলনবিল এলাকায় অবস্থিত একটি স্থান। ফরিদপুর থানার উত্তরে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাাড়া ও পূর্বে শাহজাদপুর উপজেলা। জুন মাসের শেষ সপ্তহে লতিফ মির্জা বাহিনী এই থানা আক্রমণ করার জন্য নৌকাযোগে উল্লাপাড়ার বিল এলাকা থেকে রওনা হন। ফরিদপুর থানা এলাকায় পৌঁছে যোদ্ধাগণ অস্ত্র লুকিয়ে সরাসরি থানায় প্রবেশ করেন। এরপর তারা কৌশলে পুলিশদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। কোন গুলি বিনিময় ছাড়াই এই অভিযান সম্পন্ন হয়।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাগণ থানা অভিযান থেকে চাইনিজ এলএমজি, ২৫/৩০টি ৩০৩ রাইফেল ও প্রচুর গুলি লাভ করেন। আটককৃত পুলিশগণ তাৎক্ষণিক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

তাড়াশ থানা অভিযান[১০৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে কোনো একদিন সন্ধ্যা ৭টার পর।

অভিযানের উদ্দেশ্য: তাড়াশ থানা এলাকার পুলিশ ও রাজাকার-দালালদের দৌরাত্ম বন্ধ করা, তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা এবং বাহিনীর নতুন প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাড়াশ থানার ওপর রেইড করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আব্দুল লতিফ মির্জা, হাবিলদার মোজহার, সেলিমসহ মোট ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ২টি এলএমজি, ৫টি এসএমজি, ১০টি ৩০৩ রাইফেল ও কয়েকটি ৫১ হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে তাড়াশ থানা অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের বিবরণ: তাড়াশ থানাটি শহরের পশ্চিম-উত্তর কোণে সম্পূর্ণ একটি আলাদা এলাকায় অবস্থিত। থানাটিকে বর্ষাকালে একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। প্রধান সড়ক থেকে একটি মাত্র ঢোকার রাস্তা যেটি থানার মধ্যে থেকে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে। পশ্চিম দিকে শুধু চলনবিল। উত্তর এবং পূর্ব দিকে গ্রাম এলাকা। আর দক্ষিণ দিকে তাড়াশ প্রধান সড়ক। তাড়াশ থানাটি চলনবিলের কূল ঘেঁষে অবস্থান করার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এটিকে রেইড করার পরিকল্পনা করে। থানায় কিছু দিন পূর্বে পাকবাহিনী এসে বাংকার প্রস্তুত করে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ করে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অতিপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য এই থানাকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে স্থির করে। শত্রুপক্ষের অবস্থান ছিল তাড়াশ থানার পুলিশ ক্যাম্প। এখানে পুলিশ ও রাজাকাররা একত্রে চতুর্মুখী প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। জানা যায় থানার ছাদের ওপরে শত্রু একটি এলএমজি পোস্ট স্থাপন করেছিল।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে হান্ডিয়াল নওগাঁ এলাকা থেকে প্রায় ১ কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা বিকাল ৫টার দিকে নৌকা যোগে তাড়াশ থানা অভিমুখে রওয়ানা হয়। নৌকাগুলো আগে থেকেই বিভিন্ন উপদলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আর ঠিক সেভাবেই যে যার অবস্থানের দিকে এগিয়ে চলছিল সন্ধ্যার পরেই চারদিকে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। ঠিক সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত নৌকা তাড়াশ থানা সংলগ্ন রাস্তায় ভীড়ল। চোখের পলকে মুক্তিযোদ্ধারা থানার সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যার যার অবস্থান নিল। এটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, কে কোথায় পজিশন নিবে। থানার ভিতরে থাকা পুলিশরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোম্পানি কমান্ডার অস্ত্রের কোত দখল করে নেয়। ওখানে এক পুলিশ গুলি করার চেষ্টা করলে তাকে সেখানেই খতম করে দেয়া হয়। তখনই প্রথম গুলির আওয়াজ শোনা যায়। তখন সকলেই বুঝতে পারলো এটা নিজেদের বাহিনীর গুলির শব্দ। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা যার যার অবস্থানে প্রস্তুত থেকে ফায়ার না করার নির্দেশ মেনে চললো। যাতে করে রাতের অন্ধকারে নিজেদের গুলিতে নিজেরা মারা না যায়। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক পুলিশ ও রাজাকারসহ সমস্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে। পুলিশ ও রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার নিশ্চয়তা দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওরা সবাই জীবনে বেঁচে যাওয়ায় আনন্দে কেঁদে ফেলে।

ফলাফল: শত্রুসৈন্যের ১ জন নিহত হয় ও কয়েকজন রাজাকার-পুলিশ আহত হয়। এই অভিযানে কয়েকটি এলএমজি সহ ২১/২২টির মতো ৩০৩ রাইফেল ও ১০/১২ বাক্স গোলাবারুদ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মগাছা অভিযান[১০৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোনো একদিন ভোরে।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিবাহিনীর অবস্থান রাজাকার কর্তৃক চিহ্নিত হওয়ায় হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আত্মরক্ষার্থে মুক্তিবাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: লতিফ মির্জা, লুৎফর রহমান, মোজহারুলসহ লতিফ মির্জা বাহিনীর ৩ কোম্পানি (প্রায় ৪২০ জন) যোদ্ধা চাইনিজ রাইফেল, চাইনিজ এসএমজি, এসএলআর, ব্রিটিশ স্টেনগান, ৩০৩ রাইফেল, পিস্তল, ২" মর্টার নিয়ে অভিযানে যুক্ত হয়েছিলেন।

অভিযানের বিবরণ: ব্রহ্মগাছা গ্রামটি বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার হাট পাদাসী ইউনিয়নে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ শহর হতে আনুমানিক ২০ কি.মি. দূরে এর অবস্থান। ঘটনাস্থলের মধ্যে দিয়ে ইছামতি নদী প্রবাহিত। এই নদীর উত্তর পার্শ্বে হানাদার বাহিনী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিল। শত্রুপক্ষ সিরাজগঞ্জ ক্যাম্প এলাকা হতে উক্ত স্থানে আক্রমণের উদ্দেশ্যে গমন করে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে কাঁচা সড়ক, যেটাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায় এবং অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী কাশবনের ভেতরে লুকায়িত বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে হানাদার বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধা দলটি ভদ্রঘাটে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর জুনের শেষে কিংবা জুলাই-এর ১ম দিকে ব্রহ্মগাছায় চলে যায় এবং রৌমারী হতে কিছু সদস্য ব্রহ্মগাছায় চলে আসে। ৪২টি নৌকার মাধ্যমে ইছামতি নদীপথে তারা এই এলাকা মুক্ত রাখে। এর মধ্যে কিছু নতুন সদস্য অস্ত্র চালনা শিক্ষা গ্রহণ করে। ঘটনার ২ দিন পূর্বে সৈনিক রফিক ও সঙ্গে আরো দুইজন ইছামতি নদীর উত্তর-পূর্ব দিকে ওপি তে অবস্থান করছিল। নাম না জানা একজন রাজাকার সদস্য ব্রহ্মগাছা গ্রামে আসে তার স্ত্রীকে নেওয়ার জন্য। সৈনিক রফিক সেই রাজাকার সদস্যকে ধরে ফেলে নৌকায় ওঠানোর সময় সেই রাজাকার পালিয়ে সিরাজগঞ্জ আসে এবং সেখানে অবস্থিত পাক হানাদার বাহিনীকে খবর দেয়। পরের দিন মুক্তিযোদ্ধারা রায়গঞ্জ থানার বগাদহ নামক স্থানে অবস্থান করছিল। ভোরের দিকে খবর এলো পাকসেনারা তাদের অবস্থান থেকে ৩ কি.মি. দূরে একত্রিত হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার জন্য। পলাশ ডাংগা যুব শিবিরের পরিচালক আব্দুল লতিফ মির্জা, গাজী লুৎফর রহমান (অরুণ) ও ২ নং কোম্পানি কমান্ডার ইপিআর-এর মোজাহারুলকে ডাকলেন এবং যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো। যেহেতু পাকসেনারা ব্রহ্মগাছা নদীর ওপারে প্রতিরক্ষা নিয়েছে এবং শক্তি বৃদ্ধি করছে সেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে রায়গঞ্জে আব্দুল খালেক মন্টু ভারত থেকে আনা ২˝ মর্টারসহ মোজাহারুলের ১ প্লাটুন, গাজী লুৎফর রহমানের (অরুণ) ১ প্লাটুন এবং গার্ড কমান্ডার হোসেন আলী ১ সেকশন যোদ্ধা নিয়ে পজিশনে থাকবে। আব্দুল লতিফ মির্জা নির্দেশ দেন ক্যাম্পের সিএনসি সোহরাব আলী সরকার- ১ নং কোম্পানি কমান্ডার সেনাবাহিনীর সদস্য বাকুয়ার মো. সামাদ তার কোম্পানি নিয়ে পর যোগ দিবে এবং অন্য কোম্পানিগুলো এখানে থাকবে। ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের নির্দেশে পরবর্তী কার্যক্রম চলবে। সিদ্ধান্ত শেষে সবাই পজিশনে যাওয়ার জন্য দৌড়াতে শুরু করে। হোসেনের সেকশনকে মাঝখানে রেখে বাকি ২ প্লাটুন দুই দিকে অবস্থান নিয়ে শত্রু গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা চেষ্টা করে। মাঝখান থেকে গার্ড কমান্ডার হোসেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঐ যে শালারা..."। বলেই সারা জীবনের আক্রোশ মিটানোর জন্য ফায়ার শুরু করে দিল। তিনি এক সময় এয়ার ফোর্সে চাকুরি করতেন। লুৎফর রহমান (অরুণ) ফায়ার বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন কেননা নদীর এ পারে মুক্তিবাহিনী আর ওপারে হানাদার বাহিনী, তাই যুদ্ধে কেবল গুলি নষ্ট হবে। ২নং কোম্পানি কমান্ডার মোজাহারুল-এর কাছে ২˝ মর্টার ছিল। মুক্তিবাহিনী পর্যবেক্ষণ করছিল শত্রু কোন স্থান হতে ভারী অস্ত্র চালাচ্ছে। যত গুলি চালানো হোক না কেন কারো তেমন ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল না কাজেই একমাত্র মর্টারই ছিল ভরসা। তাই শত্রুর ভারী অস্ত্রের বিরুদ্ধে মর্টারের শেল নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। কিন্তু প্রথম গোলা ফুটলো না। কারণ সেটা ছিল ড্যাম। দ্বিতীয় শেষ নিক্ষেপ করা হলো প্রচণ্ড শব্দে লক্ষ্যবস্তুতে ছুটে গেল। এতে শত্রুর অবস্থানে আঘাত করলেও ক্ষয়ক্ষতির সফলতা বোঝা যায়নি। তবে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। মুক্তিযোদ্ধারা চেষ্টা করেও শত্রুর কিছুই করতে পারছিল না। শত্রুরাও না। গোলাবারুদের অপ্রতুলতার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে দু'একটি গুলি ছোড়া হয়। শত্রু পক্ষ লাগাতার ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছোড়ে। এক পর্যায়ে মর্টার সেলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হানাদার বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাতে আবারও জরুরী ভিত্তিতে লতিফ মির্জার নেতৃত্বে আলোচনা সভা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা।

ফলাফল: ব্রহ্মগাছা যুদ্ধে উভয়পক্ষেই দীর্ঘক্ষণ গোলাগুলি করলেও কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

নওগাঁ অভিযান[১০৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১১ নভেম্বর ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহতকরণে এই সম্মুখ যুদ্ধ।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: লতিফ মির্জা, লুৎফর রহমান, সোহরাব আলীসহ প্রায় ১ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, মর্টার, ৩০৩ রাইফেল ও হাতবোমা নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: সিরাজগঞ্জের তাড়াশ থানার নওগাঁ একটি গ্রাম। এই গ্রামে লতিফ মির্জা বাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই আশেপাশে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার ঘাঁটিতে অভিযান চালাতেন। নওগাঁ গ্রামের মাজারের পশ্চিম পাশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্রায় ২৫০ জন সৈন্য অবস্থান নেন। তাদের সহযোগী ছিল মিলিশিয়া ও রাজাকার দল। ভোরবেলা প্রথমে হানাদার দল তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে দীর্ঘসময় মুক্তিযোদ্ধারা কোণঠাসা হয়ে থাকেন। তবে দুপুর ১২টার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এবার মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার বাহিনীকে পাল্টা আঘাত করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে দু'পক্ষই মাত্র ৪০ গজের মধ্যে মুখোমুখি হয়। লতিফ মির্জা মর্টার শেলিংয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে শত্রুপক্ষ দ্রুত এলোমেলো হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকিস্তানি সেনাদলকে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমাগত আঘাতে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য, মিলিশিয়া, রাজাকার মৃত্যুবরণ করতে থাকে। দুপুর ২টা নাগাদ পাকিস্তানি বাহিনীর ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৯ জন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দি হন। উভয় পক্ষে দীর্ঘক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। দুপরের শেষদিকে পাকিস্তানি সৈন্যগণ নওগাঁর অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যান।

ফলাফল: এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের শতাধিক নিহত হয় এবং তাদের সহযোগী-দালালদের ৭০/৮০ জনকে সাধারণ জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৭/৮ জন শহিদ হন ও ২০/২৫ জন আহত হয়। মুক্তিসেনারা শত্রুর নিকট থেকে বেশ কতক আরসিএল গান, এলএমজি, এইচএমজি, মর্টার, চাইনিজ রাইফেল ও প্রচুর গোলাবারুদ লাভ করে। তবে এই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ১৩ নভেম্বর নওগাঁর আমবাড়িয়া গ্রামে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘর ভস্মিভূত করে।

বেলকুচি থানা অভিযান[১১০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে চারটা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ১০ সেপ্টেম্বর কাজিপুরে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি সেনাদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। ফলে ১১ সেপ্টেম্বর স্বাভাবিকভাবেই তারা কাজিপুর থানা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর এই সুযোগে ৫০০ জনের এক বিরাট মুক্তিবাহিনী ঐদিনই সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত টাংগাইল জেলার সিংগুলীর চরে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে আনুমানিক ৩০০ জনের একটি দল বেলকুচি থানায় রেইড পরিচালনা করে।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: লতিফ মির্জা বাহিনীর আনুমানিক ৪ কোম্পানি (প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ জন, যার প্রায় ৩০০ জন উক্ত রেইডে অংশগ্রহণ করে) মুক্তিযোদ্ধা ২টি এসএলআর, ১টি মেশিনগান কার্বাইন, ১টি চাইনিজ এমএমজি, ৪টি চাইনিজ এলএমজি, ১টি ব্রিটিশ এলএমজি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ৩০৩ রাইফেল নিয়ে বেলকুচি থানা আক্রমণ করেন।

অভিযানের বিবরণ: সিরাজগঞ্জ জেলা সদর হতে প্রায় ২১ কি.মি. দক্ষিণে বেলকুচি থানা অবস্থিত। যমুনা নদীর ভাঙন থেকে বেলকুচি থানা রক্ষাকারী বাঁধের বাহিরে পুলিশ স্টেশন এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল। নদী ভাঙনের কারণে বর্তমানে উক্ত পুলিশ স্টেশনের কোনো অস্তিত্ব নেই। উক্ত পুলিশ স্টেশনের অবস্থান এমন ছিল যে, নদী ও স্থল পথে সেখানে পৌঁছানো যেতো। ১২ সেপ্টেম্বর সিংগুলীর চরের পশ্চিম দিকে নদীতে লঞ্চযোগে পাকিস্তানি বাহিনী হিন্দু শরণার্থীর এক নৌকা বহরে আক্রমণ করে। গুলির শব্দ শুনে মুক্তিবাহিনী চর থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যবাহী লঞ্চে পাল্টা আঘাত হানে। অত্র এলাকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার আমির হোসেন ভুলু বাইনোকুলার দিয়ে যাত্রীবিহীন ২০/২৫ জন পাকিস্তানি বাহিনীর একটি লঞ্চ দেখতে পান। প্রায় ৩০/৪০ মিনিট দুই পক্ষের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলার পর পাকিস্তানি সেনাদের লঞ্চটি দ্রুত সিরাজগঞ্জ সদরের দিকে পলায়ন করে। পরে জানা যায় এই যুদ্ধে ৫/৬ জন দখলদার সৈন্য মারা গিয়েছিল। এই ঘটনায় মুক্তিবাহিনীর সাহস বৃদ্ধি পায় এবং বেলকুচি আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিরাজগঞ্জ ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. সাইদ আহম্মেদকে আদাচাকীতে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। বেলকুচি বা সোহাগপুরের সাপ্তাহিক হাট ছিল বুধবার। সাইদ আহম্মদের ওপর নির্দেশ ছিল উক্ত হাটে গিয়ে তেল লবণ ক্রয়ের ফাঁকে থানার সবকিছু রেকি করে আসবে। বেলকুচি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আততায়ীর হাতে নিহত সোবাহান সাহেবের ছেলের সহযোগিতায় সাইদ আহমেদ রেকি করে রাত ৮ ঘটিকার সময় মুক্তিবাহিনীর নৌকায় ফিরে আসে এবং আমীর হোসেন ভুলুর সভাপতিত্বে রেকির উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন কোম্পানি কমান্ডার খ ম আক্তার হোসেন, ডেপুটি কমান্ডার ফজলুল মতিন মুক্তা, গ্রুপ লিডার সোহরাব হোসেন, আব্দুল বারী (ইউপি চেয়ারম্যান, বহুলী), গ্রুপ লিডার সাইদুল ও আরও অনেকে। আলোচনা শেষে রেইড পার্টি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে রেইড দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। একদল সদর থানা অফিসের পাশ দিয়ে, অন্য একটি দল বাঁধ দিয়ে আরও দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে পরবর্তীতে পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে এবং অপর দল ভাটির টানে ৪/৫টি নৌকা বোঝাই হয়ে ১২ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে চার ঘটিকার সময় বেলকুচি থানা আক্রমণ করে। সদর থানার অফিসের পাস দিয়ে গমনকারী দলের দায়িত্ব ছিল টেলিফোন সংযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে তারা দেখতে পান একটি বিল্ডিং (বর্তমানে বেলকুচি থানা টিএনও এর বাসভবন)-এ রাজাকারদের মিটিং চলছে। তিন দিক হতে হানা এলাকায় পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ারিং শুরু করে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানি মিলিশিয়া বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে ডেপুটি লিডার আব্দুর রশিদ ও অন্য একটা গ্রুপ-এর কোম্পানি লিডার সাইদুর রহমান ও উল্লাপাড়া থানার শামসুল হক গুরুতর আহত হন। ৪০/৪৫ জন পাকিস্তানি মিলিশিয়ার মধ্যে ৩/৪ জন মারা যায় এবং ১৫ জন মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। বাকীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ফলাফল: বেলকুচি থানা অভিযানে ৩/৪ জন পাকিস্তানি মিলিশিয়া মারা যায় এবং ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়। থানা থেকে এসএমজি, মর্টার, চাইনিজ রাইফেল, প্রচুর গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়।

ভাটপেয়ারী অভিযান[১১১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন মধ্যরাত।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিরাজগঞ্জ শহরকে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শহরের বাহিরে ভাটপেয়ারী স্কুলে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। শত্রুবাহিনীকে শহরের অদূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে পেয়ে মুক্তিবাহিনী তাদের ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করে। এছাড়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীকে উক্ত ক্যাম্প দখল করার জন্য আকৃষ্ট করে।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: মোজাফ্ফর হোসেন, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, হাবিলদার আজিজ, শফিকুল ইসলাম, ফিরোজ ভূঁইয়া-এর দলের ৬৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ২টি এসএলআর, ৭টি এসএমজি, ১ ব্রিটিশ এলএমজি ও ৪৫টি ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের বিবরণ: সিরাজগঞ্জ শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে ভাটপেয়ারী গ্রামটি অবস্তিত। যমুনার তীরে বেড়ী বাঁধ ঘেঁষে গ্রামটির অবস্থান (যুদ্ধের জায়গাটি বর্তমানে যমুনাগর্ভে বিলীন)। ভাটপেয়ারী স্কুলে পাকিস্তানি সৈন্যদল চতুমুর্খী প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে ও স্কুলে আসার রাস্তার পাশে একটি এলএমজি পোস্ট স্থাপন করে। রেইড করার আগে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানটি রেকি করেন। মোজাফ্ফর হোসেন স্কুলটি রেইড করার সিদ্ধান্ত নেন। মোজাফ্ফর এবং আমিনুল ইসলাম চৌধুরী পুরো দলকে চার ভাগে ভাগ করেন। রাত ১২টায় মুক্তিযোদ্ধারা কাজিপুর এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কার্য সম্পাদন সময় ছিল রাত ১.৩০ মিনিট। বাজারের নিকট স্কুলের পাশে হাবিলদার আজিজসহ আরো ১৮/২০ জন অবস্থান নেয়। স্কুলের সামনে শফিকুল ইসলাম ও তার দল অবস্থান নেয়। বাঁধের পূর্ব পাশে ফিরোজ ভূঁইয়া দল নিয়ে শত্রুর টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। শত্রুর এলএমজি ছিল স্কুলের ছাদে। এটা ধ্বংস করার জন্য তোতা মিয়াসহ ২ জন মুক্তিসেনা বটগাছে চড়ে বসে। শত্রুর তীব্র ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার আজিজ তার দল নিয়ে অবস্থান পরিবর্তন করে টয়লেটের নিকট অবস্থান নেয়। এলএমজি ম্যান শেখ আলাউদ্দিন স্কুলের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে শত্রুর এলএমজি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ তা দিয়ে শত্রুসৈন্য জানালা দিয়ে অনবরত ফায়ার করছিল। তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্লক থাকার কারণে তিনি রুমের ভেতর গুলি করতে পারেননি। কাজেই প্রত্যেকটা পরিখার মধ্যে গ্রেনেড ছোড়া হয়। ইতিমধ্যে সব শত্রু মারা যায়। শুধুমাত্র একটা রুমের ভিতর কিছু শত্রুসৈন্য তখনও জীবিত ছিল। হঠাৎ একজন মুক্তিযোদ্ধা রুমের ভিতর প্রবেশ করে তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

ফলাফল: বেলকুচি থানা অভিযানে হানাদার বাহিনীর ৩২ জন সদস্য নিহত হন ও অনেকে আহত ও বন্দী হন। মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর এই ক্যাম্প হতে প্রায় ২৫টি চাইনিজ রাইফেল, ৫টি এসএমজি, ১টি এলএমজি এবং ২১টি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং কিছু সিল বক্সসহ অনেক গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও মোতালেব এ অভিযানে আহত হন।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

লতিফ মির্জা বাহিনী বা পলাশডাঙা যুবশিবিরের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে ছাপার অক্ষরে কোনো পত্রিকা বা পুস্তিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হতো জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য। এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্যরা জনসংযোগ করতে সাধারণত হাটের দিনগুলো বেছে নিতেন। বিভিন্ন হাটে গিয়ে তারা হাটুরেদের ছোটো ছোটো দলের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য জনতার প্রতি আহ্বান জানাতেন।[১১২]

শহিদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধকালে লতিফ মির্জা বাহিনীর নিজস্ব সদস্যদের মধ্যে কেউ শহিদ হয়নি। তবে এ দলের পাঁচজন সদস্য (অ্যাডভোকেট শামসু, আব্দুস সালাম, কাঞ্চুসহ আরো ২ জন) বিভিন্ন যুদ্ধে আহত

হয়েছিলেন।[১১৩] তবে ভারত হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই বাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং এই বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রায় ৭০ জন সদস্য পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দালালদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন।[১১৪]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

লতিফ মির্জা বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের সূচনাপর্ব থেকেই প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। যেহেতু লতিফ মির্জা পূর্ব থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেও যুক্ত ছিলেন এবং সিরাজগঞ্জ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন, সেহেতু তার আনুগত্য নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব কোনো পক্ষের মধ্যেই ছিল না। লতিফ মির্জাকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার বা সেনানেতৃত্ব যে সন্দেহমুক্ত ছিল তার প্রমাণ মেলে যখন লতিফ মির্জাকে ১১ নং সেক্টর কর্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ এলাকার রাজনৈতিক সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ দেয়।[১১৫] তাছাড়া, লতিফ মির্জা বাহিনীতে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাগণ যুক্ত হতেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, লতিফ মির্জা বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কোনো নেতিবাচক সম্পর্ক ছিল না।

গণমাধ্যমে লতিফ মির্জা বাহিনী

যুদ্ধকালীন গণমাধ্যমে লতিফ মির্জা বাহিনীর কার্যাবলি নিয়ে তেমন কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধের কথা প্রচার করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[১১৬]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

লতিফ মির্জা বাহিনীর কোনো মুক্তিযোদ্ধা এখন পর্যন্ত সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক খেতাব বা রাষ্ট্রীয় কোনো পুরস্কার পাননি। উপরন্তু এই বাহিনীর অন্তত দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা আজো মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। এই বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাকারী শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতিটুকুও পাননি।[১১৭] এরপর আবার স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরে এসে এই মুক্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতাসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত রাজাকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখা যায়।[১১৮]

অস্ত্র সমর্পণ

লতিফ মির্জা বাহিনীর সমুদয় অস্ত্র ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে সরকারের মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর নিকট জমা দেওয়া হয়।[১১৯]

মূল্যায়ন

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে সিরাজগঞ্জ কার্যত শত্রুসৈন্যের দখলে চলে যায়। এসময় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দও ভারতে অবস্থান নেন। সেই অবস্থায় শত্রু কবলিত সিরাজগঞ্জ, পাবনার একাংশ, বগুড়ার একাংশ ও নাটোরের একাংশের মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের ভরসা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল লতিফ মির্জা বাহিনী। অবরুদ্ধ এসব এলাকায় জুন মাস থেকেই বাংলাদেশ সরকার বা ভারতের কোনো সহায়তা বাদেই সক্রিয় ছিল লতিফ মির্জা বাহিনী। সেসময় এই মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজনীয় রসদের (প্রধানত অস্ত্র বাদে) যোগান দিয়েছিল অবরুদ্ধ জনতা।

মুক্তিবাহিনী গঠন করেই লতিফ মির্জা ও বাহিনীর নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জনতাকে চোর-ডাকাত-লুটেরা ও রাজাকার-দালালদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের হাতে সাধারণ মানুষের সম্পদ-মান-প্রাণহানির আশঙ্কা দূর করতে তাদের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের এই কর্মকাণ্ডই

জনগণের একটি বিরাট অংশকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগী করে তুলেছিল। এইভাবেই সিরাজগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুক্তিযুদ্ধকে লতিফ মির্জা বাহিনী একটি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করেন।

সিরাজগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় লতিফ বাহিনী সৃষ্ট জনযুদ্ধের সুফল অনেকাংশে পেয়েছিল ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করা এফএফ যোদ্ধাগণ। সিরাজগঞ্জ ও নিকটবর্তী এলাকায় ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়সহ বিবিধ সহযোগিতা প্রদান করেছিল লতিফ মির্জা বাহিনী। এই বাহিনীর প্রশ্রয় না পেলে ভারত থেকে আসামাত্রই মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনতার নিকট থেকে সহযোগিতা কতটুকু পেতেন তা সন্দেহের বিষয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধ যে জনসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত, মুক্তিযোদ্ধারা যে সেইজন্য লড়াই করছেন, এই বোধ অত্র এলাকার জনতার মাঝে তৈরি করতে লতিফ মির্জা বাহিনী সক্ষম হওয়ায় এখানে কর্মকাণ্ড চালানো অন্যসব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেকাংশে সহজ হয়ে গিয়েছিল।

লতিফ মির্জা বাহিনী আলোচ্য এলাকায় সহস্রাধিক ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য পেশার মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করেছিল। স্থানীয়ভাবে এত বড় সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তৈরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল নিশ্চয়ই। পাশাপাশি এই বাহিনীর সহায়তা নিয়ে অসংখ্য ব্যক্তি ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যেতে পেরেছিলেন এবং এই বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধরসদ দেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর জন্য 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

লতিফ মির্জা বাহিনী রাজাকার-দালাল ও পাকিস্তানি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রায় অর্ধশত সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। যদিও সিরাজগঞ্জে ৭নং সেক্টর কর্তৃপক্ষ বেশ সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল, তবুও লতিফ মির্জা বাহিনীর সহায়তা ছাড়া তারা এককভাবে খুব বেশি কার্যকর কিছু করতে পেরেছিল কিনা তা অত্র এলাকার রণাঙ্গনের চিত্র থেকে বোঝা যায়। মুক্তিযুদ্ধকালে দখলদার বাহিনী ও তার স্থানীয় সহযোগীদেরকে অনেকাংশে লতিফ মির্জা বাহিনীই ব্যতিব্যস্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

মির্জা বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা প্রাপ্ত আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার দল সিরাজগঞ্জের কয়েকটি জায়গায় গণহত্যা সংঘটন করে, অগ্নিসংযোগ করে ও জনগণের সম্পদ নষ্ট করে। এসব ক্ষেত্রে পরোক্ষে হলেও কিছুটা দায় এই বাহিনীর ওপর বর্তায় এবং যুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা মানুষের মধ্যে কারো কারো এই দলের ওপর ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক।

মুক্তিযুদ্ধে বিবিধভাবে ভূমিকা রাখা লতিফ মির্জা বাহিনীর কোনো যোদ্ধাই রাষ্ট্রপ্রদত্ত বীরত্বসূচক খেতাব বা পুরস্কার পাননি। এই বাহিনীর প্রায় দুই শতাধিক সশস্ত্র সদস্য এখনো মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি এবং এ দলের স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধাগণ রাষ্ট্রের তরফ থেকে 'মুক্তিযোদ্ধা' স্বীকৃতিটুকুও পাননি। উপরন্তু সম্প্রতি সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত রাজাকার তালিকায় বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল লতিফ মির্জাসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম থাকা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

ওহিদুর বাহিনী

নওগাঁ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর রাজশাহীর (তদানীন্তন) আত্রাই থানাকে কেন্দ্র করে একদা পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা জনাব ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি গেরিলা মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনী স্থানীয়ভাবে সংগঠিত এবং যুদ্ধের পুরোটা সময় দেশের অভ্যন্তরে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছিল। প্রায় আড়াই হাজার মুক্তিযোদ্ধা-সদস্যের এই দলের প্রধান ছিলেন বর্তমান নওগাঁ জেলার অন্তর্গত আত্রাই উপজেলার রসুলপুর গ্রামের এবাদুর রহমান ও ইয়াদুন নেছা দম্পত্তির সন্তান জনাব ওহিদুর রহমান। ওহিদুর রহমান ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করে নিজ গ্রামে ফিরে যান। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপে) সহ-সভাপতি (কেন্দ্রীয় কমিটি) ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মাওলানা ভাসানীর ডাকে ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষকের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে 'লালটুপি আন্দোলন' গড়ে উঠলে ওহিদুর রহমান আত্রাই এলাকায় 'কৃষক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মাধ্যমে তিনি অত্র এলাকার খাস জমি ও জোতদার-জমিদারের ফসল দখল করে ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ শুরু করেন। ফলে অচিরেই তিনি এতদ্ অঞ্চলে কৃষকপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণের পর আত্রাইতে যে ১১ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, সেখানে ওহিদুর রহমান একজন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্থানীয়ভাবে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেন। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করলে ওহিদুর রহমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে পার্টি থেকে ইস্তফা দেন।[১২০] এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আত্রাইয়ে মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে তোলেন। ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনী তৎকালে নওগাঁ-নাটোর-বগুড়া ও রাজশাহীর প্রায় ১৫টি থানা এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। উল্লেখ্য, ওহিদুর রহমানের পিতা ১৯৭১ এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার শিকার।[১২১]

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নওগাঁ থেকে আতাউর রহমান তালুকদার (রাজশাহী-১), দেওয়ান আজিজার রহমান (রাজশাহী-২) ও মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ (রাজশাহী-৩) আসনে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) এবং কাজিমদার ওয়াসিমউদ্দিন আহমেদ (রাজশাহী-৫), ক্যাপ্টেন ইসমাইল হোসেন চৌধুরী (রাজশাহী-৬), মুহা. ইয়াজ উদ্দিন প্রামাণিক (রাজশাহী-৭), গিয়াস উদ্দিন সরদার (রাজশাহী-৮), মো. আজিজুল ইসলাম খান (রাজশাহী-৯) আসনে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) হিসেবে নির্বাচিত হন।[১২২] নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সকলেই আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার সৃষ্ট রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ ১৯৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করে। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণের পর নওগাঁ মহকুমায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ[১২৩]:

মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ (এমএনএ)	আহ্বায়ক
এম এ রকীব (ন্যাপ)	সদস্য
অ্যাডভোকেট মাজহারুল হক পোনা (ন্যাপ)	সদস্য
এ কে এম মোরশেদ (ন্যাপ)	সদস্য

অ্যাডভোকেট মোজহারুল ইসলাম (ন্যাপ)	সদস্য
আব্দুল জলিল (আওয়ামী লীগ)	সদস্য
আতাউর রহমান তালুকদার (এমএনএ)	সদস্য
দেওয়ান আজিজার রহমান (এমএনএ)	সদস্য
কাজিমদার ওয়াসিমউদ্দিন আহমেদ (এমপিএ)	সদস্য
ক্যাপ্টেন ইসমাইল হোসেন চৌধুরী (এমপিএ)	সদস্য
মুহা. ইয়জ উদ্দিন প্রামাণিক (এমপিএ)	সদস্য
গিয়াস উদ্দিন সরদার (এমপিএ)	সদস্য
মো. আজিজুল ইসলাম খান (এমপিএ)	সদস্য

নওগাঁ মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক নওগাঁ মহকুমায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এই পরিষদের অগ্রভাগে ছিলেন ময়নুল হক মুকুল, জালাল হোসেন চৌধুরী, আব্দুল মালেক, শফিক খান, মকলেছুর রহমান রাজা, আখতার আহমেদ সিদ্দিকী, খায়রুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম ইদুল, আফজাল হোসেন, আনিছার রহমান তরফদার, রঞ্জু, হারুন, মন্টু, মল্লিক, ফারুক, টুটু, সিরাজ, বিশুসহ অনেকে। নওগাঁর জনগণকে সংগঠিত করা, আগামীর সশস্ত্র লড়াইয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।[১২৪]

মহকুমা সংগ্রাম কমিটি ও মহকুমা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগপৎ নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি নওগাঁতে পালন করতে থাকে। এরই মধ্যে ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদলের ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যা শুরু করার খবর এবং সাইক্লোস্টাইল করা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ নওগাঁয় পৌঁছে। অতঃপর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নওগাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। নওগাঁ বার ভবনে (সংগ্রাম পরিষদ কার্যালয়) ২৬ মার্চেই বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং মোহাম্মদ বয়তুল্লাহ স্বাক্ষরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অ্যাডভোকেট মোজহারুল ইসলাম বার ভবনের সামনে উপস্থিত জনতাকে পাঠ করে শোনান ।[১২৫] সংগ্রাম কমিটির তৎপরতায় এবং নওগাঁ ই পি আর কমান্ডার মেজর নজমুল ইসলামের সহযোগিতায় শহরের কে. ডি. স্কুলে ছাত্র-যুবকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু হয়।

নওগাঁ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক ওহিদুর রহমান মার্চের শেষ সপ্তাহে আত্রাইয়ে চলে আসেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আত্রাইয়ের বিহারীপুর গ্রামের আবুল হাশেমের বাড়িতে আত্রাই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সভা হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক **১১** সদস্য বিশিষ্ট 'আত্রাই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের কাঠামোটি ছিল নিম্নরূপ[১২৬]:

অধ্যক্ষ মোতাহার হোসেন	আহ্বায়ক
ডা. সিরাজউদ্দীন	সদস্য
ডা. আব্দুল খালেক	সদস্য
তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী	সদস্য
আবুল হাসেম	সদস্য
বাদল দত্ত, প্রভাষক	সদস্য
আফতাব উদ্দীন মোল্লা	সদস্য
ওহিদুর রহমান	সদস্য
খায়রুল ইসলাম	সদস্য
বেলাল হোসেন	সদস্য

সাজেদুর রহমান দুদু সদস্য

আত্রাই সংগ্রাম কমিটিতে ওহিদুর রহমান খুব সক্রিয় ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার সারাদেশব্যাপী ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিল। ওহিদুর রহমান তৎকালে নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র এবং তিনি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া, বাম ছাত্র সংগঠন করার সুবাদে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির 'লালফৌজ' গঠন বিষয়ে পূর্ব থেকেই জানতেন। একদা ন্যাপ কর্মী ওহিদুর রহমান পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই দলের নীতি অনুযায়ী তিনি আত্রাই এলাকায় 'কৃষক সমিতি' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং অচিরেই একটি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১২৭] এর ফলে এই এলাকার বিভিন্ন স্থান ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এই 'কৃষক সমিতি'র নেতৃবৃন্দের। ব্যক্তিগতভাবে ওহিদুর রহমান প্রকাশ্যে যুগপৎভাবে ন্যাপ ও কৃষক সমিতি ও গোপনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে জড়িত থাকেন। সুতরাং আত্রাই ও তৎপার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 'বিশেষ কংগ্রেস'-এ পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে (স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন) বদলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনকে পার্টির অন্যতম লাইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর ফলে, 'জাতীয় মুক্তির আশা-আকাঙ্খা' ও 'একটি আলাদা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' গঠনে পার্টির পূর্বের সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলা হয়।[১২৮] ফলে পার্টির অগুনতি কর্মী সমর্থক আশাহত হয়। ওহিদুর রহমানসহ আত্রাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য নেতাকর্মী সেদিন দলের সিদ্ধান্তে মর্মাহত হন। এরপর ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় সদস্য কমরেড আবুল বাশার প্রস্তাবিত 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম তত্ত্ব' প্রত্যাখ্যাত হলে এবং পাকিস্তানি শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধকে পার্টি 'দুই কুকুরের লড়াই' হিসেবে তকমা দিলে তৎকালীন বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের পার্টির প্রায় সমস্ত সদস্য-সমর্থক তা জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।[১২৯] শুধু তাই নয়, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কমরেডরা পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করে 'রাজশাহী আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি' নাম ধারণ করে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন।[১৩০] এদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রধান মাওলানা ভাসানী মার্চের শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝটিকা সফরের মাধ্যমে গণসংযোগ চালাচ্ছিলেন। মাওলানা ভাসানী মার্চের মাঝামাঝি আত্রাইয়ের রসুলপুর গ্রামে ওহিদুর রহমানের বাড়িতে আসেন। তারপর তিনি পার্শ্ববর্তী ভবানীপুর বাজারে প্রায় দেড় হাজার কর্মী সমর্থকের মাঝে দিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতায় বলেন, 'যুদ্ধের জন্য তৈরি হও, আর কোনো রাস্তা নাই'।[১৩১] মাওলানা ভাসানীর ঐ বক্তব্য ওহিদুর রহমানসহ সকল ন্যাপ কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দের মাঝে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

আত্রাই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পাশাপাশি এপ্রিলের ১০ তারিখে (আনুমানিক) আত্রাই বামপন্থি কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় আত্রাই থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির আঙিনায়। এই সভায় বামপন্থি কর্মীরা কমরেড আবুল বাশারের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চিন্তার সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। ঐ সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যে দিক-নির্দেশনা ছিল তার প্রতি সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার করেন এবং ২৫ মার্চ গণহত্যা সংঘটনের জন্য পাকিস্তানি শাসকদের দায়ী করা হয়। এছাড়া আসন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য 'রেড আর্মি'র আদলে একটি বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে আত্রাইয়ে ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয় যা স্থানীয় জনগণের কাছে 'ওহিদুর বাহিনী' হিসেবে পরিচিত লাভ করে। উল্লেখ্য, নওগাঁ মহকুমা ২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাদলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। নওগাঁ দখলদার বাহিনীর

নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার পূর্বেই মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্থিমিত হয়ে যায় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের আহ্বায়কসহ অধিকাংশ নেতার নওগাঁ ত্যাগের ফলে।[১৩২]

সংগঠন

আত্রাইয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পাশাপাশি এতদ্ এলাকার বামপন্থি কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আত্রাইয়ের তেঁতুলিয়া সভায় সিদ্ধান্ত নেন যে, ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে আত্রাই থানা দখল করা হবে এবং সংগৃহীত অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ দিনই আত্রাই থানা আক্রমণ করা হয় এবং থানা থেকে ৩৪টি রাইফেল এবং দুই সহস্রাধিক গুলি সংগৃহীত হয়।[১৩৩] সংগৃহীত এসব অস্ত্র ও গুলি দিয়ে আত্রাই থানার ডোঁপড়া গ্রামের আনসার কমান্ডার শেখ নাছির উদ্দিনের নেতৃত্বে সাহেবগঞ্জ মাঠে এবং কয়সা গ্রামের সাবেক সেনা সদস্য এমদাদুর রহমানের নেতৃত্বে ভবানীপুর মাঠে প্রশিক্ষণ শুরু হয়।[১৩৪]

এপ্রিলের মাঝামাঝি বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের দলত্যাগী কমিউনিস্ট কর্মী-সমর্থকগণ প্রথমে 'আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি' নামে আপদকালীন দল গঠন করেন। এলাকাভিত্তিক এই দলটির ৭ সদস্য বিশিষ্ট এ্যাডহক কমিটিতে ওহিদুর রহমানকে আহ্বায়ক করা হয় এবং নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সদস্য হিসেবে থাকেন:[১৩৫]

ইব্রাহিম মণ্ডল; গ্রাম: দিঘির পাড়, আত্রাই।
রফিকুল ইসলাম পটল; গ্রাম: ফুলবাড়ি, আত্রাই।
বেলাল হোসেন; গ্রাম: জাত আমরুল, আত্রাই।
মোজাহার হোসেন; গ্রাম: দিঘা, আত্রাই।
খোদাবকস; গ্রাম: মদনডাঙ্গা, আত্রাই।

এরপর থেকে 'আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতা কর্মীগণ ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, ওহিদুর রহমান ও এই দলের নেতৃবৃন্দের কাছে এসময় আশু করণীয় হিসেবে উপস্থিত হয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করা। সে কারণে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা দল বা 'ওহিদুর বাহিনী' কে আরও সংগঠিত করা ও এই প্রয়োজনে বাহিনীর সমগ্র অংশটিকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এসময় আত্রাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছুটিতে বা পালিয়ে অথবা অবসরে থাকা ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্য এবং ছাত্র যুবককে দলে টানার কাজ চলতে থাকে। এভাবে, কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় এক হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবকের সমাবেশ ঘটে বাহিনীতে।[১৩৬]

ওহিদুর বাহিনীর সমগ্র অংশটিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়- প্রথমটি হলো সামরিক ইউনিট এবং দ্বিতীয়টি হলো সামরিক ইউনিটের বিভিন্ন দপ্তর। বাহিনীর সামরিক ইউনিটসমূহ সাধারণত নয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। উক্ত ইউনিটসমূহ হলো–

১. কমান্ড ইউনিট; ২. আর্মড ইউনিট; ৩. রেকি ইউনিট; ৪. ফান্ড ইউনিট; ৫. রেশন ইউনিট; ৬. কনভেয়ার ইউনিট; ৭. মেডিক্যাল ইউনিট; ৮. পাবলিকেশন ইউনিট এবং ৯. অবজার্ভার ইউনিট।

অপরদিকে, সামরিক ইউনিটের দপ্তরসমূহে প্রধানত বাহিনীর যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজসমূহ সম্পাদিত হতো। বাহিনীর সামরিক ইউনিটের দপ্তরসমূহ ছিল মূলত তিন ধরনের। উক্ত দপ্তরসমূহ হলো:

১. অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার;

২. অস্থায়ী গ্রুপ কোয়ার্টার এবং
৩. অস্থায়ী ট্রেনিং ফিল্ড।

বাহিনীর কমান্ড ইউনিটে সাধারণত তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথম স্তরটি ছিল আলোচ্য আধা-সামরিক বাহিনীটির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক শাখা, যা বাহিনীর হাই কমান্ড নামে অভিহিত। দ্বিতীয় স্তরটি ছিল সমন্বয়ক শাখা বা কোঅর্ডিনেটর; এ শাখায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে হাই কমান্ড থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শাহ মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ (১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য) বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ কোঅর্ডিনেটর ছিলেন।

কমান্ড ইউনিটের তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরটি ছিল গ্রুপ কমান্ড। এক একটি গ্রুপ অন্তত ১০-৩০ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত হতো। গ্রুপের সর্বোচ্চ কমান্ড অথরিটি হিসেব যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন তিনি বাহিনীতে ‘গ্রুপ কমান্ডার’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যুদ্ধকালে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল হিসেবে গ্রুপ কমান্ডের দায়িত্বে রদবদল হতে দেখা যায়।

আধা-সামরিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আলোচ্য ওহিদুর বাহিনীর নির্বাচিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত [স্থায়ী ও অস্থায়ী] কমান্ড ইউনিটের স্তরভিত্তিক সদস্যবর্গের সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় নিম্নে উল্লিখিত হলো:

হাইকমান্ড

চিফ-ইন-কমান্ড: ওহিদুর রহমান; গ্রাম: রসুলপুর, আত্রাই।
সেকেন্ড-ইন-কমান্ড-১: আলমগীর কবির; গ্রাম: চকউজির, নওগাঁ সদর।
সেকেন্ড-ইন-কমান্ড-২: আবদুল মজিদ; গ্রাম: চন্ডিপুর, নওগাঁ সদর।
সেকেন্ড-ইন-কমান্ড-৩: এমদাদুর রহমান; গ্রাম: কয়সা, আত্রাই।

কোঅর্ডিনেটর

শাহ মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ এমএনএ (রাজশাহী-৭); গ্রাম: উত্তর একডালা, বাগমারা।

গ্রুপ কমান্ড (থানা ভিত্তিক)

বাগমারা থানা

১. গ্রুপ কমান্ডার আবুল কাসেম স্বপন; গ্রাম: নানসর।
২. গ্রুপ কমান্ডার আবদুস সামাদ; গ্রাম: রায় সেনপাড়া।
৩. গ্রুপ কমান্ডার ইয়াছিন আলি; গ্রাম: যুগীপাড়া।
৪. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল হামিদ; গ্রাম: নানসর।
৫. গ্রুপ কমান্ডার ইয়াছিন আলী; গ্রাম: সোনাডাঙা।
৬. গ্রুপ কমান্ডার ময়েজ উদ্দিন; গ্রাম: সোনাডাঙা।
৭. গ্রুপ কমান্ডার আবেদ আলী মৃধা; গ্রাম: শ্রীপুর।
৮. গ্রুপ কমান্ডার আতাউর রহমান; গ্রাম: ঝিকড়া।
৯. গ্রুপ কমান্ডার আবদুস সাত্তার; গ্রাম: ডোখলপাড়া।
১০. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল হামিদ; গ্রাম: শান্তিপুর।

রানীনগর থানা

১. গ্রুপ কমান্ডার এমদাদুল হক গামা; গ্রাম: দুর্গাপুর।

২. গ্রুপ কমান্ডার মফিজার রহমান; গ্রাম: ঝিনা।
৩. গ্রুপ কমান্ডার আশরাফ হোসেন; গ্রাম: রানীনগর সদর।
৪. গ্রুপ কমান্ডার নজিবর রহমান; গ্রাম: কুজাইল।
৫. গ্রুপ কমান্ডার তাহাদ খান; গ্রাম: কুজাইল।
৬. গ্রুপ কমান্ডার মতিয়ার রহমান; গ্রাম: কৃষ্ণপুর।
৭. গ্রুপ কমান্ডার আতোয়ার হোসেন; গ্রাম: দুর্গাপুর।
৮. গ্রুপ কমান্ডার ইসমাইল হোসেন; গ্রাম: কালিগ্রাম।
৯. গ্রুপ কমান্ডার হায়দার আলি; গ্রাম: খট্টেশর, রানীনগর।
১০. গ্রুপ কমান্ডার ইয়াসিন আলী; গ্রাম: ভবানীপুর।

নওগাঁ সদর থানা

১. গ্রুপ কমান্ডার শাহাদত আলী (সাদ আলী); গ্রাম: চক বুলাকি।
২. গ্রুপ কমান্ডার আনোয়ার হোসেন বুলু; গ্রাম: চক উকির।
৩. গ্রুপ কমান্ডার আনছার আলী; গ্রাম: চন্ডীপুর।

আত্রাই থানা

১. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল আজিজ কালু; গ্রাম: ভবানীপুর।
২. গ্রুপ কমান্ডার রফিকুল ইসলাম পটল; গ্রাম: ফুলবাড়ি।
৩. গ্রুপ কমান্ডার সাজেদুর রহমান দুদু; গ্রাম: জাত আমরুল।
৪. গ্রুপ কমান্ডার মোজাহার হোসেন; গ্রাম: দিঘা।
৫. গ্রুপ কমান্ডার হাবিবুর রহমান; গ্রাম: মদনডাঙা।
৬. গ্রুপ কমান্ডার শেখ মগরেব; গ্রাম: তারাটিয়া।
৭. গ্রুপ কমান্ডার একরামুর রহমান; গ্রাম: রসুলপুর।
৮. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল মালেক; গ্রাম: মহাদিঘি।
৯. গ্রুপ কমান্ডার সোয়াবর রহমান; গ্রাম: ভবানীপুর।
১০. গ্রুপ কমান্ডার হামিদুর রহমান; গ্রাম: মীরাপুর।
১১. গ্রুপ কমান্ডার আবুল কালাম; গ্রাম: আটগ্রাম।
১২. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল মান্নান; গ্রাম: নবাবের তাম্বু।
১৩. গ্রুপ কমান্ডার আফজাল হোসেন; গ্রাম: দিঘা।
১৪. গ্রুপ কমান্ডার শেখ তসলিম; গ্রাম: তারাটিয়া।
১৫. গ্রুপ কমান্ডার আবুল কাসেম; গ্রাম: কাশিয়াবাড়ি।
১৬. গ্রুপ কমান্ডার খোদাবখস; গ্রাম: মদনডাঙ্গা।
১৭. গ্রুপ কমান্ডার আফিল উদ্দিন; গ্রাম: রামপুর।
১৮. গ্রুপ কমান্ডার মেহের আলী; গ্রাম: রামপুর।
১৯. গ্রুপ কমান্ডার আবদুর রাজ্জাক; গ্রাম: নবাবের তাম্বু।
২০. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল আজিজ; গ্রাম: কাশ্যপপাড়া।
২১. গ্রুপ কমান্ডার রণজিৎ কুমার; গ্রাম: বান্দাইখাড়া।
২২. গ্রুপ কমান্ডার শুকুর আলী; গ্রাম: গজমতখালি।

মান্দা থানা

১. গ্রুপ কমান্ডার রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (হো চাচা); গ্রাম: চক ভোলাই।

২. গ্রুপ কমান্ডার মজিবর রহমান শেখ; গ্রাম: কালীগ্রাম।
৩. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল আজিজ প্রামানিক; গ্রাম: পাকুরিয়া।
৪. গ্রুপ কমান্ডার আবুল কাসেম; গ্রাম: চক দেবীরাম।

সিংড়া থানা
১. গ্রুপ কমান্ডার মনজুর আলম হাসু; গ্রাম: চৌগ্রাম।
২. গ্রুপ কমান্ডার মকবুল হোসেন; গ্রাম: ক্ষিদ্রবড়িয়া।

নাটোর সদর থানা (নলডাঙ্গাসহ)
১. গ্রুপ কমান্ডার আবদুল কাইয়ুম; গ্রাম: স্টেশন বড়গাছা।
২. গ্রুপ কমান্ডার মোহাম্মদ আলী বাবুল; গ্রাম: দুর্লভপুর।

পুঠিয়া থানা (অ্যালাইড ফোর্স)
১. ডা. সদর উদ্দিন আহমেদ; গ্রাম: পচামাড়িয়া।

বাগাতিপাড়া থানা (রিজার্ভ ফোর্স)
১. আবু বকর সিদ্দিক গেদা; গ্রাম: বাঁশবাড়িয়া।

আর্মড ইউনিটটি অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিভাগ হিসেবে বাহিনীর গেরিলা সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। বাহিনীতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছিল এই ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, বাহিনীর সংগৃহীত অস্ত্র ও গোলাবারুদের সংরক্ষণ এবং বিতরণ ও অধিগ্রহণ করা ছিল এবং ইউনিটের অন্যতম দায়িত্ব। নিম্নে এই ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবর্গ এবং ট্রেনিং ইন্সট্রাকটরগণের নাম উল্লিখিত হলো:[১৩৭]

চিফ-ইন-আর্মড: এমদাদুর রহমান, সাবেক সেনা সদস্য; গ্রাম: কয়সা, আত্রাই।
সেকেন্ড-ইন-আর্মড: আবদুল মালেক; গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই।
আবদুল মজিদ, সাবেক সেনা সদস্য; গ্রাম: চন্ডিপুর, নওগাঁ সদর।
মফিজার রহমান, সাবেক সেনা সদস্য; গ্রাম: ঝিনা, রানীনগর।
শেখ নাসির উদ্দিন, আনসার কমান্ডার; গ্রাম: ভোপাড়া, আত্রাই।
মগরেব আলী শেখ, ই পি আর. সদস্য; গ্রাম: তারাটিয়া, আত্রাই।
আশরাফ হোসেন, ই পি আর. সদস্য; গ্রাম: রানীনগর সদর, রানীনগর।
আলী খাজা এম.এ. মজিদ, এফ এফ কমান্ডার; গ্রাম: ঝিকরা, বাগমারা।
মকবুল হোসেন, এফ এফ কমান্ডার; গ্রাম: গজমতখালি, আত্রাই।
ডা. খগেন্দ্রনাথ সরকার, এফ এফ কমান্ডার; গ্রাম: মৌপাড়া, মোহনপুর।
আবু হোসেন আবু, এফ এফ কমান্ডার; গ্রাম: কৈগ্রাম, সিংড়া।
ইজ্জত আলী, আনছার সদস্য; গ্রাম: ঝিকরা, বাগমারা।
সৈয়দ আলী, আনছার সদস্য; গ্রাম: ঝিকরা, বাগমারা।
আবদুল মালেক, গ্রুপ কমান্ডার; গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই।
ইয়াছিন আলি, সাবেক সেনা সদস্য; গ্রাম: যুগীপাড়া, বাগমারা।
শেখ তসলিম উদ্দিন, সাবেক সেনা সদস্য; গ্রাম: তারাটিয়া, আত্রাই।
আবদুস সাত্তার, আনসার কমান্ডার; গ্রাম: জামনগর, বাগাতিপাড়া।

রেকি ইউনিটটি ছিল বাহিনীর প্রধান গোয়েন্দা বিভাগ। যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বাহিনীর এই গোয়েন্দা বিভাগটি অন্তত তিন ধরনের রেকি (গোপন নজরদারি ও তথ্য আদানপ্রদান) ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। প্রথমটি ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা; বাহিনীর যুদ্ধ-অঞ্চলের নানা খবরাখবর এক স্থান হতে অন্য স্থানে আদানপ্রদান করাই ছিল এ শাখার প্রধান দায়িত্ব। বাহিনীর রেকি ইউনিটের যোগাযোগ শাখায় যে সমস্ত গেরিলা নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকে কম্যুনিকেটিভ ফোর্স হিসেবে অভিহিত করা হয়।

রেকি ইউনিটের তৃতীয় শাখাটি ছিলো-যুদ্ধ-অভিযানের পথ প্রদর্শন ব্যবস্থা (অপারেশনাল গাইড)। বাহিনীর রেকি ইউনিটের পথ প্রদর্শক ব্যবস্থায় যে সমস্ত গেরিলা নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকে গাইডার ফোর্স (পথ প্রদর্শক) হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাহিনীর এই রেকি ইউনিটের মুখ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আত্রাই থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের (গ্রুপ কমান্ডার) আবদুল আজিজ কালু। নিম্নে এই ইউনিটের বিভিন্ন শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবর্গের সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় উল্লিখিত হলো:[১৩৮]

কম্যুনিকেটিভ ফোর্স

ফাতেমা খাতুন – তেঁতুলিয়া, মান্দা।
রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (হো চাচা)– চক ভোলাই, মান্দা।
মজিবর রহমান শেখ– কালীগ্রাম, মান্দা।
আতাউর রহমান – ভবানীগঞ্জ, বাগমারা।
সাইদুর রহমান – রসুলপুর, আত্রাই।
এম.এ. খালেক – দিগলপাড়া, বাগমারা।
আবদুর রহমান পাঁচু – মাধনগর, নলডাঙ্গা।
শাজাহান মাস্টার – মীরাপুর, আত্রাই।
ওয়াহেদ মাস্টার – মহিষডাঙা, নলডাঙ্গা।
আবদুস সাত্তার – মহিষডাঙা, নলডাঙ্গা।
আবদুল জব্বার – মহিষডাঙা, নলডাঙ্গা।
মসলিম – মহিষডাঙা, নলডাঙ্গা।
ঝুনু – শিকারপুর, নওগাঁ সদর।
মখলেছুর রহমান – কৃষ্ণপুর, রানীনগর।
নাসিম মেম্বার – দীঘা, আত্রাই।
এবাদুর রহমান – দীঘা, আত্রাই।
মজিবর মাস্টার – কয়সা, আত্রাই।
নূরবক্স – আন্দোরকোটা, আত্রাই।
আনিছার রহমান – আন্দোরকোট, আত্রাই।
কমলেন্দু কবিরাজ – কাশিয়াবাড়ী, আত্রাই।
নজিবর রহমান – পাঁচুপুর, আত্রাই।
গিয়াস – মদনডাঙ্গা, আত্রাই।
হান্নান আলী – গয়লার ঘোপ, বাগাতিপাড়া।
হেকমত আলী – গয়লার ঘোপ, বাগাতিপাড়া।
বদর রাজাকার – গন্ডগোহালি, আত্রাই। (তাকে জোরপূর্বক রাজাকারের দলে ভর্তি করিয়ে নিলে সে বাহিনীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, বাহিনী তাকে পাকিস্তানি মিলিটারি এবং রাজাকার দলের তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের প্রস্তাব দিলে সে সম্মত হয়। পরবর্তী সময়গুলোতে সে বাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাকে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।)

আবদুস সামাদ – খানপাড়া, আত্রাই।
সালেকুল ইসলাম – পৈসাওতা, আত্রাই।
শাজাহান – বড়ভিটা, আত্রাই।
তাছির – বড়ভিটা, আত্রাই।
খালেক – বড়ভিটা, আত্রাই।
মেছের আলী – চিলাবাদুরী, আত্রাই।
জমির উদ্দিন – গোয়ালবাড়ী, আত্রাই।
ফজলু রহমান – গজমতখালী, আত্রাই।
আজিমউদ্দিন – সাহাগোলা, আত্রাই।
আবদুর রহমান – দিগলপাড়া, বাগমারা।
আবুল হাসেম – দিগলপাড়া, বাগমারা।
সাইদুজ্জামান শেখ – রসুলপুর, আত্রাই।
ইয়াছিন আলী – জাতআমরুল, আত্রাই।
লিয়াকত ওরফে বুদা – বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
শফির উদ্দিন – বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
নেজামুদ্দিন – জাতোপাড়া, আত্রাই।
শুকুর আলী ডাক্তার – গজমতখালি, আত্রাই।
মকছেদ আলী – হাপানিয়া, বাগাতিপাড়া।

বাহিনীর যুদ্ধ-অভিযান কিংবা বাহিনীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী এক বা একাধিক গেরিলা, যারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক বাহিনীর নিরাপদ অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতো এবং বাহিনীর শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কিত নিশ্চয়তা প্রদান করতো– তারাই বাহিনীর গাইডার ফোর্স হিসেবে বিবেচিত।

এই ফোর্সের দায়িত্বভাব সুনির্দিষ্টভাবে কোনো গেরিলা বা গেরিলা গ্রুপের প্রতি অর্পিত ছিল না। গমনাগমনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার প্রয়োজন অনুযায়ী অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি গাইডার ফোর্স গঠন করতেন এবং লক্ষ্যস্থলে বাহিনী মার্চ (গেরিলাদলের সারিবদ্ধ অভিযাত্রা) করতেন। যুদ্ধকালীন কখনো কখনো বাহিনীর গাইডার ফোর্স হিসেবে অস্থায়ীভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছেন তেমন দু'একজন গেরিলার নাম পরিচয় নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

সাইদুর রহমান – রসুলপুর, আত্রাই।
ফজলুর রহমান – তারাটিয়া, আত্রাই।
শাজাহান – উকিলপাড়া, নওগাঁ সদর।
মাখন – সর্বরামপুর, রানীনগর।

বাহিনীর কিছু শুভানুধ্যায়ী ছিলেন যারা নিয়মিতভাবে বাহিনীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থসংকটে বাহিনীর যুদ্ধ-অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের স্বাধীনতাপন্থি জোতদার-মহাজন খাদ্য ও আশ্রয়দানের পাশাপাশি আর্থিক অনুদান দিয়ে বাহিনীর সমগ্র কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক আত্রাই শাখার একজন কর্মকর্তা ব্যাংকের ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় সংগ্রাম কমিটির নিকট আটককৃত হন। সংগ্রাম কমিটি ঐ টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ভারত হতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সংগ্রাম কমিটি সদস্য আফতাব মোল্লা ও প্রভাষক বাদল দত্তকে দায়িত্ব দেয়, ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড় কিনতে, ১৫ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে বড়ভিটা গ্রামের শফিউদ্দীন সরদারের নিকট এবং

২০ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে ওহিদুর রহমানের নিকট। এর কিছুদিন পর ওহিদুর রহমানের কাছে থাকা ২০ হাজার টাকা সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য তোফাজ্জল চৌধুরী জোরপূর্বক নিয়ে নেন। এরপর ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ যখন পুরোদমে চলছে তখন তিনি শফিউদ্দীন সরকারের নিকট থেকে গচ্ছিত রাখা ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে নেন। এই ১৫ হাজার টাকাই ওহিদুর বাহিনীর প্রাথমিক ফান্ড ছিল।[১৩৯] বাহিনীর ফান্ড ইউনিট বাহিনীর পক্ষ থেকে উক্ত শুভানুধ্যায়ীগণের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন। এছাড়াও এই ফান্ড ইউনিটটি বাহিনী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অর্থ ও তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ের সার্বক্ষণিক তদারকির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, যার মুখ্য ব্যবস্থাপক ছিলেন আত্রাই থানার অন্তর্গত আটগ্রামের আবুল কালাম এবং দুর্গাপুর গ্রামের আবদুল জব্বার। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বাহিনীর আর্থদাপ্তরিক কর্মে যারা সহায়তা প্রদান করেছেন, নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত একটি নাম-পরিচয় তালিকা উল্লিখিত হলো:

শুকুর ডাক্তার; গ্রাম: গজমতখালি, আত্রাই।
আবেদ আলী; গ্রাম: শ্রীপুর, বাগমারা।
আবদুল হামিদ; গ্রাম: নানসর, বাগমারা।
আবদুল আজিজ কালু; গ্রাম: ভবানীপুর, আত্রাই।

বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ (এক বা একাধিক সেকশন, প্লাটুন, কোম্পানি অথবা ব্যাটেলিয়ন) যুদ্ধ-অভিযানের অংশ হিসেবে প্রয়োজনে যখন যে যে গ্রামে অবস্থান করতো সাধারণত সে সে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতেই তাদের খাদ্যসংস্থান করা হতো। তথাপি, আপদকালীন সময়ে গহীন বিল ও বনাঞ্চলে (স্থায়ীভাবে জঙ্গল বলা হয়) জরুরী রন্ধনকার্য সম্পাদনে একটি পানসি নৌকায় যাবতীয় রন্ধনসামগ্রী সংরক্ষিত হতো। সংরক্ষিত এই পানসি নৌকাটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তৎকালীন নওগাঁ মহকুমার আত্রাই থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের (গ্রুপ কমান্ডার) আবদুল আজিজ কালু। কমান্ডার আবদুল আজিজ নিয়ন্ত্রিত গ্রুপটি বাহিনীর রেশন ইউনিট (খাদ্য বিভাগ) নামে পরিচিত ছিলো। বাহিনীর এই খাদ্য বিভাগ বা রেশন ইউনিটে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন–

আবদুল মান্নান; গ্রাম: নবাবের তাম্বু, আত্রাই।
আফিল উদ্দিন; গ্রাম: আমরুল কসবা, আত্রাই।

কনভেয়ার ইউনিটটি ছিলো মূলত বাহিনীর পরিবহন বিভাগ। এই পরিবহন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে অন্তত ৫২টি পানসি ও কোশা নৌকা ছিল এবং অন্তত ৪০০ মাঝি এ সমস্ত নৌকার দায়িত্বে (পালাক্রমে) নিয়োজিত ছিলেন। যেহেতু বাহিনীর অভীষ্ট যুদ্ধ-অঞ্চল ছিল খাল-বিল ও নদ-নদী বেষ্টিত জলমগ্ন এলাকা। সুতরাং নৌকা ছিল বাহিনীর যুদ্ধ-অভিযানের প্রধান পরিবহন ব্যবস্থা। বাহিনীর এই পরিবহন বিভাগে যে সমস্ত গেরিলা নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকে কনভেয়ার ফোর্স এবং এই ইউনিটটিকে কনভেয়ার ইউনিট হিসাবে অভিহিত করা হয়। বাহিনীর আলোচ্য এ পরিবহন শাখার মুখ্য ব্যবস্থাপক হিসাবে আত্রাই থানার বড় কালিকাপুরের আবু জাহিদ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তার সহকারী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন উক্ত গ্রামের নাসু মাঝি। এতদ্ভিন্ন বাহিনীর এই কনভেয়ার ইউনিটের পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময়ে যারা দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে সহায়তা প্রদান করেছেন, নিম্নে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় তালিকা উল্লিখিত হলো:[১৪০]

তৈয়বর; গ্রাম: বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
বুদা; গ্রাম: বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
লিয়াকত; গ্রাম: বড় কালিকাপুর, আত্রাই।

চাঁদ; গ্রামঃ বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
করিম; গ্রামঃ বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
আবুল; গ্রামঃ বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
সেকেন্দার আলী; গ্রামঃ বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
আশরাফ আলী; গ্রামঃ বড় কালিকাপুর, আত্রাই।
আফছার আলী; গ্রামঃ চাপড়া, আত্রাই।
মুনসের আলী; গ্রামঃ মির্জাপুর, আত্রাই।
শফি; গ্রামঃ মদনডাঙ্গা, আত্রাই।
জান বকস; গ্রামঃ রনশিবাড়ি, বাগমারা।
কলিমুদ্দিন; গ্রামঃ রনশিবাড়ি, বাগমারা।
আবদুল জব্বার; গ্রামঃ রায় সেনপাড়া, বাগমারা।
মোজাম্মেল; গ্রামঃ বামনিগ্রাম, আত্রাই।
বিশু; গ্রামঃ শিবদেব পাড়া, বাগমারা।
মাজদার রহমান; গ্রামঃ বাঁশবাড়িয়া, বাগাতিপাড়া।
সাধন মোল্লা; গ্রামঃ বাঁশবাড়িয়া, বাগাতিপাড়া।

বাহিনীর একটি প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ ছিল যা পাবলিকেশন ইউনিট নামে অভিহিত। এ ইউনিটটি যুদ্ধকালীন সময়ে বাহিনীর বিবিধ মুখপত্র (যেমন- বাহিনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মতৎপরতা অথবা আদর্শজ্ঞাপক নানা প্রচারপত্র) প্রকাশ ও প্রচারণার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আত্রাই থানাধীন তারাটিয়া গ্রামের হেলু মিয়া ছিলেন এই বিভাগের মুখ্য ব্যবস্থাপক। সহকারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন একই গ্রামের শেখ হাবিবুর রহমান ও শেখ তাইফুল ইসলাম। এ ইউনিটটি সাধারণত মূল বাহিনী থেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করত। এই ইউনিটের পরিবহন হিসেবে একটি কোশা নৌকা এবং নিরাপত্তা বিধানে একটি রাইফেল (.২২ বোর) মজুত ছিল। ইউনিটটির তত্ত্বাবধানে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ও একটি ইংরেজি টাইপ রাইটার সংরক্ষিত ছিল। প্রচারপত্র লেখা ও কপি করার ক্ষেত্রে সাধারণত স্টেনসিল পেপার ব্যবহার করা হতো।[১৪১]

অবজার্ভার ইউনিটের (গোয়েন্দা বিভাগ) দায়িত্ব ছিল বাহিনীর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রজুড়ে নানাবিধ তৎপর নজরদারি। যেমন– পাকিস্তানি মিলিটারি ও রাজাকারদের গতিবিধি এবং চোর-ডাকাতদের অবস্থান ও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য রাখা। উপরন্তু, যৌথ বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপসমূহের গতিবিধি ও কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি নিজ বাহিনীর গেরিলাদের গতিবিধি ও কর্মকাণ্ড লক্ষ রাখা। এই অবজার্ভার ইউনিটটি সরাসরি বাহিনীর হাই কমান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাহিনীর হাই কমান্ড থেকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গেরিলাদের বাছাই করে অস্থায়ীভাবে একটি গ্রুপ গঠন করা হতো এবং আন্ত গোয়েন্দা নজরদারির সাময়িক দায়িত্বভার অর্পণ করা হতো। কখনো কখনো বাহিনীর হাই কমান্ডারগণ স্বয়ং এ দায়িত্ব পালন করতেন।[১৪২]

বাহিনীর সামরিক ইউনিটসমূহের যাবতীয় সামরিক কর্মতৎপরতা পরিচালনের জন্য যুদ্ধ-অঞ্চলে স্থিত বিভিন্ন গ্রামে অস্থায়ী ভিত্তিতে বহু শেল্টার (গোপন আশ্রয়) তৈরি করা হয়েছিল। এই শেল্টারসমূহ বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাগণের যুদ্ধকালীন নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং নানাবিধ দাপ্তরিক ও নৈমিত্তিক কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতো। বাহিনীর সামরিক ইউনিটের দপ্তরসমূহকে ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী প্রধানত তিন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরটি হলো অস্থায়ী হেড কোয়ার্টারসমূহ; দ্বিতীয় স্তরটি হলো অস্থায়ী গ্রুপ কোয়ার্টারসমূহ এবং সর্বশেষ ও তৃতীয় স্তরটি হলো অস্থায়ী ট্রেনিং ফিল্ডসমূহ।

অস্থায়ী হেড কোয়ার্টারসমূহে বাহিনীর সামরিক হাই কমান্ডের প্রধান প্রধান দপ্তর অবস্থিত ছিল। এই অস্থায়ী ও গোপন দপ্তরসমূহ যুদ্ধ-তৎপরতার প্রয়োজনে প্রথমত বাহিনীর হাই কমান্ডের শেল্টার হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত বাহিনীর পার্টি ও কমিশনের যুদ্ধ-পরিকল্পনা এবং রণকৌশল সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হতো। অস্থায়ী গ্রুপ কোয়ার্টারসমূহ প্রথমত বাহিনীর গেরিলা গ্রুপ ও গ্রুপ কমান্ডারগণের প্রধান শেল্টার হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত নানাবিধ গ্রুপ মিটিং-এর অস্থায়ী দপ্তর হিসেবে মূলত ব্যবহৃত হতো। অস্থায়ী ট্রেনিং ফিল্ডসমূহে বাহিনীর গেরিলাদের অনিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক ট্রেনিং প্রদান করা হতো। নিম্নে বাহিনীর সমস্ত ইউনিটের অস্থায়ী ও প্রধান-অপ্রধান দপ্তরসমূহের (হেড কোয়ার্টার, গ্রুপ কোয়ার্টার ও ট্রেনিং ফিল্ড সমূহের) সংক্ষিপ্ত স্থান-পরিচয় উল্লিখিত হলো:[১৪৩]

১. অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার (প্রধান শেল্টার):

বিল মনছুর ও মিরাট গ্রাম, রানীনগর।
হাসাইগাড়ি বিল ও হাসাইগাড়ি গ্রাম, নওগাঁ সদর।
ভীমপুর গ্রাম, নওগাঁ সদর।
ডাঙাপাড়ার মহির উদ্দিন প্রামাণিক ও হাতেম আলীর বাড়ি এবং ডাঙাপাড়া গ্রাম, আত্রাই।
গজমতখালির ডা. শুকুর আলী ও ফজলু মিয়ার বাড়ি এবং গজমতখালি গ্রাম, আত্রাই।
বড়সাঁওতা গ্রামের রাজা মিয়ার বাড়ি ও বড়সাঁওতা গ্রাম, আত্রাই।
মুর্মিদপুর হামিদুরের বাড়ি, মান্দা।
ঠাকুর মান্দা গ্রাম, মান্দা।

২. অস্থায়ী গ্রুপ কোয়ার্টার (শেল্টার):

পাহারপুরের ডাক্তার আশরাফ ও ঈসাতুল্লাহ খানের বাড়ি এবং পাহাড়পুর গ্রাম, আত্রাই;
বাগান্নার কফির উদ্দিনের বাড়ি ও বাগান্না গ্রাম, বাগমারা;
মদনডাঙা গ্রাম, আত্রাই;
হামিরকুৎসা, আনিসুর রহমানের বাড়ি ও হামিরকুৎসা গ্রাম, বাগমারাা।
মহিষডাঙ্গার ওয়াহেদ মাস্টারের বাড়ি ও মহিষডাঙ্গা গ্রাম, নলডাঙ্গা।
ভট্টপাড়া গ্রামের আব্বাস আলী সরদারের বাড়ি, নলডাঙ্গা।
তেঁতুলিয়ার মোবারক হোসেনের বাড়ি, মান্দা।
তেঁতুলিয়ার ছেফাতুল্ল্যা সোনারের বাড়ি, মান্দা।
বাঁকাপুর গ্রামের সেলিমের বাড়ি, মান্দা।
গোয়ালবাড়ি গ্রামের ইসমাইল হোসেন সরকারের বাড়ি, সিংড়া।
শহরবাড়ী গ্রামের ডা. ইজ্জতুল্লাহর বাড়ি, সিংড়া।
বাঁশবাড়িয়ার আবু বকর সিদ্দিকের বাড়ি, বাগাতিপাড়া।
ধোপাঘাটার আনোয়ার-মোহসিন ও এমাজউদ্দিনের বাড়ি, মোহনপুর।
মতিহার গ্রামের ইদ্রিস আলীর বাড়ি, মোহনপুর।
বাহিনীর সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধাগণ সম্মিলিতভাবে বাহিনীর আর্মড ফোর্স হিসেবে বিবেচিত। মাঠ পর্যয়ের নিবিড় অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, বাহিনীর আর্মড ফোর্সসমূহ সাধারণত তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথম স্তরটি ছিল বাহিনীর রেগুলার ফোর্স (নিয়মিত সশস্ত্র গেরিলা), দ্বিতীয় স্তরটি ছিলো বাহিনীর রিজার্ভ ফোর্স (সংরক্ষিত সশস্ত্র গেরিলা) এবং তৃতীয় ও শেষ স্তরটি ছিলো কম্বাইন্ড ফোর্স (যৌথ সশস্ত্র গেরিলা)। এছাড়াও বাহিনীতে অ্যালাইড ফোর্স (মৈত্রী গেরিলা), ম্যানেজিং ফোর্স (কর্মী গেরিলা) ও ভলানটিয়ার ফোর্স (স্বেচ্ছাসেবক গেরিলা) হিসেবে সহস্রাধিক অবৈতনিক কর্মী আলোচ্য

বাহিনীর আনুষঙ্গিক নানাবিধ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে বাহিনীর আর্মড ফোর্সের স্তরভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

প্রায় ১২০০-১৫০০ গেরিলাযোদ্ধার সমন্বয়ে বাহিনীর একটি নিয়মিত সশস্ত্র গেরিলা দল সংগঠিত করা হয়েছিল যা বাহিনীর রেগুলার ফোর্স হিসেবে বিবেচিত হতো।

এই রেগুলার ফোর্সটি সামগ্রিকভাবেই একটি আর্মড ফোর্স ছিল এবং যুদ্ধ অভিযানের ক্ষেত্রে এই ফোর্সটি থেকে বাছাইকৃত গেরিলাদের নিয়ে গ্রুপ কমান্ডারগণের নেতৃত্বে বিভিন্ন অস্থায়ী ডিভিশন (বিভাজিত গেরিলা গ্রুপ) তৈরি করা হতো। একজন গ্রুপ কমান্ডারের অধীন কখনো কখনো একটি স্কোয়াড, সেকশন এমনকি একটি প্লাটুন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। এছাড়া কোম্পানি অথবা ব্যাটেলিয়ন-এর ক্ষেত্রে (অস্থায়ী ভিত্তিতে) কমান্ড অথরিটি সাধারণত বাহিনীর হাই কমান্ডারগণের উপর ন্যস্ত থাকতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রুপের যাবতীয় আর্মড ফোর্স ডিভিশন সাধারণত প্রয়োজন অনুসারে এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে তৈরি করা হতো এবং বাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধ-অভিযানে স্কোয়াড কমান্ডার, সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার, কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার বাহিনীর হাই কমান্ড থেকে নিয়োগ দেয়া হতো। নিম্নে বাহিনীর গ্রুপ কমান্ড ও হাই কমান্ডের অধীনে সংগঠিত অস্থায়ী ডিভিশনসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হলো:[১৪৪]

স্কোয়াড: ৫ থেকে ৭ জন নিয়ে এক একটি স্কোয়াড সংগঠিত হতো।
সেকশন: ১০ থেকে ১৫ জন নিয়ে এক একটি সেকশন সংগঠিত হতো।
প্লাটুন: ৩০ থেকে ৩৫ জন নিয়ে এক একটি প্লাটুন সংগঠিত হতো।
কোম্পানি: ৯০ থেকে ১০০ জন নিয়ে এক একটি কোম্পানি সংগঠিত হতো।
ব্যাটেলিয়ন: ৭০০ থেকে ৮০০ জন নিয়ে একটি ব্যাটেলিয়ন সংগঠিত হতো।

প্রায় ১০০০-১২০০ গেরিলাযোদ্ধার সমন্বয়ে বাহিনীর একটি অনিয়মিত সশস্ত্র গেরিলা দল সংগঠিত করা হয়েছিল যা বাহিনীর একটি রিজার্ভ ফোর্স (সংরক্ষিত সশস্ত্র গেরিলা) হিসেবে বিবেচিত হতো। এই ফোর্সটিও সামগ্রিকভাবে একটি আর্মড ফোর্স ছিল। রিজার্ভ ফোর্স বাহিনীর মূল অংশ হতে কৌশলগত কারণে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করত এবং যুদ্ধের আপদকালীন প্রয়োজনে ও বাহিনীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকরণে হাই কমান্ডের নির্দেশিত কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করত। ওহিদুর বাহিনী নিজস্ব গেরিলাযোদ্ধাদের পাশাপাশি ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত (দু'একটি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা গ্রুপসহ) গেরিলাযোদ্ধাগণের সমন্বয়ে যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে কিছু কিছু এ্যাম্বুশ-আক্রমণ ও যৌথযুদ্ধ পরিচালনা করেছে। এই গেরিলা গ্রুপসমূহ বাহিনীর কম্বাইন্ড ফোর্স (যৌথ সশস্ত্র গেরিলা) হিসেবে বিবেচিত। এই ফোর্সে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিভিন্ন এফএফ গ্রুপের পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে মুজিব বাহিনীর কিছু কিছু গেরিলাযোদ্ধাগণ কখনো স্বতন্ত্র কখনো সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আলী খাজা গ্রুপ, রাজা-মালেক গ্রুপ, আবু হোসেন গ্রুপ, খগেন গ্রুপ প্রভৃতি ছিল এদের মধ্যে অন্যতম।

উক্ত গ্রুপসমূহের কোনো কোনো গ্রুপকে আদর্শগত কারণে বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়, যেমন- আলী খাজা গ্রুপ ও খগেন গ্রুপ প্রভৃতি; আবার কোনো কোনো গ্রুপকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিগত কারণে বাহিনীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান গ্রহণ করেতে দেখা যায়, যেমন– রাজা-মালেক গ্রুপ ও ইলিয়াস গ্রুপ প্রভৃতি।

কমান্ডার মকবুল হোসেন ও আলী খাজা এম.এ. মজিদ এক কোম্পানি (প্রায় ৯০ জন) এফএফ গেরিলা নিয়ে আগস্টের ৩ তারিখে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং আগস্ট মাসের ৯ তারিখে বাগমারা

থানার মচমইল এলাকায় ওহিদুর বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। পারস্পরিক বোঝাপড়া শেষে উভয় দলের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। চুক্তির প্রধান প্রধান শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ:[১৪৫]

১. ওহিদুর বাহিনী ও আলী খাজা গ্রুপের যেহেতু অভিন্ন লক্ষ্য (জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম) ও অভিন্ন শত্রু (পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের এ দেশীয় দোসর), সুতরাং উভয় দল কখনো কোনো অবস্থাতেই পরস্পর লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত হবে না।

২. উভয় দল পারস্পরিক সৌহার্দ বজায় রেখে পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে যৌথযুদ্ধ পরিচালনা করবে।

৩. যৌথযুদ্ধের কমান্ডিং অথরিটি ওহিদুর বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪. যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী আধাআধি অংশে বাটোয়ারা হবে, ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে যুদ্ধ চলাকালেই আলী খাজার গ্রুপ অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ ওহিদুর বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রায় লীন হয়ে গেলে উল্লিখিত চুক্তি নিস্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আলী খাজার নিজ এলাকা ঝিকরার অগণিত (৮০-১০০ জন প্রায়) গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর বাহিনীতে সক্রিয় ছিলেন এবং যুদ্ধাভিযানসহ অন্যান্য সময়গুলোতে (খাদ্যগ্রহণ, বিনোদন ও বিশ্রামে) উভয়দলের মধ্যে নিয়মিত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হতো; উপরন্তু রাজা-মালেক গ্রুপের মতো খাজা গ্রুপের প্রতি কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকট নির্দেশনা বা নজরদারির ফরমান জারি ছিল না। ফলে যৌথতার এক পর্যায়ে আলী খাজার গ্রুপ মূলত ওহিদুর বাহিনীর সমার্থক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলী খাজা শিক্ষাজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বিধায় রাজনৈতিক মতাদর্শগত প্রশ্নে উভয়ের অবস্থান প্রায় অভিন্ন ছিল।[১৪৬]

ওহিদুর বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার কিছু এলাকায় ধীরে ধীরে মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে। এসব মুক্তাঞ্চলে শরণার্থী ব্যক্তি ও পরিবার নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। যেমন- মে মাসের প্রায় শুরু থেকেই যখন পচামাড়িয়া গ্রাম শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিত পায়, তখন রাজশাহী জেলার নানা এলাকা থেকে বিশেষত বাঘা-দুর্গাপুর ও পুঠিয়া থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে সন্ত্রস্ত মানুষ পচামাড়িয়ায় জড়ো হতে থাকে। শরণার্থীদের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার পূর্বেই বাহিনীর নিয়মিত ও সশস্ত্র গেরিলাদল নিয়ন্ত্রিত বাগমারা-রানীনগর-আত্রাইয়ের নিরাপত্তাজনিত কারণে পচামাড়িয়া গ্রামের বিভিন্ন প্রবেশপথে 'চেকপোস্ট' স্থাপন করা হয়েছিল এবং শরণার্থী ব্যতীত যে কেউ-এমন কি স্থানীয় জনগণের আত্মীয়স্বজনদেরও গ্রামে প্রবেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিল। শরণার্থী ব্যবস্থাপনা ব্যতীত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রদান, খাদ্য ও বিশ্রামের শেল্টার প্রদান ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে এই মৈত্রী গ্রুপের অনন্য অবদান অনস্বীকার্য। আলোচ্য বাহিনীর বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে ডা. সদর উদ্দিন আহমদ ও তার সংগঠিত গ্রুপটিকে বাহিনীর একটি অ্যালাইড ফোর্স হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাহিনীর আর্মড ফোর্সের পাশাপাশি বাহিনীর নৈমিত্তিক প্রয়োজনে শত শত গেরিলাকর্মী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে যুদ্ধ-আনুষঙ্গিক বিবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যেমন– বাহিনীর কনভেয়ার ইউনিটের পরিবহন কর্মীগণ (মাঝি), মেডিক্যাল ইউনিটের ডাক্তার-কম্পাউন্ডারগণ প্রভৃতি। সুতরাং বাহিনীর রেকি, রেশন, ফান্ড, কনভেয়ার, অবজার্ভার, পাবলিকেশন ও মেডিক্যাল ইউনিটের নানাবিধ কর্তব্যে দায়িত্বরত আপামর কর্মীদের বাহিনীর আলোচ্য ক্ষেত্রে ম্যানেজিং ফোর্স হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে স্বেচ্ছাসেবক বলতে যা বোঝায়, সে অর্থে বাহিনীর সমস্ত রেগুলার-রিজার্ভ ফোর্সের গেরিলা যোদ্ধা ও কর্মী সকলেই স্বেচ্ছাসেবক। কেননা এ বাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে একটি অবৈতনিক বাহিনী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তাই বিশেষ অর্থে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্ম ও দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গকেই এই ভলানটিয়ার ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ বাহিনীকে অনিয়মিতভাবে শত্রুপক্ষের অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কিত সংবাদ আদানপ্রদানে সহযোগিতা করেছেন, খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করেছেন, গাইডার হিসেবে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন; বিপদে অর্থ, বুদ্ধি দিয়ে নানাবিধ সহযোগিতা করেছেন– তারাই আলোচ্য বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক বা ভলানটিয়ার ফোর্স। অনিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাহিনীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছেন এমন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা বাহিনীর নিয়মিত গেরিলাযোদ্ধা ও কর্মীদলের চেয়েও অনেক বেশি। নিম্নে শুধুমাত্র আত্রাই থানা অঞ্চলের দিঘা, শুটকিগাছা ও পার্শ্ববর্তী দু'-একটি এলাকার উল্লেখযোগ্য কিছু স্বেচ্ছাসেবকের নাম পরিচয় তুলে ধরা হলো[১৪৭]:

মাছিম উদ্দিন, দিঘা; মোহাম্মদ আলী, কয়সা; ফজেল, দিঘা; হাতেম আলী মন্ডল, রায়পুর; ইয়াছিন আলী মন্ডল, শুটকিগাছা; এবাদুর রহমান, দিঘা; মুনসুর রহমান, দিঘা; খলিলুর রহমান, কাশ্যপপাড়া; তোফাজ্জল হোসেন তোতা, দিঘা; ইসমাইল হোসেন, মদনডাঙ্গা এবং মোজাম্মেল হক মাস্টার, দিঘা প্রভৃতি।

বাহিনীর গেরিলা দলের ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে সচরাচর যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তারা ছিলেন বিশেষত সাবেক সেনা সদস্য, ইপিআর অথবা আনছার-মুজাহিদ। সুতরাং বাহিনীর আবশ্যিক শৃঙ্খলার নিয়মবিধি বৈশিষ্ট্যগতভাবে ছিল সামরিক ও আধা-সামরিক প্রকৃতির। তথাপি, জনযুদ্ধের পরম্পরা অনুসারে কিছু গেরিলা নিয়মকানুন বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাগণের কঠোরভাবে মান্যকরণ ছিল অত্যাবশ্যক। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শৃঙ্খলাবিধি উল্লিখিত হলো:[১৪৮]

১. শত্রুর মোকাবেলায় সদা ঐক্যবদ্ধতা;
২. জনগণের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতা;
৩. জনগণের কৃষিজ ও গার্হস্থ্য সম্পদ সুরক্ষা করা;
৪. নারীর প্রতি মাতৃসুলভ আচরণ করা;
৫. ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিকে লালন করা;
৬. কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ বর্জন করা;
৭. মিথ্যাবলা বর্জন করা;
৮. লোভ-লালসা বর্জন করা;
৯. স্ব স্ব স্কোয়াড বা গ্রুপ থেকে নির্দেশ ব্যতীত বিচ্ছিন্ন না হওয়া;
১০. যুদ্ধ-অভিযান ও গমনাগমনকালে ক্যামোফ্লাজ বা ধূম্রজাল সৃষ্টি করা;
১১. গ্রুপ কোয়ার্টার অথবা অস্থায়ী শেল্টারে নিশ্চুপ থাকা;
১২. ইশারা ও সাংকেতিক ভাষায় তথ্য আদানপ্রদান করা;
১৩. সদা-সর্বত্র কমান্ডারের নির্দেশনা যথাযথ পালন করা।

বাহিনীর আবশ্যিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের মাত্রা অনুযায়ী বাহিনীতে অন্তত পাঁচ রকমের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যদিও গেরিলা যোদ্ধাগণের বিধিভঙ্গের প্রবণতা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বাহিনীর আবশ্যিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তিসমূহ উল্লেখ করা হলো:[১৪৯]

১. ডিজআর্ম বা নিরস্ত্র করা;
২. উত্তমমধ্যম প্রদান করা;

৩. কোয়ার্টার গার্ড প্রদান করা শরীরে সর্বনিম্ন ২০ কেজি ওজন সমেত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (সাধারণত রৌদ্রে) দাঁড়িয়ে থাকা।
৪. বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা এবং
৫. মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা।

বাহিনীর গেরিলাগণ যুদ্ধাভিযানের অংশ হিসেবে ছোটো-বড় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ-অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করতেন এবং নানা প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন করতেন (সাধারণত নৌকায়)। ফলে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া অথবা শত্রুপক্ষের লোকজনের মুখোমুখি হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা ছিল। উপরন্তু বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই দেখা-সাক্ষাৎ হতো। যার ফলে পরস্পর অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বাহিনীর অভ্যন্তরে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাংকেতিক পাসওয়ার্ড ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার, গ্রুপ কোয়ার্টার, আশ্রয় শিবির অথবা কম্বাইন্ড ও অ্যালাইড ফোর্সের শেল্টারসমূহে সংবাদ আদানপ্রদান, যুদ্ধ-উপকরণ অথবা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ে সময় গমনাগনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পাসওয়ার্ড ব্যবহৃত হতো। বিশেষত রাত্রিকালে পাসওয়ার্ডের ব্যবহার জরুরি ছিল এবং সুনির্দিষ্ট সংকেত আদান-প্রদানেই সাধারণত শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করা হতো। বাহিনীর অধিকাংশ গেরিলাযোদ্ধাগণ যেহেতু কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি থেকে আসা অথবা সাধারণ গ্রাম্য যুবক ছিলেন এবং যেহেতু তারা সকলেই স্বশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন, তাই বাহিনীর দিকনির্দেশনামূলক সাংকেতিক পাসওয়ার্ডগুলো ছিল অতি সাধারণ। যেমন- বন্ধু, সাথী, লতা, পাতা, ফুল, তারা, ম্যাচ, আগুন, বিজলি, বিদ্যুত, খাঁচা, কবুতর ইত্যাদি। গেরিলাযোদ্ধা আনছার আলীকে বাহিনীর পাসওয়ার্ড মাস্টার হিসেবে অভিহিত করা হতো এবং গেরিলাযোদ্ধা আনিসুর রহমান শিয়ালের ডাক হুবহু নকল করে ডাকতেন। বিধায় বাহিনীতে তিনি ‘শেয়াল’ নামে বিশেষভাবে আখ্যাত ছিলেন।[১৫০]

ওহিদুর বহিনী ছিল মূলত একটি অবৈতনিক স্বেচ্ছাবাহিনী। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্যে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের গণমানুষের একটি সার্বজনীন বৃহত্তর ও সশস্ত্র সংগঠন ছিল এ বাহিনী। ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে’- বঙ্গবন্ধুর এই অনুরোধের এক জীবন্ত প্রতিচিত্র যেন অঙ্কিত হয়েছিল ওহিদুর বাহিনীর সমগ্র কর্মতৎপরতার প্রত্যেক পরতে পরতে। নৈমিত্তিক চাহিদা পূরণ যখন কষ্টসাধ্য প্রয়াস তখন গেরিলাদের মাসিক ভাতা ছিল সুদূরপরাহত কল্পনা। তবে বাহিনীর প্রত্যেক গেরিলাকে কিছু ‘সিকিউরিটি মানি’ (প্রয়োজনীয় হাত-খরচ ও আপৎকালীন ব্যয় হিসেবে) প্রদান করা হতো যা সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। একইভাবে বাহিনীর বিভিন্ন কমান্ডার ও গ্রুপ কমান্ডারদের নিকট ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা গচ্ছিত থাকত।[১৫১]

ওহিদুর বাহিনীর একটি সক্রিয় চিকিৎসা বিভাগ ছিল। কমান্ডার এমদাদুর রহমান আর্মি মেডিক্যাল কোরের প্রাক্তন সৈনিক হওয়ায় চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। এছাড়া, সার্জারি ডাক্তার ছিলেন ডা. নজর আলী (হাতিয়াপাড়া) এবং ডা. ধীরেন মৈত্র (হাটকালুপাড়া)।[১৫২] এছাড়াও আত্রাই থানাধীন বান্দাইখাড়া গ্রামের ডা. এনায়েতুল্লাহ, ডা. জমির উদ্দিন (ঠিকানা অজানা ও বাহিনীর সাথে ভ্রাম্যমান ছিলেন) ও মান্দা থানাধীন বিল কুরিল্লা গ্রামের কম্পাউন্ডার আব্দুল গফুর বাহিনীর যোদ্ধা ও অবরুদ্ধ এবং মুক্তাঞ্চলের সাধারণ মানুষের এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন।[১৫৩] এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি কয়েকজন হোমিও চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছিলেন বাহিনীর সদস্যদের। আত্রাই থানার গজমতখালীর শুকুর ডাক্তার এবং বাগমারা থানার পাহাড়পুরের আশরাফ ডাক্তার তাদের অন্যতম। ব্যক্তিগতভাবে উল্লিখিত ডাক্তারগণ বাদেও

নওগাঁর মান্দা থানাধীন কালীগ্রাম চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা ও ঔষধপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল।[১৫৪]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

আত্রাই থানা ২২ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। এর পূর্ব থেকেই আত্রাইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ওহিদুর রহমান এই কার্যক্রমে জড়িত থাকেন। ১০ এপ্রিল আত্রাই থানা দখল করে ওহিদুর রহমান ও অন্যান্যরা যে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল তা দিয়ে আত্রাইয়ের সাহেবগঞ্জ মাঠে ও ভবানীপুর মাঠে দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়।[১৫৫] এছাড়া পুরো মে মাসে আত্রাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে।[১৫৬] বাগমারা থানার ঝিকরা গ্রামের অনিমেষ লাহেড়ীর বাড়ি ও একই গ্রামের রনসিবাড়ি পাড়ায় ভোলানাথ সান্যালের বাড়িতে প্রশিক্ষণ প্রদান চলত। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন আব্দুল মজিদ (সাবেক সেনা সদস্য, গ্রাম চন্ডিপুর, নওগাঁ সদর) শেখ তসলিম উদ্দিন (সাবেক সেনা সদস্য, গ্রাম- তারাটিয়া, আত্রাই), মফিজার রহমান (সাবেক সেনা সদস্য, গ্রাম-ঝিনা, রানীনগর) এবং মগরের আলী শেখ (ই পি আর সদস্য, গ্রাম-তারাটিয়া, আত্রাই)[১৫৭] এছাড়াও বাহিনীর সদস্যবৃন্দ রাত্রীকালে যে যে শেল্টারে অবস্থান নিত, সেখানে সদস্যদেরকে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ বা শরীরচর্চা করানো হতো। এ বাহিনীর অস্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছিল সাহেবগঞ্জ মাঠ, আত্রাই; ভবানীপুর হাই স্কুল মাঠ ও রাজবাড়ি, আত্রাই; সরল শিকারপুর, নওগাঁ সদর; গজমতখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আত্রাই; হাতাস কালীপুর ও নওগাঁ সদর; হামিরকুৎসার আব্বাস আলী খাঁর বাড়ি, বাগমারা; চক পাকুরিয়া, মান্দা; মুর্শিদপুর হামিদের বাড়ি, মান্দা; জামনগরের কালিকাপুর আমবাগন, বাগাতিপাড়া; জামনগরের মেরীর পুকুরপাড়, বাগাতিপাড়া; খানপুকুর গ্রাম, রানীনগর; গুয়াতা গ্রাম, রানীনগর ও ভেটোপাড়া গ্রামের ভানকোর জঙ্গল, মোহনপুর, রাজশাহী।[১৫৮]

ওহিদুর বাহিনীর গঠন পর্বে বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার ১০ এপ্রিল আত্রাই থানা দখল করে পাওয়া ৩৪টি রাইফেলের মাধ্যমে গড়ে উঠতে শুরু করে। তাছাড়া ওহিদুর রহমানের পদক্ষেপে আত্রাই ও পার্শ্ববর্তী থানাগুলোর সচ্ছল কৃষক পরিবার ও জমিদার-জোতদার পরিবারগুলোর কাছে থাকা অস্ত্রগুলো (বেশিরভাগই সিভিল গান) সংগ্রহ করা হয়।[১৫৯] তবে শত্রুসৈন্য ও তাদের দালালদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বা যুদ্ধ জয় করে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদই বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারের মূল উৎস ছিল। এর বাইরে ভারত হতে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে যেসব যোদ্ধাগণ (এফএফ) পরবর্তীকালে ওহিদুর বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রে পরিণত হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাহিনীতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের নাম ও মোট সংখ্যার একটি খসড়া তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল:[১৬০]

টু-ইঞ্চ মর্টার – ১টি
এলএমজি – ২টি
এসএমজি – ৩টি
চাইনিজ এসএমজি – ১টি
স্টেনগান (লাইট সাব-মেশিনগান) – ২টি
চাইনিজ রাইফেল – ১টি
এসএলআর – ৫টি
থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল – ১২০০টি (প্রায়)
টু-টু বোর (.২২) – ২২টি
রিভালবার – ২টি এবং
বেয়োনেট – ৬টি

এ বাহিনীর গোলাবারুদের মজুদের মধ্যে ছিল হ্যান্ড গ্রেনেড, এন্টি-ট্যাংক গ্রেনেড, হ্যান্ড মাইন, এন্টি-ট্যাংক মাইন, রকেট লাঞ্চার, বুলেট, ট্রেসার বুলেট, ডিনামাইট এবং অন্যান্য এক্সপ্লোসিভ। আর এগুলোসহ বাহিনীতে প্রচুর দেশীয় তীর, ধনুক, বল্লম, ছুরি, বাঁশের লাঠি, বাঁশের হলঙ্গা, শূলপানি এবং লোহার রড ছিল।[১৬১]

আওতাভুক্ত এলাকা

ওহিদুর বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে 'আত্রাই অঞ্চলে' মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। 'আত্রাই অঞ্চল' বলতে একদিকে নওগাঁর দক্ষিণ অঞ্চল মান্দা, রানীনগর ও আত্রাই থানা, অপরদিকে নাটোরের উত্তর অঞ্চল, রাজশাহীর পূর্ব এলাকা বাগমারা ও পুঠিয়া থানা এলাকাকে বোঝায়।[১৬২] প্রকৃত অর্থে, বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নওগাঁ, নাটোর ও রাজশাহী মহকুমা এবং বগুড়া জেলার বগুড়া মহকুমা ছিল এই বাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল। নওগাঁ মহকুমার আত্রাই, রানীনগর, মান্দা, নওগাঁ সদর, নিয়ামতপুর ও বদলগাছি থানা; নাটোর মহকুমার সিংড়া, নাটোর সদর (নলডাঙ্গা থানাসহ) ও বাগাতিপাড়া থানা; রাজশাহী জেলার বাগমারা, মোহনপুর, পুঠিয়া ও দুর্গাপুর থানা এবং বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ওহিদুর বাহিনীর যুদ্ধ-তৎপরতা বিস্তৃত ছিল। এর বাইরে নওগাঁ মহকুমার মহাদেবপুর, পোরশা, ধামইরহাট, বগুড়া মহকুমার আদমদীঘি এবং রাজশাহীর পবা থানা এলাকাসমূহে বাহিনীর কোনো কোনো গ্রুপ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল।[১৬৩] এ প্রসঙ্গে বাহিনী প্রধান ওহিদুর রহমান লিখেছেন, "পুঠিয়ার ঢাকা রোড থেকে নওগাঁর সরল শিকারপুর (প্রায় ৬৫ মাইল), মান্দার প্রসাদপুর থেকে সিংড়ার কালিগঞ্জ পর্যন্ত (৫০ মাইল প্রায়), সান্তাহারের সান্ধিরা গ্রাম থেকে নাটোরের নলডাঙ্গা পর্যন্ত (প্রায় ৪০ মাইল) এই বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা বিচরণ করি।"[১৬৪]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

ওহিদুর বাহিনী পাকিস্তানি শত্রুসৈন্য ও তাদের এদেশীয় সহযোগী মিলিশিয়া, রাজাকার, আলবদর, আল শামসসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিকে যুদ্ধকে অনুসরণ করেছে। তবে, প্রয়োজনে এ বাহিনী বেশ কতক সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। তাছাড়া, যুদ্ধক্ষেত্রে এই বাহিনীর যোদ্ধাগণ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থানরত অন্যান্য (এফএফ, বিএলএফ) গ্রুপের যোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় করে ও মাঝে মাঝে যৌথভাবে নানা যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিল। ওহিদুর বাহিনী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত একক ও যৌথভাবে

ছোটো-বড় প্রায় দেড় শতাধিক যুদ্ধে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল।[১৬৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওহিদুর বাহিনীর যুদ্ধাঞ্চল ভৌগোলিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশ উপযুক্ত ছিল। বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের জন্য এই অঞ্চল বেশ উপযোগী ছিল। বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকা দিয়ে পাঁচটি নদী বয়ে গিয়েছে। নদীগুলো হলো আত্রাই নদী, ছোট যমুনা, ফকিন্নী (কোথাও কোথাও বার্নই), খাজুরা ও নাগর নদী এবং বাগমারার রানী নদী, নদীর পাশাপাশি ছিল বিশাল বিশাল বিল। যেমন, রানীনগর-সান্তাহারের মধ্যে রক্তদহের বিল, নওগাঁ-রানীনগর থানায় বিল মনছুর, দিঘলীর বিল, গুটার বিল, নাটোরের হালতির বিল, আত্রাই থানা ও সিংড়া থানার মধ্যে চলনবিলের একাংশ এবং মান্দা থানার বিলগুলো ছিল ভৌগোলিক দিক দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। অপরদিকে, এগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য ছিল প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থান।[১৬৬]

ওহিদুর বাহিনীর যুদ্ধাঞ্চলের সর্বত্র পাকিস্তানি মিলিটারির স্থায়ী ক্যাম্প খুব বেশি ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাজশাহী, নাটোর ও নওগাঁ হেড কোয়ার্টার থেকে হঠাৎ হঠাৎ এসে পাহারা দিত। উল্লেখ্য, অত্র এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩৪ পদাতিক ব্রিগেডের ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ১৩ এফএফ রেজিমেন্ট ও ইপিসিএএফ-এর ৬ এবং ৭ নং নিয়োজিত ছিল।[১৬৭] ওহিদুর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে কয়েকটি ক্যাম্প ছিল তার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:[১৬৮]

১. আহসানগঞ্জ স্টেশন (পুরাতন) মিলিটারি ক্যাম্প, আত্রাই হেড কোয়ার্টার;
২. গজমতখালি অস্থায়ী মিলিটারি ক্যাম্প, আত্রাই ('৭১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত);
৩. দুবলহাটি মিলিটারি ক্যাম্প, নওগাঁ সদর;
৪. নওগাঁ মিলিটারি হেড কোয়ার্টার, নওগাঁ সদর;
৫. নাটোর মিলিটারি হেড কোয়ার্টার, নাটোর সদর এবং
৬. সিংড়া থানাকেন্দ্র ও গার্লস হাইস্কুল মিলিটারি ক্যাম্প, সিংড়া

পাকিস্তানি সেনাক্যাম্পের পাশাপাশি ওহিদুর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় মিলিশিয়া-রাজাকারদের যুথবদ্ধ বা শুধুই রাজাকার ক্যাম্প ছিল বেশ কয়েকটি। নিম্নে রাজাকার ক্যাম্পের একটি তালিকা প্রদান করা হলো:[১৬৯]

১. বাগমারা থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, বাগমারা।
২. আত্রাই থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, আত্রাই।
৩. রানীনগর থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, রানীনগর।
৪. নওগাঁ সদর থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, নওগাঁ।
৫. সিংড়া থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, সিংড়া।
৬. নিয়ামতপুর থানা মিলিশিয়া ক্যাম্প, নিয়ামতপুর।
৭. মৈনম মিলিশিয়া ক্যাম্প, মান্দা।
৮. বাঁইগাছা রাজাকার ক্যাম্প, বাগমারা।
৯. সোনাডাঙ্গা-ভরট্ট রাজাকার ক্যাম্প, বাগমারা।
১০. তাহেরপুর রাজাকার ক্যাম্প, বাগমারা।
১১. খাজুরা জঙ্গল রাজাকার ক্যাম্প, নাটোর।
১২. নলডাঙ্গা রাজাকার ক্যাম্প, নাটোর।
১৩. সাহাগোলা ব্রিজ রাজাকার ক্যাম্প, আত্রাই।
১৪. ঠাইপাড়া ব্রিজ রাজাকার ক্যাম্প, আত্রাই।
১৫. মাধনগর ব্রিজ রাজাকার ক্যাম্প, নাটোর।

১৬. মধুপুর রাজাকার ক্যাম্প, বদলগাছী।
১৭. জামনগর রাজাকার ক্যাম্প (বাসু বাবুর বাড়ি), বাগাতিপাড়া।
১৮. রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়ন রাজাকার ক্যাম্প, সিংড়া।
১৯. চৌগ্রাম ইউনিয়ন রাজাকার ক্যাম্প, সিংড়া।
২০. কলম ইউনিয়ন রাজাকার ক্যাম্প, সিংড়া।
২১. মৌপাড়া রাজাকার ক্যাম্প, মোহনপুর।

পাকিস্তানি সেনাক্যাম্প ও মিলিশিয়া-রাজাকার ক্যাম্পের উপস্থিতিতেই ওহিদুর বাহিনী তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই শত্রুপক্ষের সাথে এ বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্থানে। এরূপ যুদ্ধের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো:

বার্নিতলা অভিযান[১৭০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৮এপ্রিল দুপুরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ওহিদুর রহমান ও তার বাহিনীর একদল যোদ্ধা ওহিদুর রহমানের নিজ গ্রাম রসুলপুর যাওয়ার পথে পথিমধ্যে জানা রাজাকার কমান্ডারের দলের আক্রমণের শিকার হয়। এই হঠাৎ আক্রমণের জবাব দিতেই ওহিদুর রহমানের দল পাল্টা আক্রমণ চালায়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ২০/২৫ জনের একটি দল ও তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল ৩০৩ রাইফেল।

অভিযানের বিবরণ: পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে ওহিদুর রহমান নিজ গ্রাম রসুলপুরে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল প্রায় ২৫ জনের একটি গেরিলা দল। ওহিদুর রহমান ও তার দল বার্নিতলায় পৌঁছালে হঠাৎ করে জানা রাজাকারের নেতৃত্বে একদল রাজাকার তাদেরকে আক্রমণ করে। এই আচমকা আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধা নিজামউদ্দিন, ছইরউদ্দিন ও সোলেমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেয়ে ও রাজাকারদের আক্রমণ সামলে নিয়ে প্রতি আক্রমণ চালান। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আক্রমণে রাজাকার দল প্রথমে পিছু হটে ও পরে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: ঘটনাস্থলে মুক্তিবাহিনীর তিনজন শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আক্রমণে রাজাকার দল পালিয়ে যায়। তবে পরবর্তীকালে উক্ত রাজাকার দলের ১১ জন সদস্যকে খতম করা হয়।

নলদিঘি অভিযান[১৭১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৭ আগস্ট বিকাল ৩টার পর।

অভিযানের উদ্দেশ্য: বাহিনীর প্রধান অংশ এদিন আত্রাই থানার তিলাবাদুরী গ্রামে অবস্থান করছিল। পাকিস্তানি সেনাদলের প্রায় ১২০ জনের একটি গ্রুপ তাদেরকে আক্রমণের জন্য অগ্রসরমান ছিল। এই অগ্রসরমান শত্রুসৈন্যকে এ্যাম্বুশ করা ছিল ওহিদুর বাহিনীর উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় এক ব্যাটেলিয়ন গেরিলা যোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেন। অস্ত্র হিসেবে তাদের সাথে ছিল এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল ও গোলাবারুদ।

অভিযানের বিবরণ: তিলাবাদুরী গ্রামে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা দল দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় খবর পাওয়া যায় যে, পাকিস্তানি সেনাদলের একটি বড় অংশ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছেন। শত্রুর আসার খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত তিলাবাদুরি থেকে সরে এসে পার্শ্ববর্তী রানীনগর থানার নলদিঘিতে যুদ্ধাবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যদল সেখানে পৌঁছলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে লক্ষ্য করে একযোগে গুলি চালায়। প্রায় তিন ঘণ্টা উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়।

ফলাফল: এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যের ৫ জন গুলিতে এবং ২ জন পানিতে ডুবে মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বাগমারা থানা প্রথম অভিযান[১৭২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৪ আগস্ট রাত ২টার পর।

অভিযানের উদ্দেশ্য: অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বাধা প্রদান ও মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি প্রদর্শন ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে এক ব্যাটেলিয়ন গেরিলা এলএমজি, এসএমজি, বিভিন্ন রাইফেল ও হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ করে।

অভিযানের বিবরণ: পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে উৎসবে মত্ত ছিল রাজশাহীর বাগমারা থানার পুলিশ, রাজাকার, মিলিশিয়ারা। রাত ২টা নাগাদ ওহিদুর রহমানের কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধারা থানার পূর্বপাশ থেকে থানার ভেতরে প্রবেশ করে গুলি চালানো শুরু করেন। উৎসবে মগ্ন শত্রুপক্ষ এই আচমকা আক্রমণের ধাক্কায় কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই তাদের বেশ ক'জন সদস্য হতাহত হন। এরপর থানার বাকি সদস্যরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

ফলাফল: ৫-১০ জন রাজাকার মিলিশিয়া এ আক্রমণে নিহত হয় ও বাকিরা পালিয়ে যায়। এ অভিযান থেকে ৪০টি রাইফেল ও গোলাবারুদ পাওয়া যায়। অভিযান শেষে মুক্তিযোদ্ধারা থানায় থাকা পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র-খচিত পতাকা উত্তোলন করেন।

তারানগর-বাউল্যার অভিযান[১৭৩]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপের দ্বারা আত্রাই থানার বান্দাইখাড়া গ্রামে সংঘটিত গণহত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের প্রতিশোধ নিতে এ অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: এফএফ যোদ্ধা রাজা-মালেক গ্রুপের ১ প্লাটুন, আবু রেজা-আলী খাজা গ্রুপের এক সেকশন ও আলী খাজা গ্রুপের এক কোম্পানি গেরিলাসহ ওহিদুর বাহিনীর প্রায় এক কোম্পানি গেরিলার একটি যৌথ বাহিনী এলএমজি, এসএমজি, রকেট লাঞ্চার, ৩০৩ রাইফেল ও গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ করে।

অভিযানের বিবরণ: তারানগর ও বাউল্যা আত্রাই নদীর তীরবর্তী দুটি গ্রাম। ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে পাকিস্তানি সেনাদলের প্রায় ২০০ জনের একটি দল আত্রাইয়ের বান্দাইখাড়া গ্রামে গণহত্যা ও নির্যাতন

চালিয়ে আত্রাই নদী বেয়ে চলে যায়। এই দলকে উচিত শিক্ষা দিতে মুক্তিবাহিনী আত্রাই বাজার ও বান্দাইখাড়া বাজারের প্রায় মাঝামাঝি দূরত্বে আত্রাই নদীর উভয় তীরে অবস্থিত তারানগর ও বাউল্যা গ্রামে অবস্থান নেয়। দুপুর নাগাদ শত্রুসৈন্যের পূর্বোক্ত বহর একটি বড় কোষা নৌকা ও দশ-এগারোটি পানসি নৌকায় চড়ে আত্রাই অভিমুখে অগ্রসরমান হয়। মুক্তিবাহিনীর এ্যাম্বুশ এরিয়ার মধ্যে শত্রুসৈন্য আসা মাত্র মুক্তিদল নদীর উভয় পাড় হতে একযোগে গুলি চালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে শত্রুসৈন্য বহনকারী কোষা নৌকাসহ অন্তত দশটি নৌকা তাৎক্ষণিক ডুবে যায়। আর তাদের একটি নৌকা কোনো রকমে আক্রমণ এড়িয়ে বাউল্যা গ্রামে নেমে কিছুক্ষণ এলোপাতারি গোলাগুলি করে আত্রাই অভিমুখে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: শত্রুপক্ষের ১৫০-১৮০ জন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে এবং পানিতে ডুবে নিহত হয়। বাউল্যা গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ শত্রুসৈন্যের এলোপাতারি গুলিতে মারা যান। এই পরাজয়ের পর পাকিস্তানি সৈন্যদল আর কখনো আত্রাইয়ে গণহত্যা-নির্যাতন চালাতে সাহস করেনি।

সাহাগোলা ব্রিজ অভিযান[১৭৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৬ অক্টোবর রাত ১০টার পর।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সেনাদলের একটি স্পেশাল ট্রেন নাটোর থেকে নওগাঁ যাবে সংবাদ পেয়ে চূড়ান্ত আঘাত করার লক্ষ্যে এই অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: রাজা-মালেক গ্রুপের এক প্লাটুন ও ওহিদুর বাহিনীর এক প্লাটুন গেরিলা যোদ্ধার একটি যৌথ দল এন্টি-ট্যাংক মাইন, এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, রকেট লাঞ্চার ও ৩০৩ রাইফেল নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের বিবরণ: যৌথ বাহিনীর দুটি প্লাটুন সাহাগোলা ব্রিজের নিকট তারাটিয়া ও ঝনঝনিয়া গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করে। প্রথমে ওহিদুর রহমানের প্লাটুন ব্রিজ পাহারারত ৭/৮ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করায়। তারপর ব্রিজের উত্তর পাশে এক্সপ্লোসিভ ঢেলে ডেটোনেটর ফিট করা হয় ও দক্ষিণ পাশে এন্টি ট্যাংক মাইন স্থাপন করা হয়। কিছুক্ষণ পর ৬টি বগি বোঝাই পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে ট্রেনটি ব্রিজের ওপর উঠলে বিস্ফোরণ ঘটে ও ট্রেনটি বগিসহ খাদে পড়ে যায়। এই অভিযান সম্পর্কে ওহিদুর রহমান লিখেছেন:

> ...গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে সাহাগোলা রেল স্টেশনের অর্ধকিলোমিটার দক্ষিণে ব্রিজ ও স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় নেমে পড়ি। নৌকা থেকে নেমেই ক্রলিং করে ব্রিজের কাছে গিয়ে ৭ জন রাজাকারকে আত্মসমর্পণ করাই। এবং খুব দ্রুত ব্রিজের উত্তর পাশের গার্ডারের গা ঘেঁষে ৪/৫ ফিট গর্ত খুঁড়ে এক্সপ্লোসিভ ঢেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ডেটোনেটর সেট করা হয়। এ কাজে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগে যায়। এর মাঝে অপর গ্রুপের ৮/১০ জন ব্রিজের দক্ষিণ পাশে হেভি অ্যান্টি ট্যাংক মাইন রেললাইনের দুই দিকে ফিট করে দ্রুত রেল স্টেশনে পৌঁছে ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট লাঞ্চারসহ এলএমজি ও এসএলআর নিয়ে পজিশন নেওয়া হয়। এক্সপ্লোসিভ বার্স্ট করার পর তার শব্দে আশপাশের প্রায় ২/৩ মাইল এলাকা প্রকম্পিত হয়। কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দ ছিল খুবই কম, যার জন্য আত্রাই পাকবাহিনীর ক্যাম্প ঘটনাটি আঁচ করতে পারেনি। পাক-আর্মি বোঝাই ৬টি বগিযুক্ত ট্রেনটি এগিয়ে আসছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের হেডলাইট নেভানো ছিল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসেও আমরা ঘামছিলাম। হঠাৎ করেই ঘটে গেল ঘটনা। চোখের নিমিষে ভাঙা ব্রিজের ওপর ইঞ্জিনসহ ট্রেনটি উঠার সাথে সাথে আলোর ঝলকানি দিয়ে খাদের অথৈই পানিতে পড়ে ডুবে গেল। প্রায় সাড়ে তিনশত পাক সেনার সলিল সমাধি হয়ে গেল।...[১৭৫]

ফলাফল: এ ঘটনায় ৩৫০-৪০০ জন পাকিস্তানি মিলিটারি পানিতে ডুবে মারা যায়। মুক্তিবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে এ ঘটনার পরদিন পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার সাহাগোলা গ্রামে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ব্যাপক লুটপাট করে।

বামনিগ্রামের অভিযান[১৭৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৭ নভেম্বর দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: বাহিনীর কাছে খবর আসে যে, পাকিস্তানি সৈন্য বাগমারার বামনিগ্রামে নৌপথে এসে হামলা করবে। এই হামলা প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে মুক্তিদলের এই অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: আলি খাজা গ্রুপের এক কোম্পানি, মকবুল গ্রুপের এক সেকশন এবং ওহিদুর বাহিনীর দুই প্লাটুন গেরিলার সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী এলএমজি, এসএমজি, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখ সকাল নাগাদ যৌথবাহিনী বামনিগ্রামের নদীতীরের দুই পাশে এ্যাম্বুশ প্রস্তুত করে। দুপুর নাগাদ হানাদার সৈন্য ১১টি নৌকায় চেপে বামনিগ্রামের নিকটে এসে যৌথ বাহিনীর এ্যাম্বুশে পড়ে। যৌথবাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করলে পাকিস্তানি সৈন্যবাহী পাঁচটি নৌকা এর শিকার হয় এবং অন্য নৌকাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

ফলাফল: এ অভিযানে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রায় ৪০ জন নিহত হয় ও অগণিত আহত হয়। এখানে মুক্তিবাহিনী ২৫টি স্টেনগান ও গোলাবারুদ লাভ করে।

উল্লিখিত যুদ্ধসমূহ বাদেও ওহিদুর বাহিনী একক ও যৌথভাবে তাহেরপুর হাট অভিযান (জুলাই ৫), ভবানীগঞ্জ হাট অভিযান (জুলাই ৫), ভাল্লুকগাহি অভিযান (জুলাই ৭), সিংড়া থানা আক্রমণ (জুলাই ২৮), শমসপাড়া অভিযান (আগস্ট ৬), গোয়ালবাড়ি অভিযান (আগস্ট ১১), বেগুনবাড়ি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (সেপ্টেম্বর ২০), ব্রহ্মপুর হাট আক্রমণ (সেপ্টেম্বর ২৯), কুজামারা ব্রিজ অভিযান (সেপ্টেম্বর), বাঁইগাছা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (অক্টোবর ১৩), সোনাডাঙ্গা-ভরট্ট রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, (অক্টোবর ১৪), গাঙ্গোপাড়া অভিযান (অক্টোবর ১৬), ডাঙ্গাপাড়া অভিযান (অক্টোবর ২২), মৈনম রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (অক্টোবর ২৫), তাহেরপুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (নভেম্বর ১০), পরানপুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, নিয়ামতপুর থানা আক্রমণ, স্থল বড়বড়িয়ার যুদ্ধ, চৌগ্রাম সম্মুখ যুদ্ধ (ডিসেম্বর ৮), রানীনগর থানা আক্রমণ (ডিসেম্বর ৯), তাহেরপুর হাট আক্রমণ (ডিসেম্বর ১৪) ইত্যাদি অভিযানে অংশ নেয়।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

ওহিদুর বাহিনী তাদের অভিযানগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটির খবর সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে প্রচার করেছিল। এ প্রসঙ্গে ওহিদুর রহমান লিখেছেন, "আমরা পাকবাহিনীর আত্রাই আগমনের সময় আহসানগঞ্জ হাই স্কুল থেকে নেওয়া একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন খাজুরা জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিলাম। এবার তা উঠিয়ে নিয়ে নৌকা করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অপারেশনের খবর মাঝে মধ্যে সাইক্লো করে প্রচার করতাম। এক পর্যায়ে কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় এর কার্যকারিতা আর থাকে না।"[১৭৭] সাইক্লোস্টাইল মেশিন অকার্যকর হওয়ার পর থেকে এ বাহিনীর পক্ষ থেকে ছাপার অক্ষরে আর কোনো কিছু প্রচার করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ওহিদুর রহমান তার ব্যক্তিগত পরিচিতি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্রাই, রানীনগর, মান্দা, সিংড়া, বাগমারাসহ বিভিন্ন এলাকায় দলবলসহ ঘুরে ঘুরে গ্রামের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে থাকেন। এই প্রয়োজনে তিনি ও বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ উল্লিখিত এলাকার গ্রামগুলোতে মে মাস থেকেই গ্রামবৈঠক, মতবিনিময় সভা, সাধারণ আলাপ-আলোচনা, ইত্যাদির আয়োজন করতে থাকেন। একই সাথে গ্রামগুলোর নেতৃস্থানীয় বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথেও যোগাযোগ বজায় রেখে ওহিদুর বাহিনী জনগণের মনোভাব ও মতামত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[১৭৮] জনসংযোগকালে এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ একটি কৌশল ব্যবহার করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আহ্বান উপেক্ষা করে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার যেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোপ্রকার সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে, সেজন্য এলাকাভিত্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে তা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হতো এবং উভয় পক্ষের ওপরই একপ্রকার নজরদারি করা হতো। এই বাহিনীর জনসংযোগ কার্যক্রম বিজয় অর্জন পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[১৭৯]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

ওহিদুর বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই দেশের অভ্যন্তরে শত্রুসৈন্য ও দালাল রাজাকার পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সে তুলনায় এই বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বেশ কম। এই বাহিনীর ঠিক কতজন শহিদ ও যুদ্ধাহত সদস্য তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বাহিনীর শহিদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা (অসম্পূর্ণ) নিম্নে প্রদান করা হলো[১৮০]

১. নিজাম উদ্দিন, গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: বার্নিতলা, আত্রাই; তারিখ: ২৮শে এপ্রিল;

২. ছইরউদ্দিন, গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: বার্নিতলা, আত্রাই; তারিখ: ২৮শে এপ্রিল;

৩. সোলেমান, গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই: শহিদ হওয়ার স্থান: বার্নিতলা, আত্রাই; তারিখ: ২৮শে এপ্রিল;

৪. আবুল হাসেম, গ্রাম: সাহেবগঞ্জ, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: সদুপুর, আত্রাই; তারিখ: ৩০শে এপ্রিল;

৫. রাজা মিয়া, গ্রাম: বড়সাঁওতা, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: বড়সাঁওতা, আত্রাই; তারিখ: আনুমানিক ২৬শে জুলাই;

৬. আইয়ুব আলি, গ্রাম: ভট্টপাড়া, মাধনগর, নাটোর; শহিদ হওয়ার স্থান: ডাঙ্গাপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর; তারিখ: ২১শে অক্টোবর;

৭. শাহাদত আলী (সাদ আলী), গ্রাম: রানীনগর সদর, রানীনগর; শহিদ হওয়ার স্থান: রানীনগর থানা, রানীনগর; তারিখ: ১০ই ডিসেম্বর;

৮. আব্দুল গফুর, গ্রাম: খট্টেশ্বর, রানীনগর; শহিদ হওয়ার স্থান: রানীনগর থানা, রানীনগর; তারিখ: ১৪ই ডিসেম্বর;

৯. ফিরোজ আলম, গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: নিজ বাসস্থান, মহাদিঘি, আত্রাই; তারিখপ: আনুমানিক সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (নলদিঘি যুদ্ধের প্রায় এক মাস পরে);

১০. আলমগীর, গ্রাম: মহাদিঘি, আত্রাই; শহিদ হওয়ার স্থান: নিজ বাসস্থান, মহাদিঘি, আত্রাই; তারিখ: আনুমানিক সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে,

১১. হামিরকুৎসা গ্রামের আব্বাস আলী খানের বাসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় অজ্ঞাতনামা একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা দূর্ঘটনাবসত নিজ রাইফেলের গুলিতে শহিদ হন।

বাহিনীর যুদ্ধাহত গেরিলাদের একটি খসড়া তালিকা

১. আবদুল মান্নান, গ্রাম: নবাবের তাম্বু, আত্রাই; আহত হওয়ার স্থান: বার্নিতলা, আত্রাই; তারিখ: ২৩শে এপ্রিল;

২. শাহাদত মুন্সি, গ্রাম: ভবানীপুর, রানীনগর, আহত হওয়ার স্থান: রানীনগর থানা, রানীনগর; তারিখ: ৯ই ডিসেম্বর;

৩. আবুল কাসেম, গ্রাম: কাশিয়াবাড়ী; আহত হওয়ার স্থান: রানীনগর থানা, রানীনগর; তারিখ: ১০ ডিসেম্বর;

৪. মোহসিন আলী, গ্রাম: রামনকয়া, বাগমারা; আহত হওয়ার স্থান: জাত আমরুল, আত্রাই; তারিখ: অজ্ঞাত;

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

ওহিদুর বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় প্রবাসী সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে এই বাহিনীকে সরাসরি স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। যদিও এই বাহিনী প্রধানত ওহিদুর রহমান ও অন্যান্য কয়েকজন বামপন্থি নেতাকর্মীর দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু তারা মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারকে স্বীকার করেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ওহিদুর রহমান ও অত্র এলাকার বামকর্মীদের গোপন সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও ওহিদুর রহমান ও অন্যান্য স্থানীয় বামকর্মীদের মধ্যে সে দ্বিধা ছিল না। বরং তারা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এ প্রসঙ্গে ওহিদুর রহমান লিখেছেন, "আমরা আত্রাই অঞ্চলের অর্থাৎ বৃহত্তর রাজশাহী জেলার কমরেডরা 'মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দুই কুকুরের মধ্যকার লড়াই' এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ফ্রন্ট স্থাপন করে একসঙ্গে যুদ্ধ করি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে।"[১৮১] এছাড়া বৃহত্তর রাজশাহীর জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব শাহ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ ওহিদুর বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৫/৬ মাস অবস্থান করেছিলেন এবং এই বাহিনীর একজন কোঅর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুতরাং, এটি প্রমাণ করে যে, ওহিদুর বাহিনীর কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ছিল না। এতদ্‌ভিন্ন বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে সেক্টর কর্তৃপক্ষ প্রেরিত এফএফ যোদ্ধাদল ওহিদুর বাহিনীর সাথে একত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। ঝিকরার কোম্পানি কমান্ডার আলী খাজা, নাটোর সদরের গ্রুপ কমান্ডার রমজান ও লুৎফর রহমান, রাজশাহী সদরের সাইদুর রহমান ও আব্দুস সালাম ও এফএফ কমান্ডার মখলেছুর রহমান রাজা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা ওহিদুর বাহিনীর যোদ্ধাদের সাথে একত্রে ও যৌথ কমান্ডে যুদ্ধ করেছিল।[১৮২]

গণমাধ্যমে ওহিদুর বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধকালে দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যমে ওহিদুর বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধসাফল্যের খবর প্রচারিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে এই তথ্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[১৮৩]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

ওহিদুর বাহিনীর কোনো সদস্যই সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা পুরস্কার পাননি। উপরন্তু এই বাহিনীর অন্তত সাতশত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা এখন পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।[১৮৪] এর বাইরে বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধারা তো 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতিটুকুও পাননি।

অস্ত্র সমর্পণ

ওহিদুর বাহিনীর দখলে আসা সমস্ত অস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর জমা দেওয়া হয়েছিল।[১৮৫] তবে কোনো একক স্থানে বা একই দিনে বাহিনীর অস্ত্র জমা দেওয়া হয়নি। এই বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ নওগাঁ

মহকুমার বাইরে যে যে এলাকায় সক্রিয় ছিলেন, সেই সেই স্থানের কমান্ডারের মাধ্যম সংশ্লিষ্ট থানা বা মহকুমা প্রশাসন বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকট মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেন।[১৮৬] আর ওহিদুর বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি আত্রাই-রানীনগর-মান্দা এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা বাহিনী প্রধান ওহিদুর রহমানের উপস্থিতিতে ১৯৭২ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে নওগাঁ মহকুমা শহরের আনসার হলে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিলের মাধ্যমে মহকুমা প্রশাসনের কাছে অস্ত্র জমা দেন।[১৮৭]

মূল্যায়ন

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নওগাঁ, নাটোর ও রাজশাহী মহকুমা এবং বগুড়া জেলার বগুড়া মহকুমার প্রধানত বিল এলাকা যা 'রাজশাহীর বিল এলাকা' হিসেবে সমধিক পরিচিত, সেখানে সরকারি কোনো সহযোগিতা বাদেই সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে উঠেছিল ওহিদুর বাহিনী। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত এই বাহিনীর বিচরণক্ষেত্র অত্র এলাকার প্রায় এক হাজার বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তন্মধ্যে আত্রাই, রানীনগর, মান্দা, বাগমারা, সিংড়া এলাকা ছিল বাহিনীর অপেক্ষাকৃত সক্রিয় কর্মক্ষেত্র। আগস্ট থেকে ৭ নং সেক্টর কতৃপক্ষ কর্তৃক পাঠানো ছোটো ছোটো মুক্তিযোদ্ধা দল যদিও অত্র এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তবু ওহিদুর বাহিনীই উল্লিখিত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি হিসেবে তৎপর থাকে। এছাড়া অধিকাংশ ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা দল হয় ওহিদুর বাহিনীর সাথে মিশে গিয়ে অথবা তাদের সাথে সমন্বয় করে পাকিস্তানি শত্রুশক্তির মোকাবেলা করেছিল। কেননা ভারত থেকে আসা মুক্তিদলগুলোর সামর্থ্য (লোকবল, যুদ্ধাস্ত্র, জনসমর্থন, রসদ) এমন পর্যায়ে ছিল না যে, তারা স্বতন্ত্রভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের দোসরদেরকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। বরং এসব মুক্তিদলের জন্য সর্বাবস্থায় ওহিদুর বাহিনী 'সৎ প্রতিবেশী'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এলাকা এবং প্রভাবিত জনতা ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে অন্যতম প্রধান সহায় হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এবং মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনগণের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে ওহিদুর বাহিনীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এপ্রিলের শুরুর দিক থেকেই আত্রাই এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে চোর-ডাকাত-দুস্কৃতকারীর অধিকাংশকে শাস্তি দিয়ে বা নিধন করে এ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এরপর দেশব্যাপী যখন শান্তি কমিটি ও রাজাকার-আলবদর-আলশাম্‌স তৈরি করা শুরু হয়, তখন ওহিদুর বাহিনী অত্র এলাকার পাকিস্তানপন্থি নেতৃবৃন্দকে সরাসরি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যাতে তারা ঐধরনের কোনো দল গঠন ও তৎপরতা না চালান। এর ফলে পাকিস্তানপন্থি অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকালে নিষ্ক্রিয় থাকেন। আর যারা পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন তাদের একটি বড় অংশকে এ বাহিনী নানারকম শাস্তি দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে অত্র এলাকায় সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনতার বড় অংশ তুলনামূলক নিরাপদ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পেরেছিল বলা যায়।

ওহিদুর বাহিনী তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের তৎপরতায় বাহিনীর প্রশিক্ষকগণ উল্লিখিত এলাকার প্রায় দুই হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়ভাবে এই বিরাট সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করতে পারা এ বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-মিলিশিয়ার মিলিত শক্তির বিপরীতে ওহিদুর বাহিনী প্রায় দেড়শত সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এসব সংঘর্ষে অপর পক্ষের প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য নিহত ও সংখ্যাহীন সদস্য আহত হয়েছিলেন। এছাড়া ওহিদুর

বাহিনী দখলদার বাহিনীর আয়ত্ত থেকে নওগাঁ-নাটোর-বগুড়া ও রাজশাহীর বিল এলাকার ১৫টি থানা এককভাবে ও অন্যান্য মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ওহিদুর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে পচামাড়িয়া (পুঠিয়া) এবং আত্রাইয়ের অনেকগুলো গ্রামকে এ বাহিনী মুক্তাঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তাঞ্চলে জনজীবন নিরাপদ ও স্বাভাবিক থাকায় ধীরে ধীরে রাজশাহী জেলার নানা এলাকা থেকে বিশেষত বাঘা-দুর্গাপুর ও পুঠিয়া থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে সন্ত্রস্ত মানুষ এই এলাকায় চলে এসেছিলেন। পাশাপাশি এই এলাকায় অসংখ্য শরণার্থীও আশ্রয় নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ওহিদুর বাহিনী শরণার্থীদেরকে খাদ্য ও নিরাপত্তা প্রদান ও সহজে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি মুক্তিযোদ্ধা দল নিয়োজিত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুক্তাঞ্চল তৈরি ও ব্যবস্থাপনা এবং শরণার্থী ব্যবস্থাপনা এ বাহিনীর অন্যতম অবদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

যুদ্ধ-উপদ্রুত রাজশাহীর বিস্তীর্ণ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও এক্ষেত্রে জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় সন্ত্রস্ত মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদের মনোবল ধরে রাখতে এবং তাদের সহযোগিতার হাত অব্যাহত রাখতে ওহিদুর বাহিনী উঠানবৈঠক, গ্রামবৈঠক, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখাসহ নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল। এর ফলে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আরো আস্থাবান হয়েছিল ও সেকারণে জনতার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতাও এ বাহিনী লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে ওহিদুর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য চাঁদাবাজি, লুট, নারী উৎপীড়ন ও নির্যাতনের দায়ে এ বাহিনীর বিচারকদের মাধ্যমে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। বাহিনীর বিধান মতে অপরাধী সদস্যকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী উত্তম-মধ্যম থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।[১৮৮] তাছাড়া এই বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার নিধনের প্রতিক্রিয়ায় তারা অসংখ্য গ্রাম আক্রমণ করে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন ও গণহত্যা সংঘটন করে। পাকিস্তানি সেনাদল কর্তৃক অত্র এলাকায় সংঘটিত গণহত্যার মধ্যে অন্যতম ছিল তাহেরপুর গণহত্যা, সিংড়া গণহত্যা, বান্দাইখাড়া গণহত্যা, পাকুরিয়া গণগত্যা ও আতাইকুলা গণহত্যা।[১৮৯]

মুক্তিযুদ্ধে প্রভূতভাবে অবদান রাখা ওহিদুর বাহিনীর প্রায় সাতশত সদস্য মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য এ বাহিনীর কোনো সদস্যই রাষ্ট্রীয় কোনো খেতাব বা পুরস্কার এখন পর্যন্ত পাননি। বরং নানাভাবে এ বাহিনীকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা ওহিদুর বাহিনীর কর্মকাণ্ডের রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্র

[১] *rajshahidiv.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ৬ জুন ২০২০, সন্ধ্যা ৭টা

[২] এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন: জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩২

[৩] সাক্ষাৎকার: মো. আব্দুল মজিদ মধু, পিতা: বাইনুদ্দীন সরকার, গ্রাম: উপজেলা চত্ত্বর, উপজেলা: রৌমারী, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২২ অক্টোবর ২০১৫, সকাল ১০টা

[৪] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, পিতা: মো. ইদ্রীস আলী, গ্রাম: ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ, উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৫ অক্টোবর ২০১৫, বিকাল ৫টা

[৫] *ঐ*

[৬] সাক্ষাৎকার: আবুল হাশেম, পিতা: আব্দুল হালিম সরকার, গ্রাম: কর্ত্তিমারী, উপজেলা: রৌমারী, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৮টা

[৭] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ১০

[৮] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[৯] তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৯

[১০] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[১১] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[১২] *ঐ*

[১৩] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[১৪] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[১৫] *ঐ*

[১৬] *ঐ*

[১৭] সাক্ষাৎকার: আজিজুর রহমান, পিতা: ওসমান আলী, গ্রাম: কর্ত্তিমারী, উপজেলা: রৌমারী, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৭টা

[১৮] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[১৯] মো. আজিজুল হক, 'একাত্তরের মুক্তাঞ্চল রৌমারী', বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত স্মরণিকা *একাত্তর*, রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০১১, পৃ. ১৮

[২০] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীর প্রতীক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৬টা

[২১] মো. আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[২২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ ২০১৬

[২৩] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[২৪] সাক্ষাৎকার: সোলায়মান সরকার, পিতা: আলহাজ্ব মো. বসারত আলী সরকার, গ্রাম: শঙ্কর মাধবপুর, ইউনিয়ন: কোদালকাঠি, উপজেলা: রাজিবপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২০ অক্টোবর ২০১৫, বিকাল ৩.২৫ মি.

[২৫] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত

[২৬] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

[২৭] আব্দুস সবুর ফারুকী, *বীর প্রতীক তারামন বিবির অতীত বর্তমান ও রৌমারী রাজিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, প্রকাশক, রকীবুল হাসান বিদ্যুৎ, ঢাকা, জুন ২০১১, পৃ. ৪৭

[২৮] সাক্ষাৎকার: মো. আব্দুল মজিদ মধু, প্রাগুক্ত

[২৯] সাক্ষাৎকার : আজিজুর রহমান, প্রাগুক্ত

[৩০] আব্দুস সবুর ফারুকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[৩১] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, *প্রাগুক্ত*

[৩২] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীর প্রতীক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৬টা

[৩৩] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ ২০১৬

[৩৪] সাক্ষাৎকার: আব্দুল আজিজ, পিতা: হাজী আব্দুল জব্বার, গ্রাম: সবুজবাগ, পোস্ট ও উপজেলা: রাজিবপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৪ অক্টোবর ২০১৫, সকাল ১২টা

[৩৫] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

[৩৬] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত

[৩৭] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীরপ্রতীক, *প্রাগুক্ত*

[৩৮] মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম পি এস সি, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.১৩১-১৩২

[৩৯] আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১, ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৬

[৪০] সাক্ষাৎকার: আবুল হাশেম, *প্রাগুক্ত*

[৪১] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ ২০১৬

[৪২] তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ১৪৯-৫০

[৪৩] আব্দুস সবুর ফারুকী, *বীর প্রতীক তারামন বিবির অতীত বর্তমান ও রৌমারী রাজিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, প্রকাশক, রকীবুল হাসান বিদ্যুৎ, ঢাকা, জুন ২০১১, পৃ. ৮০; *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-এগার*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩২৭-৩৪; সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত

[৪৪] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত; তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫০

[৪৫] তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

[৪৬] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত; আখতারুজ্জামান মন্ডল, *১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১২৭

[৪৭] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত

[৪৮] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত

[৪৯] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২২ মার্চ ২০১৬

[৫০] সাক্ষাৎকার: মো. আব্দুল মজিদ মধু, পিতা: বাইনুদ্দীন সরকার, প্রাগুক্ত

[৫১] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *রৌমারী রণাঙ্গন*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃ. ২২

[৫২] *ঐ*

[৫৩] আব্দুস সবুর ফারুকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৫৪] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[৫৫] *ঐ*

[৫৬] সাক্ষাৎকার: এস কে মজিদ মুকুল বীরপ্রতীক, প্রাগুক্ত

[৫৭] সাক্ষাৎকার: হাজী মো. সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত

[৫৮] লে. কর্নেল এস আই এম নূরুন্নবী খান, বীর বিক্রম (বরখাস্), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭

[৫৯] সাক্ষাৎকার: হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, প্রাগুক্ত

[৬০] তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৯৯, ১০১

[৬১] ইকতিয়ার চৌধুরী, *যুদ্ধদিনের গেরিলা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৭

[৬২] সুস্মিতা রানী দাস, 'মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় বাহিনী বা ১৪নং সেক্টরঃ একটি কেস স্টাডি-পলাশডাঙ্গা যুবশিবির', মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা), *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৩৭

[৬৩] এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫৯, ৬৬-৬৭

[৬৪] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[৬৫] *ঐ*, পৃ. ১০২

[৬৬] মাহফুজা হিলালী, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস সিরাজগঞ্জ জেলা*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৫

[৬৭] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

[৬৮] *ঐ*, পৃ. ১৪

[৬৯] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[৭০] *ঐ*, পৃ. ১০৩

[৭১] *ঐ*, পৃ. ১০৩-১০৪

[৭২] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[৭৩] *ঐ*, পৃ. ২৬-২৭

[৭৪] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

[৭৫] *ঐ*, পৃ. ১০৫

[৭৬] *ঐ*, পৃ. ১০৫

[৭৭] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭-২৩৮

[৭৮] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

[৭৯] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

[৮০] *ঐ*, পৃ. ২৪০-৪১ ও তপন কুমার দে. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

[৮১] *tarash.sirajgonj.gov.bd,* প্রবেশের তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০২০

[৮২] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

[৮৩] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

[৮৪] *ঐ*, পৃ. ১০৩

[৮৫] *ঐ*, পৃ. ১০০

[৮৬] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

[৮৭] *ঐ*, পৃ. ৩১, ৩৬

[৮৮] *ঐ*, পৃ. ৩২, ৩৫-৩৭

[৮৯] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

[৯০] *ঐ*, পৃ. ২৩৬

[৯১] মাহফুজা হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

[৯২] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

[৯৩] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[৯৪] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

[৯৫] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

[৯৬] *ঐ*, পৃ. ১৫

[৯৭] মাহফুজা হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[৯৮] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫ ও ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২,৩৫-৩৭

[৯৯] মাহফুজা হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

[১০০] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

[১০১] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[১০২] সুস্মিতা রানী দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

[১০৩] আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১, ২য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৬-৭৮
[১০৪] ইকতিয়ার চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১, ৩৬-৩৭
[১০৫] সাক্ষাৎকার: সোহরাব আলী সরকার, পিতা: রজব আলী সরকার, গ্রাম: কালিয়া হরিপুর, ইউনিয়ন: ৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: পলাশডাঙ্গা যুবশিবির কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১০টা
[১০৬] মাহফুজা হিলালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৭; তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[১০৭] *ঐ*, পৃ. ১০৭-০৮; *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৬ষ্ঠ খণ্ড*, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩১১-১৪
[১০৮] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৬ষ্ঠ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-০৯
[১০৯] *ঐ*, পৃ. ১১৮-১২০; *ঐ*, পৃ. ১০৭; *tarash.sirajgonj.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২০
[১১০] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৬ষ্ঠ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২০-২৩
[১১১] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৬ষ্ঠ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-২৬; সাক্ষাৎকার: সোহরাব আলী সরকার, *প্রাগুক্ত*
[১১২] সাক্ষাৎকার: সোহরাব আলী সরকার, *প্রাগুক্ত*
[১১৩] সাক্ষাৎকার: শেখ আব্দুর রহিম, পিতা: শেখ মোহাম্মদ আলী, গ্রাম: কালিয়া হরিপুর, ইউনিয়ন: ৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: পলাশডাঙ্গা যুবশিবির কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১২টা
[১১৪] তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯; সাক্ষাৎকার: সোহরাব আলী সরকার, *প্রাগুক্ত*
[১১৫] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় ২য় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৬৩
[১১৬] *tarash.sirajgonj.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ৯ জুলাই ২০২০
[১১৭] সাক্ষাৎকার: সোহরাব আলী সরকার, *প্রাগুক্ত*
[১১৮] *প্রথম আলো*, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯
[১১৯] *tarash.sirajgonj.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ: ৯ জুলাই ২০২০
[১২০] সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, গ্রাম: রসুলপুর, উপজেলা: আত্রাই, জেলা: নওগাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: রাজশাহী সার্কিট হাউজ, রাজশাহী, ৫ জুলাই ২০১৯, সন্ধ্যা ৭টা
[১২১] ওহিদুর রহমান, *মুক্তি সংগ্রামে আত্রাই*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ৫৫
[১২২] এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬০, ৬৬
[১২৩] আইয়ুব হোসেন, *বৃহত্তর রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১১৪-১৫
[১২৪] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
[১২৫] আইয়ুব হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭
[১২৬] সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, প্রাগুক্ত
[১২৭] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[১২৮] আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৮২
[১২৯] মিজানুর রহমান মিজান, *মুক্তিযুদ্ধে ওহিদুর বাহিনী*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, মে ২০১৮, পৃ. ৩০
[১৩০] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩
[১৩১] *ঐ*, পৃ. ৪৫
[১৩২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫তম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৫
[১৩৩] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
[১৩৪] *ঐ*, পৃ. ৫২
[১৩৫] মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৩৬ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

১৩৭ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান (অধিনায়ক,ওহিদুর বাহিনী), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, মুক্তির মোড়, নওগাঁ, ১১ জুলাই ২০১৯, সকাল ১০টা

১৩৮ *ঐ*

১৩৯ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

১৪০ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*

১৪১ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

১৪২ *ঐ*, পৃ. ৪৫

১৪৩ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*

১৪৪ *ঐ*

১৪৫ সাক্ষাৎকার: আলী খাজা এম. এ. মজিদ, গ্রাম: ঝিকরা, উপজেলা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: সার্কিট হাউজ চত্বর, রাজশাহী, ১৩ জুলাই ২০১৯, বেলা ১২টা।

১৪৬ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

১৪৭ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*

১৪৮ সাক্ষাৎকার: এমদাদুর রহমান, গ্রাম: কয়সা, উপজেলা: আত্রাই, জেলা: নওগাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শুটকিগাছা বাজার, আত্রাই, ১২ জুলাই ২০১৯, সকাল ১১টা।

১৪৯ *ঐ*

১৫০ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*

১৫১ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

১৫২ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৫৩ সাক্ষাৎকার: এমদাদুর রহমান, প্রাগুক্ত

১৫৪ *ঐ*

১৫৫ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

১৫৬ *ঐ*, পৃ. ৫৯

১৫৭ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

১৫৮ সাক্ষাৎকার: এমদাদুর রহমান, প্রাগুক্ত

১৫৯ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

১৬০ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

১৬১ *ঐ*, পৃ. ৬৫

১৬২ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

১৬৩ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৬৪ ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

১৬৫ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

১৬৬ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, প্রাগুক্ত

১৬৭ *লে জেনারেল জে এফ আর জেকব*, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা: একটি জাতির জন্ম*, ইউপিএল, ঢাকা, নবম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ১৬১, ১৬৫

১৬৮ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১৬৯ *ঐ*, পৃ. ৭৮

১৭০ সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*

১৭১ সাক্ষাৎকার: মোজাহার হোসেন, গ্রাম: দিঘা, উপজেলা: আত্রাই, জেলা: নওগাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শুটকিগাছা বাজার, আত্রাই, ১২ জুলাই ২০১৯, সকাল ১১টা; মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

১৭২ মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১

১৭৩ ঐ, পৃ. ৯২-৯৩

[১৭৪] *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *৬ষ্ঠ খণ্ড*, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৪৯-৫৩; ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

[১৭৫] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[১৭৬] মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[১৭৭] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[১৭৮] সাক্ষাৎকার: মোজাহার হোসেন, *প্রাগুক্ত*; সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম স্বপন, গ্রাম: নানসর, উপজেলা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ভবানীগঞ্জ বাজার, বাগমারা, রাজশাহী, ১৩ জুলাই ২০১৯, বিকাল ৪টা।

[১৭৯] সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম স্বপন, প্রাগুক্ত

[১৮০] মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭

[১৮১] ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[১৮২] *ঐ*, পৃ. ৬৯-৭০, ৭৪-৭৫

[১৮৩] সাক্ষাৎকার: মোজাহার হোসেন, প্রাগুক্ত

[১৮৪] সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম স্বপন, প্রাগুক্ত; তালিকাভুক্ত নন এমন মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দেখতে দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-৫৬

[১৮৫] সাক্ষাৎকার: ওহিদুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: রাজশাহী সার্কিট হাউজ, রাজশাহী, ৫ জুলাই ২০১৯, সন্ধ্যা ৭টা

[১৮৬] সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম স্বপন, প্রাগুক্ত

[১৮৭] সাক্ষাৎকার: মোজাহার হোসেন, প্রাগুক্ত

[১৮৮] মিজানুর রহমান মিজান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১২

[১৮৯] *ঐ*, পৃ. ৭৯-৮০

চতুর্থ অধ্যায়

আঞ্চলিক বাহিনী : খুলনা বিভাগ (যুদ্ধকালীন)

খুলনা বাংলাদেশের বর্তমান আটটি বিভাগের অন্যতম একটি বিভাগ। ব্রিটিশ আমলে ১৮৮২ সালে খুলনা জেলার পত্তন হয়।[১] জেলা হওয়ার পর থেকে খুলনা রাজশাহী বিভাগের অধীন ছিল। ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে খুলনা জেলা রাজশাহী বিভাগের অধীনই থেকে যায়। এরপর প্রশাসনিক প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিভাগের খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা এবং তৎকালীন ঢাকা বিভাগভুক্ত বরিশাল জেলা কর্তন করে খুলনা বিভাগ গঠন করে।[২] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খুলনা বিভাগের অধীন পাঁচটি জেলা (খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী) ছিল।[৩]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাদল গণহত্যা শুরু করলে তৎকালীন খুলনা বিভাগের প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে যে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিল, খুলনা বিভাগভুক্ত এলাকাসমূহ (পুরোপুরি বা আংশিকভাবে) তার মধ্যে ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টরভুক্ত হয়। ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টরভুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনী ও যথাযথ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় ভারতে প্রশিক্ষিত ও আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা দল ছাড়াও তৎকালীন খুলনা বিভাগের যশোর জেলার মাগুরা মহকুমায় 'আকবর বাহিনী'; খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় 'রফিক বাহিনী', সুন্দরবন এলাকায় (খুলনার বাগেরহাট মহকুমাধীন) 'জিয়া বাহিনী' ও বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমায় 'সিদ্দিক বাহিনী' নামে চারটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধে আলোচ্য বাহিনীসমূহের কর্মকাণ্ড নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

আকবর বাহিনী

মাগুরা

মুক্তিযুদ্ধকালে যশোর জেলাধীন মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানায় সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠিত হয়। এই মুক্তিযোদ্ধা দল বা বাহিনী আকবর বাহিনী বা 'শ্রীপুর বাহিনী'[৪] নামের পরিচিতি অর্জন করে।

আকবর বাহিনী (এরপর থেকে এই নামেই লেখা হবে) প্রধান আকবর হোসেন মিয়ার জন্ম তৎকালীন মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানাধীন খামার পাড়ার অন্তর্গত টুপিপাড়া গ্রামে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কুমার নদী। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের (১৯২৭ ইং) ২৫ কার্তিক গোলাম কাদের মিয়া ও মা মোছা. নাবেজান বিবির সংসারে তার আগমন। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় খামার পাড়া মক্তবে। এরপর খামার পাড়া বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ও শ্রীপুর মহেশচন্দ্র পাইলট হাইস্কুল থেকে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা।

আকবর হোসেন মিয়ার পেশাজীবন শুরু হয় ১৯৫১ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কর্পোরাল গ্রাউন্ড কমব্যাট ইন্সট্রাক্টর (জি সি আই) হিসেবে। তার চাকরির প্রথম পোস্টিং ছিল সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে। সব ক্ষেত্রেই বাঙালির ওপর শোষণ, নির্যাতন, বাঙালি সৈনিকদের অবজ্ঞার চোখে দেখা, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের অশ্রাব্য গালিগালাজ, প্রভৃতির কারণে তিনি ১৯৫৪ সালের ৮ আগস্ট চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন।[৫] [আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭]

হাইস্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় আকবর হোসেন 'বাংলা ভাগ' প্রত্যক্ষ করেন। কৈশোরে পাকিস্তানের পক্ষে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান', স্লোগান তোলা আকবর হোসেন ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আবার মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেন। এসময় মাগুরা মহকুমার শ্রীপুরে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এর দাবিতে ছাত্রদের যে মিছিল হয় সে মিছিলে নেতৃত্ব দেন আকবর হোসেন।[৬]

১৯৫৪ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চাকরি ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসার সময় আকবর হোসেন প্রত্যক্ষ করেন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ঘিরে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আকর্ষণে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৫ সালে শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহকুমা আওয়ামী লীগের ৩ নং সহ-সভাপতি হন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

আকবর হোসেন ১৯৬৫ সালে শ্রীপুর থানার ৩নং শ্রীকোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে আওয়ামী মনোনীত ৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র তিনিই জয়লাভ করেছিলেন। এরপর টানা ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ২০15 সালের ২ মে তিনি পরলোক গমন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় জনপ্রিয় চেয়ারম্যান আকবর হোসেনের নেতৃত্বে শ্রীপুর থানায় একটি আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের দেশে অবস্থান করে তিনি শ্রীপুর থানাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

যুদ্ধকালে জনসাধারণ ও শত্রু পক্ষের নিকট এই বাহিনী আকবর বাহিনী এবং বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ৮ ও ৯ নং সেক্টর কমান্ডের দাপ্তরিক কাগজপত্রে 'শ্রীপুর বাহিনী' নামে পরিচিতি পায়।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

মাগুরা জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করে ১৯৮৪ সালে এর পূর্বে মাগুরা বৃহত্তর যশোর জেলার একটি মহকুমা ছিল। যশোর ১৭৮৬ সালে জেলার মর্যাদা পায়।[৭] আর মাগুরা যশোর জেলার অধীন মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৮৪৫ সালে।[৮] তারপর থেকে ১৯৮৪ সাল থেকে প্রায় ১৪০ বছর মাগুরা মহকুমা হিসেবে থেকে যায়। মাগুরার উত্তরে রাজবাড়ী ও ঝিনাইদহ জেলা, দক্ষিণে যশোর ও নড়াইল জেলা, পূর্বে মধুমতি ও ফরিদপুর জেলা, পশ্চিমে ঝিনাইদহ ও যশোর জেলা অবস্থিত।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মাগুরার মো. সোহরাব হোসেন যশোর-৬ আসন থেকে এম এন এ নির্বাচিত হন।[৯] আর যশোর-১০ ও যশোর-১১ আসন থেকে মাগুরার আওয়ামী লীগ নেতা মো. আছাদুজ্জামান ও সৈয়দ আতর আলী এম পি এ নির্বাচিত হন।[১০] মাগুরার মতো সারাদেশেই আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু ১ মার্চ আকস্মিকভাবে তিনি উক্ত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে মাগুরার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ২ ও ৩ মার্চ মাগুরাতে হরতাল পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর ৮ মার্চ মাগুরা মহকুমায় সর্বদলীয় মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন অ্যাডভোকেট মো. সোহরাব হোসেন এমএনএ ও সৈয়দ আতর আলী এমপিএ। অ্যাডভোকেট মো. আছাদুজ্জামান এমপিএ-কে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং মাগুরা মহকুমার এসডিও ওয়ালিউল ইসলামকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।[১১] এছাড়া সংগ্রাম কমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন নাসিরুল ইসলাম, বেবী সিদ্দিকী, আকবর হোসেন মিয়া, সৈয়দ তৈয়বুর রহমান, সৈয়দ মাহবুবুল হক, খন্দকার আব্দুল মাজেদ, আ. জলিল সর্দার, আ. হাফিজ মাস্টার, আবুল ফাত্তাহ, কাজী ইউসুফ আলী, মোল্লা নবুয়ত আলী, কাজী ফয়েজুর রহমান মিয়া, গোলাম মোস্তফা, গোলাম ইয়াকুব, রোস্তম আলী, আলাউদ্দিন আহমদ, আবু বকর, শাহাদত হোসেন, মোশারফ হোসেন, আব্দুর রশীদ বিশ্বাস, নজরুল ইসলাম, বাণী মিয়া, লুৎফর রহমান শিকদার, আইয়ুব হোসেন, সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম, খোন্দকার রওদাক আলী প্রমুখ।[১২] এরপর মাগুরা মহকুমার অন্যান্য থানায়ও সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৮ মার্চ শ্রীপুর থানাধীন ৩নং শ্রীকোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকবর হোসেন মিয়া এক গোপন সভার আয়োজন করেন। সেখানে স্থানীয় জনগণ, প্রাক্তন ও ছুটিতে থাকা ইবি আর, ইপিআর পুলিশ ও আনসারদের সমন্বয়ে কীভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সশস্ত্র উপায়ে প্রতিরোধ করা যায় তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।[১৩]

২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্রী দিবসে মাগুরা পুলিশ লাইনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন উপস্থিত জনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বাজায়। ২৪ মার্চ যশোরের রাস্তায়-রাস্তায় আন্দোলনরত জনতা ব্যারিকেড সৃষ্টি করলে মাগুরার জনগণও প্রতিরোধমুখি হয়ে ওঠেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যা শুরু করার খবর মাগুরায় পৌঁছলে শুরু হয় প্রতিরোধ কার্যক্রম। মাগুরা মহকুমা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে মাগুরার প্রবেশ পথগুলোতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীপুরে সংগ্রাম কমিটির হরিন্দির শাহাদত আলী, জোকার আলাউদ্দিন, গোয়ালগাড়ার আবু বকর, টুপিপাড়ার আবুল হোসেন মিয়া, খামার পাড়ার খন্দকার আবু হাসান, মিয়া সিরাজুল ইসলাম, ম. হোগলডাঙ্গার নাসিরসহ মাগুরার মুক্তিকামী জনতা

মাগুরার প্রবেশপথগুলো যেমন, সীমাখালী, আলমখালী, বিষয়খালী, কামারখালী, লেবুতলা, লাঙ্গলবাঁধ ইত্যাদি স্থানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই কাজে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা সহযোগিতা করেন।[১৪] প্রতিরোধ পর্বে মাগুরার মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট তেমন কোনো উন্নত অস্ত্র ছিল না। দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট মাগুরার মহকুমা ট্রেজারি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র ছিল।[১৫]

এসময় মাগুরা মহকুমার সংগ্রাম কমিটির তত্ত্বাবধানে ও শ্রীপুরের ৩নং শ্রীকোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আকবর হোসেন মিয়ার পরিচালনায় মাগুরা আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়। এই উদ্যোগে আকবর হোসেনের সাথে ছিলেন হরিন্দির শাহাদত আলী, সুধীর কুমার, শ্রীপুরের মুকুল (যুদ্ধে শহিদ) জোকার আলাউদ্দিন, গোয়াল পাড়ার আবু বকর, টুপিপাড়ার আবুল হোসেন মিয়া, খামার পাড়ার খন্দকার আবু হাসান, সিরাজুল ইসলাম, হোগল ডাঙ্গার নাছিরসহ আরো অনেকে।[১৬] এই ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ছাত্র-যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে পুলিশ, হাবিলদার শাহজাহান, হারেছার রশীদ (যুদ্ধে শহিদ) ও আব্দুল মান্নান ছিলেন এবং সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন আকবর হোসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শ্রীপুর কলেজের ছাত্র।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা ও প্রতিরোধ কর্মে ব্যস্ত যোদ্ধাদের জন্য এসময় স্থানীয় জনসাধারণ চাল, ডাল, চিড়ে, মুড়ি, রুটি, ডাব, নারকেল, তরকারি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করত। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর এসব শহর থেকে মানুষ গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করে। এ সময় গ্রামমুখী ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটা অসহায় মানুষের সহযোগিতার জন্য খামার পাড়া, কাজলী, সাচিলাপুর বাজারে সাহায্য শিবির খোলা হয় ও তাদের মাঝে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দেয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য সামগ্রী বিলিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আকবর হোসেনের পরিকল্পনায় মাগুরা শহরে ঢাল, সড়কি নিয়ে মিছিল করা হয়।

এদিকে ৩০ মার্চ এতদ্অঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি সেনাদলের সাথে কুষ্টিয়াতে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা ইপিআর মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহের পুলিশ, ইপিআর ও আনসার সদস্যরা যুক্ত হন। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা পরাজিত হয় ও মুক্তিবাহিনী ও অনেকে হতাহত হয়।[১৭] এ ঘটনার পর মাগুরার মহকুমা সংগ্রাম কমিটির অধিকাংশ নেতা ভারতে চলে যান। নেতৃবৃন্দের ভারত গমন মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতাকে হতাশ করে। কিন্তু আকরব হোসেন নোমানী ময়দান সংলগ্ন আনসার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রাখেন।[১৮]

এদিকে মাগুরা প্রতিরোধদের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে গেল। মাগুরা-কামারখালী, মাগুরা-বিষখালী, মাগুরা-লাঙ্গলবাঁধ প্রভৃতি রুটে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাগুরা শহর জনশূন্য হতে শুরু করে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষে মাগুরা আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্থগিত করে আকবর হোসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রীপুরে চলে যান।[১৯]

২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনা বিনা বাধায় ঝিনাইদহ থেকে মাগুরায় প্রবেশ করে । ২৪ এপ্রিল তারা মাগুরা নতুন বাজারসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড ও অগ্নি সংযোগ করে। এছাড়া তারা শহরে অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি, দোকানপাট লুট করে এবং অন্যদেরকে লুটপাট চালাতে প্ররোচিত করে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ও কর্মীবৃন্দের অনেকেই শ্রীপুর থানায় আশ্রয় নেন। এ পরিস্থিতিতে আকবর হোসেন ও তার সঙ্গীরা দেশে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দল

গঠন করতে সচেষ্ট হন। এই কাজে আকবর হোসেনকে সহযোগিতা করেন শ্রীপুরের ন্যাপ নেতা কাজী ফয়জুর রহমান, আঠারোখাদা গ্রামের কাজী ইউসুফ আলী, শাহাবউদ্দিন প্রমুখ।[২০]

সংগঠন

মাগুরা আনসার ক্যাম্প থেকে আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে শ্রীপুর থানার জোয়ারদার আব্দুর রহিম, বরিশাটের মোল্লা নবুয়ত আলী, জাকির হোসেন, কাজলীর মোল্লা মতিয়ার রহমান ও নুরুল ইসলাম শ্রীপুরে চলে আসেন। শ্রীপুর হাই স্কুলে আকবর হোসেনের নেতৃত্বে পুনরায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এসময় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অস্ত্র ছিল ৬টি ৩০৩ রাইফেল, ১টি চায়নিজ রাইফেল ও কিছু গুলি। এই নিয়েই যাত্রা শুরু করে আকবর বাহিনী বা শ্রীপুর বাহিনী।[২১] শ্রীপুর হাই স্কুলে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প গঠিত হওয়ার সংবাদ শ্রীপুরসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স, আনসার এর অবসরপ্রাপ্ত বা ছুটিতে থাকা বা পক্ষত্যাগকারী সদস্যদের অনেকে আকবর বাহিনীতে যোগ দেন। এছাড়া স্থানীয় ছাত্র-যুবকগণও আকবর বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন।[২২]

শ্রীপুর হাই স্কুলের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কৌশলগত কারণে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খালিয়া খড়িচাইল গ্রামে। খালিয়া-খড়িচাইল শ্রীপুর থানার বড়বিলার পশ্চিম পাড়ের নিভৃত দ্বীপসম গ্রাম। এই গ্রামের চারিদিকে জলাশয় থাকায় ক্যাম্পের নিরাপত্তা ঝুঁকি তুলনামূলক কম ছিল। মূলত এই ক্যাম্পকে কেন্দ্র করেই আকবর বাহিনীর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হত। বলা যেতে পারে যে, খালিয়া-খড়িচাইল ক্যাম্পই ছিল আকবর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। তবে নিরাপত্তার জন্য বাহিনী প্রধানসহ মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন।

মুক্তিবাহিনী গঠনের কিছুদিনের মধ্যে (মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত) এ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ জনে। আর এই বাহিনীর অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ২৪টি। ডিসেম্বর পর্যন্ত এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পৌঁছায় প্রায় ২০০০ এ। এর মধ্যে ১২৭ জন ছিলেন ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্য যারা আকবর বাহিনীতে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় ২০০ জন ছিলেন ভারতে প্রশিক্ষিত এফ এফ যোদ্ধা, প্রায় ৩০০ জন ছিলেন মুজিব বাহিনীর যোদ্ধা, আর বাকি সদস্যরা ছিলেন আকবর বাহিনীর নিজস্ব যোদ্ধা ও সহযোগী।[২৩] আকবর বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন আকবর হোসেন মিয়া ও উপ-অধিনায়ক ছিলেন শ্রীপুরের বরিশাট নিবাসী মোল্লা নবুয়ত আলী। শ্রীপুরকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে ভাগ করে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। শ্রীপুর পশ্চিম অঞ্চলের সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন আকবর হোসেন ও শ্রীপুর পূর্ব অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করতেন মোল্লা নবুয়ত আলী।[২৪] শ্রীপুর পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো হলো লাঙ্গলবাঁধ, গোয়ালপাড়া, আলফাপুর, আবাইপুর, টুপিপাড়া প্রভৃতি। এসব এলাকয় আকবর হোসেনের সাথে কোম্পানি কমান্ডার আনারুপি (পূর্ব শ্রীকোল), আব্দুল ওহাব (টুপিপাড়া), আশরাউদ্দিন আহমদ, আব্দুল খালেক (মধুপুর), সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক (কাশিয়ানী), আব্দুল মালেক (আমতৈল), আব্দুল কালাম (ঘাসিয়ারা), হারেজউদ্দিন খান (বগুড়া), আফজাল হোসেন, মনোয়ার হোসেন (বগুড়া), ইদ্রিস আলী (পূর্ব শ্রীকোল), ওলিয়ার মৃধা (খাসারপড়া) প্রমুখ ছিলেন। আর শ্রীপুর পূর্ব অঞ্চলের কমান্ডভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল শ্রীপুর, কাজলী, বরিশাট, নাকোল, রাধানগর, দারিয়াপুর, জঙ্গল ইউনিয়ন (ফরিদাপুর) ও রাজবাড়ি এলাকার কিয়দংশ। এসব স্থানে মোল্লা নবুয়ত আলীর সহযোগী হিসেবে কোম্পানি কমান্ডার আলম (বেলনগর), মাকু মিয়া, আব্দুল মান্নান, আব্দুল আজিজ, মোশারফ (মসজা), মনিরুল ইসলাম, মনোয়ার হোসেন (নহাটা) আকরাম হোসেন, আব্দুল মান্নান (রাইনগর), হাফিজার রহমান (বিষ্ণুপুর), সুলতান আহমদ (বিষ্ণুপুর), নওশের আলী (দারিয়াপুর) প্রমুখ

ছিলেন।[২৫] যুদ্ধের কৌশলগত প্রয়োজনে বা শক্তি সামর্থ্যের বিবেচনায় মাঝে মাঝেই আকবর হোসেন ও নবুয়ত মোল্লার নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাবৃন্দ একত্রে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন। আবার কখনো কখনো অধিনায়ক ও উপ অধিনায়কের নিয়ন্ত্রণাধীন কমান্ডারদের কাউকে কাউকে বদলি করে বাহিনী পুনর্গঠন করে যুদ্ধ করা হত।[২৬] এছাড়া ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা এফএফ কমান্ডার, মুজিব বাহিনীর কমান্ডার ও যোদ্ধাদেরকে অধিনায়ক ও উপ-অধিনায়কের কমান্ডে রেখে সংগঠন চালানো হতো।[২৭]

আকবর বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন সুবেদার আব্দুল ওহাব। এক্ষেত্রে বাহিনীর সদস্যদের জন্য সামরিক বাহিনীর অনুরূপ সামরিক আইন ও বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতো। বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব রাখা হতো ও সদস্যদের ওপর নজরদারি করা হতো।[২৮] বাহিনীর সদস্যদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা এবং বাহিনীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য খামার পাড়ার ওলিয়ার রহমান এবং কাশিয়ানির আব্দুল রাজ্জাক নান্নু মিয়ার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আকবর বাহিনীর একটি গুপ্তচর দল ছিল। এই দলের কাজ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের সহযোগিদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। এই দলের কয়েকজনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদের চিহ্নিতকরণ, তথ্য বিনিময় ও সহজ যোগাযোগের জন্য কতক গোপন কোডের ব্যবহার শেখানো হয়। এই দলের সদস্যগণ তথ্য আহরণ ও রেকিকরণ উভয় কাজই করতেন। এই দলের সদস্যগণ বিভিন্ন বয়সের ছিলেন। ছোটদের মধ্যে কাছেরুজ্জামান, ঝন্টু-১, ঝন্টু-২ ও জিল্লু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর বয়স্কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আব্দুস সামাদ, আ. ওহাব জোয়ারদার ওরফে বাঁশি মিয়া। এই দলের সদস্যরা তথ্য সংগ্রহ বা রেকির প্রয়োজনে বিভিন্ন রকম সাজ যেমন হাটুরে কৃষক, ফেরিওয়ালা, রাখাল, পাগল প্রভৃতি গ্রহণ করতেন।[২৯]

আকবর বাহিনীর যোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় হাতুরে ডাক্তার (কোয়াক) জনাব হায়াত, ডাক্তার আব্দুল হাই ও ডাক্তার হাশেম আলী গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি তারা প্রায়ই বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করতেন। এদের মধ্যে ডাক্তার আব্দুল হাই নবুয়ত আলীর সাথে ও ডাক্তার হায়াত এবং হাশেম আলী আকবর হোসেনের সাথে থাকতেন। তারা প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অভিযানে ওষুধপত্র ও হালকা যন্ত্রপাতিসহ অংশ নিতেন।[৩০] সামরিক অভিযানের প্রয়োজনে আকবর বাহিনীর সদস্যরা সাধারণত হাটা পথ ব্যবহার করতেন। তবে বর্ষাকালে তারা বাইচের নৌকা ব্যবহার করতেন।

আকবর বাহিনী সামরিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শ্রীপুর মুক্তাঞ্চল পরিচালনা ও বাহিনী পরিচালনার স্বার্থে বেসামরিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করে। শ্রীপুর মুক্তাঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য হরিন্দি গ্রামের আকরাম হোসেনকে (পুলিশের প্রাক্তন এসআই) শ্রীপুর থানার ওসি নিয়োগ দেওয়া হয়। এসময় কারো কোনো অভিযোগ থাকলে থানায় তা মীমাংসা করা হতো। যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে যেমন- হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি না হয়, তার জন্য পেট্রল ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়। সশস্ত্র অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা এই দায়িত্ব পালন করেন। কোনো নারী যাতে লাঞ্ছিত না হয় সে ব্যাপারে বাহিনী প্রধানের কড়া নির্দেশ ছিল। অপরাধী যেই হোক তাকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেওয়া ছিল। আকবর বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা, সততা সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কি না এ ব্যাপারে বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন মিয়া সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি প্রত্যেক সদস্যকে পরীক্ষা করে দেখতেন যে, কারো কাছে কোনো লুণ্ঠিত সামগ্রী আছে কি না। কারো কাছে এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো।[৩১]

আকবর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দু-মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান বিশেষ করে চোর-ডাকাতদের হাত থেকে নিরীহ গ্রামবাসীকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এ বাহিনীর সদস্যরা গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন সফলতা আনতে না পারলেও পরবর্তীকালে তারা চোর-ডাকাতদের দমন করে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। হিন্দুদের ঘরবাড়ি যাতে কেউ ভেঙ্গে নিয়ে না যায় সে ব্যাপারে এ বাহিনী পর্যায়ক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করে। বাহিনী পরিচালনার স্বার্থে আকবর হোসেন বাহিনীর সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য টুপিপাড়ার আবুল হোসেন (বি.কম) এবং মোহাম্মদপুরের খালিয়া গ্রামের হাফিজ মাস্টারকে দায়িত্ব দেন। বাহিনীর আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক দেশপ্রেমিক ব্যক্তির নিকট থেকে বাহিনী গঠনের শুরুর দিকে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফরিদপুরের অলংকারপুর গ্রামের সৈয়দ আলী মেম্বার (৩০০০ টাকা), তখলপুরের কাজী ফয়জুর রহমান (১০০০ টাকা), দরিয়াপুরের ইন্তাজ আলী (৩০০০ টাকা) এছাড়া সোহরাব হোসেন, আমিন হোসেন, ইছরাইল হোসেন, রুহুল বিশ্বাস, বদরুজ্জামান, আছিরউদ্দিন প্রমুখ এই বাহিনীকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন।[৩২] বাহিনী পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেলে শ্রীপুর ও পার্শ্ববর্তী হাট বাজার থেকে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। হাট বাজারের ইজারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন সুজায়েত খন্দকার। তাছাড়া শরণার্থী হিসেবে ভারতে যাওয়া হিন্দু পরিবারগুলোর ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত ফসলের অংশবিশেষ বিক্রয় করেও বাহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়।[৩৩]

বাহিনীর সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হয় বাহিনীর নিজস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য। আগস্ট মাস থেকে বাহিনীর নিজস্ব সদস্যদের প্রত্যেককে মাসিক বেতন বাবদ ৪০ টাকা প্রদান করা হতো। বেতনের পাশাপাশি তাদেরকে পোশাক প্রদান করা হতো।[৩৪] আর বাহিনীতে থাকা ভারত ফেরত প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের মাসিক ১৫০ টাকা বেতন-ভাতা প্রদান করা হতো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে। তবে ভারত ফেরত প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের ভাতা প্রদান করলেও, বাহিনী পরিচালনা বা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন-ভাতা বাবদ আকবর বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে কোনো অর্থ পায়নি।[৩৫] বাহিনীর নিজস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বাহিনীর নিজস্ব তহবিল হতেই প্রদান করা হতো।

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

মাগুরা মহকুমা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর মাগুরার নোমানী মাঠ সংলগ্ন আনসার ক্যাম্প মাঠে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ছাত্র-যুবক ও অন্যান্য পেশাজীবীদেরকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। এসময় মাগুরা ট্রেজারি থেকে দখল করা অস্ত্র ছিল এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান উৎস। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন শ্রীপুর থানার শ্রীকোল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আকবর হোসেন মিয়া। কিন্তু এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মাগুরা থেকে শ্রীপুর ফিরে আকবর হোসেন শ্রীপুর হাই স্কুলে নতুন একটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন।[৩৬] এরপর ১৫ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শ্রীপুর প্রবেশ করলে শ্রীপুর হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অল্প কিছুদিনের জন্য বিঘ্নিত হয়। প্রশিক্ষণের জন্য উল্লিখিত স্থানসমূহ বাদে আকবর বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল শ্রীপুরের খাড়িয়া-খড়িচাইল, খামারপাড়ার কাঠালবাগান, টুপিপাড়া, দাইরপোল ছাচিলাপুর, দারিয়াপুর কাদির পাড়া, রাধানগর, করুনদি, নাকোল, নহাটা, বরিশাট, সদালপুরের পালপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। প্রকৃতপক্ষে এই বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ যখন যে এলাকায় অবস্থান করতেন, সেখানেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতেন।[৩৭]

আকবর বাহিনীতে শুরু থেকেই ছাত্র-যুবকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। পাশাপাশি মাগুরা বা পার্শ্ববর্তী এলাকার ইবিআর, ইপিআর, আনসার, পুলিশ (অবসরপ্রাপ্ত বা পাকিস্তানি পক্ষত্যাগকারী) সদস্য এই বাহিনীতে যোগ দিতে থাকেন। এই বাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আকবর হোসেন মিয়া, আব্দুল মান্নান, হাবিলদার শাহজাহান, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওহাব, আনোয়ার হোসেন, ইদ্রিস প্রমুখ। প্রশিক্ষণার্থীদের অস্ত্রচালনা, শরীর চর্চার পাশাপাশি কয়েখজনকে রেকি ও গ্রেনেড চালনার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই বাহিনীর নিকট থেকে কমপক্ষে পাঁচশ মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।[৩৮] প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ সনদ দেওয়া হয়।

আকবর বাহিনীর সূচনা হয় মাত্র ৬টি ৩০৩ রাইফেল, ১টি চায়নিজ রাইফেল ও ১টা অয়ারলেস সেট নিয়ে[৩৯] মাগুরা আনসার ক্যাম্প থেকে শ্রীপুর চলে আসার সময় তারা কোনো অস্ত্র আনতে পারেন নি। শ্রীপুরের খালিয়া-খড়িচাইল ক্যাম্পে অবস্থান করেই স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাকাতদের নিকট থেকে বেশ কিছু রাইফেল উদ্ধার করেন। মে মাসের শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীর অস্ত্রের সংখ্যা হয় ২৪টি।[৪০] এরপর জুন মাস থেকে আকবর বাহিনী শ্রীপুর, শৈলকুপা, পাংশা, ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে থানা দখল, শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ করে বহু অস্ত্র লাভ করে। এছাড়া, পাকিস্তানি সেনাদল ও রাজাকারদের ক্যাম্প আক্রমণ করেও অনেক অস্ত্র পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বাহিনীর অস্ত্রের প্রধান উৎসই ছিল এর শত্রুর অস্ত্রভান্ডার। পাশাপাশি আকবর বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ আগস্ট মাস হতে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে কিছু এসএমজি, রাইফেল, গ্রেনেড ও ব্রিজ বিধ্বংসী এক্সপ্লোসিভ পেতে শুরু করে।[৪১] আকবর বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সেক্টর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তার পাঠানো অস্ত্রচাহিদার উত্তরে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার এম এ মঞ্জুরের পক্ষে ২৭ অক্টোবর তারিখে মেজর এমএন হুদা নিম্নোক্ত অস্ত্রশস্ত্র আকবর বাহিনীর জন্য প্রেরণ করেন।[৪২]

৩০৩ রাইফেলের গুলি	২৫০০ টি
এস এম আর গুলি	৩০৫ টি
মাইন এম ১৬	৪ টি
এ/টিকে	৪ টি
বুকলেট	২ টি

তাছাড়া ভারতে প্রশিক্ষিত যেসব মুক্তিযোদ্ধা (এফ এফ ও মুজিব বাহিনী) অস্ত্রসহ আকবর বাহিনীতে যুক্ত হতেন, তাদের অস্ত্রও এ বাহিনীর অস্ত্রভান্ডার বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। এ বাহিনীর অস্ত্রভান্ডারে ছিল এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, টোটোবর ও চায়নিজ রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল, টুইস মর্টার, গ্রেনেড, মাইন, ঢাল, সড়কি, রামদা প্রভৃতি।

আওতাভুক্ত এলাকা

আকবর বাহিনীর সূচনা হয় তৎকালীন মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানাকে কেন্দ্র করে। মাগুরা সে সময় ৮ নং সেক্টরভুক্ত যুদ্ধাঞ্চল ছিল। মাগুরা ছাড়াও ৮ নং সেক্টরভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলগুলো ছিল তদানীন্তন কুষ্টিয়া জেলা, যশোর জেলা, খুলনা জেলার সদর, সাতক্ষীরা মহকুমা ও ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশ। আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধকালে ৮ নং সেক্টরভুক্ত ঝিনাইদহের শৈলকুপা, রাজবাড়ির পাংশা ও গোয়ালন্দ, ফরিদপুরের মধুখালী এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। বাহিনীর অধিনায়কের দাবি অনুযায়ী ঝিনাইদহের “গাড়াগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত” ছিল এ বাহিনীর কর্মতৎপরতা।[৪৩] উল্লিখিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে মাগুরার শ্রীপুর অঞ্চল ছিল মুক্তাঞ্চল। তবে রোজা চলাকালে কিছু দিনের

জন্যে শ্রীপুর হাই স্কুলে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প চালু হয়েছিল। ঐ দিনগুলো বাদে আর বাকি সময়ে শ্রীপুর মুক্ত এলাকা ছিল।[৪৪]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে তথা প্রতিরোধ পর্বে আকরব বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ পাকিস্তানি সেনাদলের যাতায়াত পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। এ সময় মাগুরা হতে লাঙ্গলবাঁধ, দোরান নগর, ওয়াপদা ক্যানেলের অনেকগুলো স্থান এবং মাগুরা-শ্রীপুর রাস্তার অনেক স্থান কেটে বা

খুঁড়ে যোগযোগ ব্যবস্থা চলার অনুপযোগী করে তেলো হয়। এছাড়া, শ্রীপুরের প্রবেশ মুখগুলোতে সর্বক্ষণ নজরদারি স্থাপন করা হয় যাতে পাকিস্তানি সৈন্যদল বা রাজাকার দলের গতিবিধি জানা যায়। মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো এবং তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি করা।

মুক্তিযুদ্ধকালে আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধ উভয় কৌশলই অবলম্বন করেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে "আঘাত কর এবং সরে পড়' তথা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়। কারণ আকবর বাহিনীর উদ্দেশ্যই ছিল শত্রুপক্ষকে বিক্ষিপ্ত আক্রমণের মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং স্থিরভাবে সংগঠিত হতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ শত্রুপক্ষকে একই দিনে একাধিক স্থানে আঘাত করেছে। এর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের মনে এই ধারণার জন্ম দেওয়া যে, মুক্তিবাহিনী সব জায়গায় সর্বক্ষণ সক্রিয় আছে। আলোচ্য নীতির ফলে সহজে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা সহজ হয়।

গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। যেমন শৈলকুপা থানা আক্রমণ, ইছাখান্দা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ প্রভৃতি। আকবর বাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১২৭ জন ইবিআর, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য থাকার সুবাদে সম্মুখ যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল।[৪৫]

মুক্তিযুদ্ধকালে আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ প্রায় প্রতি দিনই বিভিন্ন ধরনের অভিযানে ব্যস্ত থাকতেন।[৪৬] দুষ্কৃতকারী, ডাকাত ও লুটেরা প্রতিরোধের পাশাপাশি আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ কমপক্ষে ২৫টি যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শৈলকুপা থানা অভিযান[৪৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৬ আগস্ট রাত ১. ৩০ মিনিট।

অভিযানের উদ্দেশ্য: শৈলকুপা থানা তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমাধীন থানা ও এর অবস্থান শ্রীপুর থানার পশ্চিমে। এই থানা অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। এই অবস্থানে হানা দিয়ে শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন ও তাদের মধ্যে ভীতিসঞ্চার করা ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আকবর মিয়ার নেতৃত্বে কামরুজ্জামান, আলম, হাবিলদার জালাল, আব্দুল মালেক, খোকন, মুশারফ সিরাজ, নবুয়ত আলী ও স্থানীয় কিছু মুক্তিযোদ্ধসহ প্রায় অর্ধশত মুক্তিযোদ্ধা এই অভিযানে অংশ নেন। তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টির অধিক রাইফেল, ৩টি চায়নিজ রাইফেল, বেশ কিছু গোলা বারুদ ও কিছু গ্রেনেড।

অভিযানের বিবরণ: শৈলকুপা থানা একই রাতে পরপর দু'বার আক্রমণ করা হয়। প্রথমবার কমান্ডার আলমের নেতৃত্বে থানায় আক্রমণ করা হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষের তেমন ক্ষয়ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। এই অভিযানে শুধু একজন বিহারী সাব-রেজিস্ট্রার নিহত হয়। তারপর শত্রুপক্ষের প্রতিরোধের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসেন। এ অবস্থায় আকবর হোসেনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় থানা আক্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারের অতর্কিত আক্রমণের ফলে প্রস্তুতিহীন পুলিশ ও রাজাকারগণ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

ফলাফল: শত্রুপক্ষের ১১ জন রাজাকার, ১৫ জন পুলিশ, ২ জন দারোগা, ১জন সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ), শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোবারক মোল্লা ও তার সঙ্গীরা ধরা পড়েন। এছাড়া ক্যাম্প

থেকে ৫৭ টি রাইফেল ও ৪ হাজার গুলি পাওয়া যায়। মুক্তিবাহিনীর তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। শুধু মুক্তিযোদ্ধা আলমের হাতে গুলি লাগে।

শ্রীপুর থানা অভিযান[৪৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২১ আগস্ট ভোর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: শ্রীপুর থানা পুলিশ আকবর বাহিনীর সাথে একটি অনাক্রমণ চুক্তি মোতাবেক অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করবে না ও একে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু শ্রীপুর থানার ওসি মতিয়ার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মাগুরায় থাকা পাকিস্তানি পুলিশ ইন্সপেক্টর ও যশোরে থাকা পুলিশের এসপি ও ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারকে চিঠি লেখেন যে, "চেয়ারম্যান আকবর হোসেন ও মোল্লা নবুয়ত আলীর নেতৃত্বে স্থানীয় একটি দুষ্কৃতকারী দল গঠিত হয়েছে। তারা খাড়িয়া খড়িচাইল ক্যাম্প করে থাকে। আমাদের শক্তির চাইতে তাদের শক্তি অনেক বেশি। তাদেরকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করা সম্ভব।" এই চিঠি উদ্ধার করার পর ওসি মতিয়ার ও থানার পুলিশদেরকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত অভিযান।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: এই অভিযানে আকবর বাহিনীর মোল্লা নবুয়ত আলী, নাজায়েত আলী, গোলাম মোস্তফা, আবু হাসান, আবু হোসেন, জহুরুল হক চৌধুরী, আব্দুল খালেক, তোফাজ্জেল প্রমুখসহ কমান্ডার নীরু, কমান্ডার এনামুল কবির ও কমান্ডার কবীরের দল অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্রের মধ্যে ৩০৩ রাইফেল, চায়নিজ রাইফেল, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: ২১ আগস্ট ভোর বেলা শ্রীপুর থানা চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে কয়েকটি রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে থানার পুলিশকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়। জবাবে থানার পুলিশ সদস্যরা পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। এসময় কয়েকশো মানুষ 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে থানার ভেতর ঢুকে পড়তে চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা গুলি চালানো বন্ধ করে। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে।

ফলাফল: শ্রীপুর থানা আকবর বাহিনী দখল করে নেয় ও থানার ৩৪টি রাইফেল, দেড় হাজার গুলি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করে। পুলিশ সদস্যদেরকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

সরইনগর ও আলফাপুর অভিযান[৪৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: আগস্টের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন দুপুর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মুক্তিবাহিনীর শৈলকুপা অভিযানের পর পাকিস্তানি সেনাদলের একটি বড় দল শৈলকুপা থেকে শ্রীপুরের দিকে অভিযান চালাতে অগ্রসর হয়। তারা শ্রীপুর থানায় দুইদিক থেকে তথা সরইনগর ও আলফাপুর হয়ে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর অভিযান বানচাল করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আকবর হোসেন ও কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে খন্দকার নাজায়েত আলী, মোল্লা নবুয়ত আলী, বদরুল আলম, গোলাম মোস্তফা, আমজাদ আলী, হাফিজার, বাছিরুজ্জামান, অলিয়ার রহমান, আনোয়ার হোসেন, মনোয়ার হোসেন, হাফিজার বাচ্চু, আনারুদ্দীন, মকছেদ, মোক্তাদ, সিরাজ, মতিয়ার, রশিদ, নজর আলী, রুস্তম, ছাত্তার, ছায়েম, ইন্তাজ, আ. মালেক, হাবিবুর রহমান, আবু বকর, মন্টু মিয়া, আলম প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে এসএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড ও অন্যান্য গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: পাকিস্তানি সেনাদল দুই দিক দিয়ে শ্রীপুর অঞ্চলে প্রবেশ করে। তাই আকবর হোসেনের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা শ্রীকোল সংলগ্ন সরইনগর ওয়াপদা ক্যানেলের কাছে এবং কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে আর একটি দল আলফাপুরে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল শ্রীকোলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে না পেরে কুমার নদীর ধার দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এসময় মীনগ্রামের মান্দায় ও সরইনগর ওয়াপদা ক্যানেলের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে সৈন্যকে আক্রমণ করে। অন্যদিকে কামরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন দলটি আলফাপুরে শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ চালায়। বেশ কিছুক্ষণ উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়।

ফলাফল: সরইনগর ও আলফাপুরের যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদলের পঞ্চান্ন জন সদস্য নিহত হন ও বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনী হস্তগত করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কিছু ছিল না। তবে, পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের পরের দিন আক্রমণ করে। যদিও মুক্তিযোদ্ধারা শ্রীপুরের নিরাপদ অবস্থানে চলে যেতে সক্ষম হন, তবুও তাদের কয়েকটি আশ্রয়স্থল পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয় ও শ্রীপুর স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞানাগার ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

মাগুরা আনসার ক্যাম্প অভিযান[৫০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৭ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১১টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মাগুরা আনসার ক্যাম্পে রাজাকারদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মাগুরা আনসার ক্যাম্প অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল রাজাকারদেরকে আক্রমণ করে যত বেশি সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদলের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: এই অভিযানে আকবর বাহিনীর ২৭ জন যোদ্ধা অংশ নেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আকবর হোসেন, হাফিজার, মুন্সী আব্দুল আজিজ, বদরুল আলম, আশরাফ মোশারফ, খোকন, আহম্মেদ প্রমুখ। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ইবিআর ও ইপিআর থেকে আসা। আর যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তাদের নিকট এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, রাইফেল ও গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: মুক্তিযোদ্ধারা আনসার ক্যাম্প রোধ করে রাত এগারটায় ক্যাম্পের পাশে অবস্থান নেন। রাত ১১.০৫ মিনিটে এলএমজি, এসএমজি ও এসএলআর দিয়ে ক্যাম্পের ওপর গুলি চালানো হয়। আনসার ক্যাম্প ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ডাক বাংলোতে পাহারারত শত্রুসৈন্যের ওপরও আক্রমণ চালানো হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির প্রত্যুত্তরে পিটিআই ক্যাম্প থেকেই শত্রুসৈন্যের প্রতিরোধ বেশি আসে। প্রায় ১ঘন্টা গোলাগুলির পর মুক্তিযোদ্ধারা অভিযান সমাপ্ত করে ফিরে আসেন।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ২৭ জন রাজাকার ও ডাক বাংলোতে ২জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় শত্রুদল প্রায় সারারাত মাগুরা শহরে মর্টার হামলা চালাতে থাকে।

বিনোদপুর রাজাকার ক্যাম্প অভিযান[৫১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৫ অক্টোবর ভোর আনুমানিক ৩.৩০ মিনিট।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মাগুরার বিনোদপুরে অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়াই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আকবর বাহিনীর বাছাইকৃত ৬৫ জন মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের নেতৃত্বে এই অভিযানে অংশ নেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাদের কাছে ছিল এলএমজি, এসএলআর ও রাইফেল।

অভিযানের বিবরণ: বিনোদপুরের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের জন্য ৪ অক্টোবর মুক্তিযোদ্ধারা যাত্রা শুরু করেন। ৫ অক্টোবর ভোর আনুমানিক ২.৩০ মিনিটে তারা রাজাকার ক্যাম্পের নিকট অবস্থান

নেন। ভোর ৩.৩০ মিনিটের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়। অতর্কিত আক্রমণে রাজাকাররা ভীত হয়ে যখন আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন পার্শ্ববর্তী আলোকদিয়া থেকে রাজাকারদের আরেকটি দল মুক্তিযোদ্ধাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। এছাড়া, মাগুরাতে অবস্থিত পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি অংশ মুক্তিবাহিনীকে আক্রমণের জন্য নিকটবর্তী চাউলিয়াতে এসে পড়ে ও আর আর-২ মর্টার ও এলএমজি থেকে গুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসেন।

ফলাফল: রাজাকারদের প্রতিরোধের শুরুর দিকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য কিশোর মুকুল শহিদ হন এবং গোলাম মোস্তফা নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হন। অপর দিকে শত্রুপক্ষের ৬ জন রাজাকার নিহত হয়।

মাশালিয়া অভিযান[৫২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকের কোনো এক দিন বিকাল বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ৫ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর বিনোদপুর রাজাকার ক্যাম্প অভিযানের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৫০০ জনের একটি দল রাজাকারসহ আকবর বাহিনীর টুপিপাড়া ক্যাম্প আক্রমণ করে ১১ অক্টোবর। এছাড়া, টুপিপাড়াসহ শ্রীপুরের অন্যান্য স্থানে যেখানেই আকবর বাহিনীর ক্যাম্প ছিল, সেখানেই তারা আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল আকবর বাহিনীসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ লক্ষ্যে শত্রুদল কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি ক্যাম্প তথা টুপিপাড়া, খামারপাড়া, গাংনালিয়া বাজার, শ্রীকোল, আবইপুর, লাঙ্গলবাঁধ এলাকার ক্যাম্পে অভিযান চালায়। এসব স্থানে পাকিস্তানি সেনাদল ও মুক্তিবাহিনীর বেশ কিছু সম্মুখযুদ্ধ ও খণ্ড যুদ্ধ হয়। শ্রীপুর-লাঙ্গলবাঁধ এলাকায় মাশালিয়াতেও এরূপ একটি সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মূলত, পাকিস্তানি সেনাদলের অভিযান রুখতেই মুক্তিবাহিনীর এই অভিযান।

লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র: আকবর বাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদলের সর্বাত্মক যুদ্ধাভিযানের খবর পেয়ে অধিনায়ক আকবর হোসেন তার বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে পজিশনে পাঠান। এর মধ্যে ছিল গাংনালিয়া বাজার, কাজলী, শ্রীপুর, জোকা, শ্রীকোল, খামারপাড়া, মাশ লাঙ্গলবাঁধ প্রভৃতি। লাঙ্গলবাঁধ-শ্রীপুরের নিকটবর্তী মাশালিয়া এলাকায় আকবর হোসেনের নেতৃত্বে প্রায় ২০ জনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল ছিল। এ দলের নিকট এলএমজি, এসএলআর, স্টেনগান, রাইফেল ও গোলাবারুদ ছিল।

অভিযানের বিবরণ: মুক্তিযোদ্ধারা লাঙ্গলবাঁধের রাস্তা ধরে মাশালিয়া গ্রামের মসজিদের কাছে অবস্থান নিয়েছিল আর মসজিদের পাশের ক্যানেলের রাস্তা ধরে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল লাঙ্গলবাঁধের উত্তর দিকে যাচ্ছিল। শত্রুসৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জে পৌঁছালে একইসাথে তারা এলএমজি, এসএলআর ও রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। অপর দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির প্রত্যুত্তরে শত্রুসৈন্যরাও এলএমজি থেকে অনবরত ব্রাশফায়ার করতে থাকে। শত্রুপক্ষের গুলির তোড়ে টিকে থাকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথম মাশালিয়া গ্রামের সরকারি পুকুরের পাড়ে আশ্রয় এবং তারপর সেখান থেকে পশ্চাদপসরণ করে পার্শ্ববর্তী চন্ডিখালি গ্রামে চলে যায়।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাতে শত্রুসৈন্যের ৬ জন অফিসারসহ মোট ১৪ জন সৈন্য নিহত হন। তবে, মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ হতাহত হননি। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও সৈন্যহানির প্রতিক্রিয়ায় মাশালিয়া গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার দল অগ্নিসংযোগ করে ও গণহত্যা চালায়।

উল্লিখিত যুদ্ধসমূহের বাইরে আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ ইচ্ছাখাদা রাজাকার ক্যাম্প অভিযান (২৬ সেপ্টেম্বর), হাজীপাড়া রাজাকার ক্যাম্প অভিযান (১০ অক্টোবর), কাজলী অভিযান (৩০ অক্টেরব), গাংনালিয়া-বরিশাট রাজাকার ক্যাম্প অভিযান (৭ নভেম্বর), নাকেল বাজার অভিযান (২৪ নভেম্বর), নহাটা অভিযান, বারাইপাড়া অভিযান (১১ নভেম্বর), খামারপাড়া অভিযান (১৩ নভেম্বর), গোপালপুর বাজার রাজাকার ক্যাম্প অভিযান, তারাপুর অভিযান (১৩ ডিসেম্বর) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ নেন। আকবর বাহিনীর যোদ্ধাদের সহযোগিতায় মাগুরা শত্রুমুক্ত হয়।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

আকবর বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে ছাপার অক্ষরে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেনি। বাহিনীর গোয়েন্দা সদস্য বা সাধারণ লোক মারফত হাতে লেখা চিঠিপত্র বিনিময় করে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। যুদ্ধের শেষ দিকে ঝিনাইদহ, পাংশা, মাগুরা, রাজবাড়িতে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এসব প্রচারপত্র হাট শ্রীকোল বাজারের নুরুল ইসলামের হ্যান্ড প্রেস থেকে ছাপানো হয়। এই প্রচারপত্রের মাধ্যমে উল্লিখিত এলাকার রাজাকারদের শ্রীপুর বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়। প্রচারপত্র বিলি করার পর কিছুদিনের মধ্যে অত্র অঞ্চলের প্রায় অর্ধশত রাজাকার আকবর বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[৫৩] এছাড়া জুনের পর থেকে প্রধানত শ্রীপুরে এ বাহিনীর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি উঠানবৈঠক ও মতবিনিময় সভা করা হয়েছিল।[৫৪]

যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা

আকবর বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সাথে প্রায় ২৫টি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এছাড়া, এ বাহিনীর সদস্যগণ স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাকাত-দুষ্কৃতকারী লুটেরাদের সাথেও অনেকগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এসব অভিযানে আকবর বাহিনীর লোকক্ষয় সংখ্যার বিচারে সামান্য। এ বাহিনীর একজন সদস্য শহিদ হয়েছিলেন ও পাঁচজন সদস্য আহত হয়েছিলেন। বাহিনীর শহিদ যোদ্ধা হলেন শ্রীপুরের শেখ বদর উদ্দীনের ছেলে মুকুল। আর আহতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রহমান, খন্দকার আব্দুল মাজেদ, আলম।[৫৫]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

আকবর বাহিনী গঠনের শুরু থেকেই বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন মিয়া ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে কার্যক্রম চালিয়ে ছিলেন। তিনি মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই তার ভাতিজা শহীদুল ইসলাম রাজার মাধ্যমে মাগুরার এমএনএ সোহরাব হোসেন, এমপিএ আছাদুজ্জামান, সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী ও পরবর্তীকালে আবুল মঞ্জুরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন।[৫৬] তিনি জুলাই মাসের মাঝামাঝি তার বাহিনীর ১২৮ জন যোদ্ধার পরিচয় ও তাদের কাছে থাকা ১২৮টি ৩০৩ রাইফেল এবং ৩টি চায়নিজ রাইফেলের নম্বর তালিকা কর্নেল ওসমানীর নিকট প্রেরণ করে তার বাহিনীর জন্য অস্ত্র মঞ্জুরির আবেদন পাঠান। এই চিঠির প্রতি উত্তরে সেপ্টেম্বর মাসের শেষার্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আকবর হোসেনের কাছে পাঠানো হয়।[৫৭] এরপর ৩১ অক্টোবর আকবর বাহিনীকে স্বীকৃতি দিয়ে ৮নং সেক্টর কমান্ডার আবুল মঞ্জুরের স্বাক্ষরিত একটি স্বীকৃতি সনদ আকবর হোসেনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সনদপত্রটি মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন এটিএম আব্দুল ওহাব[৫৮] আকবর হোসেনের কাছে পৌঁছে দেন। স্বীকৃতির সনদ প্রদানের পর আকবর বাহিনীর প্রশংসাসূচক ও বাহিনীর জন্য উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিয়ে চিঠি পাঠান মেজর মঞ্জুর ও মেজর এম এন হুদা। এছাড়া, মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক ও দক্ষিণ পশ্চিম জোনের কমান্ডার জনাব তোফায়েল আহমদ শ্রীপুর অঞ্চলে থাকা মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আকবর হোসেনের কমান্ডে রেখে তত্ত্বাবধান করার জন্য পত্র পাঠান।[৫৯] আকবর বাহিনীর যোদ্ধাগণ অবশ্য স্বীকৃতির সনদপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই

ভারতে প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতাপূর্বক শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করে চলছিলেন।

গণমাধ্যমে আকবর বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধকালে আকবর বাহিনীর যুদ্ধাভিযানের খবর নানা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই বাহিনী ১৯৭১ এর ৫ জুন ফরিদপুরের রামদিয়ার সোনাজুর গ্রামের রাজাকার চাঁদ খাঁকে আক্রমণ করে আহত করে। পরেরদিন স্থানীয় মানুষ আহত চাঁদ খাঁকে রাস্তায় পেয়ে হত্যা করেন। এই খবরটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।[৬০] এ রকম আকবর বাহিনীর শৈলকুপা থানা অভিযান, শ্রীপুর থানা অভিযান, বিভিন্ন রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও সাফল্যের খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। এছাড়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্ভবত ২৩ আগস্ট শ্রীপুরকে মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়।[৬১] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাদেও পশ্চিম বাংলার *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *বসুমতি* এবং বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকায় এ বাহিনীর বেশকিছু অভিযানের খবর ছাপা হয়।[৬২] জন্মভূমি পত্রিকায় ১৩ সেপ্টেম্বর এ বাহিনীর শ্রীপুর থানা অভিযান সম্পর্কে লেখা হয়[৬৩]:

> যশোহরের শ্রীপুর থানা দখল
>
> মুজিবনগর, ৯ই সেপ্টেম্বর–গত সপ্তাহে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা যশোহর জেলায় শ্রীপুর থানাটি সম্পূর্ণরূপে শত্রু কবল মুক্ত করেছে। মুক্তি বাহিনী ও জনতার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। শ্রীপুরের এই অতর্কিত আক্রমণে পাক বাহিনীর খান সেনাসহ প্রায় ১২৫ জন রাজাকারকে হত্যা করা হয়েছে। এই আক্রমণের ফলে আমাদের মুক্তি বাহিনী ১৪টি রাইফেল, একটি বৃটিশ রিভলবার, ১০টি শিরস্ত্রাণ এবং বহু কার্তুজ দখল করেছে।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

আকবর বাহিনীর সদস্যদের কেউই মুক্তিযুদ্ধের পর ঘোষিত সামরিক বা বেসামরিক কোনো খেতাব বা উপাধি বা পুরস্কার পাননি। এমনকি এই বাহিনীর প্রায় বিশ জন সদস্য আছেন যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারেননি। এরকম একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন শ্রীপুরের খামারপাড়ার ওলিয়ার মৃধা।[৬৪] খেতাব অপ্রাপ্তি বিষয়ে বাহিনীর প্রধান আকবর হোসেন বলেছিলেন, "খেতাবের জন্য যুদ্ধ করিনি। দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে এটাই বড় পাওনা।"[৬৫]

অস্ত্র সমর্পণ

আকবর বাহিনীতে তিন প্রকারের যোদ্ধা ছিলেন। একদল ছিলেন বাহিনীর নিজস্ব যোদ্ধা, একদল ছিলেন ভারতে প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এবং আরেকদল ছিলেন মুজিব বাহিনীর সদস্য। এই যোদ্ধাবৃন্দের কাছে প্রায় আটশত অস্ত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর এসব অস্ত্র দুটি ভাগে জমা দেওয়া হয়। আকবর বাহিনীর নিজস্ব যোদ্ধা ও এফ এফ যোদ্ধাদের অস্ত্র ১৯৭২ এর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ৮ নং সেক্টরের মাগুরা অঞ্চলের কমান্ডার এটি এম আব্দুল ওহাবের কাছে জমা দেওয়া হয়।[৬৬] আর মুজিব বাহিনীর সদস্যগণ তাদের অস্ত্র ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট জমা দেন।[৬৭]

মূল্যায়ন

মাগুরার মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনীর অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। অবরুদ্ধ দেশে অবস্থান করে স্থানীয় লুটেরা-দুষ্কৃতকারী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর এই দুই পক্ষের মোকাবেলা

করা এ বাহিনীর সদস্যদের জন্য খুব সহজ ছিল না। এরপর আবার বাহিনীর প্রধানকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণার ফলে আকবর বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন মিয়ার জীবন আরো কঠিন হয়ে পড়েছিল।[৬৮] তারপরও দেশের মুক্তির কথা ভেবে এ বাহিনীর যোদ্ধাগণ সর্বোচ্চ ঝুঁকির মধ্যে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করেছিলেন।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চের পরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সারা দেশে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা, বাড়িঘর লুট, অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। এ সময় মাগুরাতে তারা ঘোষণা দেয়, 'সব লুট কর লেও, কাফের খাম কর দো, মালাউনকা গর্দান লে লো'। বিভিন্ন স্থানে তারা মাইকে প্রচার করতে থাকে, 'শহর সে সব লুট কর দাও।' পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ঘোষণা এবং নির্দেশের ফলে মাগুরাতে লুটপাটের মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানিদের সহায়তায় রাজাকার-আল বদর-আল শামস বাহিনী বিপুল উৎসাহে লুটতরাজ শুরু করে, শুরু করে গণহত্যা। এদের সঙ্গে সঙ্গে অহসযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরও অনেকে ভোল পাল্টে যোগ দেয় এই লুটতরাজে। চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়ে যায় এ সময়। কুখ্যাত ডাকাত রব্বানী, জয়নাল, কাওছার, নান্নু, লাল, বারিক, মজিদ, মকবুল, রাজ্জাক, রুস্তম, ইমান আলী, হামেদ, মকা প্রভৃতি দস্যুদের অত্যাচার পাকিস্তানিদের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যায়। এমনকি সহায়-সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণের মায়ায় ভারতে আশ্রয় নেবার জন্য যাওয়া শরণার্থীদের ওপরও লুটপাট চলতে থাকে। শ্রীপুর থানার এ সময়ের দারোগা মতিয়ার রহমানও এই সুযোগে যাত্রীদের টাকা, পয়সা, সোনাদানা ছিনিয়ে নেয়ার কাজে লেগে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, লুটপাটের এসব ঘটনায় এলাকার চেয়ারম্যান এবং আকবর বাহিনীর প্রধান হিসেবে আকবর হোসেন মানুষকে নিরাপত্তা দেয়া এবং পাকিস্তানিদের পাশাপাশি এসব দুস্যদেরও খতম করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন- মোল্লা নবুয়ত আলী, শাহাবুদ্দিন খান, মৌলভী খন্দকার নাজায়েত আলী, আবু হাসান, সুবেদার ওহাব, লতিফ, সুলতান, শহিদুল ইসলাম, আনারউদ্দিন, মকতাদ, মকসেদ প্রমুখ। এদের সহযোগিতায় আকবর হোসেন ডাকাত সর্দার বারিক, মসলেম, সাহেব আলী, সুরুজ মিয়া, কমির, মধু, আয়েন উদ্দিন, খনো, যুবা প্রমুখ ডাকাতকে হত্যা করে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। শ্রীপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন ফরিদপুরের মধুখালী, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ির পাংশা, গোয়ালন্দ, ঝিনাইদহের শৈলকুপা অঞ্চলে এ বাহিনী সাধারণের জানমাল রক্ষার চেষ্টা চালায়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে উল্লিখিত ডাকাত-লুটেরা-রাজাকারদের দমন করার ফলে শ্রীপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য পরিবার অবরুদ্ধ দেশেই থেকে যান। যুদ্ধকালে আকবর বাহিনী ও স্থানীয় জনগণ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলার পাশাপাশি এই বাহিনী প্রায় পাঁচ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের ভেতরেই প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু যুবকগণ আকবর বাহিনীর আকবর হোসেনের নিকট থেকে পরিচিত সনদ নিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যেতেন।[৬৯] আকবর হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত এই সনদ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চিহ্নিতকরণে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের ঝুঁকি কমাতে অনেকাংশে সহযেগিতা করেছিল। এর ফলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অত্র এলাকার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন যোদ্ধা তৈরি করা সহজ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই আকবর বাহিনী শ্রীপুর অঞ্চলকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কৌশলগত কারণে মুক্তাঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের জন্য ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে সরকার বহির্বিশ্বের কাছে দেখাতে সক্ষম হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সরকারের উপস্থিতি অলীক নয়, বাস্তব সত্য। ১৯৭১ এর যুদ্ধ ভারত বনাম পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়, বরং বাঙালি জাতি বনাম পশ্চিম

পাকিস্তানের যুদ্ধ। আর যুদ্ধক্ষেত্র যেহেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, সুতরাং এটা প্রমাণ করা সহজ হয়েছিল যে, এই যুদ্ধে অবরুদ্ধ দেশের জনগণের সমর্থন রয়েছে।

শ্রীপুর মুক্তাঞ্চলে আকবর বাহিনী বেসামরিক প্রশাসন চালু করেছিল। এ ধরনের প্রশাসন তারা চালু রেখেছিলেন পাকিস্তান সরকারের পরিচালিত প্রশাসনের সমান্তরালে। অবরুদ্ধ শ্রীপুরের অধিকাংশ জনগণ এই প্রশাসনের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে, শ্রীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া ডাকাতি ও লুটপাট থেকে রক্ষার জন্য আকবর বাহিনীর গৃহীত ব্যবস্থা এলাকার জনগণ অনুমোদন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে শ্রীপুর অঞ্চলে কোনো রাজাকার দল গড়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ আকবর বাহিনীর সার্বক্ষণিক নজরদারি ও এসব ক্ষেত্রে গৃহীত কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। এমনকি শ্রীপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকা রাজাকারদেরকে এ বাহিনী পক্ষ ত্যাগ করে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এতে রাজাকারদের মধ্যে যারা এ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বও এ বাহিনী পালন করে।[৭০]

আকবর বাহিনী যুদ্ধকালে যেসব অঞ্চলে অভিযান চালাতে তথা দখল রাখতে পেরেছিল, তার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর ওপর আঘাত হানার জন্য নতুন নতুন মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরি করতে সহযোগিতা করে। ফরিদপুরের জামালপুর এলাকায় হাবিলদার জালাল মিয়াকে, ফরিদপুরের নাড়ু য়াতে সিরাজ ইপিআরকে, রাজবাড়ির পাংশায় মতিন সাহেবের ডুমাইন এলাকায় সোহরাব সাহেবকে, মাগুরার পূর্ব দিকে ইপিআর-এর মান্নান ও আবুলকে স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা দল তৈরি করতে সহযোগিতা করে।[৭১]

আকবর বাহিনী শ্রীপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলার সুবাদে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অসংখ্য এফএস যোদ্ধা আগস্ট মাস থেকে এবং অসংখ্য বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর সদস্য সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে এ অঞ্চলে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এর ফলে একদিকে যেমন এসব যোদ্ধাগণ নিরাপত্তা পান, তেমনিই স্থানীয় জনগণের সহযোগিতাও পাওয়া সহজ হয়। আর এই সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আরো শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিল এবং শত্রুপক্ষকে আরো বেশি ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা লক্ষ করেছি যে, আকবর বাহিনী ও ভারত প্রত্যাগত মুক্তিবাহিনীর মিলিত বা সমন্বিত অভিযান পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে আগস্টের শেষদিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং একই সাথে লক্ষণীয় যে, এসব অভিযানে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির হারও তুলনামূলক বেশি ছিল।

১৯৭১ এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হলে মাগুরার মানচিত্র (মূলত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির অবস্থান) সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আকবর হোসেনকে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ক্যাপ্টেন, আব্দুল ওহাবের সাথে পরামর্শ করে সেই মানচিত্র তৈরি করে যৌথবাহিনীর নিকট প্রেরণ করেন।[৭২] দেখা যায়, যৌথবাহিনী সেই মানচিত্র ব্যবহার করেই শত্রুসৈন্যের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। তাছাড়া এই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলেন আকবর বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ। মাগুরা বিজয় অভিযানে পাকিস্তানি সৈন্যের প্রতিরোধ ভেঙে আকবর বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দই প্রথমে মাগুরাতে প্রবেশ করেন। তাছাড়া, মিত্রবাহিনীর আগমনের পর তাদের সাথে যৌথভাবে ফরিদপুর ও রাজবাড়ি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন আকবর বাহিনীর অনেক সদস্য।

যৌথবাহিনী কর্তৃক মাগুরা বিজয় সম্পন্ন হলে আকবর বাহিনীর সহযোগিতায় মাগুরা মহকুমায় স্বাধীন প্রশাসন চালু করা হয়। এই প্রশাসনের একটি অংশ ছিল পুলিশ প্রশাসন। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মাগুরা থানায় থাকা অল্প সংখ্যক পুলিশের সাথে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকেও পুলিশের সাথে

সহযোগিতার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতার অভিযোগে আটক সকল ব্যক্তিকে থানা হাজতে আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[৭৩] এই ব্যবস্থার ফলে অংসখ্য চিহ্নিত রাজাকার জনরোষ থেকে রক্ষা পান। এদেরকে পরবর্তীতে আইনের আওতায় এনে বিচার করা হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যাপক সহযোগিতার বাইরে সম্পূর্ণ ব্যক্তি প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা আকবর বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এ বাহিনীর যোদ্ধাগণের কেউই বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা সামরিক অথবা বেসামরিক পুরস্কার পাননি। তদুপরি এই বাহিনীর অনেক সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে এই বাহিনীর উপস্থিতি শুধু কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ এই বাহিনীই ছিল পূর্বোল্লিখিত অঞ্চলে জনযুদ্ধের প্রকৃত কারিগর।

রফিক বাহিনী

বাগেরহাট

মুক্তিযুদ্ধকালে তৎকালীন খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা এলাকায় একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনীর প্রধান সংগঠক ছিলেন বাগেরহাট সদর থানাধীন চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর গ্রামের সন্তান রফিকুল ইসলাম খোকন। তার পিতা ছিলেন মো. সায়েল উদ্দিন পেশায় বাগেরহাটের এসডিও কোর্টের নাজির । রফিক একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বাগেরহাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে বাগেরহাট পিসি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকেই তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এলএলবি-তে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে শেষ পর্যন্ত আইনে ডিগ্রি নিতে পারেননি। রফিক একই সাথে একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। তিনি মূলত বামপন্থায় বিশ্বাস করতেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি খুলনা জেলা ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর সভাপতি ছিলেন।[৭৪] তাছাড়া তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।[৭৫] ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি রফিক বাগেরহাটের কৃষক আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন।[৭৬]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রফিক প্রধানত তার বাম মতাদর্শী ও কৃষক আন্দোলন কর্মীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বাগেরহাটের চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর এলাকায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেন। এই দল মুক্তিযুদ্ধের শেষাবধি অত্র এলাকার প্রায় ১৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিচরণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দালাল-সহযোগীদের প্রতিহত করে।[৭৭] এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রফিকুল ইসলামের নামেই বাহিনীর পরিচিতি গড়ে ওঠে 'রফিক বাহিনী' হিসেবে।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

খুলনা জেলার বাগেরহাট থানায় সাংগঠনিক কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয় বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এবং বাংলা ভাগের পর কৃষক আন্দোলনের পুনরুভ্যুত্থান ঘটে ১৯৬২ সালে।[৭৮] কৃষক আন্দোলনের এই পুনরুভ্যুত্থান ঘটে তৎকালীন ছাত্রনেতা এস এম এ সবুরের নেতৃত্বে চিতলমারী অঞ্চলে। এছাড়া ষাটের দশকে বাগেরহাটের অন্যান্য থানায়ও কৃষক আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন রফিকুল ইসলাম খোকন।

১৯৬৬ সালে ঢাকায় সুখেন্দু দস্তিদার, আব্দুল হক এবং মোহাম্মদ তোয়াহা মিলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) নামে যে গোপন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন, দু'বছরের মধ্যেই তা মোট পাঁচটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে জাফর-মেনন-রনো উপদলের নাম ছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি বা সংক্ষেপে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। রফিকুল ইসলাম ছিলেন জাফর-মেনন-রনো উপদলেরই একজন অনুসারী।

রফিকুল ইসলাম খোকন এই সময় ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি বাগেরহাট-পিরোজপুর এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ করছিলেন। প্রধানত কৃষক সমাজের মধ্যে শ্রেণি সংগ্রামের চেতনা গড়ে তুলে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলাই ছিল রফিকদের লক্ষ্য। তাদের মূল স্লোগান ছিল 'লাঙল যার জমি তার'। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার বিষয়টিও তাদের আদর্শের সাথে যুক্ত ছিল, তাই স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র কথা বলেও তারা স্লোগান দিতেন, বলতেন 'কৃষক-শ্রমিক অস্ত্র ধরো/পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'।[৭৯]

বাগেরহাট-পিরোজপুর এলাকায় উল্লিখিত সমন্বয় কমিটির একটি জনসমর্থন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। বিশেষ করে, কৃষক সমাজের একটি অংশের সমর্থন তারা পেতে থাকেন। কৃষক সমাজ প্রধানত এলাকাভিত্তিক স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হতো। রফিকুল ইসলাম খোকন বাগেরহাট মহকুমাধীন প্রায় প্রতিটি স্থানে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করায় তিনি এ এলাকায় কৃষক আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। বাগেরহাটের ফকিরহাট, বিষ্ণুপুর, সুলতানপুর-রঘুনাথপুর এলাকায় কৃষক আন্দোলন বিশ শতকের ষাটের দশকে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর জন্য অনুসরণীয় হয়ে ওঠে।[৮০] মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই কৃষক আন্দোলনের কর্মীগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাগেরহাটের জনগণ আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী করে। এ নির্বাচনে বাগেরহাট মহকুমায় জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে মওলবী আবুল খায়ের (খুলনা-১) ও শেখ আব্দুল আজিজ (খুলনা-২) এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে শেখ আব্দুর রহমান (খুলনা-২), মীর সাখাওয়াত আলী দারু (খুলনা-৩), আব্দুল লতিফ খান (খুলনা-৪), কুবের চন্দ্র বিশ্বাস (খুলনা-৫) ও শেখ আলী আহমদ (খুলনা-৬) নির্বাচিত হন।[৮১] আওয়ামী লীগের এ বিজয়ে জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে অচিরেই ক্ষমতার পালাবদল ঘটবে। কিন্তু, কেন্দ্রে ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭১ এর ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করেন ১ মার্চ। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২ মার্চ ঢাকায় ও পরবর্তী তিনদিন সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাগেরহাটবাসী স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করেন। হরতাল পালনের পাশাপাশি বাগেরহাট মহকুমার আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর) নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী ৯ মার্চ বিকালে গঠন করেন ‘বাগেরহাট মহকুমা সংগ্রাম কমিটি’। কমিটিতে বাগেরহাট মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাগেরহাট নির্বাচনী এলাকার সদ্য নির্বাচিত এমপিএ অ্যাডভোকেট শেখ আবদুর রহমানকে আহ্বায়ক, বাগেরহাট মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোরেলগঞ্জ থানার সোনাখালী নিবাসী অজিয়র রহমানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করা হয়। অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক হন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) বাগেরহাট মহকুমা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এস এম এ সবুর। সদস্য ছিলেন বাগেরহাট মহকুমা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা মোরেলগঞ্জ থানার তেলিগাঁতি নিবাসী আবদুস সত্তার খান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) বাগেরহাট মহকুমা শাখার সভাপতি শেখ আমজাদ আলী গোরাই মিয়া, কচুয়ার নবনির্বাচিত এমপিএ মীর সাখাওয়াত আলী দারু, মোজাফ্ফর ন্যাপের সহ-সভাপতি মনসুর আহমদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বাগেরহাট মহকুমা শাখার সভাপতি আতিয়ার রহমান, অধ্যাপক সৈয়দ শামছুল হক, শিক্ষক আতাহার আলী খান, শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল বারী, তেলিগাঁতি গ্রামের সোহরাব হোসেন, বাগেরহাট বৈটপুর গ্রামের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান আলী, গাজী আবদুল জলিল, খারদার গ্রামের সরদার আবদুল জলিল, কাড়াপাড়া গ্রামের কানাইলাল বসু, খারদার গ্রামের আবদুল গণি সরদার প্রমুখ।[৮২] এ সংগ্রাম পরিষদের অফিস স্থাপন করা হয়েছিল বাগেরহাট নিউ মার্কেটের দোতলায়।[৮৩] কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ মার্চ বাগেরহাট বহুমুখী হাই স্কুলের সামনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের কাজ শুরু হয় এবং এখানেই একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত স্কুলের বাইরে বাগেরহাট বালিকা বিদ্যালয় এবং বাগেরহাট পিসি কলেজের মাঠ ব্যবহার করা শুরু হয়।[৮৪] স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে স্বেচ্ছাসেবী যুবকদেরকে নাগের বাড়ীর মাঠ, কাড়াপাড়া স্কুল মাঠ, আনসার ক্যাম্প মাঠ প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতে থাকে।[৮৫] বাগেরহাট বহুমুখী হাই স্কুল মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন শেখ আব্দুর রহমান ও প্রশিক্ষক ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য কাজী আমজাদ হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক ও খন্দকার মাহতাবউদ্দিন। শহিদ সৈয়দ

অজিয়র রহমান ছিলেন নাগের বাড়ী মাঠের দায়িত্বে। কাড়াপাড়া মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আব্দুল বারি সিকদার। আনসার ক্যাম্প মাঠের প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শেখ আমজাদ আলী গোরাই। গোরাই মিয়ার সাথে এই ক্যাম্পের অন্যতম পরিচালনা সহযোগী ছিলেন রফিকুল ইসলাম খোকন।[৮৬] এসব ক্যাম্পে ছাত্র-যুবক, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি ছিল অনুপ্রেরণাদায়ী। ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাক্তন বা ছুটিতে থাকা সেনা, ইপি আর,পুলিশ, আনসার সদস্যদেরকে জড়ো করার কাজও চলতে থাকে।

২৩ মার্চকে প্রতিরোধ দিবস ও একই সাথে সাধারণ ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। সেই ঘোষণার সাথে একাত্ম হয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চকে পাকিস্তান দিবেসের পরিবর্তে ‘বাংলা দিবস’ হিসেবে পালনের আহ্বান জানান। আর এ দিন সারাদেশে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী বাগেরহাটের মহকুমা আদালত চত্ত্বরে শেখ আব্দুর রহমান, সৈয়দ অজিয়র রহমান, এস এম এ সবুর, আবদুস সত্তার খান, গাজী আব্দুল জলিল, সরদার আব্দুল জলিল, মতিয়র রহমান পাটোয়ারি, ইব্রাহিম মাস্টার, আমীরুজ্জামান বাচ্চু প্রমুখের উপস্থিতিতে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার দায়িত্ব পালন করেন মহকুমা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।[৮৭]

২৫ মার্চ বাগেরহাট শহর কম্পিত হয়েছিল বিভিন্ন পেশাজীবী ও স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলের মিছিলে মিছিলে। বাগেরহাট মহকুমার গোটাপাড়া ও চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন এবং কচুয়া থানার ধোপাখালী ও গজালিয়া ইউনিয়নের গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার জনতা দা-কুড়াল-ঢাল-সড়কি-রামদা-লাঠি ও দু'একটি ব্যক্তিগত বন্দুকসহ জঙ্গি মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করেন।[৮৮]

২৫ মার্চ রাত্রিতে ঢাকা শহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের সূচনায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ সময় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আব্দুল আজিজ ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। ঢাকায় গণহত্যার ঘটনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি টেলিফোন মারফত খুলনার খানজাহান আলী রোড়স্থ নিজ বাসায় জানান। এই খবর ২৬ মার্চ বাগেরহাটের অধ্যাপক শামসুর রহমানের বাসায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে পোঁছে দেন মুজিবর রহমান। তার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে মহকুমা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ অজিয়র রহমান বাগেরহাট নিউ মার্কেটের দোতলায় সংগ্রাম কমিটির একটি জরুরি সভা আহ্বান করেন। সভায় অজিয়র রহমান ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুস সত্তার খান, আব্দুল লতিফ খান, সরদার আব্দুল জলিল, আমিরুজ্জামান বাচ্চু, সৈয়দ তোশারফ হোসেন প্রমুখ। সভা চলাকালে মহকুমা অয়ারলেস স্টেশনের অপারেটর রবীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বার্তাটি সভাস্থলে পৌঁছে দেন। সভায় তা পাঠ করে শোনানো হয়।[৮৯] এদিকে ২৭ মার্চ সকালেই প্রশিক্ষণ শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ পূর্বনির্দেশমতো বাগেরহাট ট্রেজারির সামনে একত্র হন। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক শেখ আবদুর রহমান আগে থেকেই এসডিপিও-র সাথে গোপনে পরামর্শ করে রেখেছিলেন। সেই পরামর্শ অনুসারে ট্রেজারির তালা ভেঙে ফেলা হয়। পাওয়া যায় ৩৩টি ৩০৩ রাইফেল এবং দুই বাক্স গুলি। এটাই ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের অস্ত্রের প্রথম বড় ধরনের সংগ্রহ।[৯০]

অতঃপর এই সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি স্থায়ী ক্যাম্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিষয়টি নিয়ে শেখ আবদুর রহমান তখন বাগেরহাট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ভদ্রলোকের পরামর্শ অনুযায়ী বাগেরহাট বাসাবাটির জমিদার নাগদের পরিত্যক্ত বাড়িটিকে ক্যাম্পের জন্য মনোনীত করা হয়। সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ তখন থেকে ঐ ক্যাম্পে অবস্থান করতে থাকেন এবং এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের নাগেরবাড়ি ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা ঘটে। নাগেরবাড়িতে সংগ্রাম কমিটির নিয়মিত বৈঠক বসত।

বাগেরহাট প্রতিরক্ষার জন্য সংগ্রাম কমিটি একটি বৈঠকে আলোচনা করে ৩টি বাহিনী নিযুক্ত করে। আনসার কমান্ডার হাবিবুর রহমানকে চিতলমারী এলাকা, কচুয়ার গোয়ালমাঠ ও মোরেলগঞ্জের তেলিগাতী এলাকার দায়িত্ব প্রদান করা হয় সোহরাব হোসেনকে।[৯১]

স্বাধীনতা ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মুক্তিবাহিনীতে পরিণত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি জোরদার করেছিল। ২৭ মার্চ ১৯৭১ বরিশালের এমএনএ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর চিতলমারী হয়ে বাগেরহাট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বাগেরহাট আসেন। গল্লামারী রেডিও স্টেশন দখল করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে শেখ আবদুর রহমানের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। এর পরের দিন ২৮ মার্চ শনিবার বাগেরহাট এসে পৌঁছান পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা ট্যাঙ্ক মেজর এম এ জলিল। তার সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন ইমাম মেহেদী, ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা, নায়েক সুবেদার সিদ্দিক সহ পাঁচ-ছয় জনের একটি দল। এদের সঙ্গে একটি এস এম জিসহ কয়েকটি হালকা অস্ত্র ছিল। আমলাপাড়া শেখ আবদুর রহমান সাহেবের বাসায় এসে তারা ওঠেন এবং গভীর রাত পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ২৯ মার্চ সকালে মেজর জলিলকে নাগেরবাড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। নাগেরবাড়ি ক্যাম্প থেকে প্রধানত ইপিআর এবং পুলিশ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের বেছে বেছে একটি শক্তিশালী দল গঠন করে মেজর জলিল তাদের নিয়ে বাগেরহাটের ষাটগুম্বজ মসজিদে যান। সেখানে নবনির্মিত রেস্ট হাউসে নতুন একটি ক্যাম্প গঠন করে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান করতে থাকেন।[৯২]

বাগেরহাটে সংগ্রাম কমিটি নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম অভিযান ছিল গল্লামারী বেতার কেন্দ্র অভিযান। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখলের খবরে অনুপ্রাণিত হয়ে মেজর এম এ জলিল খুলনার গল্লামারীতে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র দখল করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা জানতে পারেন যে, বাগেরহাট থানার সুনগর গ্রামনিবাসী বৃহত্তর খুলনার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কামরুজ্জামান টুকু শতাধিক অস্ত্র ও পঁচিশ জনের মতো একটি বাহিনী নিয়ে রূপসার নিকটবর্তী নেহালপুরের জাহানারা লজে ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। টুকুর দলের সহযোগিতা নিয়ে মেজর জলিলের পরিকল্পনা মোতাবেক ৪ এপ্রিল রাত ১০ টার পরে গল্লামারী বেতার কেন্দ্র দখলের জন্য অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা এই অভিযানে সাফল্য পাননি। গল্লামারী অভিযান ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় নাগেরবাড়ি ক্যাম্পে ফিরে আসেন। গল্লামারীর ব্যর্থতার জন্য হতোদ্যম বাগেরহাট সংগ্রাম কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার পর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এলাকা ত্যাগ করতে থাকেন।[৯৩] এমন অবস্থায় বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে আহ্বায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আব্দুস সত্তার খান, যুগ্ম-আহ্বায়ক হয়েছিলেন এস এম এ সবুর, খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আতিয়ার রহমান এবং অস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান।[৯৪]

নতুন কমিটির নেতৃত্বে বাগেরহাটে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হতে থাকে। অতঃপর এপ্রিলের ২৪ তারিখ বাগেরহাট শহর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়।[৯৫] শহরের নাগেরবাড়ি ক্যাম্পসহ সংগ্রাম কমিটি পরিচালিত অন্যান্য ক্যাম্পগুলো এরপর আর সক্রিয় থাকে নি। ক্যাম্পগুলোর মুক্তিযোদ্ধাগণ হয় বাগেরহাটের অন্যান্য থানায় অথবা ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যেতে শুরু করেন।[৯৬]

ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাগেরহাট মহকুমা সংগ্রাম কমিটিতে ভাসানী ন্যাপ নেতা শেখ আমজাদ আলী গোরাই সক্রিয় ছিলেন। গোরাই মিয়ার পরিচালনায় সংগ্রাম কমিটির আনসার ক্যাম্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলমান ছিল। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অন্যান্য অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কৃষক আন্দোলন কর্মী, ন্যাপনেতা রফিকুল ইসলাম খোকন। রফিক ব্যক্তিগতভাবে মহকুমা সংগ্রাম কমিটির

সাথে যুক্ত না থাকলেও সংগ্রাম কমিটি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে তার দলীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেককে অস্ত্র প্রশিক্ষণ করিয়েছিলেন।[৯৭] কিন্তু সংগ্রাম কমিটি গল্লামারী অভিযানে এবং নাগেরবাড়ি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে অস্ত্র বিতরণকালে বামপন্থী কর্মীদের নিকট অস্ত্র প্রদান না করলে রফিক সংগ্রাম কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিবাহিনীর সমান্তরালে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এই উদ্যোগ আরো গতি লাভ করে যখন মহকুমা সংগ্রাম কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় দেশের মাটিতে থেকে দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে মোকাবেলার অভিপ্রায়ে রফিক ও তার ১১ জন সহযোদ্ধা ১৯ এপ্রিল বাগেরহাট শহর ত্যাগ করে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয়গাছি-রঘুনাথপুর এলাকায় গমন করেন। সেখান থেকে তারা চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর এলাকায় চলে আসেন এবং একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে তোলেন। এই দল ধীরে ধীরে 'রফিক বাহিনী' বা 'খোকন বাহিনী'[৯৮] নামে পরিচিতি লাভ করে।

সংগঠন

বাগেরহাটে সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অকার্যকর হওয়ার পূর্বেই মোহাম্মদ যুবায়ের নোমা, শঙ্কর বিশ্বাস, খসরু, আসাদসহ ১১ জনকে সাথে নিয়ে রফিকুল ইসলাম খোকন জয়গাছি-রঘুনাথপুর ডা. কৃষ্ণপদ ব্যানার্জির বাড়িতে পৌঁছান। সেখান থেকে ঐ দিনই রফিক তার সঙ্গীদের নিয়ে চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর হাই স্কুলে এসে ওঠেন।[৯৯] চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর বাগেরহাটের দড়াটানা নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত। শহর থেকে এ স্থানের দূরত্ব প্রায় ৭ কি.মি.। ভৌগোলিক দিক থেকে হাই স্কুলে অবস্থিত গেরিলা ঘাঁটিটি ছিল তুলনামূলক নিরাপদ। এর তিন দিক দিয়ে বিরাট জলাভূমি এলাকা ছিল। সুতরাং এক দিকে পাহারা দিয়েই এই ঘাঁটি নিরাপদ রাখা যেত।

বাহিনী গঠনের শুরুতে এ বাহিনীর সবাই ছিলেন ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির সক্রিয় সদস্য।[১০০] এদের মধ্যে অন্যতম হলেন আসাদ, যুবায়ের, কৃষ্ণপদ, আলিমুদ্দিন মোল্লা, ইসমাইল হোসেন মেজো, শঙ্কর, শেখর, নিশো, কৃষ্ণপদ ব্যানার্জি, বেল্লাল, মোশাররফ, আবদুল মজিদ, দাদা মজিদ, সুশান্ত মজুমদার, আবু বকর সিদ্দিক, রতন ঘোষ, বাদল, বাচ্চু, মিলন, মন্টু, তোফাজ্জেল, মকছুদ, হায়াত গজনবী, মুজিবুর রহমান পাইক, আব্দুল মজিদ পাইক, শেখ রেজাউল রহমান, শেখ আবু তালেব প্রমুখ। এদের পাশাপাশি মে মাসের প্রথম দিকে রফিক বাহিনীতে পিরোজপুরের ওবায়েদুল কবির, বাদল, তোফাজ্জেল হোসেন, মঞ্জু, নূর দিদা খালেদ রবি, সমীর কুমার, বাচ্চু, শহীদুল হক চাঁন, সামসুদ্দোহা মিলন, শহীদুল হকসহ বেশ কিছু বামপন্থি মুক্তিযোদ্ধা যোগ দেন।[১০১]

রফিক বাহিনীতে সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন কৃষক পরিবারের সন্তান।[১০২] এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ রফিক বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন রফিকুল ইসলাম খোকন এবং সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শেখ আনিছুর রহমান।[১০৩] চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর হাই স্কুল কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা এই বাহিনী প্রথম দিকে উল্লিখিত কাঠামো অনুসরণ করে চলে। তবে বাহিনীতে সদস্য ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি পেলে বাহিনীকে আরো বিস্তৃত পরিসরে সাজানো হয়। বাগেরহাট শহরের বুক চিরে প্রবাহিত ভৈরব-দড়াটানা নদীর উত্তর তীরে বিষ্ণুপুরের খালিশপুর গ্রামে ছিল এই বিপ্লবী যোদ্ধাদের সদর দপ্তর। অন্য দুটি ঘাঁটি ছিল সন্তোষপুর প্রাইমারি স্কুল ও চিতলমারীর ইউনিয়নের সুড়িগাতী গ্রামে।[১০৪]

প্রতিরক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে রফিক বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। এই বিভাগের সদস্যবৃন্দ দুধওয়ালা, মাঝি, পিওন প্রভৃতি বেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির খবরা-খবর সংগ্রহ করতেন।[১০৫]

রফিক বাহিনীতে একটি ‘আত্মঘাতি গেরিলা দল’ গঠন করা হয়। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন যুবায়ের, ওবায়েদুল, কাদের, বাদল, সমীর, বাচ্চু, মান্নান, ইসমাইল হোসেন মোঝো, কৃষ্ণপদ, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। বিশেষ বিশেষ অভিযানে এদেরকে পাঠানো হতো। বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধে এ ধরনের গেরিলা দল গঠনের একমাত্র কৃতিত্ব রফিক বাহিনীর।

রফিক বাহিনীতে একটি অস্থায়ী মেডিক্যাল টিম কাজ করত। আহত মুক্তিযোদ্ধা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদেরকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করত এই টিম। বাগেরহাটের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মো. বদিউজ্জামান রফিক বাহিনীর প্রধান চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন। তবে তিনি ক্যাম্পে অবস্থান করতেন না। গোপনে সুযোগ মতো তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা দিতেন। ডা. বদিউজ্জামানের সহযোগী মাঝিডাঙ্গা নিবাসী মো. শুকুর আলীও এ ব্যাপারে বেশ তৎপর ছিলেন। শুধু চিকিৎসা নয়, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করতেন।[১০৬]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

রফিক বাহিনীর ভ্রুণ গঠিত হয়েছিল কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে। আর সেই ভ্রুণ থেকে একটি সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের সূত্রপাত ঘটে বাগেরহাট মহকুমা সংগ্রাম কমিটি নিয়ন্ত্রিত শহরের আনসার ক্যাম্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই আনসার ক্যাম্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন ভাসানী ন্যাপ নেতা শেখ আমজাদ আলী গোরাই। তার সহযোগীর ভূমিকায় থাকাকালে রফিকুল ইসলাম খোকন নিজ মতাদর্শী বহু ছাত্র-যুবককে অস্ত্র প্রশিক্ষণ করিয়েছিলেন। প্রধানত ছাত্র-যুবকদের রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র চালনা শেখানো ছিল আনসার ক্যাম্পের অন্যতম কর্মসূচি। এছাড়া বিস্ফোরক তৈরি ও গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষাদানও এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রফিকের অনুসারী বামপন্থি ক্যাডারগণ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিবিধ কলাকৌশল শেখেন। এরপর ২৪ এপ্রিল বাগেরহাট শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলে চলে গেলে রফিক বাহিনীর সদস্যরা আর শহরে থাকেননি। ইতোপূর্বে ১৯ এপ্রিল তারা বাগেরহাট ত্যাগ করে চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরে ঘাঁটি স্থানান্তর করেন। বিষ্ণুপুরের খালিশপুর ও চিতলমারির সুড়িগাতি নামক স্থানে রফিক বাহিনীর অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।[১০৭] এই কাজে স্থানীয় জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। এরপর রফিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে অত্র এলাকার উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাহিনীর লোকবল বৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় শত শত ব্যক্তিকে দুই-তিন সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান চলতে থাকে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধাগণ রাইফেল, লাইট মেশিনগান, হ্যান্ড গ্রেনেড, বিস্ফোরক দ্রব্য কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শিখে নেন। এছাড়া তাদেরকে এ্যামবুশের কৌশল ও রণাঙ্গণের বিবিধ কৌশল শেখানো হয়।[১০৮] উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাদেও রফিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে হালিশহর, ডিংশিপাড়া, জয়গাছি, রঘুনাথপুর, বানিয়াগাঁতি, সুলতানপুর, দেবীরবাজার, সন্তোষপুর, গোটাপাড়ার বাবুরহাট প্রভৃতি গ্রামে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্যাম্প ছিল।[১০৯]

রফিক বাহিনী গঠনের প্রথমদিকে বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইপিআর-এর প্রাক্তন সদস্য পিরোজপুরের সুলতান আহমদ। পরে এ পদে আসেন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার এ কে এম তাজুল ইসলাম। তিনি কিছু স্বেচ্ছাসেবকসহ রফিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং এই বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষণের ভার নেন। সুবেদার তাজুল ইসলাম ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ও পরবর্তীকালে বাগেরহাট সাব-সেক্টর কমান্ডার।[১১০]

শুরুতে রফিক বাহিনীর সদস্য আসাদের নিকট একটি রিভলবার ছিল, অন্য কারো কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। এই রিভলবারটি সংগ্রহ করা হয়েছিল খুলনা অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার পর। অস্ত্রটি ১৫০ টাকা দিয়ে আসাদ কিনে নিয়েছিলেন।[১১১] এ পর্যায়ে রফিক অস্ত্রের জন্য ফকিরহাট থানাধীন

বাহিরদিয়ায় তার সহযোগী মানস ঘোষ ও পিরোজপুরের ফজলুল হক খোকনের সাথে যোগাযোগ করেন। ইতোমধ্যে ফজলু ২৬ মার্চ পিরোজপুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফলে বেশ কিছু অস্ত্র পান। তিনি সেখান থেকে ১৯টি ৩০৩ রাইফেল ও গোলাবারুদ রফিকের নিকট পাঠিয়ে দেন।[১১২] এরপর পার্শ্ববর্তী ডেমা এলাকা থেকে পাওয়া যায় ৬টি ৩০৩ রাইফেল। এছাড়া বারুইপাড়ার মোশাররফ মিয়ার বাড়ি থেকে ১টি ব্যাটাগান ও কিছু গোলাবারুদ পাওয়া যায়।[১১৩] ২৭ এপ্রিল রফিক কয়েকজন সহযোগীসহ বাগেরহাট শহরের ফাইন আর্ট প্রেসের নিকট অতর্কিতে পুলিশের ওপর হামলা চাপিয়ে ৫টি রাইফেল এবং বিষ্ণুপুর ফেরার পথে একজন আনসার সদস্যের নিকট থেকে ১টি রাইফেল ছিনিয়ে নেন।[১১৪] এই অভিযানে রফিকের সঙ্গী ছিলেন গোলাম মোস্তফা হিল্লোল, শঙ্কর বিশ্বাস, নিশু ও কুটি। তাছাড়া রফিক বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রের ঘাটতি দূর করতে নিজেদের উদ্যোগে অস্ত্র ও বোমা তৈরির উদ্যোগ নেন। এই প্রচেষ্টায় তারা একই ধরনের পাইপ বোমা তৈরি করেন। এই বোমার ফর্মুলা তারা পেয়েছিলেন ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ খান মেননের নিকট থেকে। এই অস্ত্র তৈরিতে ১২ ইঞ্চি লম্বা একটি টিউবওয়েলের পাইপ ও বিস্ফোরক প্রয়োজন হতো। এই বোমা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন আসাদুল হক। এই বোমা তৈরি হত রফিক বাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে।[১১৫]

রফিক বাহিনীতে দলপ্রধান নছু মিয়া নামের একজন অস্ত্র মেকানিককে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই নছু মিয়া একসময় ভারতের ইছুপুর গান ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। রফিক বাহিনীর সদস্যরা সেসব পুরাতন রাইফেল সংগ্রহ করেছিলেন, নছু মিয়া সেগুলো মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছিলেন।[১১৬] এভাবেই রফিক বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এরপর শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করেও অসংখ্য অস্ত্র এই বাহিনী সংগ্রহ করে।

আওতাভুক্ত এলাকা

রফিক বাহিনীর যাত্রা চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে শুরু হলেও আস্তে আস্তে এ বাহিনীর কার্য পরিধি বেড়েছিল। মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোরূপ সহযোগিতা বাদেই এই বাহিনী বাগেরহাটের ১০০ থেকে ১৫০ কি.মি. এলাকা দখলে রাখতে পেরেছিল। বাহিনীর আয়ত্তে থাকা এই এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা তাদের সহযোগী শক্তি মাঝে মাঝে ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনা করলেও কখনোই স্থায়ী কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। সে অর্থে উল্লিখিত সীমানাকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে গণ্য করা যায়। এ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে কোনো এলাকা তো হারানই নি বরং নতুন নতুন এলাকা বাহিনীর অধিকারে এনেছিল। এ বাহিনীর তৎপরতায় মুনিগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে চিতলমারী পর্যন্ত বিরাট এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠে। এই সীমানার মধ্যে ছিল গোটাপাড়া, বিষ্ণুপুর, চিতলমারী, ধোপাখালী, বেমত্যা, সন্তোষপুর, চরবানিয়া প্রভৃতি।[১১৭]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

রফিক বাহিনী এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছোটো-বড় কমপক্ষে ২০টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ ও সম্মুখ যুদ্ধ দুই প্রকার যুদ্ধই রয়েছে। রফিক বাহিনী এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতির পাশাপাশি প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। এছাড়া কৌশলগত কারণে রফিক বাহিনী মুজিবনগর সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট মুক্তিযোদ্ধা দলগুলোর সাথেও যৌথভাবে পাকিস্তানি

সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। নিম্নে এই বাহিনীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হলো:

বাগেরহাট থানা অভিযান[১১৮]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ০১ মে রাত ১২টা ১ মিনিট।

অভিযানের উদ্দেশ্য: বাগেরহাট মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ অজিয়র রহমান ২৪ এপ্রিলের পর রফিক বাহিনীর ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। এরপর এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি বাগেরহাটে আসেন ও পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাকে মুক্ত করতে ছাত্রলীগ নেতা ও পরবর্তীকালে মুজিব বাহিনীর বাগেরহাট অঞ্চলের প্রধান কামরুজ্জামান টুকু রফিক বাহিনীর সহযোগিতা চান। এরপর উভয়পক্ষ আলোচনা করে যৌথভাবে অজিয়র রহমানকে মুক্ত করতে যুগপৎ বাগেরহাট থানা ও জেলখানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এ অভিযানে রফিক বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বাগেরহাট থানা আক্রমণ করে পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখা।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: রফিক বাহিনীর রফিকুল ইসলাম খোকন, মোহাম্মদ যুবায়ের, শহীদ, গোবিন্দ, মধু, আসাদ, খসরু, মুজিবুল, আনিসুর রহমানসহ ২০/২২ জন যোদ্ধা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এদের নিকট ৩০৩ রাইফেল, পিস্তল ও কিছু হাত বোমা ছিল।

অভিযানের বিবরণ: যথাসময়ে রফিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা বাগেরহাট থানাকে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে থানার পুলিশ প্রথমদিকে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন। তবে আক্রান্ত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ শুরু হয়। এরপর উভয়পক্ষ বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় করে যায়।

ফলাফল: রফিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে বেশ কয়েকজন পুলিশ নিহত ও আহত হন এবং রফিক বাহিনীর যোদ্ধাগণ সম্পূর্ণ অক্ষত থাকেন। রফিক বাহিনী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। কেননা তারা থানার পুলিশকে ঠিকমতোই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই অভিযানটি ফলপ্রসু হয়নি। কামরুজ্জামান টুকুর দলটি জেলখানা আক্রমণ করলেও অজিয়র রহমানকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে অজিয়র রহমানকে আর জীবিত পাওয়া যায়নি।

কচুয়া থানা অভিযান[১১৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন রাত আনুমানিক ১০ টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: রফিক বাহিনীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তাজুল ইসলাম, যুবায়ের, কেষ্ট ব্যানার্জী, কান্ত, আবু মনসুর, কুদ্দুস, এম এ এইচ সেলিম, নিরোদ, মুজিবর, বাচ্চু, বাদল, নবিরুদ্দিন, শঙ্কর, সিরাজ, হাবিব, তৈয়ব খাঁ, সালেক, খসরুসহ আরো কয়েকজন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট ৩০৩ রাইফেল, ব্যাটাগান, হাত বোমা ও পাইপ বোমা ছিল।

অভিযানের বর্ণনা: মুক্তিযোদ্ধারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে থানা অভিযান পরিচালনা করেন। এদের একটি দল কাভারিং ফায়ারিং দিতে থাকে এবং অন্য দল গুলি করতে করতে থানায় প্রবেশ করে। থানার টেলিফোন লাইনটি অকেজো করে দেওয়া হয়। থানার পুলিশ সদস্যরা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার পূর্বেই সবাইকে অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য করা হয়।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের নূন্যতম ক্ষতি বাদেই এই অভিযান থেকে ৮টি ৩০৩ রাইফেল, ২টি স্টেনগান ও ১টি রিভলবার সংগ্রহ করেন।

মাধবকাঠি অভিযান[১২০]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৭ আগস্ট ভোরবেলা অভিযান শুরু হয়।

অভিযানের উদ্দেশ্য: মাধবকাঠি কচুয়া থানার ধোপাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম। এখানে বহু পুরোনো একটি মাদ্রাসা ছিল। বাগেরহাটে রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের উদ্যোগে মাধবকাঠি মাদ্রাসায় জুলাই মাসে একটি রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাধবকাঠি রাজাকার ক্যাম্প কৌশলগতভাবে রফিক বাহিনী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলগুলোর জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল। তাই এই রাজাকার ক্যাম্প উৎখাত করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: মাধবকাঠি রাজাকার ক্যাম্প উৎখাত অভিযানটি অত্র এলাকার মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করেছিলেন। এই অভিযানে রফিক বাহিনীর একটি দল, হাবিবুর রহমানের একটি দল ও শামসুল হকের একটি দল অংশ নেয়। এদের কাছে ৩০৩ রাইফেল, স্টেনগান, রিভলবার ও হাতবোমা ছিল।

অভিযানের বিবরণ: মাধবকাঠি রাজাকার ক্যাম্পে দেড়শ এর অধিক রাজাকার অবস্থান করছিল। ৭ আগস্ট ভোর নাগাদ পূর্ব পরিকল্পনামাফিক রফিক বাহিনী মাদ্রাসার দক্ষিণ দিক থেকে, হবির দল পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। এদের সাথে শামসুল হকের বাহিনীও যুক্ত হয়। রাজাকাররাও প্রতিরোধ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে শোনা যায় যে, বাগেরহাট থেকে সড়কপথে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আসছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী নদী থেকে গানবোট আসার শব্দও শোনা যায়। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদল কয়েকভাবে বিভক্ত হয়ে সড়ক পথে ও নিকটবর্তী খালের পাড়ে অবস্থান নেয়। কিন্তু সড়কপথে বা নদীপথে কোনো পাকিস্তানি সৈন্যই অবশেষে আসেননি। এই সুযোগে রাজাকাররা পালিয়ে যায়।

ফলাফল: এই অভিযানের পর মাধবকাঠি মাদ্রাসা থেকে রাজাকার ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে দেখা যায়। মাধবকাঠি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের মোট ১৯ জন নিহত হয় ও বহুজন আহত হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন সামান্য আহত হয়েছিলেন।

পানিঘাট অভিযান[১২১]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৯ সেপ্টেম্বর সকাল।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পানিঘাট বাগেরহাটের যাত্রাপুর থানাধীন বিষ্ণুপুর ইউনিয়নভুক্ত নদী-নালাপূর্ণ একটি স্থান। এখানে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই রফিক বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। অন্যদিকে অপরপক্ষ এই স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। শত্রুপক্ষের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতেই রফিক বাহিনীর এই পানিঘাট অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: রফিক বাহিনীর ইসমাইল হোসেন মেঝো, কৃষ্ণদাস, যুবায়ের, সুশান্ত মজুমদারসহ অনেকে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাছাড়া, রফিক বাহিনীর সমর্থনে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা দলও এগিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধ উপকরণ হিসেবে স্টেনগান, ৩০৩ রাইফেল, পাইপবোমা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট ছিল।

অভিযানের বিবরণ: পানিঘাট অঞ্চলটি নদী-নালা-খাল-ঘেরা হওয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল লঞ্চে করে এ স্থানে আসে। আর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন খালের পাড়ে ট্রেঞ্চে মুক্তিযোদ্ধাগণ অবস্থান নিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জে এসে পড়লে মুক্তিযোদ্ধারাও বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুর দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আঘাতে শত্রুপক্ষ লঞ্চ ঘুরিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর আরো কয়েক দফায় তারা পানিঘাটে অবতরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু, প্রতিবারই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মার খেয়ে পিছিয়ে যান। প্রায় সারাদিন ধরে উভয়পক্ষে এই যুদ্ধ চলেছিল।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্যের ১৬ জন এবং কয়েকজন রাজাকার নিহত হন। শহরে কার্ফ্যু জারি করে এসব লাশ সংগ্রহ ও কবর দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে নবীরউদ্দিন এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।

বাবুরহাট অভিযান[১২২]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৩০ অক্টোবর দুপুরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও রাজাকাররা প্রায়ই বাগেরহাট মহকুমার গোটাপাড়া ইউনিয়নের বাবুর হাটের দিক থেকে চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য অভিযান চালাত। ৩০ অক্টোবরও এই উদ্দেশ্যে তারা বাবুরহাট বাজার হয়ে এক দল ও পানিঘাট হয়ে আরেক দল বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের এই অভিযান ব্যর্থ করতেই রফিক বাহিনীর বাবুরহাট অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: রফিক বাহিনীর সুশান্ত মজুমদার, যুবায়ের, আকবর, কুদ্দুস, সালাম, ইসমাইল হোসেন মেঝো, আকো ওহাব, আকো (২) প্রমুখ এই যুদ্ধে অংশ নেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাদের নিকট ছিল স্টেনগান, ৩০৩ রাইফেল, পিস্তল, পাইপ বোমা ইত্যাদি।

অভিযানের বিবরণ: রফিক বাহিনীর বিষ্ণুপুর ঘাঁটি আক্রমণের জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর বড় একটি দল মুক্ষাইট হয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে অগ্রসর হয়। এই দলকে রাজাকারের পোষাক পরিহিত দবিরউদ্দিন নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা বিভ্রান্ত করে ভিন্ন পথে নিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির রেঞ্জে নিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আঘাতে পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পালায়। পাকিস্তানি বাহিনীর অন্য একটি গ্রুপ বাবুরহাট ব্রিজের কাছে এসে রফিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। দু'পক্ষই এখানে ঘণ্টা খানেক গুলি বিনিময় করে।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে শত্রুসৈন্যের ১ জন ক্যাপ্টেনসহ ৪ জন সৈন্য ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

উল্লিখিত যুদ্ধসমূহের বাইরে রফিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি কৃতিত্ব হল বাগেরহাটের 'রাজাকার মেজর' হিসেবে পরিচিত কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার রজ্জব আলীর উপর আক্রমণ। রজ্জব আলী বাগেরহাটে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর দেশীয় দালালদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও একইসাথে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ব্যক্তি ছিলেন। বাগেরহাটে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, গণহত্যা ও সকল প্রকার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান পরিকল্পক ও বাস্তবায়নকারী ছিলেন রজ্জব আলী ফকির। রফিক বাহিনীর 'সুইসাইডাল স্কোয়াড' জুলাই মাসের ১০ তারিখ বাগেরহাট সার্কিট হাউজের সামনে রজ্জব আলীকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ চালায়। এ ধরনের প্রচেষ্টা বাগেরহাটে এই প্রথমবারের মত নেওয়া হয়েছিল। যদিও রজ্জব আলী ঐ আক্রমণে নিহত হননি, তবুও ঐ অভিযান রফিক বাহিনী তো বটেই, বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থনকারী সব পক্ষকেই দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল।[১২৩] এর ফলে জুলাই মাসের পর থেকে বাগেরহাটে রাজাকার বাহিনীর কর্মকাণ্ড কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ ঐ ঘটনায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। রফিক বাহিনীর অভিযানসমূহের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য

ছিল বাহিরদিয়ায় রাজাকার-বহনকারী বিশেষ ট্রেনে আক্রমণ, দেপাড়া ব্রিজের যুদ্ধ, আলাইপুরের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ, বাবুরহাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, মুক্ষাইট যুদ্ধ, মাধবকাঠি মাদ্রাসা যুদ্ধ, বাঁশতলা ব্রিজের যুদ্ধ ইত্যাদি।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে রফিক বাহিনী কোনো পত্রিকা বা প্রকাশনা বের করেনি। তবে এই বাহিনী কয়েক ধাপে হ্যান্ডবিল, প্রচারপত্র ও জনযুদ্ধের নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য যে, বাগেরহাটের রাজাকার কমান্ডার রজ্জব আলী ফকিরের ওপর এই বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণের খবর লিফলেট আকারে ছেপে প্রচার করা হয়েছিল।[১২৪]

যুদ্ধাহত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা

রফিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে খুব কম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধে এই বাহিনীর দুইজন বীর যোদ্ধা নবীরউদ্দিন (পৌনিঘাটের যুদ্ধে) ও বিজয় পাল (পশ্চিমভাগ যুদ্ধে) শহিদ হয়েছিলেন। এছাড়া, বাহিনীর রফিকুল ইসলাম খোকন ও বেশ কয়েকজন যুদ্ধে আহত হয়ে ছিলেন। আর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেমসাইডের ঘটনায় রফিক বাহিনীর গোলাম মোস্তফা হিল্লোল ও মজবুল নিহত হয়েছিলেন।[১২৫]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

রফিক বাহিনী প্রধান রফিকুল ইসলাম খোকন ও তার দলের শুরুর দিকের বেশ বড় অংশের মুক্তিযোদ্ধারা আদর্শে বামপন্থি ছিলেন। মধ্যপন্থি আওয়ামী লীগের সাথে তাদের আদর্শগত পার্থক্য ছিল এটাও ঠিক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে রফিক বাহিনীর সদস্যগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ নিয়েছিলেন। তারা কখনোই মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেননি বা তাদেরকে অস্বীকার করেননি। তাছাড়া আওয়ামী লীগের বাগেরহাট মহকুমা শাখার নেতৃবৃন্দও রফিকুল ইসলাম পরিচালিত রফিক বাহিনীকে বাধা দেননি। উপরন্তু, বাগেরহাট ২৪ এপ্রিল শত্রুসৈন্যের দখলে চলে গেলে মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ অজিয়র রহমান রফিক বাহিনী চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১২৬] এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুজিব বাহিনীর একাংশের সাথেও এই বাহিনী সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা করে শত্রুসৈন্যের মোকাবেলা করেছিল।[১২৭] তবে, স্বীকার করতেই হবে যে, রফিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না।

গণমাধ্যমে রফিক বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধকালে দেশি বা বিদেশি গণমাধ্যমে রফিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো খবর প্রকাশিত হয়নি।[১২৮]

বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

রফিক বাহিনীর কোনো সদস্য সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাননি। বরং এ বাহিনীর অন্তত বিশজন সদস্য এখনো মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি।[১২৯]

অস্ত্র সমর্পণ

রফিক বাহিনী যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, সেহেতু এ বাহিনীর যোদ্ধাগণ সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধির নিকট অস্ত্র জমা দেননি। ২৯ ডিসেম্বর এই সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল গ্রেপ্তারকৃত হলে ও এর কিছুদিন পর বাগেরহাট সাব-সেক্টর কমান্ডার তাজুল

ইসলাম গ্রেফতারকৃত হলে রফিক বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক হয়ে পড়েন। এর মধ্যে বাগেরহাটে রফিক বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে আটক করা হলে রফিক বাহিনী পুনরায় চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে অবস্থান নেন। এর কিছুদিন পর তারা ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। অবশেষে **১৯৭২**সালের **৩১** জানুয়ারি রফিক বাহিনীর যোদ্ধাগণ রাশেদ খান মেননের উপস্থিতিতে বাগেরহাট মহকুমা প্রশাসকের নিকট বেশকিছু অস্ত্র সমর্পণ করেন।[১৩০] পরবর্তীকালে **১৯৭৩** সালের মাঝামাঝি সময়ে রক্ষী বাহিনীর তৎপরতা ও পার্টির সিদ্ধান্তে বাগেরহাট টেনিস গ্রাউন্ডে সংরক্ষিত অস্ত্রের ভাণ্ডার আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও যশোরের তৎকালীন জিওসি ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর বীর উত্তম-এর উপস্থিতিতে জমা দেয়া হয়।[১৩১]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালে বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট ও চিতলমারী থানার বৃহদাংশে রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনী অত্যন্ত কার্যকরভাবে অত্র এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদেরকে মোকাবেলা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধেও সূচনাপর্ব থেকে বিজয় অর্জন অবধি এই বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের কোনোরূপ সহযোগিতা বাদেই কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। এই সময়ে রফিক বাহিনীর মূল আশ্রয় হয়েছিল স্থানীয় জনতা। এই বাহিনীর যোদ্ধাগণ জনগণের মাঝেই সব সময় অবস্থান করেছিলেন। অত্র এলাকায় জনগণ এবং বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, কখনোই একে অন্যকে পরিত্যাগ করেনি।

রফিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে স্থানীয়ভাবে প্রায় চারশত মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সংখ্যার বিচারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধার সংখ্যা কিছু কম মনে হলেও সময়, পরিবেশ এবং উল্লিখিত সংখ্যক সদস্যের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা বিচারে তা সন্দেহাতীতভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। যদিও এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে দলে সদস্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিচারে কৃষক-শ্রমিক পরিবারের সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন, তবে পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগে এই দল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

রফিক বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকায় জনগণের সম্পদ, সম্মান ও প্রাণ বাঁচানোর জন্য সর্বদা তৎপর ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বাহিনী তার আওতাভুক্ত এলাকায় পাকিস্তানের সমর্থক দালাল-রাজাকারদের কয়েকজনকে চরমতম শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড' দিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করেছিল।[১৩২] এছাড়া স্থানীয় জনগণকে ডাকাত-লুটেরাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এই দল নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করেছিল। এর ফলে অত্র এলাকার বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ তুলনামূলক নিরাপদে দিনযাপন করতে পেরেছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে রফিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত (আহত, নিহত, উদ্দেশ্য সাধনে বাধাপ্রাপ্ত, ইত্যাদি) পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার দল প্রতিহিংসা বাস্তবায়নে বহুবার এই দলের মূল ঘাঁটি এলাকা চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরে হামলা চালিয়েছিল। হামলাকালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা গণহত্যা চালিয়েছিল, অগ্নিসংযোগ করেছিল ও নারী নির্যাতন করেছিল। স্থানীয় জনতার ওপর দখলদার বাহিনীর এই গণহত্যা-নির্যাতনের কারণ ছিল মূলত রফিক বাহিনী। সুতরাং এই বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শত্রুপক্ষ সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের দায় পরোক্ষে হলেও কিছুটা এই বাহিনীর ওপর বর্তে। তাছাড়া এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দের বৃহৎ অংশ রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন আদর্শের হওয়ায় কখনো কখনো এ বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশের বৈরি আচরণের শিকার হয়েছিল।[১৩৩]

বাগেরহাটের মুক্তিযুদ্ধে প্রভূতভাবে ভূমিকা রাখা রফিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ন্যূনতম সহযোগিতাও পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পরে এ বাহিনীর কোনো সদস্যই রাষ্ট্রীয় খেতাব বা পুরস্কার পাননি। এমনকি এই বাহিনীর প্রায় বিশজন সদস্য আজো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ এই মুক্তিযোদ্ধা দলের অবদান অনেকাংশেই অস্বীকৃত রয়েছে বলা যায়।

জিয়া বাহিনী

সুন্দরবন

মুক্তিযুদ্ধকালে সুন্দরবন ও নিকটবর্তী এলাকায় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় একটি আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে। মুক্তিদল গড়ে তেলার এই প্রচেষ্টায় জিয়াউদ্দিন সহযোগিতা পেয়েছিলেন স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধপন্থি নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের। এই মুক্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউদ্দিন আহমেদের নামানুসারে এই বাহিনীর পরিচিতি গড়ে ওঠে 'জিয়া বাহিনী' নামে।

জিয়াউদ্দিন আহমেদের পরিবার প্রদত্ত নাম ছিল আবুল মোমেনীন জিয়াউদ্দিন আহমেদ। কিন্তু নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করার সময় পরিবারের সম্মতিতে উক্ত নাম বদলে আলী হায়দার জিয়াউদ্দিন আহমদ করা হয়।[১৩৪] জিয়াউদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৫০ এর ডিসেম্বরে তৎকালীন বরিশাল জেলাধীন পিরোজপুর মহকুমা শহরে। তার পিতা আফতাব উদ্দিন আহমেদ পেশায় ছিলেন আইনজীবী। আফতাব উদ্দিন আহমেদ ছিলেন পিরোজপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।[১৩৫] তিনি বাইশ বছরাধিক পিরোজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং কয়েক বছর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ পিরোজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। মাধ্যমিকের ছাত্র থাকাকালেই তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ছয়-দফা আন্দোলনে সক্রিয় হন। এরপর তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে এই সংগঠনের পিরোজপুর মহকুমা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আগরতলা মামলা বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে কয়েক ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা হয়।[১৩৬] ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে মুক্ত আগরতলা মামলার ২ নয় আসামী পিরোজপুরের সন্তান লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে পিরোজপুরবাসী গণ-সংবর্ধনা প্রদান করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনাকারী ও আয়োজক ছিলেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও তৎকালীন ছাত্রনেতৃবৃন্দ।

পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৬৯ এর শেষ দিকে পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র থাকা কালে। ১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি ক্যাডেট কোর্স সম্পন্ন করেন এবং লেফটেন্যান্ট হিসেবে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদেন।[১৩৭] ১৯৭১ এর ২০ মার্চ তিনি ছুটি নিয়ে পিরোজপুর আসেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এতে জড়িয়ে পড়েন। তার নেতৃত্বে সুন্দরবনে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প গড়ে ওঠে। ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রেক্ষাপট

জিয়াউদ্দিন আহমেদ ছাত্র থাকাকালীন শ্রেণিকক্ষে ও বিভিন্ন সভা-সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্যের কথা শুনতেন। আর বাংলা ভাষার মার্যাদা রক্ষার আন্দোলনের প্রতীকী দিন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' পালনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সরকারের নিড়ীপনমূলক পদক্ষেপতো জিয়াউদ্দিন ব্যক্তিগতভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি প্রকৃত সত্যটি ব্যক্তিগতভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধানটা খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি। শোষণের চিত্রটা তখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমাদের সামনে। বাঙালী বিদ্বেষ, বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা, বাঙালীকে নিচু জাতি মনে করা পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরকম মানসিকতা আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগাতো। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তনে তার পাঁচ ভাগও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে করা হয় নি। পাকিস্তানের হাজার হাজার মাইল রাস্তা পাকা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ সে আমলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে অদূরবর্তী মানিকগঞ্জে যাওয়ায় ছিল খুব দূরূহ ব্যাপার। সেই মুড়ির টিনের বাস আর সেই ইটের খোয়া বিছানো ভাঙা রাস্তা, তাও সিঙ্গেল ট্র্যাক। একটা বাস আরেকটা বাসকে সাইড দিতে গেলে কাঁচা মাটিতে নেমে পড়তে হতো। আর সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশগুলো বিশাল হাইওয়ে দ্বারা যুক্ত একটা আরেকটার সঙ্গে। রাস্তা ঘাটের এই উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় অর্থনীতির একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তখনই তৈরি হয়ে গেছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে কিছুই করেনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। ... পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে গিয়ে ব্যাপারগুলো সামনা সামনি দেখে একেবারে সরাসরি বুঝতে পারতাম কী প্রবল বৈষম্য বিরাজমান দুই অংশের মধ্যে। আগেতো সব শুনতাম। শোনা আর সামনা সামনি দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য। ... ইসলামের দোহাই দিয়ে শাসক শ্রেণী যা ইচ্ছা তাই করে যাবে আর আমরা মুখ বুজে থাকবো, এটা কি করে সম্ভব? ইসলামের দোহাই দিয়ে তারা আপনার আদরের দুলালীকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, পাশবিক উল্লাসে তারা মাতাল হয়ে উঠবে আর আপনি ইসলামের দোহাই দিলেই সব কিছু ভুলে থাকবেন-একটানা ২৪ বছর ধরে এটা কি করে সম্ভব হলো এই প্রশ্নটা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানের প্রাথমিক দিনগুলোতে আমাকে খুব চিন্তিত করে তুলতো।[১৩৮]

দুই পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থা, তারতম্য-প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে তৎকালীন সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত কয়েক জন বাঙালি ক্যাডেট বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন।[১৩৯] তবে, শেষ পর্যন্ত এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি।

১৯৭০ এর নির্বাচন শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে সামরিক সরকারের দূরভিসন্ধির বিরুদ্ধে সারা বাংলার ন্যায় পিরোজপুরের মানুষও বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পিরোজপুর-কাউখালি-ভাণ্ডারিয়া-কাঁঠালিয়া আসনে আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান, বানারিপাড়া-নাজিরপুর-স্বরূপকাঠি আসনে আওয়ামী লীগ নেতা এ কে ফজলুল হক, বামনা-পাথরঘাটা-মঠবাড়িয়া আসনে আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট শামসুল হক এমএনএ নির্বাচিত।[১৪০] পিরোজপুরে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ভাণ্ডারিয়া আসনে আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম, বানারিপাড়ার একাংশ ও নাজিরপুর আসনে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল, মঠবাড়িয়া আসনে আওয়ামী লীগ নেতা সওগাতুল আলম সগীর, পিরোজপুর ও কাউখালি আসনে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. আব্দুল হাই, স্বরূপকাঠি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. শাহ মোজাহার উদ্দিন বিজয়ী হন।[১৪১] উল্লিখিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান, অ্যাডভোকেট শামসুল হক, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল, সওগাতুল আলম সগীর, ডা. আব্দুল হাই ও অন্যান্যের নেতৃত্বে মার্চের প্রথম থেকেই পিরোজপুরে নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হতে থাকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ মোজাফ্ফর, ন্যাপ (ওয়ালী), ছাত্র ইউনিয়ন জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে বেশ সক্রিয় ছিল।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা ধরে রাখার কূটকৌশলের বিরুদ্ধে ২ মার্চ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এর মাধ্যমে পিরোজপুরে প্রথম প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। এই সংগঠনের নেতাকর্মীরা বাঁশের লাঠি ও ডামি রাইফেল নিয়ে সদর রাস্তায় মহড়া দিলে পথচারী জনসাধারণ তাদেরকে করতালি দিয়ে

অভিনন্দন জানায়।[১৪২] ৩ মার্চ এমএনএ শামসুল হক, ছাত্রলীগ নেতা ওমর ফারুক, আওয়ামী লীগ নেতা বদিউল আলমের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কর্মীরা পাকিস্তানি পতাকায় আগুন ধরিয়ে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করে। মহকুমা আওয়ামী লীগ ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত হরতাল পালনসহ মিছিল-সমাবেশ-সভা ও নানা কর্মসূচি পালন করতে থাকে।[১৪৩] ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকায় সংঘটিত গণহত্যা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর বরিশাল থেকে এমএনএ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর টেলিফোনে ঐ রাতেই পিরোজপুরে পাঠান। এ সংবাদ পেয়ে এমএনএ অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান ছাত্রলীগ নেতা আ. মালেক খান আবুর'র মাধ্যমে সে রাতেই মাইক যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার চালান ও পরদিন বিকালের জনসভায় শহরবাসীকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান।[১৪৪] মধ্যরাতে এরকম ঘোষণা শুনে অন্যান্য অনেকের মতো জিয়া উদ্দিন আহমেদও বেশ চিন্তিত ও তৎপর হন। তিনি ইতোমধ্যে ২০ মার্চ পিরোজপুরে পৌঁছেছেন। ২৬ মার্চ সকালেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে এমএনএ এনায়েত হোসেন খানের সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। এ আলোচনা থেকে জিয়াউদ্দিন পরবর্তী করণীয় কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন নি। কিন্তু, এনায়েত হোসেন খানের সাথে আলোচনা, স্থানীয় জনগণের মানসিকতা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে জিয়াউদ্দিনের মনে হয়েছিল যে "বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা এসব অঞ্চলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিগুলো ২৫ তারিখ রাত এবং ২৬ তারিখের মধ্যেই স্বাধীনতা যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং নিজ নিজ সংগঠনকে সেভাবে প্রস্তুতও রেখেছে।"[১৪৫] ২৬ মার্চ দুপুর পর্যন্ত জিয়াউদ্দিনের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর দুটি গ্রুপের আলাদা আলাদা আলাপ হয়। এই আলাপের মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ কৌশল সংক্রান্ত।

২৬ মার্চ বিকালে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পিরোজপুর গোপাল কৃষ্ণ টাউন হল মাঠে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় এমএনএ এনায়েত হোসেন খানের আবেগময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষণে জনতা মহকুমা ট্রেজারি ও থানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুট করে।[১৪৬] এই কাজে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বেশ উদ্যোগী ছিল বলা হয়। ২৭ মার্চ পিরোজপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।[১৪৭] এই কমিটি আবার স্থানীয়ভাবে 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার' নামেও পরিচিত হয়। এই বিপ্লবী সরকারের প্রধান ছিলেন অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান এমএনএ। সরকারের অন্যান্য দায়িত্ব বিভাজিত ছিল ডা. আব্দুল হাই এমপিএ, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল এমপিএ, অ্যাডভোকেট আলী হায়দার খান (ন্যাপ-ওয়ালী) প্রমুখের মধ্যে। অ্যাডভোকেট আ. মান্নান (কমিউনিস্ট পার্টি) এর দায়িত্ব বিপ্লবী সরকার প্রধানকে সহায়তা করা।[১৪৮] এই সরকারের তরফে পিরোজপুর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় জিয়াউদ্দিন আহমেদকে।[১৪৯]

২৭ মার্চ সকালে মাইকিং করে পিরোজপুর স্কুল মাঠে একটি গণসমাবেশের আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের মূল বিষয় ছিল "স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন মুক্তিফৌজ গঠনের উদ্দেশ্যে আজ বিকেলে সরকারী স্কুল ময়দানে এক গণসমাবেশের আহ্বান জানাচ্ছে এবং গতকাল ট্রেজারী ও থানার অস্ত্র যারা পেয়েছেন তারা তাদের অস্ত্র নিয়ে সেখানে হাজির হবেন।"[১৫০] এই আহ্বানে ঐ দিন সরকারী স্কুল মাঠে কয়েক হাজার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী জড়ো হয়েছিলেন। এদের মধ্য থেকে প্রায় এক হাজার চারশ জনকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাছাই করা হলো। জমায়েতে আসা লোকজনের নিকট থেকে প্রায় সোয়া দুইশ রাইফেল জিয়াউদ্দিনের কাছে জমা পড়ল। এদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাদের বাছাই করা হলো তাদের মধ্যে দুই শতাধিক সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও আনসারের সদস্য ছিলেন।[১৫১] এই সমাবেশে বিপ্লবী সরকারের প্রধান অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খান এমএনএ কে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়।[১৫২] এবং এদিনই বাছাইকৃত যোদ্ধাদের কোম্পানি ও প্লাটুন ফরমেশন দেওয়া হয়।[১৫৩]

এরপর থেকেই বিপ্লবী সরকারের সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়। ২৮ মার্চ পিরোজপুর সরকারী বিদ্যালয়ে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।[১৫৪] এই ক্যাম্পটি আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় স্থাপন করা হয়। এছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে করিমুন্নেছা স্কুলে ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাম্প করা হয়। এর বাইরে ছাত্রলীগ কর্মীরা আলাদাভাবে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন পিরোজপুর পিটিআইতে। এই ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ কার্যে যুক্ত ছিলেন এ কে এম এ আউয়াল। আর সরকারী স্কুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ছিলেন সুবেদার তাজুল ইসলাম। এ সময় জিয়াউদ্দিন আহমেদ পিরোজপুরের উদ্যোগী শিক্ষিত নারী ও উচ্চ শিক্ষিত যুবক বা পেশাজীবীদের (বিশেষ করে শিক্ষক) জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছিলেন। গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়।[১৫৫] এছাড়া জিয়ার নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পিরোজপুর রায়েরকাঠি জমিদার বাড়ির জঙ্গলে, কালিকাঠি ও শঙ্করপাশা গ্রামে গোপন গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।[১৫৬] পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী মহকুমা ও থানা এলাকায় (মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, স্বরূপকাঠি, বানারীপাড়া, কাউখালী, বাগেরহাটের কচুয়া, শরণখোলা, মোরেলগঞ্জ) মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও গতিপ্রবাহ জানার জন্য যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। উল্লেখ্য, জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালন ব্যয়ের সিংহভাগই বিপ্লবী সরকারের তরফ থেকে নির্বাহ করা হয়েছিল। আর পিরোজপুরের তৎকালীন সেকেন্ড অফিসার মিজানুর রহমান (পরবর্তীকালে শহিদ) তার বিশেষ তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।[১৫৭]

খুলনার গল্লামারী বেতার কেন্দ্র অভিযান পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে মেজর এম এ জলিল বরিশাল থেকে বাগেরহাটে যাবার পথে পিরোজপুরে কিছু সময় অবস্থান করেন। এ সময় পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১৫৮] গল্লামারী অভিযানের জন্য পিরোজপুরের নির্বাচিত কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে মেজর জলিলের সাথে পাঠানো হয়। এপ্রিলের ১০ তারিখ শেখ আবু নাসের, সিরাজুল আলম খান (ছাত্রনেতা), নড়াইলের এসডিও কামাল উদ্দীন আহমেদ পিরোজপুর আসেন। জিয়াউদ্দিন আহমেদের সাথে দেখা হলে নাসের সাহেব তাকে বেশ কিছু অস্ত্র প্রদান করেন। এসব অস্ত্রের মধ্যে সেমি অটোমেটিকস, অটোমেটিকস, এসএ জি, এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড ছিল।[১৫৯]

১৭ এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এরপর পিরোজপুর মহকুমা প্রশাসন সরাসরি বিপ্লবী সরকারকে সহায়তা প্রদান শুরু করে। পিরোজপুরের এসডিপিও ফয়জুর রহমান (পরবর্তীকালে শহিদ) পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। ইতোমধ্যে পিরোজপুর মহকুমার বিভিন্ন থানায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। পিরোজপুর সদরে আ. মান্নান, স্বরূপকাঠিতে জাহাঙ্গীর বাহাদুর, কাউখালিতে হাবিবুর রহমান, ভান্ডারিয়ার সুবেদার আব্দুল আজিজ, মঠবাড়িয়ায় আলতাফ হোসেনকে নিয়োগ করা হয়।[১৬০] তবে, ১৮ এপ্রিল বরিশালের নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানি সেনাদলের হাতে চলে গেলে এবং এর কিছু পূর্ব থেকেই পিরোজপুরের সংগ্রাম পরিষদ বা বিপ্লবী সরকারের নেতৃবৃন্দ ভারতে অবস্থান নিতে শুরু করলে মহকুমার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেওয়া অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। এ অবস্থায় মঠবাড়িয়া এমপিএ সওগাতুল আলম সগীরের অনুরোধে জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রায় ছয়শত মুক্তিযোদ্ধার সহায়তায় ১৮ এপ্রিল ও পরবর্তী কয়েকদিন কাউখালি, কাঠালিয়া, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, বাগেরহাটের শরণখোলা থানা ও কয়েকটি ফরেস্ট অফিস অভিযান পরিচালনা করে অস্ত্র উদ্ধার করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করেন।[১৬১] ইত্যবসরে, পিরোজপুর শহরের বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা শহরে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। এছাড়া, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার বা সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ ভারতের উদ্দেশ্যে পিরোজপুর ছাড়লে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেজর জলিল ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় জিয়াউদ্দিন আহমেদকে

বরিশাল এলাকায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।[১৬২] এই নির্দেশনা মোতাবেক জিয়াউদ্দিনও চেষ্টা চালিয়ে যান। তবে মে'র ৪ তারিখে পিরোজপুর পাকিস্তানি সেনাদলের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[১৬৩] জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ অবস্থায় কয়েকজন সঙ্গীসহ সুন্দরবন এলাকায় চলে যান। সমাপ্ত হয় পিরোজপুরের প্রতিরোধ পর্ব।

সংগঠন

পিরোজপুর পাকিস্তানি সৈন্যদলের দখলে চলে গেলে জিয়াউদ্দিন আহমেদ মংলা হয়ে ভারতে যাবার চেষ্টা করেন।[১৬৪] কিন্তু, ভারতে যেতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বাগেরহাটের কচুয়া হয়ে মোরেলগঞ্জে আসেন। ২২ মে মহীউদ্দিন কামাল ও আব্দুল আউয়ালকে সঙ্গে নিয়ে জিয়াউদ্দিন স ম কবির আহমদ মধু প্রতিষ্ঠিত খাউলিয়া ক্যাম্পে উপস্থিত হন।[১৬৫] এরপর শরণখোলার সামসুল আলম তালুকদারের দলকে খবর দেওয়া হয়। উভয়পক্ষ আলোচনা করে জিয়াউদ্দিন আহমেদকে তাদের সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আর বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হন শামসুল আলম তালুকদার।[১৬৬] বাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে সুন্দরবনকে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব করেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ। এ প্রস্তাব তিনি হঠাৎ করে আনেন নি। ইতোমধ্যে ২ জুন খাউলিয়া ক্যাম্প রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদলের আক্রমণের শিকার হয়েছে।[১৬৭] তাছাড়া, কৈশোরে নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' পাঠ করে প্রবলভাবে প্রভাবিত জিয়াউদ্দিন তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেশ থেকে পাঞ্জাবী তাড়ানোর যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনায় তাদের ঘাঁটি হিসেবে সুন্দরবনকে মনোনীত করে ছিলেন। এ বিষয়ে একটি গোপন চিরকুটে জিয়াউদ্দিন তার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন "পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা করতেই হবে আমাদের এবং যদি আর কোন উপায় না থাকে তাহলে আমাদের দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে সেই যুদ্ধ। এবং সুন্দরবনকে আমরা আমাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করবো।"[১৬৮] শুধু তাই নয়, পিরোজপুরের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রধান অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খানের সাথে আলোচনাকালেও জিয়াউদ্দিন প্রস্তাব করেছিলেন "আমরা সুন্দরবনে ঘাঁটি গড়ে তুলবো।"[১৬৯] এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, পিরোজপুরে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনের পর পরই জিয়াউদ্দিন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ গোপনে সুন্দরবনের কোথায় কোথায় ক্যাম্প করা যায় তা দেখে গিয়েছিলেন। এরপর এপ্রিলের ২১ তারিখ শরণখোলা থানা আক্রমণের পর তিনি শরণখোলা ফরেস্ট অফিস ও সুন্দরবনের বগীতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের সূচনা করেন। বগীর ক্যাম্পের দায়িত্ব দেওয়া হয় সুবেদার আব্দুল আজিজ ফুল মিয়াকে। এদিনই তারা সুন্দরবনের গভীরে কোথায় কোথায় ক্যাম্প করা যায় তা দ্বিতীয় বারের মতো পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন।[১৭০] সুতরাং সুন্দরবনে ঘাঁটি করার পরিকল্পনা জিয়াউদ্দিনের যে পূর্ব থেকেই ছিল তা নিঃসন্দেহ।

সুন্দরবনে ঘাঁটি করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জিয়াউদ্দিন ও তার দল এর উদ্দেশে রওনা করেন।[১৭১] এই মুক্তিদলকে সুন্দরবনে পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করেন শরণখোলার ধানসাগর গ্রামের খলিল ও ধলু খলিফা।[১৭২] ধানসাগর গ্রামে পূর্ব থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পটি ভোলা নদীর পশ্চিম পাড়ে শরণখোলা ও চানপায় রেঞ্জ অফিসের মধ্যবর্তী ধানসাগর গ্রামের ফরেস্ট অফিসের ভিতরে অবস্থিত ছিল। এই ক্যাম্পের সূচনা করেছিলেন শামসুল আলম তালুকদার।[১৭৩] এই ধানসাগর ক্যাম্প থেকে রওনা করে ধানসাগর খালের মধ্য দিয়ে ভোলা নদীতে পৌঁছে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ভোলা নদী থেকে উঠে যাওয়া কলমতেজি খাল বেয়ে জিয়াউদ্দিন ও তার সঙ্গীরা সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে কিছুদিন তারা নৌকায় অবস্থান করেন। এরপর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বসবাসযোগ্য ঘাঁটি তৈরি করেন। এই ঘাঁটি স্থাপিত হয় সুন্দরবনের প্রায় সাত কিলোমিটার ভেতরে আড়াইবাঁকি নামক স্থানে। জায়গাটা আড়াইবাঁকি খাল, মাইঠার খাল ও মূর্তির খালের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল।[১৭৪] এই ক্যাম্পটি জিয়া বাহিনীর 'আড়াইবাঁকি ক্যাম্প' নামে পরিচিত হয়। সুন্দরনের এই অংশে ঘাঁটি গড়ে তোলার কারণ ছিল কৌশলগত। এই এলাকা

জনবসতি থেকে খুব একটা দূরে নয় আবার শত্রুর জন্য দুর্ভোগ্য ছিল। অপর পক্ষ গানবোট বা অন্য কোনো বড় নৌযান নিয়ে সহজেই এই এলাকায় প্রবেশ করতে পারত না। অথচ মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের ওপর আক্রমণ চালাতে বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষাকৃত সহজেই পৌঁছাতে পারতেন।[১৭৫] আড়াইবাঁকি ঘাঁটি স্থাপনের পর পূর্বোল্লিখিত সুবেদার আব্দুল আজিজ ফুল মিয়ার নেতৃত্বাধীন বগী ঘাঁটিকে করা হয় এর অগ্রবর্তী ঘাঁটি। ভৌগোলিক কারণেই বগী ঘাঁটির গুরুত্ব ছিল বাগেরহাট ও পটুয়াখালীর সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত বলেশ্বর নদীর (প্রায় ৭ কি.মি. প্রশস্ত ছিল সেকালে) তীরেই সুন্দরবন লাগোয়া বগীর অবস্থান। বগী হয়েছিল সুন্দরবন সাব-সেক্টরের অগ্রবর্তী ঘাঁটি এবং শরণখোলা ফরেস্ট অফিসকে করা হয়েছিল সাব-সেক্টর কমান্ডারের কমান্ড পোস্ট।[১৭৬] জিয়াউদ্দিন এরপর পিরোজপুরে ও অন্যান্য মহকুমায় বিচ্ছিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সুন্দরবনে গড়ে তোলা ঘাঁটিতে আসতে আহ্বান জানান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই এলাকায় তিনি ও তার সঙ্গীরা অনেকটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে ফেলেন।[১৭৭]

জিয়া বাহিনী আড়াইবাঁকি ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে তেঁতুলবাড়িয়া ও তাম্বুলবুনিয়া খালের দুই তীর ধরে ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশটি ঘাঁটি গড়ে তোলে। তেঁতুলবাড়িয়া ও তাম্বুলবুনিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রত্যেকটি খাল ও তার শাখা-প্রশাখা মিলে প্রায় চার কি.মি. জায়গা জুড়ে স্থাপন করা হয় এসব ঘাঁটি। এসব ঘাঁটির মধ্যে ৪টি ঘাঁটি ছিল সর্ববৃহৎ। এই চারটির একটি ছিল সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার। এই ঘাঁটির অবস্থান ছিল তেঁতুলবাড়িয়ার দুধমুখী খালের পাড়ে। এই ঘাঁটিতে বাহিনী প্রধান, উপপ্রধান বা সহ অধিনায়ক থাকতেন। এই ঘাঁটিতে প্রধান দপ্তর, হাসপাতাল, অস্ত্রাগার, গুদামসহ বেশ কয়েকটি আস্তানা গড়ে তোলা হয়েছিল। জিয়া বাহিনীর দ্বিতীয় বৃহৎ ক্যাম্প ছিল স্টুডেন্টস্ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের অবস্থান ছিল তেঁতুলবাড়িয়ার পূর্ব দিকে তাম্বুলবুনিয়া খালের উত্তর পাড়ে। এর কমান্ডার ছিলেন ছাত্রনেতা লিয়াকত আলী খান ও সহকারী কমান্ডার ছিলেন পরিতোষ কুমার পাল। আড়াইবাঁকি ঘাঁটি ছিল এ বাহিনীর তৃতীয় বৃহত্তম ঘাঁটি যার নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার কবির আহমদ মধু ও তার সহকারী ছিলেন খালিদ হোসেন।[১৭৮] বাহিনীর চতুর্থ ক্যাম্পটির অবস্থান ছিল লোকালয়ের মধ্যে মোরেলগঞ্জ থানার জিউধরা ইউনিয়নের কালী বাড়ি গ্রামে। দু'জন কোম্পানি কমান্ডার এর দায়িত্বে ছিলেন। এদের একজন ছিলেন বঙ্গবন্ধু কোম্পানির নূর মোহাম্মদ হাওলাদার এবং অন্যজন ব্রাভো কোম্পানির হাবিবুর রহমান[১৭৯] জিয়া বাহিনীর ক্যাম্পগুলো অবস্থিত ছিল তেতুলবাড়িয়া খালের (প্রকৃতপক্ষে এটি ঐসময় একটি মরা নদী) দুই তীর ধরে প্রায় বিশ মাইলব্যাপী। ক্যাম্পগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার সহজ যোগাযোগের জন্য এই বিশ মাইল এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা (কাঁচা) তৈরি করা হয়েছিল।[১৮০] এসব রাস্তা বা ছোট পথের ধার দিয়ে খনন করা হয়েছিল বাংকার। এ পথে ছোট ছোট খাল পার হওয়ার জন্য খালের উপর বাঁশ দিয়ে অসংখ্য সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল। তাছাড়া, শরণখোলা ফরেস্ট অফিস থেকে হেড কোয়ার্টারে স্বল্প সময়ে ও নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ১ কি.মি. দীর্ঘ একটি খাল খনন করেছিলেন। এই খালের নাম হয় 'জয় বাংলার খাল' বা 'জয় বাংলার ভারানি'। এই খাল তেঁতুলবাড়িয়া (তেঁতুলবুনিয়া) খালের সাথে গোলবুনিয়া খালকে সংযুক্ত করেছিল।[১৮১] এই খালের ফলে প্রায় সাত কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করার বাধ্যতা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রেহাই পান।

পাকিস্তানি সেনাদল ও রাজাকার-দালালদের আক্রমণে বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ দুটি কৌশল অবলম্বন করেন। এর একটি কৌশল ছিল শক্তিশালী প্রহরা চৌকি তৈরি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তেঁতুলবাড়িয়া খালের চারপাশে ছিল অসংখ্য খাল। আর মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিসমূহ ছিল সেসব খালের একেবারে মাথায়। মূলত নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঘাঁটিগুলো খালের মাথায় স্থপন করা হয়েছিল। মূল নদী দিয়ে ঢুকে বিপরীত পক্ষ যাতে ঘাঁটিগুলোর সন্ধান না পায়। বরং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য মূল নদী থেকে খালে ঢোকার মুখেই স্থাপন করা হয়েছিল

প্রহরা চৌকি। এসব চৌকি বসানো হয় উঁচু মাচার উপর। চৌকিগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল শক্তিশালীভাবে নির্মিত। এসব চৌকির কোনো একটি আক্রান্ত হলে অন্তত কয়েকদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো রসদ ও লোকবল সেখানে রাখা হতো যাতে আক্রমণকারী এই চৌকিগুলোকেই মুক্তিযোদ্ধাদের মূল ঘাঁটি মনে করে। এ কৌশল খুবই ফলপ্রসু হয়। অপর পক্ষ বার বার এ চৌকিগুলোর ওপরই আক্রমণ চালায়। তারা মূল ঘাঁটিতে কখনোই পৌছাতে পারেননি।[১৮২] জিয়াউদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় কৌশল ছিল মূল মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটির বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ। এ বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছিল মূল ঘাঁটি থেকে ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ কি. মি. দূরে বনের অভ্যন্তরে। অপর পক্ষের দ্বারা মূল ঘাঁটি আক্রান্ত হলে বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব এড়িয়ে বিকল্প আশ্রয় নিশ্চিত করা এবং অপর পক্ষের বিমান হামলা বিশেষ করে নাপাম বোমা হামলা থেকে বাহিনীর লোকবল ও রসদ রক্ষার উদ্দেশ্যে এ বিকল্প ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়।[১৮৩] এরূপ বিকল্প ঘাঁটির ন্যায় জিয়া বাহিনীর একটি বিকল্প হেড কোয়ার্টার বা ভ্রাম্যমান হেড কোয়ার্টার ছিল। এই হেড কোয়ার্টার ছিল মূলত একটি বড় বজরা জাতীয় নৌকা। এই নৌকা পাওয়া গিয়েছিল মোরেলগঞ্জের ফরেস্ট অফিসগুলোর একটি থেকে। এই নৌকা ব্যবহৃত হতো উচ্চ পদের কর্মকর্তাদের জন্য। জিয়াউদ্দিন এই নৌকা পাওয়ার পর তাকে ভ্রাম্যমান হেড কোয়ার্টারে রূপ দেন। এই নৌকায় বাহিনীর উপ-প্রধান সামসুল আলম তালুকদার, হেলাল, আলাউদ্দিন, পরিতোষ কুমার পালসহ নেতৃস্থানীয় সদস্যদের প্রবেশের অনুমতি ছিল। এ নৌকা পাহারার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়োজিত থাকত। এই নৌকাকে সাব-সেক্টরের কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হতো।[১৮৪]

জিয়া বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা সদস্য সংখ্যা আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দুই হাজারে পৌছে অক্টোবরের শেষাবধি এ সংখ্যা প্রায় দশ হাজারে উপনীত হয়।[১৮৫] ডিসেম্বর নাগাদ এ সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজারে পৌঁছে।[১৮৬] এই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৯ নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে জিয়ার বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন। আগস্টের ১৩ তারিখ জিয়াউদ্দিন আহমেদ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৪ আগস্ট তার বাহিনীর সকল মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সমাবেশ ডাকেন। প্রায় এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের এ সমাবেশে জিয়াউদ্দিন আহমেদ ৯ নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার কর্তৃক সুন্দরবন সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তার নিয়োগপত্র দেখান।[১৮৭] এ সভায় অধিনায়ক তার বাহিনীকে নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করেন:[১৮৮]

কমান্ডিং অফিসার: জিয়া উদ্দিন আহমেদ
সেকেন্ড-ইন-কমান্ড: শামসুল আলম তালুকদার
চীফ সিকিউরিটি অফিসার: আবুল কালাম মহিউদ্দীন
অপারেশনাল অফিসার: আবুল আসাদ/শেখ আবদুল আসাদ
অস্ত্রাগার তত্ত্বাবধায়ক: শহীদুল আলম বাদল (চান মিয়া)
খাদ্য বিভাগ: মোস্তফা হেলাল
অর্থ বিভাগ: নূরুল ইসলাম হাওলাদার
কন্সট্রাকশন বিভাগ: নূর মোহাম্মদ হাওলাদার
অ্যাডজুট্যান্ট: আব্দুল হাই খোকন
রিক্রুটিং বিভাগ: লিয়াকত আলী খান
প্রশিক্ষণ বিভাগ: আলতাফ হোসেন ও শহীদ আলী

উল্লিখিত বিভাগ ব্যতীত এ বাহিনীতে যোগাযোগ বিভাগ, ভারতের সাথে যোগাযোগ বিভাগ, শরণার্থী বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ ও চিকিৎসা বিভাগ ছিল। বাহিনীর মূল ঘাঁটিতে একটি হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। এই চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন ভান্ডারিয়ার ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম। মুক্তিযুদ্ধকালে

তিনি বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার সাথে হোমিওপ্যাথ ও পল্লী চিকিৎসক ছিলেন কয়েকজন। এরা হলেন মঠবাড়িয়ার আবুল হোসেন, তাফালবাড়িয়ার আব্দুল কাদের, পিরোজপুরের ডাক্তার নুরুল হক ও মোড়েলগঞ্জের ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস। বাহিনীর অধিনায়কের নিয়ন্ত্রণে একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। গোয়েন্দা সদস্য হিসেবে বাছাই করা হত খুব মুসল্লী হিসেবে পরিচিত বা সে ধরনের অবয়ব যাদের ছিল তাদেরকে। এছাড়া এ বাহিনীতে একটি রেকি দল ছিল যাদের ক্যাম্প ছিল তাম্বুলবুনিয়া খালের পূর্বে পাঙ্গাশিয়া খালের পাশে। বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাছের চাহিদা পূরণের জন্য প্রায় সত্তর জন জেলের সমন্বয়ে একটি মাছ ধরা কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল।[১৮৯] আর বাহিনীর সদস্যদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণের জন্য একটি 'ইমারজেন্সি স্টোর' ছিল।

জিয়াবাহিনী তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় যুদ্ধ ও প্রতিরোধ তৎপরতা জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব বিভাজন করেন নিম্নোক্তভাবে[১৯০]

নায়েক সুবেদার কবীর আহমদ মধু, কমান্ডার, বাগেরহাট
আফজাল হুসাইন, কমান্ডার, সাতক্ষীরা
আলী আহমদ খান, কমান্ডার, মোরেলগঞ্জ থানা
সুবেদার আব্দুল আজিজ ফুল মিয়া, কমান্ডার শরণখোলা
লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, অপারেশন কমান্ডার
উল্লিখিত এলাকাবাদে সুন্দরবন সাব-সেক্টরের বাকি সব এলাকা।

এছাড়া জিয়া বাহিনীর সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চারটি কমান্ডের অধীন বিন্যস্ত করা হয়। এই চারটি কমান্ডের কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে-

১। স ম কবীর আহমদ মধু
২। শেখ আব্দুল আসাদ
৩। আলতাফ হোসেন এবং
৪। লিয়াকত আলী খান[১৯১]

উল্লিখিত কমান্ডারদের অধীন নিম্নোক্ত কোম্পানি ও প্লাটুন কমান্ডারগণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৯২]

নূর মোহাম্মদ হাওলাদার কমান্ডার	:	বঙ্গবন্ধু কোম্পানি
হাবিবুর রহমান (কাউখালি)	:	কমান্ডার, হিরো কোম্পানি
আমজাদ হোসেন মল্লিক	:	কমান্ডার, টাইগার কোম্পানি
ক্বারী আবুল হোসেন	:	কমান্ডার, ব্রেভো কোম্পানি
সুবেদার আব্দুল গাফ্ফার	:	কোম্পানি কমান্ডার
সুবেদার আব্দুল আজিজ ভুলু	:	ঐ
বজলুর রহমান	:	ঐ
আব্দুল আউয়াল (পিরোজপুর)	:	ঐ
কামাল আহমেদ (পিরোজপুর)	:	ঐ
শহীদুল আলম বাদল (মঠবাড়িয়া)	:	ঐ
সুবেদার আজিজ (ভান্ডারিয়া)	:	ঐ
শামসুল হক (পিরোজপুর)	:	ঐ
হাবিলদার আবেদ (পিরোজপুর)	:	ঐ
হাবিবুর রহমান শিকদার (পিরোজপুর)	:	ঐ
সুবেদার লতিফ (পিরোজপুর)	:	ঐ
সুবেদার সোহরাব (মঠবাড়িয়া)	:	ঐ

হাবিলদার আলাউদ্দিন (বরগুনা)	:	ঐ
নূরুল হুদা (গলাচিপা, পটুয়াখালী)	:	ঐ
আব্দুল কাদের (গলাচিপা, পটুয়াখালী)	:	ঐ
সুবেদার রুস্তম আলী (রাজাপুর)	:	ঐ
মাস্টার মোখলেসুর রহমান	:	কমান্ডার, প্রহরা চৌকি
হেমায়েত হোসেন বাদশা	:	প্লাটুন কমান্ডার
নূরুল হক (পিরোজপুর)	:	প্লাটুন (মর্টার), কমান্ডার
মোশারেফ হোসেন খান	:	প্লাটুন কমান্ডার
আঃ হান্নান তালুকদার	:	ঐ
মোশারফ হোসেন তালুকদার	:	ঐ
ইদ্রিস আলী ইজারাদার	:	ঐ
হাবিবুর রহমান হাওলাদার	:	ঐ
বি এইচ এম ফারুক শিকদার (কাঠালিয়া)	:	ঐ
শাহ আলম হাওলাদার	:	ঐ
হাবিলদার নজরুল ইসলাম	:	ঐ
মোবারক উল্লাহ	:	ঐ
মনসুর হাওলাদার	:	ঐ

বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার স্বার্থে একটি বিচার বিভাগ ছিল যার প্রধান ছিলেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ নিজেই। মূলত সামরিক বাহিনীর বিধান মতোই এ বিভাগ পরিচালনা করা হতো। এ বিভাগের অধীনে ছিল একটি জেলখানা।[১৯৩] বাহিনীর প্রধানকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করতেন মোহাম্মদ হেলাল। এছাড়া অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সহকারীর ভূমিকা পালন করেন শামসুদ্দিন আজাদ, পরিতোষ কর্মকার পাল, বিপুল হালদার, মৃণাল কান্তি হালদার, ডাক্তার জাহাঙ্গীর প্রমুখ।[১৯৪] এ বাহিনীতে আগস্টের শেষ পর্যায়ে আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কর্পোরাল আব্দুস সামাদ যুক্ত হন। তিনি এ বাহিনীতে বাহিনীর অধিনায়কের সহকারী কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৯৫]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহ

২৫ মার্চে পাকিস্তানি সেনাদল কর্তৃক গণহত্যা শুরু ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পিরোজপুরে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয় ২৬ মার্চ মহকুমা শহরের বৈরাগীর ভিটায়/বাড়িতে। এই প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ। ২৬ মার্চ বিকালে পিরোজপুর মহকুমা ট্রেজারি লুট হলে জিয়াউদ্দিনের হাতে প্রায় পনেরটি রাইফেল ও বেশকিছু গুলি আসে। এগুলো দিয়েই ঐদিনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ।[১৯৬] এরপর ২৮ মার্চ পিরোজপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কালেক্টরেট মাঠে এবং পিটিআই মাঠে বিভিন্ন পক্ষ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু মে এর প্রথম সপ্তাহ থেকে মহকুমা শহরে আর কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রাখা সম্ভব হয়নি। এরপর জুলাই এর প্রথম সপ্তাহের ভেতরে জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে সুন্দরবনে ঘাঁটি তৈরি হলে বাহিনীর সদস্যদের জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির অবস্থান ছিল তেঁতুলবাড়িয়া খালের পূর্ব দিকে তাম্বুলবুনিয়া খালের উত্তর পাড়ে। এটি ছিল একটি স্টুডেন্ট ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের সাথে জঙ্গল পরিষ্কার করে একটি প্যারেড গ্রাউন্ড তৈরি করা হয় ও একটি পুকুর কাটা হয়। এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন লিয়াকত আলী খান ও সহযোগী ছিলেন পরিতোষ কুমার পাল। এই ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কর্ম পরিচালনায় পূর্বোক্তদের সহযোগী ছিলেন মোশাররফ হোসেন খান, আব্দুল মান্নান তালুকদার, মাহতাব উদ্দিন এবং মোশাররফ হোসেন

তালুকদার নামের চারজন প্লাটুন কমান্ডার।[১৯৭] এদের মাধ্যমে যুবকদের সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ছাড়াও সুন্দরবনের মধ্যে আরো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় সুপতির নিকট হয়লাতলায়। এ কেন্দ্রটি অক্টোবর মাসে বাধালের আফজাল হুসাইনের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয়। এর অবস্থান ছিল শরণখোলা রেঞ্জ অফিস থেকে দক্ষিণে ক্ষুদিরামের খাল বরাবর ভোলা নদীর পূর্ব তীরে ছোট একটি খালের পাড়ে। এ কেন্দ্রের ইনস্ট্রাক্টর নিযুক্ত হন আলী আহমদ খান।[১৯৮] এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর বাইরে বাহিনীর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এ কেন্দ্রের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন খুরশীদ জাহান বেগম।[১৯৯] প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বাস্তব প্রয়োজনে মাত্র দুই/তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাইফেল, লাইট মেশিনগান, হ্যান্ডগ্রেনেড, বিস্ফোরক প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পাশাপাশি তাদেরকে যুদ্ধের মৌলিক বিষয়েও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অবশ্য, কমান্ডার পর্যায়ের যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ থাকতো। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে দুই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এক দলকে নিয়মিত বাহিনীর মতো সরাসরি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার আলতাফ। আর একটি দলকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হতো। গেরিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন কমান্ডার শহীদ আলী। প্রশিক্ষণ কর্মের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ছাড়াও বাহিনীর অধিনায়ক জিয়াউদ্দিন নিজেও নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। এছাড়া, বাহিনীভুক্ত বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় ছোটো আকারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতেন।[২০০] এসব কেন্দ্রে বাগেরহাট, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি, ভোলা এলাকার বাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[২০১]

সুন্দরবনে জিয়া বাহিনীর ভ্রূণ গঠিত হয়েছিল ২১ এপ্রিল শরণখোলা থানা আক্রমণ করে পাওয়া যায় ৩২টি রাইফেলের ওপর ভিত্তি করে। এই অস্ত্র শামসুল আলম তালুকদার, সুবেদার আবদুল আজিজ ফুল মিয়ার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে জিয়াউদ্দিন বর্গা ক্যাম্প ও শরণখোলা ফরেস্ট অফিস ক্যাম্পের সূচনা করেন।[২০২] উল্লিখিত অস্ত্রগুলোই পরবর্তীকালে জিয়া বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সূচনাপর্বের ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা রাখে। এছাড়া জুনের মাঝামাঝি থেকে পিরোজপুর মহকুমাধীন প্রত্যেকটি থানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জিয়া বাহিনীর তরফে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহস্রাধিক মুক্তিযোদ্ধা জিয়া বাহিনীতে যুক্ত হন। এদের অনেকেই ৩০৩ রাইফেলসহ বাহিনীতে যুক্ত হন। উল্লেখ্য, এদের অধিকাংশই ছিলেন পিরোজপুর মহকুমা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত ও জিয়াউদ্দিন পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রশিক্ষণার্থী ও সংগঠক পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা। এরাই পরবর্তীকালে জিয়া বাহিনীর মূল শক্তি হয়ে ওঠে। জিয়া বাহিনী ভারত সরকারের তরফ থেকে দু'দফায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ পেয়েছিল। এছাড়া ৯ নং সেক্টর কমান্ডারের নিকট থেকেও কিছু অস্ত্র সহায়তা পেয়েছিল। এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল ৩টি রিকয়েললেস রাইফেল, ৩টি ৩ ইঞ্চি মর্টার, অটোমেটিক রাইফেল, আনার্গা গ্রেনেড লিম্পেট মাইন ও অন্যান্য হালকা অস্ত্র।[২০৩] আর এ বাহিনীর অস্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার-দালাল এবং বিভিন্ন থানার অস্ত্র ভান্ডার। জিয়া বাহিনী শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে দখল করা অস্ত্রেই ধীরে ধীরে সবল হয়ে ওঠে।[২০৪]

আওতাভুক্ত এলাকা

মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টরের অন্তর্গত ছিল দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খুলনার দক্ষিণাঞ্চল সহ সমগ্র বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। এই এলাকার দক্ষিণস্থ সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন অরণ্যের পুরোটাই ছিল ৯নং সেক্টরের অন্তর্গত। সুন্দরবনকে আশ্রয় করে লে. জিয়াউদ্দিন আহমেদ যে মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে তোলেন, এই দল পিরোজপুর পটুয়াখালী বরগুনার একাংশ,

বাগেরহাটের একাংশ (শরণখোলা-মোরেলগঞ্জ থানা), মংলা পোর্ট ও সুন্দরবন এলাকায় সক্রিয় ছিল।[২০৫] ইতোমধ্যে লে. জিয়াউদ্দিনকে সুন্দরবন সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলে তার দলের আওতাভুক্ত এলাকার অগ্রবর্তী অংশ হয় মঠবাড়িয়ার একাংশ, শরণখোলা, রামপাল, মংলা থানা ও পাথরঘাটার একাংশ। সুন্দরবনের গহীন অরণ্যকে পশ্চাদভূমি করে প্রায় ৪০ মাইল সম্মুখবর্তী এলাকায় এ বাহিনীর সদস্যরা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যান।[২০৬] জিয়া বাহিনীর তৎপরতায় অরণ্যঘনিষ্ঠ লোকালয়ের একটি বড় অংশ মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। শরণখোলা, বগী, তাফালবাড়ি, মোরেলগঞ্জের নিম্নাঞ্চল, গোপখালী, চালতাবুনিয়া প্রভৃতি এলাকার হাট-বাজার-গ্রাম-জনপদ মিলিয়ে একটি বড় মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি জিয়া বাহিনীর বিশেষ সাফল্য।[২০৭]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

জিয়া বাহিনীর সদস্যগণ যেসব এলাকায় সক্রিয় ছিলেন, সেখানে তাদেরকে মোকাবেলা করতে হয় একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য ও দালাল-রাজাকারদেরকে। ১৯৭১-এর এপ্রিলের শেষদিকে বৃহত্তর খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালী জেলার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৯ম পদাতিক ডিভিশনের অধীন এডহক ব্রিগেড মোতায়েন করা হয় পাকিস্তান নেভির কমান্ডার ওলজারিনের নেতৃত্বে।[২০৮] এই ব্রিগেডের অধীন বরিশালে কর্নেল আতিক, পটুয়াখালীতে মেজর নাদের পারভেজ, পিরোজপুরে ক্যাপ্টেন এজাজ এর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদলের কয়েকটি কোম্পানি মোতায়েনকৃত ছিল। এই সেনাদলের সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিল ইপিকাফ এর ৫নং উইং এর একটি বড় অংশ।[২০৯] এছাড়া পাকিস্তান নৌবাহিনীর নৌসেনারা সুন্দরবন সংলগ্ন জলপথে নিয়মিত টহল (গান বোট দিয়ে) দিত। পাকিস্তানি সেনাবাহনীর শক্তি আরো সংহত ও বৃদ্ধি করেছিল উল্লিখিত এলাকায় অবস্থিত থানাসমূহের পুলিশ সদস্য ও প্রায় আট হাজার সশস্ত্র রাজাকার।

জিয়া বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই সামরিক শক্তিকে বেশ কৌশলে ও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করেছিল বলা যায়। অপরপক্ষকে মোকাবেলা করার জন্য জিয়া বাহিনী শুরু থেকেই গেরিলা পদ্ধতি ও সম্মুখ যুদ্ধ পদ্ধতি দুটিই অনুসরণ করেছিল। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় টহল রত পাকিস্তানি সৈনিকদের ওপর ‘হিট অ্যান্ড রান পলিসি’ প্রয়োগ করে আক্রমণ চালানো হতো।[২১০] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধারা মোলেগঞ্জ, ভান্ডারিয়া, কাউখালী থানার অস্ত্রশস্ত্র দখল করে ঘাঁটিতে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই খবর পান যে, ভান্ডারিয়া ও কাউখালী বন্দর পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকাররা পুড়িয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় বাহিনীর অধিনায়ক ও অন্যান্য কমান্ডারগণ সম্মিলিতভাবে রণনৈতিক কৌশলে একটি পরিবর্তন আনেন। এ বাহিনী ‘হিট অ্যান্ড রান’ পদ্ধতি পরিহার করে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী দশ-বারো-পনেরো মাইল পর্যন্ত এলাকা সার্বক্ষণিক মুক্ত রেখে সুন্দরবন এবং এর আশেপাশে শত্রুকে প্রলুব্ধ করে এনে তাদের ওপর হামলা চালানোর কৌশল অনুসরণ করা শুরু করে আগস্টের শেষ দিক থেকে।[২১১] এই কৌশল অবলম্বন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে যথাসম্ভব জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা ও বৃদ্ধি করা। এই কৌশল অনুসরণ করার পর থেকে অত্র এলাকার মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল পাল্টানোর সিদ্ধান্ত বেশ কার্যকর হয়েছিল। জিয়া বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে ছোট-বড় পঞ্চাশটির বেশি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।[২১২] এসব যুদ্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, শরণখোলার রায়েন্দা রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, তাফালবাড়ি রাজাকার ঘাঁটি অভিযান, মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটি অভিযান (২য় বার), দৈবজ্ঞহাটি রাজাকার ক্যাম্প অভিযান, ভান্ডারিয়া থানা অভিযান, কাউখালি থানা অভিযান, শরণখোলা অভিযান, বানসাগর অভিযান, রায়েন্দা রাজাকার ঘাঁটি অভিযান (২য় বার) তুষখালী খাদ্যগুদাম অভিযান, ১২ দিনব্যাপী সুন্দরবনের যুদ্ধ, সরালিয়া ও রাজাপুর যুদ্ধ, ধানসাগর যুদ্ধ (২য় বার), আইরনের যুদ্ধ, বড় মাছুয়ার যুদ্ধ, মাপলাজোড় যুদ্ধ, তাকালবাড়ির যুদ্ধ, শরণখোলা থানা দখল, মঠবাড়িয়া থানা দখল প্রভৃতি। এছাড়া ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-মংলা নৌরুটে প্রায় প্রতিদিনই জিয়া বাহিনীর দ্বারা পাকিস্তানি সৈন্য ও রসদবাহী নৌযান ও গানবোট আক্রান্ত হতো। পাশাপাশি বগী, তাফালবাড়ি, সুপতি, মাছুয়া, তুষখালী, চরদুয়ানীতে (এগুলো সুন্দরবন সংলগ্ন স্থান) নিয়মিত ভাবে পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগীদের কে এ্যামবুশ করা হতো।[২১৩] উল্লিখিত অভিযান বা যুদ্ধগুলোর মধ্যে কয়েকটি অভিযান/যুদ্ধের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

রায়েন্দা-রাজাকার ঘাঁটি অভিযান[২১৪]

অভিযান তারিখ ও সময়: ১১ জুলাই রাত ১২টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: বাগেরহাটের শরণখোলা থানার সদরের রায়েন্দাতে জুনের মাঝামাঝি রাজাকার ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এখানকার রাজাকাররা রায়েন্দাসহ পার্শ্ববর্তী বানিয়াখালী, নলবুনিয়া, বাঁধাল, মালশা, আম ডাগাছিয়া প্রভৃতি স্থানে খুন, নির্যাতন, লুটপাট চালাতে থাকেন। এই অপকর্ম প্রতিরোধের মানসে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: জিয়া বাহিনীর সুবেদার আব্দুল আজিজ ফুল মিয়া, সুবেদার আনোয়ার, সুবেদার আ. গফফার, হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে ৪৭ জন মুক্তিযোদ্ধা এ অভিযানের অংশ নেন। এ অভিযানে অস্ত্রশস্ত্র বলতে তাদের কাছে বেশিরভাগই ৩০৩ রাইফেল, দেশি বন্দুক, হাত বোমা ছিল।

অভিযানের বিবরণ: রায়েন্দা থানা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে রাজাকারদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। রাজাকারদের সহযোগিতা করছিল থানার পুলিশ। নিরাপত্তার জন্য থানার চারদিকে বড় বড় পরিখা খনন করা হয়েছিল। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার ফুল মিয়া, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার গফফার এবং তৃতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান খান। আর সার্বিকভাবে সামনে থেকে কমান্ডের দায়িত্ব ছিলেন সুবেদার আনোয়ার। পরিকল্পনা মাফিক মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল রাজাকার ঘাঁটির পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ও প্রথম দল দক্ষিণ তথা নদীর থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু রাজাকার ঘাঁটির তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান ও সমরাস্ত্রের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। উপরন্তু রাজাকার ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আরেক দল রাজাকার নদীপথে এসে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করে। এর ফলে দ্বিমুখী যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা আরো বেকায়দায় পড়েন। যদিও পিছন থেকে আক্রমণকারী রাজাকার দলকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু রাজাকারদের মূল ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছানোও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযান গুটিয়ে নিয়ে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যান।

ফলাফল: রায়েন্দা অভিযানে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন (সাউথখালী), ইসমাইল হোসেন (রাজাপুর) ও আসমত আলী খড়িয়াখালী যুদ্ধস্থলে নিহত হন। যুদ্ধের পরে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অভিযোগে মুক্তিযোদ্ধা আ. সাত্তারকে রাজাকারেরা হত্যা করেন। এ যুদ্ধে সুবেদার গফফার ও হাবিব খান আহত হন। রাজাকারদের পক্ষে ক্ষয়ক্ষতি জানা যায় না।

মোরেলগঞ্জ রাজাকার ঘাঁটি অভিযান[২১৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৫ আগস্ট দিবাগত ভোর ৪টা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ঘাঁটি স্থাপনের পর থেকে মোরেলগঞ্জের রাজাকার বাহিনী গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট ও নানাবিধ অপকর্ম করছিল। ১৪ আগস্ট মোরেলগঞ্জের বিশিষ্ট ন্যাপ (ভাসানী) নেতা মোস্তফা কামালকে হত্যা করেন রাজাকাররা। এই রকম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: বাহিনী প্রধান জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে শামসুল আলম তালুকদার, কবির আহমদ মধু, সুবেদার আজিজসহ শতাধিক বাছাইকৃত যোদ্ধা এলএমজি, স্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেডসহ এই অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: মোরেলগঞ্জ থানা সদরের চারটি স্থানে রাজাকারদের ঘাঁটি ছিল। এসব স্থানে যুগপৎ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিকল্পনানুযায়ী (ক) কুঠিবাড়ি রাজাকার ঘাঁটি দখল করবে এ্যাডজুটেন্ট খোকনের উপদল; (খ) কবিরাজ বিল্ডিং এর ঘাঁটি দখলের দায়িত্ব পান সুবেদার কবির আহমদ মধুর উপদল; (গ) সুকুমার বাবুর দালানের ঘাঁটি দখলের ভার পান সুবেদার আজিজের উপদল ও (ঘ) অম্বিকাচরণ হাই স্কুলের ঘাঁটিতে দখল প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পান কমান্ডার মোতাহারের উপদল। মোরেলগঞ্জ কলেজের দীঘির পাড়ে রিজার্ভ সৈন্য ও শামসুল আলম তালুকদারসহ কমান্ড

পোস্টের দায়িত্ব নেন জিয়াউদ্দিন নিজেই। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে চারটি উপদল ভোর ৪ টায় টার্গেটগুলোতে আক্রমণ চালায়। কিন্তু সকাল ৯টা পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ফল মুক্তিযোদ্ধারা পেলেন না। উপরুন্ত রায়েন্দা থেকে একটি লঞ্চ বোঝাই রাজাকার তাদের সহকর্মীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলে জিয়াউদ্দিন নিজেই তাদেরকে প্রতিরোধ করেন। এর ফলে উক্ত দল সত্তর পালিয়ে যায়। সকাল ৯টার পর জিয়া উদ্দিন রিজার্ভ সৈন্যসহ অম্বিকাচরণ হাই স্কুলে আক্রমণ চালান। কিন্তু, রাজাকারগণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় স্কুলঘাঁটি দখল বিলম্বিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় কাভারিং ফায়ার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম মুকুল ও সোহরাবকে পর্যায়ক্রমে রাজাকারদের অবস্থানে গ্রেনেড চার্জ করতে পাঠালে তারা অসফল হন এবং উল্টো আহত হন। উপায়ন্তর না পেয়ে জিয়াউদ্দিন ও শামসুল আলম তালুকদার যথাক্রমে রাজাকার ঘাঁটির (স্কুল ভবনে) উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে এল এম জি'র ব্রাশ ফায়ারে জানালা ভেঙে ফেলেন। মুক্তিযোদ্ধা আসাদ ও হেলালকে গ্রেনেডসহ বিল্ডিংয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা ভেন্টিলেটরের ভেতর দিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়তে থাকেন। এতে কয়েকজন রাজাকার নিহত হলেও বাকিরা যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ অবস্থায় জিয়াউদ্দিন উত্তর দিকের ভাঙা জানালা দিয়ে ঘরের ভতরে ঢুকে ব্রাশ ফায়ার ৫ জন রাজাকারকে খতম করেন। এরপর ২২ জন রাজাকার অস্ত্র ত্যাগ করে ধরা দেন। এখানে মুক্তিযোদ্ধারা ৪৪টি অস্ত্র হস্তগত করেন। এছাড়া দুপুর নাগাদ অন্যান্য টার্গেটগুলোতেও মুক্তিযোদ্ধারা সাফল্য পান।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে মোরেলগঞ্জ রাজাকার ঘাঁটির পতন ঘটে। চল্লিশের অধিক রাজাকার এ যুদ্ধে নিহত হন। দুই শতাধিক অস্ত্র ও রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মুকুল ও সোহরাবসহ তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এ যুদ্ধে গুরুতর আহত মুকুল ও সোহরাব পরবর্তীকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে যাবার পথে পাকিস্তানি সৈন্যেদলের হাতে বন্দি হয়ে নিহত হন।

ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানা অভিযান[২১৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন ভোর বেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ভান্ডারিয়া থানা ও কাউখালি থানা দুটিই পিরোজপুরের অন্তর্ভুক্ত শক্তিশালী পাকিস্তানি ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। এই দুইটি থানায় অবস্থানরত পুলিশ, মিলিশিয়া ও রাজাকারগণ স্থানীয় সাধারণ মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার করে। এই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাগণ ঐ থানা দুটি দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: ভান্ডারিয়া থানায় অভিযান পরিচালিত হয় মূলত কমান্ডার সুবেদার আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে প্রায় এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে। আর কাউখালি থানায় আক্রমণ পরিচালনা করেন কমান্ডার হাবিবুর রহমান হাবিব। তার সঙ্গে প্রায় এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা ছিল। উভয় দলই এলএমজি. স্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, এসএলআর ও গ্রেনেড নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের বিবরণ: ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানায় জিয়া বাহিনী মোরেলগঞ্জের ঘাঁট থেকে অভিযান পরিচালনা করেন। মোরেলগঞ্জ থেকে ভান্ডারিয়ার অবস্থান পূর্বে ও কাউখালির অবস্থান উত্তর পূর্বে। এদের মাঝে বলেশ্বর নদী প্রবাহিত ছিল। ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানার অবস্থান পরস্পরের উত্তর দক্ষিণ মুখে। মোরেলগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি থেকে ভান্ডারিয়া থানা কাউখালির তুলনায় কাছে। পরিকল্পনামাফিক দুটি দলই বলেশ্বর নদী পার হয়ে থানার কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ভোরবেলা সুবেদার লতিফের দল পশ্চিম দিক থেকে থানা আক্রমণ করেন। প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধারা ভারী অস্ত্রের প্রয়োগ করেন। এই কৌশলের ফলে থানা থেকে প্রতিরোধ তুলনামূলক দুর্বল হয়। প্রায় পনের মিনিট গুলি বিনিময়ের পরেই অপর পক্ষ আত্মসমর্পণ করেন। অন্যদিকে কাউখালি থানার কমান্ডার হাবিব

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালান। কাউখালি থানায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। তবে একটানা প্রায় দেড়ঘন্টা গুলি চালাবার পর কাউখালি থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।

ফলাফল: ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানা অভিযানে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো রূপ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। অন্যদিকে ভান্ডারিয়া থানা দখল করে প্রায় তিনশ অস্ত্র ও কাউখালী থানা দখল করে প্রায় আড়াইশো রাইফেল মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করেন।

তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযান[২১৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৮ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: জিয়া বাহিনীর সুন্দরবন ক্যাম্পে উল্লিখিত সময়ে দশ হাজারের অধিক মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন যাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস অত্র এলাকার জন্য এমনিতেই খাদ্য সঙ্কটের সময়। এসময় সাধারণ মানুষের নিকট থেকে খাদ্য সহায়তা পাওয়া যাবেনা চিন্তা করে চলমান খাদ্য ঘাটতি ও আসন্ন খাদ্যাভাব দূর করতে উল্লিখিত অভিযান পরিচালনা করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: জিয়া বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড শামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন আলতাফ, আসাদ, হেলাল, সুবেদার গফফার, শহীদুল আলম বাদল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে প্রায় আড়াই হাজার সদস্য উল্লিখিত অভিযানে অংশ নেন। এসময় অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাদের কাছে এলএমজি, এসএমজি, অটোমেটিক রাইফেল, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতি অস্ত্র ছিল।

অভিযানের বিবরণ: তুষখালি পিরোজপুর মহকুমাধীন মঠবাড়িয়া থানা থেকে প্রায় ৮/৯ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান যেখানে একটি সরকারি খাদ্য গুদাম ছিল। এই তুষখালির পাশ দিয়ে বলেশ্বর নদী প্রবাহিত ছিল। তুষখালির খাদ্য গুদাম দখল করতে জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিকল্পনা স্থির করা হয় যে, শামসুল আলম তালুকদারের নেতৃত্বে খাদ্য গুদাম আক্রমণ করা হবে, ক্যাপ্টেন আলতাফ ও সুবেদার গফফারের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা মঠবাড়িয়া থানা ঘেরাও করবেন, শহীদুল আলমের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা খাদ্য গুদাম ও মঠবাড়িয়া থানার মধ্যবর্তী গুদিহাটা এলাকায় অবস্থান নেবেন যাতে মঠবাড়িয়া থেকে এসে কোনো রাজাকার/পুলিশ খাদ্য গুদাম আক্রমণকারী যোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। এছাড়া চরখালী, চরদোয়ানী, তাফালবাড়ি, ঘষিয়াখালী প্রভৃতি স্থানের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুত রাখা হয়। যাতে এসব এলাকা থেকে রাজাকার দল বা বলেশ্বর নদীতে টহল দেওয়া পাকিস্তানি গানবোট মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কোনো অবস্থায় আক্রমণ করতে না পারে। এর বাইরে আরো কয়েকটি ছোট ছোট এ্যাম্বুশ প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা মাফিক ত্রিশটি ছিপ নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধারা বগী থেকে যার যার গন্তব্যে রাত ১০ টায় রওনা দেন। ভোর ৩টায় শামসুল তালুকদারের দল (প্রায় চারশত মুক্তিযোদ্ধার দল) তুষখালির খাদ্য গুদাম পাহারারত রাজাকার ঘাঁটি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এল এম জি ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে প্রথম ধাপে আক্রমণ চালায়। এতে রাজাকাররা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন, এই ঘাঁটি থেকে প্রায় তিনশ রাইফেল উদ্ধার করা হয়। এরপর গুদাম দখল করে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষ চাল নৌকায় বোঝাই করতে শুরু করেন। অন্যদিকে খাদ্য গুদাম আক্রান্ত হলে তুষখালি থেকে একদল রাজাকার মঠবাড়িয়া পালিয়ে যাবার পথে শহীদুল আলম বাদলের দলের এ্যাম্বুশের শিকার হয়। এ যুদ্ধে কয়েকজন রাজাকার আহত হন ও রাজাকারদের গুলিতে বিধান নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এর বাইরে ক্যাপ্টেন আলতাফ ও সুবেদার গফফার মঠবাড়িয়া থানা চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখেন। এখানে দু'পক্ষই প্রায় দুই ঘণ্টা গুলি বিনিময় করে। এছাড়া আরো কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল

শেলা নদী ও তুষখালির সামনের দিকের তেলিখালী ও চরখালীতে পাকিস্তানি গানবোট এ্যাম্বুশ করেন।

ফলাফল: তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় দুই হাজার দুইশতমন চাল সংগ্রহ করেন ও প্রায় তিনশত রাইফেল দখল করেন। এছাড়া মঠবাড়িয়া থানাও সফলভাবে ঘেরাও করে রাখা সম্ভব হয়। অন্যান্য সাফল্যের পাশাপাশি এ অভিযানে বিধান নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন।

পাকিস্তানি বাহিনীর সুন্দরবন আক্রমণ প্রতিহতকরণ[২১৮]

মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার তারিখ ও সময়: ১অক্টোবর ভোরবেলা সুন্দরবনে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানে পাকিস্তানি বাহিনী হামলা করে।

ঘাঁটি-আক্রান্ত হওয়ার কারণ: ২৮ সেপ্টেম্বর জিয়া বাহিনী পিরোজপুরের তুষখালি খাদ্য গুদাম আক্রমণ করে খাদ্য ও অস্ত্র দখল করে। এই আক্রমণে মুক্তিবাহিনীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বিচার করে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই জিয়া বাহিনীর সুন্দরবন ঘাঁটি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের এই আক্রমণ।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: বাহিনী প্রধান জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রায় ছয় হাজার মুক্তিযোদ্ধা এল এম জি, এম জি, রিকয়েললেস রাইফেল, স্টেনগান, অটোমেটিক রাইফেল, এস এম জি, ৩০৩ রাইফেল, আনার্গা গ্রেনেড সহ অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের এই আক্রমণ প্রতিহত করেন।

অভিযানের বিবরণ: মুক্তিবাহিনীর সুন্দরবনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পটুয়াখালীস্থ বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডার মেজর নাদের পারভেজের নেতৃত্বে কয়েকহাজার সৈন্য ও রাজাকার হামলা চালায়। এর মধ্যে কোম্পানি বেলুচ সৈন্য, মিলিশিয়া, ৬টি পাকিস্তানি গানবোট, একাধিক বিমান ও সহস্রাধিক রাজাকার দালাল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই হামলা চালাবার জন্য নাদের পারভেজ প্রায় ১০০ মোটর লঞ্চ রিকুইজিশন করেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে এক নাগাড়ে ১২দিন আক্রমণ চালানো হয়। ঘাঁটিগুলোর মধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন বড় মাছুয়া, চরদোয়ানী, সুপতি, বগী, তাফালবাড়ি, জিউধরা প্রভৃতি বড় বড় ঘাঁটিই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযানের পর পাকিস্তানি পক্ষ থেকে যে একটি কঠিন প্রতিক্রিয়া আসবে তা জিয়াউদ্দিন ও অন্যান্য কমান্ডারগণ পূর্ব থেকেই অনুমান করেছিলেন। কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা ও মেয়াদ যে এত দীর্ঘ ও ভয়ানক হবে, তা মুক্তিযোদ্ধারা কল্পনা করেননি। এ কারণে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের মিলিত আক্রমণের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধারা বিক্ষিপ্ত ও পরিকল্পনাহীন হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় জিয়াউদ্দিন ত্বরিৎ ঘুরে ঘুরে সবগুলো ঘাঁটিকেই পুনরুজ্জীবিত করেন ও তাদের শক্তিশালী করতে অস্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সাথে সাথে তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা জানান। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানি পক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর মর্টার ও গানবোট থেকে প্রচুর শেল নিক্ষেপ করেন। এ রকম আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় মাছুয়া ঘাঁটির কমান্ডার সুবেদার গফফার মূল অবস্থান ছেঁড়ে গ্রামের কাছাকাছি একটি বাড়িতে অবস্থান নেন। তাদেরকে ধরতে শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য ঐ বাড়িতে আক্রমণ চালায়। তবে কাদাপানিতে অপরপক্ষ খানিকটা অসুবিধায় পড়ার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ত্রিশজন পাকিস্তানি সৈন্যকে ধরাশায়ী করেন। এদিকে শামসুল হক ব্যাপারী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি সৈন্যর হাতে ধরা পড়েন। বড় মাছুয়ার যুদ্ধের একদিন পর বগীতে পাকিস্তানি সৈন্যদলের সাথে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। বগী ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন হাবিলদার আলাউদ্দিন। বগী ক্যাম্পের কাছাকাছি বলেশ্বর নদীর পার ঘেঁষে মুক্তিযোদ্ধরা বাঙ্কার খনন করেছিলেন ও সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ৪/৫টি গানবোট নিয়ে বগী ফরেস্ট অফিসের ওপর

আক্রমণ চালায় ও পার্শ্ববর্তী গাছতলা স্লুইজ গেটের কাছে নেমে এগোতে থাকেন। এ অবস্থায় হাবিলদার আলাউদ্দিন ও তার সহযোদ্ধারা পরিকল্পনা অনুযায়ী অপর পক্ষকে গুলির রেঞ্জে আসার সুযোগ দেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা এগোতে এগোতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হওয়ায় কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির মুখে চলে আসেন। এমন সুযোগে আলাউদ্দিনসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে পাড়ে থাকা সৈন্য ও গানবোটগুলোতে আক্রমণ করেন। এতে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হন ও আহত হন। উভয়পক্ষে এরপর প্রায় দু'ঘণ্টা গুলি বিনিময় চলে।

উল্লিখিত যুদ্ধগুলোর মতো মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার টিপু সুলতানের নেতৃত্বে তাফালবাড়িতেও পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ হয়। এখানেও কয়েকজন সৈন্য ও রাজাকার নিহত ও আহত হন। এরূপ সুপতি, মঠবাড়িয়ার গোলবুনিয়া, বর্নী, ভোলা নদীর পাড়ের জঙ্গলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তানি সৈন্যদলের আক্রমণ যখন নানাভাবে ব্যর্থ হচ্ছিল তখন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিগুলোর ওপর বিমান ও গানবোট সহযোগে সাঁড়াশি হামলা চালানো শুরু করে। তবে বিমান হামলাতেও মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন ক্ষতি হয় নি। কারণ বিকল্প ঘাঁটি থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ত্বরিৎ অবস্থান পাল্টান। মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে বিমানগুলোকে আক্রমণ না করার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করতে বিমানগুলো বিভ্রান্ত হয়; বিমান থেকে ফেলা গোলাগুলোর অধিকাংশ নরম কাঁদামাটি ও পানিতে পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারপরেও পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যান।

ফলাফল: একটানা ১২ দিনব্যাপী আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নগণ্য। শামসুল হক ব্যাপারী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা আটককৃত হয়ে পিরোজপুরে নিহত হন ও কয়েকজন আহত হনঅ অপরদিকে এ অভিযানে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার মিলিয়ে শতাধিক নিহত হন ও বেশ কয়েকজন আহত হন। এই আক্রমণ মুক্তিযোদ্ধারা সফলভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

শরণখোলা ও মঠবাড়িয়া থানা অভিযান[২১৯]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৭ ডিসেম্বর দুপুর বেলা ।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ডিসেম্বরে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড গঠন ও ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে জিয়া বাহিনী পার্শ্ববর্তী থানাগুলো দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরণখোলা থানার রাজাকার ও আল বদর ঘাঁটি ও মঠবাড়িয়া থানা দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: জিয়াউদ্দিন আহমেদ, শামসুল আলম তালুকদার, ক্যাপ্টেন আলতাফের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত মুক্তিযোদ্ধা রিকয়েললেস রাইফেল, ৩ ইঞ্চি মর্টার, এলএমজি, এসএমজি, এসএলআর, অটোমেটিক ও সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল, গ্রেনেড প্রভৃতিসহ অভিযানে অংশ নেন। এর মধ্যে প্রথমদিকে শামসুল আলম তালুকদার ও পরে জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে শরণখোলা দখল অভিযান পরিচালিত হয় এবং ক্যাপ্টেন আলতাফের নেতৃত্বে মঠবাড়িয়া থানা অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানের বিবরণ: শরণখোলায় মুক্তিযোদ্ধাদের মোট তিনটি স্থানে যুগপৎ অভিযান চালাতে হয়েছিল। শরণখোলার রায়েন্দাতে থানা ভবন ও ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে ছিল রাজাকার ঘাঁটি এবং আওয়ামীলীগ নেতা নাসিরউদ্দিনের ভবনে অবস্থিত আল বদর ঘাঁটি। ৭ ডিসেম্বর দুপুরবেলা শামসুল তালুকদারের নেতৃত্বে নাসিরউদ্দিনের ভবনে অবস্থিত আল বদর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। সকলের ডান দিক দিয়ে শ্যামল মন্ডল ও বাম দিকে দিয়ে ফারুক শিকদার এলএমজি নিয়ে পজিশন নেন, ডান

পাশের অগ্রগামী দলে ছিলেন শেখ আবদুল আসাদ, টিপু সুলতান, হেমায়েত উদ্দিন বাদশাহ, বিনয় মজুমদর, গুরুপদ বালা, অজিত এবং রফিক। আর বাম দিকে অগ্রগামী দলে ছিলেন মণি, বাবুল, হাকিম আইউব, লতিফ, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। ডান দিক দিয়েই শ্যামল মন্ডল গুলি চালানো শুরু করেন। কিন্তু আল বদরদের অবস্থান ছিল সুবিধাজনক স্থানে বালির বস্তার আড়ালে এই অবস্থান থেকে তারা গুলি করায় অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধারা ভবনের দিকে এগোতে পারছিলেন না। উপরন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টাকালে আল বদরের গুলিতে গুরু পদ নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। এরপর উত্তেজিত মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ তীব্রতর করেন। কিন্তু পুনরায় শেখ আবদুল আসাদ ও টিপু সুলতান গুলিতে নিহত হন। এদের লাশ উদ্ধার করার সময় আলতাফ হোসেন শিকদার নিহত ও আলাউদ্দিন গুলিবিদ্ধ হন এবং পরবর্তীতে আল বদররা তাকে হত্যা করেন।

প্রথম দিনের এই বিপর্যয়ে অশান্ত হয়ে জিয়াউদ্দিন ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়েই শরণখোলায় যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে প্রায় তিনশতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে একযোগে থানা ভবন আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। এভাবে আক্রমণ করায় থানার রাজাকাররা পর্যুদস্ত হন। অনুরূপভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিল ভবনও মুক্তিযোদ্ধাদের কব্জায় আসে। এরপর জিয়াউদ্দিন আল বদর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। তিনি নিজে ৩ ইঞ্চি মটার চালিয়ে নাসিরউদ্দিনের ভবন গুড়িয়ে দেন যা গতদিন থেকে কেউ করতে পারেননি। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল বদর ক্যাম্প দখল করেন। সমাপ্ত হয় শরণখোলা বিজয় পর্ব। এদিকে ক্যাপ্টেন আলতাফের নেতৃত্বে প্রায় দুই শত মুক্তিযোদ্ধা ৭জি নম্বর মঠবাড়িয়া থানা আক্রমণ করেন। এখানকার রাজাকাররা শরণখোলায় ব্যবহৃত মর্টারের গোলার শব্দেই ভীত হয়ে দ্রুত আত্মসসমর্পণ করেন।

ফলাফল: মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে শরণখোলা থানা ও মঠবাড়িয়া থানার পতন ঘটে। এ অভিযানে প্রায় দুই শতাধিক রাজাকার আলবদর ধরা পড়েন ও প্রায় একশত নিহত হন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধারা এদের নিকট থেকে চারশতাধিক অস্ত্র উদ্ধার করেন। এ যুদ্ধে মোট ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন।

শরণখোলা ও মঠবাড়িয়া থানা মুক্ত করার পর জিয়াউদ্দিনের মুক্তিবাহিনী ৮ ডিসেম্বর পিরোজপুর সদর থানা, ১৫ ডিসেম্বর মোরেলগঞ্জ থানা নিজেরাই মুক্ত করতে সক্ষম হন।[২২০] এছাড়া, বাগেরহাটের রামপাল থানা ও মংলা থানা মুক্ত করতেও এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।[২২১] এ বাহিনীর কর্মতৎপরতা বিবেচনায় রেখে ৯নং সেক্টর কমান্ডার বাগেরহাট সাব-সেক্টর কমান্ডারকে জিয়া বাহিনীর প্রধান জিয়াউদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার নির্দেশ দেন,[২২২] এই সুযোগে জিয়া বাহিনীর একদল মুক্তিযোদ্ধা বাগেরহাট সদর থানা মুক্ত করার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

জিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ তাদের আওতাধীন এলাকায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা বা বজায় রাখতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন, বাহিনী গঠনের প্রথম থেকে শেষাবধি স্থানীয় ডাকাত-লুটেরা চোর-দুস্কৃতকারীদেরকে মোকাবেলার যথেষ্ট চেষ্টা তারা অব্যাহত রাখেন। শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে তাফালবাড়ি, বগী, আমডাগাছিয়া, হইলাবুনিয়া, সোনাখালী, ফুলহাতা, হ্যারমা, পাঁচগাঁও, ঢুলিগাথি, গজালিয়া প্রভৃতি) লুটপাট, ডাকাতি, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে বহু দফায় অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে তাফালবাড়ির লুটেরা বারেক খাঁ, বগীর দালাল ইউসুফ কারী, হুইলাবুনিয়ার পঞ্চায়েত বাড়ির আব্দুল আজিজ নিহত হন ও আব্দুল হাকিম গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে অত্র এলাকার প্রায় ২০ জন ডাকাত নিহত হন ও তাদের নিকট থেকে কিছু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।[২২৩] অনুরূপভাবে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া, কাউখালি, ভান্ডারিয়া থানা এলাকার লুটেরা ডাকাত, দালাল ও নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর ফলে ঐসব স্থানে অপরাধ একটি পর্যায় পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে জিয়াবাহিনীর একটি বিশেষ অবদান ছিল মংলা বন্দর ও হিরণপয়েন্টে নৌ-কমান্ডোদের জাহাজ বিধ্বস্তকরণ কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান করা। প্রায় অর্ধশত নৌ-কমান্ডোকে ভারত থেকে জিয়াউদ্দিনের সাথে সুন্দরবন ক্যাম্পে পাঠানো হয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। এই দলকে নিরাপদে ভারত থেকে সুন্দরবন ক্যাম্পে ও পরে মংলা ও হিরণপয়েন্টে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া, খাদ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে ১৬ আগস্ট, ২৬ অক্টোবরসহ অন্যান্য দিনে পাকিস্তানি ও বিদেশী মালিকাধীন বেশ কয়েকটি জাহাজ ধ্বংসকরণ কর্মসূচি সফল ভাবে বাস্তবায়ন করতে জিয়া বাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২২৪]

এছাড়া ডিসেম্বরে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ সেনা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নির্দেশনা আসে যে, সুন্দরবনের দুবলার চরের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া মার্কিন সপ্তম পারমাণবিক নৌবহরে খুলনা বরিশাল এলাকার পাকিস্তানি অফিসার ও সৈন্যের বড় অংশ আশ্রয় নিতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করছে। এ অবস্থায় তাদেরকে যেন বাধা দেওয়া হয়। এরকম নির্দেশনানুযায়ী জিয়াউদ্দিন তার বাহিনীর যোদ্ধাদের দ্বারা সুন্দরবনের কাছাকাছি সব জলপথে টহলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের তৎপরতায় ও বাধায় সমুদ্র অভিমুখী পাকিস্তানি সৈন্যবাহী বেশকিছু নৌযান দিক পরিবর্তন করে খুলনার দিকে ফিরে আসে। এছাড়া জিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পলায়নপর বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য আটককৃত হন।[২২৫]

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে জিয়া বাহিনীর নিজস্ব কোনো প্রকাশনা ছিল না। তবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি বা বৃদ্ধির জন্য এ বাহিনীর নেতৃবৃন্দ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিশেষ করে আগস্ট মাসের মাঝামাঝিতে মোরেলগঞ্জ আক্রমণের পর পাকিস্তান সরকারের প্রতি অসহযোগিতা মূলক আচরণ করার আহ্বান জানিয়ে এলাকা ভিত্তিক প্রচারণা চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই রকম একটি প্রচেষ্টা ছিল আগস্ট মাসে চলমান এস এস সি (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে প্রচারণা চালানো। এছাড়া তুষখালির খাদ্য গুদাম দখল করার পর বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড শামসুল আলম তালুকদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া সমাবেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করতে ও পাকিস্তানি শাসকচক্রকে প্রত্যখ্যান করতে আহ্বান জানান।[২২৬]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার আল বদর দালালদের সাথে যুদ্ধে জিয়া বাহিনীর বেশ কয়েকজন যোদ্ধা উল্লেখযোগ্যভাবে আহত হয়েছিলেন। আহত যোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার আ. গফফার, কমান্ডার হাবিবুর রহমান আছমত ও গেরিলা যোদ্ধা সোহরাব।[২২৭] এছাড়া সম্মুখ যুদ্ধেও নানারকমভাবে এ বাহিনীর প্রায় বিশজন সদস্য শহিদ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন আবু বকর সিদ্দিক তালুকদার (মোরেলগঞ্জ), নজরুল ইসলাম খান মুকুল (মহিষচরানিযা, মোরেলগঞ্জ), আনোয়ার হোসেন খান (সাউথখালী, তাফালবাড়ি, শরণখোলা), ইসমাইল হোসেন (রাজাপুর, শরণখোলা), আচমত আলী মুন্সী (মুড়িয়াখালী, শরণখোলা), শামসুল হক ব্যাপারী (বকুলতলা, শরণখোলা), আব্দুস সত্তার হাওলাদার (রাজাপুর, শরণখোলা), আলতাফ হোসেন শিকদার (রাজাপুর, শরণখোলা), শেখ আবদুল আসাদ (পদ্মনগর, কচুয়া), গুরুপদ বালা (বড় নবাবপুর, রামপাল), হাবিলদার আলাউদ্দিন (বরগুনা), টিপু সুলতান (ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর), আ. সাজেদ (কেউন্দিয়া, কাউখালি), বিধান ও সিরাজ (বসন্তপুল, পিরোজপুর)।[২২৮]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাহিনী গঠনের পরপরই বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রের জন্য তিনি জুলাই মাসের প্রথম দিকে ভারতে যান।[২২৯] ভারতে বিভিন্ন সময় সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানী, ৯নং সেক্টর প্রধান মেজর জলিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সালের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সুন্দরবন কেন্দ্রিক পরিকল্পনার কথা উপস্থাপন করেন।[২৩০] এরপর তাকে পিরোজপুর, ভান্ডারিয়া, কাঁঠালিয়া, ও খুলনার সুন্দরবন এলাকার সাব সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।[২৩১] এছাড়া তাকে বেশকিছু অস্ত্র ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধা প্রদান করা হয়। এরপর আবার ৯নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে চিঠি আসায় তিনি সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বারের মতো ভারতে যান।[২৩২] এসব সাক্ষাতে প্রাপ্ত নির্দেশনানুযায়ী জিয়াউদ্দিন তার বাহিনী পরিচালনা করতে সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু জিয়াউদ্দিনের বাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ও জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে জেনারেল ওসমানীর কাছে লিখিত অভিযোগ আসায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে জিয়াউদ্দিকে ভৎসনা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে আনা ঐ অভিযোগ পরবর্তীকালে মিথ্যা প্রমাণিত হলেও আরেকটি কারণে বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ সামরিক কর্তৃপক্ষ তার দলের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সপ্তাহে পিরোজপুর, শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জে ধৃত রাজাকার দালাল লুটেরাদের অনেককে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করায় জিয়া উদ্দিনের বিরুদ্ধে উল্লিখিত অসন্তুষ্টি জন্ম নেয়। এছাড়া বিজয় পরবর্তীকালে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে জিয়ার অনুসারীদের সমন্বয়হীনতা দুই পক্ষের মধ্যে দূরত্ব ও কখনো কখনো দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল।[২৩৩]

গণমাধ্যমে জিয়া বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে জিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ড যুদ্ধকালে খুব কমই প্রচারবহুল গণমাধ্যমে স্থান পেয়েছিল। জিয়া বাহিনীর মোরেলগঞ্জ আক্রমণের সংবাদ মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশ* পত্রিকায় প্রচার করা হয়।[২৩৪] বরিশাল থেকে প্রকাশিত *বিপ্লবী বাংলাদেশ* পত্রিকায় এই বাহিনীর ভান্ডারিয়া ও কাউখালি থানা অভিযান সম্পর্কে বলা হয়, "এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা বরিশাল জেলার কাউখালী এলাকার হানাদার বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দেন। কয়েক ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৩৭ জন খানসেনা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে খতম হয়। অবশিষ্ট খানসেনারা অস্ত্রশস্ত্র পানিতে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। মুক্তিযোদ্ধারা ৮টি রাইফেল, কয়েকটি মাঝারী মেশিনগান এবং প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ দখল করিতে সক্ষম হন।"[২৩৫] একই পত্রিকায় এই বাহিনীর তুষখালি খাদ্য গুদাম অভিযান সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, "অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন জিয়ার নেতৃত্বে তুষখালী থানায় আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ ও রাজাকারকে বন্দী করা হয়। থানা থেকে বেশ কিছু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এখানকার সরকারী গুদাম থেকে খাদ্যশস্য উদ্ধার করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেয়।"[২৩৬] জিয়াউদ্দিন আহমেদ যুদ্ধকালে যখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন, তখন তার বাহিনীর কর্মকাণ্ড বিষয়ে বিবিসি সহ বিদেশি ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গণমাধ্যমকে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[২৩৭]

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

জিয়া বাহিনীর কোনো সদস্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত বীরত্বসূচক কোনো খেতাব বা অন্য কোনো পুরস্কার পাননি।[২৩৮] বরং এ বাহিনীর অনেক সদস্য এখনো মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি। জিয়া বাহিনীর নারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার খুরশীদ জাহান বেগম এরকম একজন যার নাম এখনো তালিকাভুক্ত নয়।[২৩৯] এছাড়া বাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধাদেরকে নানাভাবে সেবাদানকারী (নৌকার মাঝি, জেলে প্রমুখ) ব্যক্তিগণকে তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিটুকুই দেওয়া হয়নি।

অস্ত্র সমর্পণ

জিয়া বাহিনীর অধিনায়ক জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও তার বাহিনীভুক্ত যোদ্ধারা যুদ্ধশেষে অস্ত্র জমা দিয়েছিলেন। বিজয়ের পরপরই পিরোজপুরে মিলিশিয়া ক্যাম্প স্থাপন করা হয় এবং সেখানে জিয়া বাহিনীর সদস্যবৃন্দ পিরোজপুর মহকুমা প্রশাসনের নিকট অস্ত্র জমা দেন।[২৪০]

মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টর গঠন করা হয়েছিল দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক থেকে বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপের উপকূলবর্তী অংশ ৯নং সেক্টর। এই সেক্টর এলাকার খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা এবং পটুয়াখালীর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন, যার আয়তন প্রায় ৪১১০ বর্গ কি.মি. এবং এর প্রায় ১৭০০ বর্গ কি.মি. জলাভূমি। পরস্পর যুক্ত প্রায় ৪০০ নদী নালা ও খালসহ প্রায় ২০০টি ছোট বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে সুন্দরবন জুড়ে।[২৪১]

৯নং সেক্টর এলাকার পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যেখানে স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াত করা যায়। এছাড়া ৯নং সেক্টর এলাকার সর্বদক্ষিণে রয়েছে বঙ্গপসাগর এবং ভারত মহাসাগর। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। এসব ঘাঁটি থেকে স্থল ও জলপথে মুক্তিযোদ্ধারা ৯নং সেক্টর এলাকায় প্রবেশ করে পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনাসহ দেশের ভেতরেই মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রশস্ত্র ট্রানজিট করতেন। এ কারণে পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত সংলগ্ন জলাভূমি, বনভূমি ও স্থলপথের নিরাপত্তার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এলাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানে দেশের দক্ষিণাঞ্চল পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া এবং নদী ও সমুদ্রপথ মুক্তিবাহিনীর জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। এছাড়া পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল মংলা ও চালনা বন্দরের নিরাপত্তা ও দখল বজায় রাখা প্রসঙ্গে। এহেন ভূকৌশলগতভাবে ও সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্ববহ এলাকার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদ। সুন্দরবনের অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও রণকৌশলগত গুরুত্ব উপলব্ধি ও বিবেচনা করে সুন্দরবনকে আশ্রয় করে পিরোজপুর-পটুয়াখালী-বরগুনার একাংশ, বাগেরহাটের শরণখোলা মোরেলগঞ্জ মংলা পোর্ট এলাকায় জিয়াউদ্দিনের মুক্তিদল সক্রিয় ছিল। প্রধানত স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ও জিয়াউদ্দিন এবং বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা-সংগঠকদের তৎপরতায় এ মুক্তিযোদ্ধা দল জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরে বিজয় অর্জন পর্যন্ত উল্লিখিত এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্য মিলিশিয়া, নৌসেনা, রাজাকার-আল বদর-দালালদেরকে সর্বোতভাবে মোকাবেলা করে। উল্লেখ্য জিয়া বাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের সেনা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কিছু অস্ত্র এবং লোকবল লাভ করেছিল। প্রাপ্ত অস্ত্র ও লোক-সহায়তা নিঃসন্দেহে এই বাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি ছিল জিয়া বাহিনীর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ ও জনসমর্থন। এর ভিত্তিতে জিয়া বাহিনী অত্র এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ে গিয়েছিল। উল্লিখিত এলাকা সমুহে জিয়া বাহিনী ব্যতীত কদাচিত বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত বা অন্যান্য (যেমন বিএলএফ) মুক্তিযোদ্ধা দল সক্রিয় ছিল। সুতরাং সুন্দরবন সন্নিহিত এলাকাসমূহে মুক্তিযুদ্ধের মূল কারিগর জিয়া বাহিনী। জিয়া বাহিনী পাকিস্তান সৈন্যদল ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর ছিল। চোর-ডাকাত-লুটেরা-নির্যাতনকারী ও সুযোগসন্ধানী দালালদের একটি অংশকে প্রতিহত করে এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ স্থানীয় জনমনে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। এ

বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা যুদ্ধের প্রথমার্ধেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুস্কৃতকারী নিহত ও আহত হয়েছিল। ফলে এ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি জনসমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য জিয়া বাহিনীর একটি বিশেষ অবদান এ বাহিনী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। জিয়াউদ্দিন আহমেদ পিরোজপুরে থাকাকালে মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ে পিরোজপুরে আগ্রহী ও উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে অত্র এলাকার বেশ বড় একটা অংশের ছাত্র-যুবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে যখন জিয়াউদ্দিন আহমেদ সুন্দরবনে ঘাঁটি তৈরি করেন তখন তাদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ ঘাঁটিতে যোগ দেন।[২৪২] এরপর সুন্দরবন ঘাঁটিতেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বাগেরহাটের দক্ষিণাংশ প্রভৃতি এলাকা ভারতীয় সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থিত সেহেতু এসব এলাকা থেকে আগ্রহী ছাত্র-যুবকদের পক্ষে সীমান্তের ওপারে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই উল্লিখিত এলাকার ছাত্র-যুবক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বনকারী অনেকেই আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এ অবস্থায় সুন্দরবনে মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি স্থাপিত হলে এবং এখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় জুলাই আগস্টের পর অত্র এলাকার প্রায় আট হাজার ছাত্র-যুবক-কৃষক শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছিলেন।[২৪৩] সুন্দরবন ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক নতুন মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হচ্ছিল, সে বিষয়টি ৯নং সেক্টর কমান্ডার ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৪৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯নং সেক্টরের অধীন নভেম্বর পর্যন্ত যেখানে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার[২৪৫] সেখানে জিয়া বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল (বাহিনীভুক্ত প্রায় তিন হাজার ভারত প্রত্যাগত যোদ্ধা বাদে) প্রায় এগার হাজার।

জিয়া বাহিনীর অনুসৃত গেরিলা যুদ্ধকৌশল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসৃত গেরিলা পদ্ধতি থেকে খানিকটা ভিন্ন ছিল বলা যায়। 'হিট এন্ড রান' গেরিলা পদ্ধতির দুর্বলতা এই যে, এ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিরোধী পক্ষকে আক্রমণ করে স্থান ত্যাগ করার পর তারা স্থানীয় জনসাধারণের ওপর নারকীয় নির্যাতন চালায় ও প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমেই জনসমর্থন এবং সহযোগিতা হারাতে থাকেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে মুক্তি অর্জন প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জিয়া বাহিনী আগস্টের শেষ দিক থেকে নভেম্বর পর্যন্ত একটু ভিন্ন আক্রমণ কৌশল অনুসরণ করে। তারা সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী দশ পনেরো মাইল পর্যন্ত এলাকা সার্বক্ষণিক মুক্ত রেখে সুন্দরবন ও এর আশেপাশে শত্রুপক্ষকে প্রলুব্ধ করে এনে তাদের ওপর হামলা চালাতে থাকেন। এই কৌশল অনুসরণ করার ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমে এসেছিল, তেমনি জিয়া বাহিনীর প্রতি জনসমর্থন লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জিয়া বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল ১০নং সেক্টরভুক্ত নৌ-কমান্ডোদেরকে এই দল পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে নিরাপদে আশ্রয় প্রদান, গাইড প্রদান ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে। জিয়া বাহিনীর সহযোগিতা পেয়েই ভারতে প্রশিক্ষিত নৌকমান্ডোগণ মংলা বন্দর, চালনা বন্দর, হিরণ পয়েন্টসহ সুন্দরবনের নিকটবর্তী বিভিন্ন জলপথে বেশ কিছু জাহাজ, নৌযান ধ্বংস বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়োছিলেন। অনুরূপ এই আঞ্চলিক দলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ভারত থেকে দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র ও প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ট্রানজিট করার ক্ষেত্রে।[২৪৬] ভারত থেকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে পটুয়াখালী বরিশাল, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটিতে অস্ত্র ও প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জিয়া বাহিনীর ঘাঁটি সমূহ ট্রানজিট ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া জিয়া বাহিনীর অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক ও মুক্তিযোদ্ধা ভারত প্রত্যাগতদেরকে গাইড করে নিরাপদে প্রত্যাশিত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও

করতেন।[২৪৭] পাশাপাশি উল্লিখিত এলাকাসমূহ থেকে যারা ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য যেতে চেষ্টা করতেন তাদেরকেও জিয়া বাহিনীর সদস্যগণ সাময়িক আশ্রয়দানসহ নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

জিয়াউদ্দিন আহমেদ বরিশাল সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর ও পটুয়াখালী সাব-সেক্টর কমান্ডার লে. মেহেদী আলী ইমাম এর নিয়ন্ত্রনাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তার বাহিনীর সমন্বয় ঘটিয়ে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির মোকাবেলা করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে জিয়া বাহিনী বরং উল্লিখিত সাব- সেক্টর দুটোর জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন।[২৪৮]

মুক্তিযুদ্ধে জিয়া বাহিনীর অনবদ্য ভূমিকা ছিল শরণার্থী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। রাজাকার-দালাল-লুটেরা-আল বদর ও পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে সম্ভ্রম ও সম্পদ হারানো লক্ষাধিক শরণার্থীকে (বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, ফরিদপুর এলাকার) ভারতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন এ বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্ব। শরণার্থী সংক্রান্ত সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এই বাহিনীতে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কর্মরত ছিল।[২৪৯] কোনো একক আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দলের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে শরণার্থী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঐরূপ আলাদা কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জিয়া বাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড় অবদান পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, শরণখোলা মোরেলগঞ্জ থানা দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। উল্লিখিত থানাসমূহ এ বাহিনী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে দখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়। তারপর এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ মংলা থানা, বাগেরহাট সদরসহ খুলনা মুক্তকরণে ভূমিকা রাখেন।[২৫০]

জিয়া বাহিনীর কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণ যেমন নিরাপত্তা ও মনোবল পেয়েছিল, তেমন কিছু ক্ষেত্রে জনগণের প্রাণ ও সম্পদহানির পরোক্ষ দায় এ বাহিনীর যোদ্ধাদের। এই বাহিনীর দ্বারা মোরেলগঞ্জের দৈবজ্ঞহাটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রান্ত হলে এর প্রতিশোধস্বরূপ রাজাকারের দল শাঁখারীকাঠি গণহত্যা চালায়। এ গণহত্যায় পঞ্চাশের কাছাকাছি সাধারণ (হিন্দু) মানুষ নিহত হন।[২৫১] এছাড়া মোরেলগঞ্জের রাজাকার ঘাঁটি জিয়া বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার দল মোরেলগঞ্জ বাজার পুড়িয়ে দেয়। তাছাড়া এদের হাতে ডা. আবুল মজিদ, সাহেব আলী খান, আব্দুর রহমান খান, ফারুক খান নিহত হন । অনুরূপ ভাবে জিয়া বাহিনী কর্তৃক ভান্ডারিয়া, কাউখালি, রাজাপুর থানার অস্ত্রশস্ত্র দখলকৃত হলে প্রতিহিংসাস্বরূপ ভান্ডারিয়া বন্দর ও কাউখালি বাজার পুড়িয়ে দেওয়া হয়।[২৫২] এছাড়া এই বাহিনীর ভেতরে শৃঙ্খলাভঙ্গের কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছিল যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহিনীর অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দের কারণ হয়েছিল।[২৫৩]

সুতরাং সুন্দরবনের সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় এনে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ব্যক্তি প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জিয়া বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও ন্যূনতম সহযোগিতাসহ বেশ কার্যকরভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরকে মোকাবেলা করেছিল। এটাও সত্য যে, বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দল পরিচালনায় কিছু শৃঙ্খলাহানির ঘটনা ছিল এবং স্থানীয় অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিবাহিনীর কারণে। উপযুক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, এই বাহিনীর ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যথাযথভাবে স্বীকৃতি পায়নি। এ বাহিনীর কোনো সদস্যই রাষ্ট্রীয় কোনো খেতাব বা পদক পাননি। বাহিনীর অনেক সদস্যই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। সে কারণে রাষ্ট্রের নিকট ইতিহাসের দাবি এই যে মুক্তিযুদ্ধে জিয়া বাহিনীর প্রকৃত অবদান চিহ্নিত করে এ বাহিনীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হোক।

সিদ্দিক বাহিনী

ভোলা

মুক্তিযুদ্ধকালে ভোলা ছিল বরিশাল জেলার সর্বদক্ষিণের মহকুমা। ভোলার উত্তরে ইলিশ নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে যমুনা নদী ও পশ্চিমে তেঁতুলিয়া নদী। দ্বীপময় ভূখণ্ড ভোলায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রচেষ্টায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা একদল মুক্তিযোদ্ধা ব্যতীত ভোলার মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভোলায় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সমরনায়ক ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান। শুরুর দিকে ভোলার বোরহানউদ্দিন থানা কেন্দ্রিক মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে তুললেও ধীরে ধীরে তিনি ভোলার মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসীন হন। তার নামানুসারেই এ বাহিনী পরিচিতি পায় 'বাঘা সিদ্দিক বাহিনী' নামে। তিনি ভোলায় বাহিনী পরিচালনা করলেও মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে পটুয়াখালী জেলায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন।[২৫৪] ভোলায় বোরহানউদ্দিন থানা থেকে সিদ্দিক বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হলেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে গোটা ভোলার মুক্তিযোদ্ধারা এ বাহিনীর নেতৃত্বাধীন হয়। তিনি ছিলেন ভোলার মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সর্বাধিনায়ক।

সিদ্দিকুর রহমান ১৯৪৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেউলা ইউনিয়নের বড়পাতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আব্দুল হক হাওলাদার ও মায়ের নাম জমিলা খাতুন। সিদ্দিকুর রহমান লালমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর থেকে তিনি বিএ পাস করেন।[২৫৫] মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি 'বাঘা সিদ্দিক', 'মেজর সিদ্দিক', 'হাইকমান্ডার সিদ্দিক' নামে পরিচিত লাভ করেন। তবে স্থানীয়রা তাকে 'বাঘা সিদ্দিক' নামেই বেশি চেনেন তার অসীম সাহসিকতার জন্য।[২৫৬] সিদ্দিকুর রহমান পেশাজীবনে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি হাবিলদার থাকা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে দেশে চলে আসেন। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতার ভিত্তিতে বোরহানউদ্দিন থানায় তিনি মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে পুরো ভোলা মহকুমার মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পান।[২৫৭] এরপর থেকে তিনি 'হাইকমান্ড সিদ্দিক' নামে পরিচিতি পান।

বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভোলা থেকে জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে তোফায়েল আহমদ (ভোলা, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন এলাকা) এবং ডা. আজহার উদ্দিন আহমদ (তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন এলাকা) নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন মোশাররফ হোসেন শাহজাহান (ভোলা), নজরুল ইসলাম (দৌলতখান), রেজা-ই করিম চৌধুরী চুন্নু (বোরহানউদ্দিন) ও মোতাহার উদ্দিন মাস্টার (চরফ্যাশন, লালমোহন)।[২৫৮] বিজয়ী সংসদ সদস্যগণ দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত প্রার্থী ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে ভোলার ছাত্র-যুবক তাৎক্ষণিক প্রতিবাদী মিছিল করে। ভোলা কলেজ থেকে প্রথম মিছিল বের হয়। ২ মার্চ ভোলায় জনসভা হয় যেখানে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মোশাররফ হোসেন শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে মহকুমা ছাত্রলীগ সভাপতি ও ভিপি সালেহ আহমদ, ফজলুল কাদের মজনু মোল্লা, আজিজুল ইসলাম ভূইয়া, কার্তিক দেবনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। জনসভা শুরুর পূর্বে ভোলার বরিশাল ভবনের সম্মুখে প্রথম

স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সভা শেষে মিছিল করে ছাত্র-জনতা কোর্ট ভবনে যায়। কোর্ট ভবনের ছাদে উঠে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে মজনু মোল্লার কার্যকর অংশগ্রহণে একদল ছাত্র-যুবক বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।[২৫৯] এরপর থেকে প্রতিদিন ভোলার প্রত্যেকটি থানায় মিছিল-সমাবেশ চলতে থাকে ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নানা রকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হতে থাকে।

৭ মার্চে আওয়ামী লীগের জনসভায় দলপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন, সে মোতাবেক ভোলায় ১০ মার্চ সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। ভোলা মহকুমা সংগ্রাম কমিটির কাঠামো ছিল নিম্নরূপ: [২৬০]

নাম	পদবি
মো. শামছুদ্দীন আহমদ	আহ্বায়ক
মোশাররফ হোসেন শাহজাহান	সদস্য
রেজা-ই-করিম চৌধুরী	ঐ
নজরুল ইসলাম	ঐ
রিয়াজউদ্দিন মোক্তার	ঐ
মাওলানা মমতাজুল করিম	ঐ
এ কে এম নাছির উদ্দিন	ঐ
ডা. সাইফুল্লা মিয়া	ঐ
আব্দুল মান্নান	ঐ
ফজলুর রহমান মাস্টার	ঐ
হাজী মোখলেসুর রহমান	ঐ
নূর সোলায়মান তালুকদার	ঐ
আবু আমির চৌধুরী	ঐ
ডা. সৈয়দ আহমদ	ঐ
ওবায়দুল হক	ঐ
খোরশেদ আলম	ঐ
মাকসুদুর রহমান	ঐ
আব্দুল হাই	ঐ
ডা. আব্দুল লতিফ	ঐ

(তালিকা অসম্পূর্ণ)

ভোলা মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হওয়ার পূর্বেই বোরহানউদ্দিন থানায় ৯ মার্চ সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম কমিটির কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:[২৬১]

নাম	পদবি
রেজা-ই-করিম চৌধুরী	সভাপতি
বশিউদ্দিন মিয়া	সহ-সভাপতি
মো. সিরাজুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
ডা. সৈয়দ আহমদ	কোষাধ্যক্ষ
আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া	প্রচার সম্পাদক
ফখরুল ইসলাম চৌধুরী	সদস্য
সিরাজুল ইসলাম চান্দু মাস্টার	সদস্য

বোরহানউদ্দিন থানা সংগ্রাম কমিটির পাশাপাশি এখানে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল যার নাম ছিল 'দুর্গত এলাকা ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'। এই কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন মো. জুলফিকার আলী। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মো. নাজিমউদ্দিন, নূরনবী, মোসলেম হাওলাদার, জাহাঙ্গীর, মাহবুব, আ. রব, আবু।[২৬২]

বোরহান উদ্দিন থানা ও ভোলা মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হওয়ার পর ভোলার অন্যান্য থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। অবশ্য সংগ্রাম কমিটি গঠনের পূর্বেই ভোলা কলেজ মাঠে ভোলা কলেজের ডামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়। এরপর সংগ্রাম কমিটি গঠিত হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়। ভোলার টাউন স্কুল মাঠ, বাংলা স্কুল মাঠ, সরকারি স্কুল মাঠ ও বাংলা বাজার মাদ্রাসা মাঠে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ভোলা সদরের মোল্লা বাড়িতে মহিলাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্যও একটি ক্ষুদ্র ক্যাম্প ছিল। উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষক ছিলেন হাবিলদার গাজী জয়নাল আবেদীন, নায়েক আব্দুর রব, সিপাহী শাহজাহান ও বশির আহমদ ও আনসার কমান্ডার চান মিয়া।[২৬৩]

বোরহার উদ্দিন থানা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হওয়ার পর সংগ্রাম পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় বোরহানউদ্দিন হাই স্কুলের মাঠে অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়। এই কাজে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আ. মান্নান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসভবনকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ছিলেন সুবেদার হাতেম আলী হাওলাদার, হাবিলদার সামসুল হক ও ছাত্রনেতা মো. জুলফিকার আলী।[২৬৪] প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রথমদিকে ৬০ সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হয়, যার কমান্ডার ছিলেন ছাত্রনেতা মো. জুলফিকার আলী। পরবর্তীকালে বোরহানউদ্দিন থানাধীন ছুটিতে ঘরে ফেরা সকল সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যকে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে যুক্ত করা হয়।

২ মার্চ ভোলায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ মার্চ ভোলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন ছিল প্রকৃতপক্ষে 'পাকিস্তান দিবস'। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে 'পাকিস্তান দিবস' এর পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয়। ভোলা শহরে ২৩ মার্চে জনসভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকানপাট, অফিস-আদালত ও বাড়িঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে।[২৬৫] পাশাপাশি ফ্লাইং অফিসার মাকছুদুর রহমানের নেতৃত্বে ও বেশ ক'জন সেনা সদস্যের তত্ত্বাবধানে ভোলা শহরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকে।

২৫ মার্চ দিবাগত রাত একটায় ভোলা টিএন্ডটি'র দায়িত্বরত কর্মকর্তা জনাব এলাহী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পান এবং তিনি বার্তাটি ঐ রাতেই শহরের মোল্লা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এছাড়া ভোলার এমপিএ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানও উক্ত টেলিগ্রামটি পান।[২৬৬] ২৬ মার্চ এমপিএ জনাব শাহজাহানের বাসভবনে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সভা হয়। ২৭ মার্চ হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ভোলা ট্রেজারি থেকে ৭৫টি রাইফেল সংগ্রহ করা হয়। এরই সাথে ভোলায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২৮ মার্চের পরপরই বরিশাল থেকে মেজর জলিল সংগ্রাম কমিটিকে একদল মুক্তিযোদ্ধা পাঠাতে বলেন। এই আহ্বানে হাবিলদার সিদ্দিক ও জব্বার একদল মুক্তিযোদ্ধা ও বেশ কিছু অস্ত্র নিয়ে ভোলা-৩ লঞ্চে বরিশালে যান এবং তারা মেজর জলিলের নির্দেশে খুলনা, বরিশাল ও সুন্দরবনে পাকিস্তানি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন।[২৬৭] এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাবিলদার সিদ্দিক অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মেজর জলিলের সাথে ভারতে যান। ভারত থেকে চল্লিশ ড্রাম পেট্রল, দুই লঞ্চ ভর্তি অস্ত্র নিয়ে তারা ৭ মে সুন্দরবন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর পাকিস্তানি গানবোটের মুখোমুখি হন। এখানে পাকিস্তানি গানবোটের গোলার আঘাতে তাদের লঞ্চ ডুবে যায় এবং

মুক্তিযোদ্ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আত্মরক্ষার্থে সহযোদ্ধা আব্দুল জব্বারসহ নদী সাঁতরে পার হয়ে সেখান থেকে কয়েকদিন বাদে সিদ্দিকুর রহমান ভোলায় চলে আসেন। ইতোমধ্যে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করে পাকিস্তানি সরকার।[২৬৮]

২৫ এপ্রিল বরিশাল শহর পাকিস্তানি সেনাদল দখল করে। এই সংবাদে ২৭ এপ্রিল ভোলা সংগ্রাম কমিটি ভেঙে দেওয়া হয় এবং থানা ও ট্রেজারি থেকে নেওয়া অস্ত্রে ফেরত দেওয়ার জন্য মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের নির্দেশ আসে।[২৬৯] এই প্রেক্ষাপটে অনেক মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র ফেরত দেন এবং মহকুমা সংগ্রাম কমিটির অধিকাংশ নেতা এবং মুক্তিযোদ্ধা নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে শহর ত্যাগ করেন। ৩ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভোলা শহর দখল করে। এরই সাথে ভোলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাংগঠনিক প্রতিরোধ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় বিক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান। এসময় দেউলা রজব আলী হাই স্কুলে নাজিরপুরের পীর মাওলানা আবদুল লতিফের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। পীর সাহেব সিদ্দিকুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশে দেন। পীর সাহেবের নির্দেশ ও উৎসাহ পেয়ে তিনি পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-দালালদেরকে প্রতিরোধ করতে আরো সক্রিয় হন।[২৭০] তিনি বোরহানউদ্দিনের নিজবাড়ি এসে মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে বোরহানউদ্দিনে ৯৫টি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় এবং কয়েকজন নারীকে নির্যাতন করা হয়। এ অবস্থায় তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করে কোরআন স্পর্শ করিয়ে তাদেরকে শপথ করান যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালিয়ে যাবে না। এরপর তিনি পুরাতন হাজী বাড়িকে তার প্রধান ক্যাম্প ঘোষণা করে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা শুরু করেন।[২৭১] তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে বোরহানউদ্দিন থানায় একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে ওঠে।

সংগঠন

বোরহানউদ্দিনের দেউলাতে হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেছেন শুনে ভোলার বিভিন্ন স্থানের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ এসে সিদ্দিক বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন। শুরুর দিকে এই দলে স্বল্প প্রশিক্ষিত সদস্যের চেয়ে ইবিআর, ইপিআর, আনসার, পুলিশ সদস্য সংখ্যায় বেশি ছিল। কেননা, ’৭০-এর ঘুর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় এলাকা থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কয়েক মাসের ছুটিতে বাড়িতেই ছিলেন। এরা ভোলার বিভিন্ন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন।[২৭২] যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এ বাহিনীর অধীন প্রায় সাত হাজার মুক্তিযোদ্ধা ছিল। এর পাশাপাশি বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী/সহযোগী। এছাড়া এ বাহিনীর সংগঠক ও নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সাথে সংগ্রাম কমিটির আত্মগোপনে থাকা নেতাদের মধ্যে রেজা-ই করিম চুন্নু এমপিএ, মোতাহার উদ্দিন মাস্টার এমপিএ এর সুসম্পর্ক ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন বিষয়ে কমান্ডার সিদ্দিক মোতাহার উদ্দিন মাস্টার এমপিএ’র সাথে পরামর্শ করতেন।[২৭৩] তবে এ বাহিনীর উপর তাদের সরাসরি কোনো প্রভাব ছিল না।[২৭৪]

সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন এ বাহিনীর অধিনায়ক। তার সেকেন্ড ইন কমান্ড (টুআইসি) কয়েক ধাপে কয়েকজন ছিলেন। সুবেদার আমির হোসেন, আব্দুল জব্বার, আসমত আলী মিয়া, শামসুল হক বিভিন্ন সময় সিদ্দিক বাহিনীর সহ-অধিনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাবাজারের সিদ্দিক যিনি মোচু সিদ্দিক নামে পরিচিত তিনিও কিছু সময় সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের মধ্যে আসমত আলী মিয়া সবসময় সিদ্দিকুর রহমানের সাথে থাকতেন।[২৭৫]

সিদ্দিক বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হতো দেউলার পুরাতন হাজী বাড়িকে। এটি ছিল মূলত একটি বাগান বাড়ি। পৈতৃক সূত্রে এই বাড়ির মালিকানা ছিল সিদ্দিকুর রহমানের পরিবারের। এখানে দুটি ঘর ছিল। হাজী বাড়ি ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন হাবিলদার

শামসুল হক। হাজী বাড়ির ক্যাম্প ছাড়াও বোরহানউদ্দিনের কাচিয়া ক্যাম্প পরিচালনা করতেন হযরত আলী ও শানু মিয়া, বোরহানউদ্দিন ক্যাম্প পরিচালনা করতেন সুবেদার আমীর হোসেন, গাজীপুরা ক্যাম্প তত্ত্বাবধান করতেন বাংলাবাজারের সিদ্দিক এবং সাঁচড়া ক্যাম্প দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন হাবিলদার মিলন তালুকদার। হাজী বাড়ি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ ও ক্যাম্পের আর্থিক দিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন চরফ্যাশনের ফখরুল আলম।[২৭৬] উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প বাদে সিদ্দিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ভোলার অন্যান্য থানায় ছোটো ছোটো কয়েকটি ক্যাম্প ছিল। চরফ্যাশনে পেয়ার আলী ব্যাপারীর বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি ক্যাম্প ছিল। এছাড়া লালমোহনেও এ বাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল।[২৭৭] পাশাপাশি দৌলতখান থানার দিদারুল্লাহ গ্রামে, চরপাতা খাঁ বাড়িতে, মেদুয়ার অদুদ মিয়ার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল।[২৭৮] এসব ক্যাম্পের বাইরেও সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বোরহানউদ্দিন থানাধীন রাজাবাড়ি, দেউলার তালুকদার বাড়ি (নতুন), দেউলার তালুকদার বাড়ি, আজহার চৌধুরী বাড়ি, রফিজল মিয়া হাওলাদার বাড়ি, দেউলার মোসলমান বাড়ি, দেউলার ইস্কুল বাড়ি, দেউলার চৌধুরী বাড়ি (ওপার বাড়ি), বাটামারার আলতাফ হাওলাদার বাড়ি, কাচিয়ার দাসবাড়ি ফুল, কাচিয়ার গগন আলী মুন্সি বাড়ি, বোরহানগঞ্জের কমল মিত্র বাড়ি; লালমোহন থানাধীন টিটিয়ার গিয়াস চেয়ারম্যান বাড়ি, ফরাশগঞ্জের কাশেম চেয়ারম্যানের বাড়ি, গাইমারা পাটোয়ারী বাড়ি, পাঙ্গাইসা পাটোয়ারী বাড়ি, বদরপুরের হাজী বাড়ি, দালাল বাড়ি, মজু চেয়ারম্যানের বাড়ি, চরউমেদের হাসান আলীদের বাড়ি, চরউমেদের রবদের বাড়ি; চরফ্যাশন থানাধীন কাচ্ছপিয়ার মজিদ ডাক্তারের বাড়ি, ভদ্র পাড়ার মিয়া বাড়ি; ভোলা সদর থানাধীন আলীনগরের ইছহাক জমাদার বাড়ি, জাঙ্গালিয়ার বারি বাড়ি, জাঙ্গালিয়ার রুহুল আমিন উকিল বাড়ি, চর আলগির হাজী বাড়ি, চরপাতার শরত ডাক্তারের বাড়ি, বাপ্তার বরকন্দাজ বাড়ি, তালতলির খুনিয়াদের বাড়ি, উত্তর জয়নগরের মজিদ পণ্ডিত বাড়ি, চরপাতার নজু মিয়াদের বাড়ি; দৌলতখান থানাধীন চরপাতার পাটেয়ারী বাড়ি, মৃধা বাড়ি, কলাকোপার জুগি বাড়ি, কালা মুন্সি বাড়ি এবং তজুমদ্দিন থানাধীন শম্ভুপুরের অনিল মাস্টারের বাড়ি অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতেন।[২৭৯]

সিদ্দিক বাহিনীর নিজস্ব অর্থ বিভাগ ছিল। এ অর্থের মূল জোগানদাতা ছিলেন বাহিনী প্রধান নিজেই। নিজের জমি বিক্রি করে তিনি বাহিনী পরিচালনা করতেন। তিনি তার বাহিনী পরিচালনার জন্য প্রায় পনের কানি জমি বিক্রি করেন।[২৮০] এছাড়া স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গুটিকয়েক ব্যক্তি ক্যাম্প পরিচালনায় তাকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কমান্ডার সিদ্দিক গরিব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। চাহিদার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কখনো পাঁচশত টাকা, কখনো সাতশত টাকা সহযোগিতা হিসেবে দিতেন। এ বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকে বেতন বা ভাতা দেওয়া হতো না।[২৮১]

সিদ্দিক বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ থাকার কারণে বিভিন্ন অভিযান পলিচালনা, তথ্য সরবরাহ করতে সুবিধা হতো। তবে নিয়মিত গোয়েন্দা বিভাগ ছিল না। অভিযান পরিচালনার প্রেক্ষাপটে যখন যাকে প্রয়োজন হত তাকে গোয়েন্দা বিভাগে কাজে লাগানো হতো।[২৮২]

সিদ্দিক বাহিনীর আনুষ্ঠানিক কোনো বিচার বিভাগ ছিল না। তবে বাহিনীর প্রধান স্থানীয় মানুষের করা নানা অভিযোগের বিচার করতেন। এই কাজে তিনি বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। কমান্ডার সিদ্দিক তার বাহিনীর সদস্যদের শপথ করান যেন তারা কোনো অন্যায় কাজে অংশ না নেন। এ বাহিনীর সদস্যদের জন্য তিনি মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য খারাপ কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।[২৮৩] বাহিনীর কোনো সদস্য নিয়মভঙ্গ করলে তাকে সামরিক আইন অনুযায়ী বিচারের মুখোমুখি হতে হবে- এই ছিল বাহিনী প্রধানের নির্দেশনা।

এ বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প 'হাজী বাড়ি ক্যাম্প'র রান্নার কাজ করতেন পাশের বাড়ির মহিলারা। ক্যাম্পে যারা আসতেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হতো। তবে, যে কেউই এ ক্যাম্পে আসার অনুমতি পেতেন না। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের জন্য স্থানীয়রা বিভিন্ন সময়ে অনেক কিছু (খাদ্য সামগ্রী, অর্থ) দিয়ে সহযোগিতা করতেন।[২৮৪]

প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহ

সিদ্দিক বাহিনীর অনেক সদস্যই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বোরহানউদ্দিন হাই স্কুল মাঠে ছাত্র ও যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এই স্কুল মাঠই ছিল বোরহানউদ্দিনে প্রধান মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া অনেক বেসামরিক ব্যক্তি পরবর্তীকালে সিদ্দিক বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন। এ বাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের বড় সংখ্যক সদস্য ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য। ফলে তারা নিজেরা প্রশিক্ষিত ছিলেন। এরপর বাহিনী গড়ে তোলার পর হাজী বাড়ি ক্যাম্পে আগ্রহী স্থানীয় তরুণ, ছাত্র ও যুবকদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ বাহিনীর অস্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প লালমোহন, তজুমদ্দিন ও চরফ্যাশনেও গড়ে তোলা হয়। এসব ক্যাম্পে সিদ্দিক বাহিনী প্রায় পাঁচ হাজার স্থানীয় ব্যক্তিকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।[২৮৫]

বাহিনী গঠনের শুরুতে কমান্ডার সিদ্দিকের দলের কাছে মোট তিনটি ৩০৩ রাইফেল ছিল।[২৮৬] এর মধ্যে দুটি রাইফেল কমান্ডার সিদ্দিক সিরাজ সিকদার গ্রুপের সদস্যদের নিকট থেকে পান।[২৮৭] এরপর ভোলার বিভিন্ন থানায় অভিযান পরিচালনা করে এ বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে সিদ্দিক বাহিনীর অস্ত্র সংগ্রহের মূল উৎস ছিল থানা আক্রমণ। এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্য, রাজাকার-পুলিশ-দালালদের সাথে যুদ্ধে সাফল্যের পর সেখান থেকেও অস্ত্র উদ্ধার হতো।[২৮৮] সিদ্দিক বাহিনীর প্রধানের নির্দেশে স্থানীয় রাজাকার মান্নানকে হত্যা করা হয়। রাজাকার মান্নান হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে পুলিশ আসে এবং স্থানীয় এক রাজাকারের বাড়িতে দুপুরের খাবার খায়। সে সময় সিদ্দিক বাহিনী অভিযান চালিয়ে পুলিশ ও রাজাকারদের নিকট থেকে ১২টি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেন।[২৮৯] চরফ্যাশন থানার রাজাকার গোয়েন্দা মনোয়ারা বেগমকে সিদ্দিক বাহিনী হত্যা করে। তার হত্যার সংবাদ পেয়ে থানার ওসিসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য তদন্ত করতে আসলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে ওসি রিভলবার ফেলে পালিয়ে যান। এখানে পুলিশ ও রাজাকারদের কাছ থেকে ৬টা রাইফেল উদ্ধার করা হয়।[২৯০] এভাবে থানা দখল ও শত্রুপক্ষের নিকট থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে সিদ্দিক বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

আওতাভুক্ত এলাকা

সিদ্দিক বাহিনী প্রধান সিদ্দিকুর রহমান খুলনা, পটুয়াখালীর যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেও তার 'বাঘা সিদ্দিক বাহিনী' মূলত গড়ে ওঠে ভোলা মহকুমাকে কেন্দ্র করে। ভোলা মহকুমার বোরহানউদ্দিন থানার দেউলা ইউনিয়ন থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে গোটা ভোলা মহকুমায় এ বাহিনীর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ভোলার অন্যান্য ছোট ছোট গ্রুপগুলো এ বাহিনীর নেতৃত্ব মেনে নেয়।[২৯১]

যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভোলার ওয়াপদা কলোনি ও ওয়াপদা রেস্ট হাউজে পাকিস্তানি সৈন্যদলের সুরক্ষিত ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে মেজর জাহান জেব খানের নেতৃত্বে এক কোম্পানির অধিক সৈন্য অবস্থান করতেন।[২৯২] এছাড়া ওয়াপদা ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে মহকুমার অন্যান্য থানায়ও মিলিশিয়া-পুলিশ-রাজাকার সমন্বয়ে ক্যাম্প করা হয়েছিল। এই পাকিস্তানি শত্রুদলকে মোকাবেলা

করতে সিদ্দিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মূলত গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস এ বাহিনী অস্ত্রের অভাবে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। প্রধানত আগস্ট মাস থেকে এই বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাদের পরিকল্পনা ছিল ভোলার সর্বদক্ষিণ দিক থেকে এক একটি করে থানা মুক্ত করে পাকিস্তানি শক্তিকে একটি স্থানে আবদ্ধ করে ফেলে তাদেরকে চূড়ান্ত আঘাত করা।[২৯৩] এই পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যরা বিরোধীপক্ষের সাথে এককভাবে ও যৌথভাবে (সিরাজ সিকদার গ্রুপ এবং ভারত প্রত্যাগত যোদ্ধাদের সাথে) প্রায় ১৫টি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এসব যুদ্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধাভিযানের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ওসমানগঞ্জ অভিযান[২৯৪]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ৯ আগস্ট দুপুরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: চরফ্যাশন থানা নিজেদের দখলে নিয়ে আসা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য। এজন্য সিদ্দিক বাহিনীর ২৭ জন ও সিরাজ সিকদার গ্রুপের ১৩ জন যোদ্ধা ওসমানগঞ্জের পেয়ার আলী ব্যাপারী বাড়িতে ক্যাম্প বানায়। এ বাড়ির দক্ষিণ পাশের দেওয়ান বাড়িতেই ছিল রাজাকারদের আড্ডা। সে বাড়ির রুস্তম আলী দেওয়ানের এক ছেলে বেলায়েত দেওয়ান ও তার এক পুত্রবধূ দেলোয়ারের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম পুলিশ ও রাজাকারদের পক্ষে স্পাই এর কাজ করতেন। আগস্টের শুরুর দিকে কোনো একদিন বেলা ১২টার দিকে মনোয়ারা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে এসে মুলিবাঁশের বেড়ায় ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। বিষয়টা একজন পাহারারত মুক্তিযোদ্ধার নজরে এলে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে আনা হয়। অতঃপর তাকে তল্লাসী করে সন্দেহজনক একটা চিরকুট পাওয়া যায়। এরপর তাকে পালাক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি থানার একজন ইনফর্মার। তার ভাসুর বেলায়েত দেওয়ানও তার সাথে জড়িত। বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বেলায়েতকে ধরে নিয়ে আসেন। কমান্ডার সিদ্দিকের নির্দেশে তাকে ও মনোয়ারাকে গুলি করা হয় ও তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটা মুহূর্তের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারাও প্রস্তুত হতে থাকেন যেকোনো হামলা প্রতিহত করার জন্য। এই প্রেক্ষাপটে ওসমানগঞ্জের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা লিপ্ত হন।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সিদ্দিকুর রহমান (কমান্ডার), আলহাজ্ব শামসুল হক, জিয়াউর কুদ্দুস লিয়াকত, হযরত আলী, বাংলাবাজারের সিদ্দিক, ফখরুল আলম, মাহে আলম কুট্টি, আছমত আলী, খোরশেদ খান, আবুল কাশেম (তজুমুদ্দিন), কাঞ্চন মিয়া (দৌলতখান), হারিচ মিয়া (চরভূতা), মাওলানা মাকসুদুর রহমান, মিজানুর রহমান, আবুল কালাম, মীর জকির হোসেন (চরফ্যাশন), সালাউদ্দীন, মোস্তাফিজুর রহমান, জাহাঙ্গীর, আলী হাসান দুলাল, আব্দুল খালেক (খালেক কমান্ডার), আ. মান্নান (বাঘমারা), হায়দার, রুহুল মাস্টার, ওহাব আলী, গিয়াস উদ্দীন আহমদ, রিয়াজুর রহমান খোকন, আবদুস সামাদ হিরণ, হিমেল চন্দ্র দাস, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস, ডা. হাশেম আলী, মীর মফিজুর রহমান, মোতাহার, দিল মোহাম্মদ ফারুক, প্রমুখ তিনটি ৩০৩ রাইফেল, একটি রিভলবার, একটি পিস্তল, তিনটি গ্রেনেড ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: ওসমানগঞ্জ স্থানটি ভোলার সর্বদক্ষিণের উপজেলা চরফ্যাশনের অন্তর্গত। থানা সদর থেকে তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং গজারিয়া বাজার থেকে সরাসরি দক্ষিণে এর অবস্থান। স্থানটা ছিল থানা সদর থেকে বেশ দূরে এবং পথও ছিল যথেষ্ট দুর্গম। দিনটি ছিল ঝড়বৃষ্টিমুখর। মুক্তিযোদ্ধারা দুপুরের খাবার তখনো পুরোপুরি শেষ করেননি। কেউ খেয়েছে, কেউ খাবার অপেক্ষা করেছেন। এমনি সময়ে কেউ একজন জানালো- পুলিশ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডার সাহেব সকলকে তৈরি হতে বললেন। সিদ্দিক সাহেব সকলকে পজেশন নিতে বললে কেউ ঘরের আড়ালে কেউ গাছের

আড়ালে অবস্থান নিল। আগ্নেয়াস্ত্র কম থাকলেও সকলের কাছে পর্যাপ্ত লাঠিসোটা ছিল। এ প্রসঙ্গে সিদ্দিকুর রহমান বলেন:

> আমরা লক্ষ করছি ৩৫-৪০ জনের একটি গ্রুপ আসছে। ও.সি রকিবউদ্দিন আসছেন সাইকেলে চড়ে কিন্তু প্যাডেলে চাপ দিচ্ছেন না। তাকে ধরে ফেলে নিয়ে আসছে দু'জন পুলিশ। পিছনে এবং আশ-পাশে ছিল ৯ জন পুলিশ আর মিলিশিয়া ছিল ৩১ জন। ব্যাপারী বাড়ি পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মুখারবান্দা খাল। খালের উপর একটি বড় সাঁকো। তারা সাঁকোর কাছাকাছি এসে চিন্তা করছিল কীভাবে সাঁকো পার হওয়া যায়। দারোগা সাইকেল থেকে নামলেন মাত্র। তার মধ্যে একটা বিলাসী মনোভাব, কোন রকম যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। বরং তথাকথিত স্পাই বেলায়েত ও মনোয়ারা হত্যার তদন্ত করার জন্য তারা খুব ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল। তাদের কোন একজন সবেমাত্র সাঁকোয় পা রাখল অমনি আমি ফায়ার ওপেন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা এগুচ্ছেন। আর মিলিশিয়া পিছাচ্ছে। অতঃপর অপ্রস্তুত মিলিশিয়াদের এবার পালানোর পালা। কিন্তু পালিয়ে তারা যাবে কোথায়। পিছনে বিস্তৃত মাঠ, সরু রাস্তা এবং দু'পাশে দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত। একটা-দেড়টা থেকে শুরু করে যুদ্ধ চলল প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ।"

ফলাফল: ওসমানগঞ্জের যুদ্ধে ১১ জন মিলিশিয়া-পুলিশ-রাজাকার নিহত হন আর ধরা পড়েন চরফ্যাশন থানার ও.সি.সহ ৯ জন। যুদ্ধশেষে মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেল উদ্ধার করেছিলেন ১৩টি আর সঙ্গে গোলাবারুদ পাওয়া গেলো পর্যাপ্ত । সবচেয়ে বড় লাভ তাদের মনোবল বেড়ে গেল। তারা নিশ্চিত হলেন যে, ঐক্যবদ্ধ থাকলে এবং সঠিক সময়ে সঠিক কমান্ডিং থাকলে যে কোনো যুদ্ধে তারা জয় লাভ করতে পারবেন।

দেউলা অভিযান[২৯৫]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ১৬ অক্টোবর দুপুরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: ১৪ অক্টোবর মান্নান চৌকিদার নামে দেউলার এক রাজাকারকে মেরে সিদ্দিক বাহিনী রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখে। এর উদ্দেশ্য ছিল মান্নানের মতো আর কেউ যাতে রাজাকারী করার সাহস না করে। এরপর ১৫ অক্টোবর সাঁচড়া ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লালমিয়া সাহেবের বাড়িতে একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে আসা ১৪ জন রাজাকার ও ২ জন পুলিশের নিকট থেকে সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যরা ১২টি অস্ত্র এবং কিছু গোলাবারুদ দখল করেন। এই দুটি ঘটনার জেরে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার দলের অর্ধশতাধিক সদস্য সিদ্দিক বাহিনীর দেউলা ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসেন। আক্রমণ করতে আসা এই দলকে প্রতিরোধ করতেই সিদ্দিক বাহিনীর দেউলা অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: সিদ্দিকুর রহমান (কমান্ডার), মাওলানা মাকসুদুর রহমান, আলহাজ্ব শামসুল হক, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, নায়েক আসমত আলী, ল্যান্স নায়েক জিয়াউল হক, নায়েক গিয়াস উদ্দিন, হাবিলদার নাছির, বাংলাবাজারের সিদ্দিক, নায়েক শান্ত, ল্যান্স নায়েক কাঞ্চন, হাবিলদার শামছুল হক মীরা, তাজুমাস্টার (তজুমদ্দিন), জিয়াউল কুদ্দুস লিয়াকত, জাহাঙ্গীর তালুকদার, আবু মিয়া, গিয়াস উদ্দিন (বদরপুর), মিলন তালুকদার, আমির হোসেন মিয়া, তোফাজ্জল, আ. সামাদ হিরণ, রতন মুসলমান, শাজাহান মুসলমান, আজাহার মাস্টার, মতলেব সাজী, মালেক চৌকিদার, আলী ব্যাপারী, তোফায়েল আহমদ, মো. মোসলেম, মো. ইসলাম, ফজলুল হক মনী, শামছুল হক হাওলাদার, মো. হাফিজ উদ্দিন, বাসু হাওলাদার, আছমত মুন্সী, বেলায়েত, ওয়াজী উল্লাহ, শান্ত হাওলাদার, তাজু হাওলাদার, মাজেদ, মোবারক, কমান্ডার শহীদুল আলম, লালু, হানিফ, জুলফিকার, মজু, জলীল (লালমোহন), তানসেন, ইউনুস আলী খন্দকার, ইউনুস (কালমা), আবু কাশেম, হারুন তালুকদার, লোকমান তালুকদার, ফখরুল আলম (চরফ্যাশন), গাজী জয়নাল আবেদীন এবং তালুকদার বাড়ির

সদস্য ও গ্রামের সাধারণ লাঠিধারী মিলে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল একশ এর সামান্য বেশি। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিল আঠাইশটি ৩০৩ রাইফেল, কিছু হাতবোমা এবং দেশীয় অস্ত্র।

অভিযানের বিবরণ: দেউলা বোরহানউদ্দিন থানাধীন একটি গ্রাম। এই গ্রামের শান্তির হাট কিমতউল্লা হাজী বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্যাম্প ছিল। ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও রাজাকার দল তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেউলা রওয়ানা হয়। সম্মুখ বাহিনীতে ত্রিশজন সদস্য ও অল্পসংখ্যক পুলিশ এবং রাজাকার। তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছিলেন শান্তি কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান শিকদার ও তোফাজ্জল শিকদার। কমান্ডার সিদ্দিক তখন হাজী বাড়ি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। তালুকদার বাড়ির জাহাঙ্গীর তালুকদার তাকে দৌড়ে গিয়ে সংবাদ দিলেন যে, মিলিটারি আসছে। সংবাদ শোনা মাত্র সিদ্দিক সাহেব তার দলবল নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। দৌড়ে তারা তালুকদার বাড়ি পর্যন্ত চলে এলেন। এখানে এসে সংবাদ পেলেন যে, মিলিটারি চৌধুরীদের বাড়ি প্রবেশ করেছে। কারণ, ঐ বাড়ির কুট্টি চৌধুরী ও তার ছেলে লাল চৌধুরী শান্তি কমিটির সদস্য ছিল। সেখান থেকে বের হয়ে সম্মুখবাহিনী দরুণ বাজার ঘুরে জানখাঁর দীঘীর পূর্বে পাড় দিয়ে দক্ষিণ দিকে আসছিল। আসার পথে রাস্তার দু'পাশে যত ঘর-বাড়ি ছিল সবগুলোতেই আগুন দিতে দিতে আসছিল। সিদ্দিক সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে কিছুতেই তালুকদার বাড়ি পর্যন্ত আসতে দেয়া যাবে না যেহেতু এ বাড়িতে পাকা ঘর আছে। এখানে একবার উঠলে তাদের আর ঘায়েল করা যাবে না। সেজন্য তারা বাড়িটাকে পিছনে রেখে উত্তরমুখী হয়ে অবস্থান নিলেন। বাড়ির মূল ফটক পূর্বদিকে। এখানে পাকা মসজিদ ও কাচারী। তার পাশেই বড় পুকুর। মুক্তিযোদ্ধারা কেউ পুকুর পাড়ের ঢালে, কেউ গাছের আড়ালে, কেউ ধান ক্ষেতের আড়ালে, কেউ বাড়ির ছাদে অবস্থান নিল। পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে নির্বিঘ্নে আসতে দেয়া হল। সিদ্দিক সাহেব আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন– তিনি ফায়ার ওপেন করবেন। অবশ্য আট-দশজনের একটা গ্রুপকে তিনি উত্তর পশ্চিম দিকের বাড়িতে অবস্থান নেয়ার কথা বলেছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যগণ যখন পঞ্চাশ থেকে একশ গজের মধ্যে চলে এলেন তখনই কমান্ডার সিদ্দিক পাকিস্তানি কমান্ডারের পায়ে গুলি ছুঁড়লেন। তার গুলি চালানোর পর পরই চারদিক থেকে ফায়ার শুরু হয়ে গেল। আধাঘণ্টা গোলাগুলির পর যখন শত্রুসৈন্যের মধ্যে ৮-১০ জন পড়ে গেল, তখনই তারা পালাতে শুরু করলেন। ওদিকে তাদের আসার পথে তারা জানখাঁর দীঘির উঁচু পাড়ের উপর মর্টার বসিয়ে এসেছিলেন। সম্মুখ বাহিনীকে সার্পোট দেয়ার জন্য পশ্চাৎ বাহিনী সেখান থেকে সেল নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু সব সেলই অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ শুরু হয় আনুমানিক দিনের বারটা থেকে। চলতে থাকে একটানা পাঁচটা পর্যন্ত। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি সৈন্যদের সার্পোটিং বাহিনী আর সম্মুখে এগুলো না। তারা সেখান থেকে মর্টার রেখেই পালাতে থাকলেন। এছাড়া তৃতীয় যে দলটি খেয়াঘাট পার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে আসছিল তারাও খারাপ সংবাদ পেয়ে পিছিয়ে গেল। দেউলা তালুকদার বাড়ির উত্তর পাশে যে স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেটা ছিল আসলে একটা সরু রাস্তা ও তার পাশে ছিল ধানক্ষেত। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী যখন দাঁড়াতে পারলো না তখন অস্ত্র ফেলে তারা দিগ্বিদিক পালাতে থাকলো। কেউ ধান ক্ষেতে লুকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। গ্রাম্য লোকজন লাঠির আঘাতে তাদের ধরাশায়ী করলেন।

ফলাফল: দেউলার যুদ্ধে ২৯ জন পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার এবং থানার ও সি সহ দুইজন পুলিশ নিহত হয়েছিলেন। মতি শিকদার ও দুজন পুলিশসহ রাজাকার ধরা পড়েছিল মোট ৮ জন। পরে অবশ্য বন্ড রেখে রাজাকার ও পুলিশদের ছেড়ে দেয়া হয়। কমান্ডার সিদ্দিক সাহেবের মতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৪০। এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় লাভ যোদ্ধারা প্রায় ৪০ টির মত অস্ত্র পায় এবং চারদিকে একটা জয় জয়কার সাড়া পড়ে যায়।

লালমোহন থানা অভিযান[২৯৬]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২১ অক্টোবর ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: দেউলার যুদ্ধে জয়লাভের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা পুরানো পরিকল্পনা মোতাবেক ভোলার দক্ষিণ দিক থেকে এক একটা করে থানা তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে শুরু করেন। এভাবে এগোলে পাকিস্তানি বাহিনীকে ভোলা সদরের ক্যাম্পে কোনঠাসা করে ফেলা যাবে। এই পরিকল্পনা থেকেই লালমোহন থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন হাইকমান্ড সিদ্দিক।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমানের সাথে শামসুল হক, সিদ্দিকুর রহমান (মোচু সিদ্দিক), আসমত আলী, গিয়াস উদ্দিন, সুবেদার শানু, মো. জিয়াউল হক, কমান্ডার শহিদুল আলমসহ আনুমানিক ১০০ সদস্যের এক দল মুক্তিযোদ্ধা প্রায় পঞ্চাশটি ৩০৩ রাইফেল ও কিছু হাতবোমা নিয়ে লালমোহন থানা অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানের বিবরণ: লালমোহন ভোলার দক্ষিণের একটি থানা। ২০ অক্টোবর রাতে দেউলা হাজী বাড়ি ক্যাম্প থেকে রওনা করে লালমোহনের রাস্তা ধরে শাহবাজপুর কলেজের কাছাকাছি পৌঁছে কমান্ডার সিদ্দিক তার দলকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। থানার পশ্চিম দিক থেকে শামসুল হক ও তার বাহিনী, উত্তর দিক থেকে মোচু সিদ্দিক, দক্ষিণ দিক থেকে হাবিলদার গিয়াস উদ্দীন ও পূর্ব দিক থেকে হাবিলদার শানুকে থানা আক্রমণ করার দায়িত্ব দেয়া হল। যোদ্ধারা খুব দ্রুত যে যার জায়গা মতো অবস্থান নিলেন। ভোর ঠিক পাঁচটায় কমান্ডার সিদ্দিক সাহেব পশ্চিম দিকের আর.সি.ও. অফিসের সম্মুখের আম গাছের সাথে রাইফেল ঠেকিয়ে প্রথম ফায়ার ওপেন করলেন। যুদ্ধ শুরু হল ফজরের নামাজ শেষে হওয়ার সাথে সাথে। এরপর পরই চারদিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। থানা থেকেও যথারীতি কাউন্টার দেয়া হল। মোচু সিদ্দিকের নেতৃত্বে উত্তর দিকের গ্রুপটি অবস্থান নিয়েছিল রায় মোহন কুণ্ডের বাড়ি ও তার আশপাশে। গিয়াসের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণের গ্রুপটি ছিল করিম রোড ও তার আশপাশে। শানুর গ্রুপটি ছিল পূর্বদিকের পরিবার পরিকল্পনা অফিস ও রাস্তায় উপর ছড়িয়ে। সবচেয়ে শক্তিশালী দলটা ছিল পশ্চিম দিকের আর.সি.ও. অফিস এবং বাজারের দিকে। হাইকমান্ড সিদ্দিক এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন। যোদ্ধারা চারদিক থেকে থানার দিকে এ্যাম্বুশ করে থাকলেন ভোর থেকে। সকাল থেকে গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকে। ভিতর থেকে দশটা গুলি হলে বাইরে থেকে একটি গুলি ছোঁড়া হয়। ভিতরে অবস্থানরত রাজাকার বা পুলিশকে বোঝানো হচ্ছিল যে, থানার চারদিক যোদ্ধারা ঘিরে আছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এরকম নিরচ্ছিন্নভাবে গুলি বিনিময় চলতে থাকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত। অপর দিকে ভিতরকার লোকদের আত্মসমর্পণ করতে না দেখে কমান্ডার সিদ্দিক যুদ্ধের কৌশল বদল করেন। তিনি রাজাকার কমান্ডার শফির মাকে ধরে নিয়ে এলেন। তাকে থানার কাছাকাছি মানবঢাল বানিয়ে মাইকে ঘোষণা দেয়ালেন। বললেন, 'শফি, তুই সারেন্ডার কর, না হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' এরকম বারবার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও কাজ হচ্ছিল না। এছাড়া সকাল থেকে সিদ্দিক সাহেবও নানাভাবে ভয় দেখিয়েছেন। তাতে কাজ না হওয়ায় তিনি শান্তি কমিটির সভাপতি ফয়জুল্লাহকে (মোহাদ্দেস সাহেব) নিয়ে এলেন। তিনিও সারেন্ডার করার জন্য মাইকে ঘোষণা দিলেন। এক্ষেত্রে রশিদ ডিলার, প্রিন্সিপাল নজরুল, মুজাফফর হাওলাদার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। থানার চারদিকে ছিল বালির বস্তার বাঙ্কার। উঁচু বালির বস্তা ভেদ করে কিছুতেই মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি ভিতরে গিয়ে লাগছিল না। এ অবস্থায় মোহাদ্দেস সাহেব থানার অভ্যন্তরে যাবার পরিকল্পনা করলেন। সে মোতাবেক মাইকে ঘোষণা দিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। তার সাথে বেশ খানিকটা সময় বাকবিতন্ডা হয়েছিল। রাজাকার কমান্ডার কিছুতেই আত্মসমর্পণ করতে চাইছিল না। তার বক্তব্য সে যুদ্ধ করতে করতে মরে যাবে। মরে সে শহিদ হবে। তবু সে কাপুরুষের মতো সারেন্ডার করবে না। কিন্তু মোহাদ্দেস সাহেব তাকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, তারা

কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে না। বরং ভাইয়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করছে। অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল যদি তাদের কেউ কিছু না বলে এবং থানা থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হয় তাহলেই কেবল তারা সারেন্ডার করতে রাজি আছে। মোহাদ্দেস সাহেব তাদের শর্ত মেলে নিলেন এবং বের হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করে মাইকে ঘোষণা দিতেই তারা বের হয়ে গেল। অবশেষে বিকেল তিনটার দিকে যোদ্ধারা থানার ভিতরে ঢুকলেন । কমান্ডার সিদ্দিক ও হরিগঞ্জের কাঞ্চন মিয়া থানার পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করে সরাসরি মালখানায় গেলেন। সেখান থেকে ৭২টি রাইফেল উদ্ধার হলো। কিন্তু গোলাবারুদ তেমন ছিল না। কারণ, সকাল থেকে গুলি চালানোর কারণে গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পুলিশ ও রাজাকারগণ চলে যাবার পর চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন। কমান্ডার সিদ্দিক সাহেবের সাথে আগতবাহিনী ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে যারা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে তারা হলেন মোতাহার উদ্দিন মাস্টার এমপিএ, হাজী মোখলেসুর রহমান, খালেক কমান্ডার, সুলতান কমান্ডার, আবুল হাশেম ফকির, মাহে আলম কুট্টি, মোজাফফর হাওলাদার, নূরুজ্জামান, হরিগঞ্জের কাঞ্চন মিয়া হাবিলদার, হাশেম হাবিলদার ও কাশেম হাবিলদার দু'ভাই ও হারিছ, বালুর চরের ইউনুস মৃধা ও ইসমাইল মৃধা, মফজিল হক মফি, পঞ্চায়েত বাড়ির মফিজল ইসলাম, কানু, মুন্সী বাড়ির আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল নজরুল, আবু সওদাগর, মোতাহার সওদাগর, সোলায়মান হাওলাদার, লিয়াকত, তাজু মাস্টার, রশিদ ডিলার ও চরলক্ষীর সফিউল্লাহ।

ফলাফল: লালমোহন থানা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ৭২টি রাইফেল উদ্ধার করেন। এই থানা দখলের সময় গুলি বিনিময়কালে চারজন সাধারণ মানুষ (মকবুল আহমদ খন্দকার, বাগান বাড়ির মনোরঞ্জন পাল, মনা কুন্ডু ও থানার এক বাবুর্চি) শহিদ হন । লালমোহন থানা দখলের পরপরই ভোলার দক্ষিণাঞ্চল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে চলে আসে।

বোরহানউদ্দিন অভিযান[২৯৭]

অভিযানের তারিখ ও সময়: ২৯ অক্টোবর ভোরবেলা।

অভিযানের উদ্দেশ্য: পাকিস্তানি সৈন্যদল বাংলাবাজার আক্রমণের সাফল্যের পরপরই বোরহানউদ্দিন দখল করার জন্য অভিযান চালায়। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতেই এ অভিযান।

লোকবল ও যুদ্ধাস্ত্র: কমান্ডার সিদ্দিকের দলের প্রায় পাঁচশ সদস্য ৩০৩ রাইফেল, কিছু হাতবোমা নিয়ে এই অভিযানে অংশ নেন। উল্লেখ্য বোরহানউদ্দিনের মূল যুদ্ধটা হয়েছিল ভারত থেকে আসা চরফ্যাশনের আবুল কাশেমের দল ও হাবিলদার মজিবুর রহমানের দলের যোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদলের।

অভিযানের বিবরণ: বাংলাবাজার যুদ্ধের তিনদিন পরেই বোরহানুদ্দিনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের একদিন আগে থেকেই মুক্তিবাহিনীর দু'টি দল বোরহানউদ্দিন হাইস্কুলে অবস্থান করছিল। এর একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন চরফ্যাশনের আবুল কাশেম। এই দলটি ভারত থেকে আসা এবং অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত। তারা পশ্চিম দিকের নদী পথে এসে বোরহানউদ্দিন ওঠে। তাদের কাছে ছিল ভারতীয় ও রাশিয়ান এসএলআর, লাইট মেশিনগান, রকেট লাঞ্চার প্রভৃতি। অপর দলের নেতা ছিলেন হাবিলদার মজিবুর রহমান। তার দলের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। তারা অবস্থান করছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারা মূলত যুদ্ধ করতেন বরিশাল সেক্টরে শাজাহান ওমরের নেতৃত্বে। তারা মেহেন্দীগঞ্জের কোনো এক স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন। এছাড়া হাইকমান্ড সিদ্দিকের নেতৃত্বে যে চার-পাঁচশ যোদ্ধা ছিলেন তারাও বোরহানউদ্দিনের চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করছিলেন। এর মধ্যে পঞ্চাশ জনের একটি দল শামসুল হকের নেতৃত্বে বাজারের পশ্চিমে ছিটু ব্যাপারীর বাড়িতে অবস্থান করছিল। কমান্ডার সিদ্দিকের নেতৃত্বে বড় দলটি বাজারের মধ্যকার

থানা ও তার আশপাশে অবস্থান করছিল। আসলে যোদ্ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। শহর রক্ষাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া তখন পাকিস্তানি বাহিনী কেবল ভোলা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল। সুতরাং হামলা যদি আসে সেটা আসবে কেবল উত্তর দিক থেকেই। আর সেদিকে তো কাশেম ও মুজিবরের নেতৃত্বে শক্তিশালী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বড় আকারের দু'টি দল মোতায়েনই করা আছে। কিন্তু তারা মোটেও ভাবেনি পশ্চিম দিকের নদী পথে এসে পাকিস্তানি সৈন্যদল কোনো হামলা চালাতে পারে। অথচ সেই পথেই পাকিস্তানি সৈন্যদল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণ ছিল ভয়াবহ এবং সেটাকে সার্পোট দেয়ার জন্যই সড়ক পথে ভোলা থেকে কয়েক গাড়ি সৈন্যকে বোরহানউদ্দিনে আনা হয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা খুব দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। হাইকমান্ড সিদ্দিক সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়:

> থানা ও তার আশপাশের বাড়িতে আমার নেতৃত্বে যে ৭০/৭৫ জন যোদ্ধা অবস্থান করছিলেন। তাদের তৈরি হতে হতে পাকিস্তানি বাহিনী খেয়াঘাটের দিক থেকে থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। ফলে আমাদের পক্ষে তেমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। পাকবাহিনীর সাথে বোরহানউদ্দিনে যে যুদ্ধ হয়েছে সেটা কেবল স্কুলে অবস্থানরত ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই। সেখানে কেউ আহত হয়েছে, কেউ পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। ওদিকে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সমরাস্ত্র ও লোকবল আমাদের ছিল না। ফলে দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে আমাদের পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।[২৯৮]

সিদ্দিক সাহেব তার অনুগত বাহিনী নিয়ে বোরহানউদ্দিন বাজার থেকে আনুমানিক মাইল খানেক পূর্ব দিকে এক খেজুর বাগানে অবস্থান করছিলেন। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে কেবল বোরহানউদ্দিন বাজারের ধোঁয়া দেখছিলেন। কিন্তু এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। তাছাড়া মাত্র দু'দিন আগে বাংলাবাজার যুদ্ধে অতর্কিত হামলায় অনেকে নিহত হয়েছেন বলে কেউ আর পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে যায়নি। এদিকে দুপুর বারটার দিকে গোলাগুলি থেমে গেল। পাকিস্তানি সৈন্যদলের একটি গাড়ি বোরহানউদ্দিন বাজার থেকে পূর্বদিকে গিয়ে বোরহানগঞ্জ বাজারে আগুন দিল। তাদের গাড়ি সেদিকে যেতে দেখে কমান্ডারের নির্দেশ ছাড়াই লালমোহনের তানসেন ও জলিলসহ আরো ক'জন রাস্তার কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে এ্যাম্বুশ করেছিলেন। উদ্দেশ্য আবার কোনো গাড়ি পূর্বদিকে গমন করলে তারা গুলি ছুঁড়বে অথবা আগের গাড়ি ফেরৎ এলেও তারা সেটার উপর হামলা চালাবে। ঘণ্টা দেড়েক চুপচাপ থাকার পর পূর্বদিকগামী গাড়িটা ফেরৎ এলে তানসেন ও জলিল গাড়ির চাকায় গুলি ছুঁড়লেন। তাতে একটি চাকা পাংচার হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ চার পাঁচজন পাকিস্তানি সেনা নেমেই যেদিক থেকে গুলি এসেছে সেদিকে ব্রাসফায়ার শুরু করল। তাতেই তানসেন ও জলিলের সমস্ত শরীর ঝাঁঝড়া হয়ে গেল। প্রায় ১৫-১৬ মিনিট অবস্থানের পর পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ি চলে গেলে সিদ্দিক সাহেবের দল এসে তানসেন ও জলিলের লাশ উদ্ধার করল এবং দ্রুত তাদের বাড়ি লালমোহনের দেবীর চর পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করল।

ফলাফল: বোরহানউদ্দিন দখল করার জন্য পাকিস্তানি সেনাদলের আক্রমণ প্রতিহত করার সক্ষমতা মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না। একেবারে অপ্রস্তুত থাকা এবং ভারী অস্ত্র না থাকায় সিদ্দিক বাহিনী কোনো প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়। এ যুদ্ধে সিদ্দিক বাহিনীর তানসেন ও জলিল নামের দুই সহযোদ্ধাসহ অন্যান্য দলের বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত ও আহত হন।

উপর্যুক্ত যুদ্ধাভিযানের বাইরে সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বোরহানউদ্দিন থানা দখল অভিযান, বাংলাবাজার অভিযান, ঘুইঙ্গারহাট অভিযান, গুপ্তগঞ্জ অভিযান, গরুচৌক্কা খাল অভিযান, চরফ্যাশন থানা দখল অভিযানসহ পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা অভিযান পরিচালনা করেন।[২৯৯] এছাড়া সিদ্দিক বাহিনীর যোদ্ধারা ভোলার দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় সক্রিয় দুস্কৃতকারী রাজাকার, লুটেরা, ডাকাত ও শান্তি কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই

অভিযান পরিচালনা করতেন। এ ধরনের অভিযান অক্টোবর থেকে ভোলা শহরেও পরিচালনা করা হতে থাকে। এর পাশাপাশি ভোলা শহরের সাথে অন্যান্য থানা এলাকার সহজ যোগাযোগের মাধ্যম পাকা রাস্তা, পুল, কালভার্ট ধ্বংস করার চেষ্টা প্রায় প্রতিদিনই চলতে থাকে। ভোলাতে পাকিস্তানি প্রশাসন যে অকার্যকর তা প্রমাণ করতে মুক্তিযোদ্ধারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর কয়েকটাতে আক্রমণ করে পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করে দেন।[৩০০]

প্রকাশনা ও জনসংযোগ

মুক্তিযুদ্ধকালে সিদ্দিক বাহিনীর কোনো প্রকাশনা ছিল না। তবে এ বাহিনী স্থানীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও বাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। এর ফলে স্থানীয় জনগণ তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। স্থানীয়রা তাদের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখে। এ বাহিনী অনেকটাই সামরিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। সেকারণে বাহিনীর নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক জনসভা বা সমাবেশ আয়োজনের বদলে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধের কৌশল কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ সময় শলাপরামর্শে ব্যস্ত থাকতেন।[৩০১]

যুদ্ধাহত ও শহিদ যোদ্ধা

সিদ্দিক বাহিনীর শহিদ সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। এর মধ্যে মর্মান্তিকভাবে শহিদ হন তানসেন, জলিল ও বোরহানউদ্দিন হাই স্কুলের শিক্ষক নুর ইসলাম। এছাড়া পকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে/সংঘর্ষে এ বাহিনীর বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিলেন।[৩০২]

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক

মুক্তিযোদ্ধা দল গঠনপর্বে সিদ্দিকুর রহমান ও তার দলের নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেই মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন। তদুপরি সিদ্দিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন বোরহানউদ্দিন এলাকার এমপিএ রেজা-ই করিম চৌধুরী চুন্নু ও চরফ্যাশন-লালমোহন এলাকার এমপিএ মোতাহার উদ্দিন মাস্টার। ওসমানগঞ্জ ও দেউলার যুদ্ধে সাফল্যের পর অক্টোবরের মাঝামাঝি পূর্বোক্ত দুই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ ভোলা কলেজের ভিপি সালেহ আহমদ, বোরহানউদ্দিন সংগ্রাম কমিটির সহ-সভাপতি ও কালমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মজু মিয়া, বশির মিয়া, হোসেন চৌধুরী, হোসেন হাওলাদার, হাফিজ হাওলাদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সিদ্দিকুর রহমানকে ভোলার সকল মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেন।[৩০৩] সিদ্দিক বাহিনীর জন্য এই স্বীকৃতি একটি বড় অর্জন ছিল। সিদ্দিকুর রহমানকে ভোলার কমান্ডার নিয়োগের পর এ বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা পূর্বের তুলনায় আরো বাড়তে থাকে এবং ভোলায় বিক্ষিপ্তভাবে সক্রিয় ছোট ছোট মুক্তিযোদ্ধা দল সিদ্দিক সাহেবের কমান্ড মেনে নেন। আবার এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে ভারত থেকে অস্ত্র ও ৭২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ভোলায় আসেন আনসার এডজুটেন্ট আলী আকবর। তিনি ভোলায় এসে সিদ্দিকুর রহমানের প্রতি তাকে কমান্ডার হিসেবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। এই প্রেক্ষাপটে পূর্বোক্ত নেতৃবৃন্দ বোরহানউদ্দিনের আব্বাস আলী বাড়ির স্কুল ঘরে আলী আকবর ও সিদ্দিকুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক আলী আকবরকে ভোলার কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করে যে কাগজপত্র দেওয়া হয়েছিল তা তিনি উপস্থাপন করেন। কাগজপত্র দেখে নেতৃবৃন্দ আলী আকবরকে ভোলার কমান্ডার ও সিদ্দিকুর রহমানকে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড ঘোষণা করেন।[৩০৪] বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ও স্থানীয়

জনপ্রতিনিধিদের রায় মেনে নিয়ে সিদ্দিকুর রহমান ও তার বাহিনীর সদস্যগণ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য নেতৃত্ব পরিবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই নতুন কমান্ডার আলী আকবরের নেতৃত্বের দুর্বলতায় বিরাট সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের প্রাণহানির কারণে পুনরায় সিদ্দিকুর রহমানকে ভোলার স্থায়ী কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩০৫] তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সিদ্দিক বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের বা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, অর্থ বা নির্দেশনা যুদ্ধকালে পায়নি। এমনকি এই বাহিনীর অধিনায়ক বা কোনো সদস্যের সাথে বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিনিধির ন্যূনতম যোগাযোগ ঘটেনি। ভোলা এলাকা যদিও নবম সেক্টরের অধীন বরিশাল সাব-সেক্টরের আওতাভুক্ত ছিল, তবুও সেক্টর কর্তৃপক্ষ বা সাব-সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমরের সাথে ভোলার মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো যোগাযোগই হয়নি।[৩০৬] তবু সিদ্দিকুর রহমানকে বরিশাল সাব-সেক্টরের অধীন বোরহানউদ্দিন-চরফ্যাশন থানার বেইজ কমান্ডার নিয়োগ করা হয়েছিল যুদ্ধের প্রায় শেষ ভাগে।[৩০৭] সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিদ্দিক বাহিনী যদিও বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগহীন ছিল, তারপরও এ বাহিনী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থেকে ভোলায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল।

গণমাধ্যমে সিদ্দিক বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধকালে সিদ্দিক বাহিনী গণমাধ্যমে প্রায় স্থান পায়নি বললেই চলে। যেহেতু এই বাহিনী সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের গণমাধ্যম শাখা তেমন একটা জানত না, সে কারণে এই বাহিনী তেমনভাবে প্রচারের আলোয় আসতে পারেনি। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ বেতারে ভোলার মুক্তিযোদ্ধাদের থানা (দৌলতখান, তজুমদ্দিন, লালমোহন, বোরহানউদ্দিন থানা) দখলের সংবাদ প্রচারিত হয়।[৩০৮] এসব থানা দখলের কাজটি করেছিলেন মূলত সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। সে হিসেবে দাবি করা অসমীচীন হবে না যে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত থানা দখলের উক্ত সংবাদগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে সিদ্দিক বাহিনীর যোদ্ধাদের দ্বারা থানা দখলের সংবাদ।

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা

সিদ্দিক বাহিনীর কোনো সদস্য বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব পাননি। এ বাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা এখনো 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাননি বা তালিকাভুক্ত হতে পারেননি বাহিনীর এমন সদস্য সংখ্যা পঁচিশ জনের মতো হবে।[৩০৯] এছাড়া সিদ্দিক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক সদস্যদেরকে (সশস্ত্র নয় যারা) তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনাই করা হয় না।

অস্ত্র সমর্পণ

সিদ্দিক বাহিনী বরিশাল জেলা প্রশাসনের কাছে অস্ত্র জমা দেয়। তবে প্রথমে ভোলার মুক্তিযোদ্ধারা এ বাহিনীর প্রধান সিদ্দিকুর রহমানের কাছে অস্ত্র জমা দেন। তিনি সমস্ত অস্ত্র পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে জানিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন।[৩১০]

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভোলা একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থান দখল করে আছে। দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভৌগোলিকভাবে চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভোলায় মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল গেরিলা ও জনযুদ্ধের একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। আর ভোলায় পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী গেরিলা যুদ্ধ ও জনযুদ্ধের প্রকৃত নির্মাতা ছিল সিদ্দিক বাহিনী। বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব থেকে কোনোরূপ সহযোগিতা প্রাপ্তি ছাড়াই এই মুক্তিযোদ্ধা দল ভোলায় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে মূল ভূমিকা পালন করে। যদিও ভোলাতে মে-জুন থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল গড়ে উঠেছিল, সিদ্দিক বাহিনী প্রধান সিদ্দিকুর রহমানকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ অক্টোবরের মাঝামাঝিতে ভোলার মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা

করলে ভোলার সবকয়টি মুক্তিযোদ্ধা দল তাকে মেনে নেয় এবং প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা (ভারত প্রত্যাগত কয়েকজন বাদে) সিদ্দিক বাহিনীর সাথে মিশে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারত থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা প্রথম ভোলায় আসেন অক্টোবরের মাঝামাঝিতে।[৩১১] এরপর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কয়েক দফায় আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধাসহ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা ভোলায় আগমন করেন।[৩১২] এর বাইরে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর সদস্যরা ভোলায় আসেন ভোলা মুক্ত হওয়ার পরের দিন ১১ ডিসেম্বর।[৩১৩] সুতরাং এ কথা বলা অবশ্যই যৌক্তিক হবে যে, ভোলার মুক্তিযুদ্ধের মূল কারিগর সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

সিদ্দিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম ক্যাম্প গড়ে ওঠে বোরহানউদ্দিন থানার দেউলার হাজী বাড়িতে। পৈতৃকসূত্রে এই বাড়ির মালিকানা ছিল সিদ্দিকুর রহমানের পরিবারের। এরপর মূলত দক্ষিণ ভোলায় এ দল তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করতে থাকেন। সিদ্দিক বাহিনীর যোদ্ধাদের খাদ্য ও আনুষঙ্গিক চাহিদা মেটাতে দলপ্রধান নিজের সঞ্চিত অর্থ ও পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জমির বড় অংশ বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করেছিলেন। পাশাপাশি এই দলের ব্যয়ভার মেটাতে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি কিছু পরিমাণ অর্থ ও খাদ্য সহযোগিতা প্রদান করেন। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করেন যোদ্ধা ক্যাম্পের নিকটস্থ পরিবারের নারী সদস্যরা। উল্লেখ্য, সিদ্দিক বাহিনীর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক। আর ভোলার আপামর জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এই বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে সহায়তা করেছে।

সিদ্দিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শুরুতে অস্ত্র ছিল মাত্র দুটি ৩০৩ রাইফেল। এরপর পাকিস্তানি সৈন্য, রাজাকার, পুলিশের সাথে যুদ্ধ করে এবং ভোলার বিভিন্ন থানা দখল করে এই বাহিনী তাদের অস্ত্র সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু এসব অস্ত্রের মধ্যে প্রায় সবগুলোয় ছিল ৩০৩ রাইফেল। সুতরাং বলা যায়, আধুনিক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সেনাদলকে মোকাবেলায় এ বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ ভীষণ সাহস ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ভোলায় একমাত্র ভারতে প্রশিক্ষিত আলী আকবর গ্রুপের যোদ্ধাদের কাছেই কেবল কিছু উন্নত অস্ত্র ছিল।[৩১৪]

ভোলায় পাকিস্তানি সৈন্য প্রবেশের পর প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন স্থানীয় শান্তি কমিটির কয়েকজন সদস্য ও পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন রাজাকার-দালাল পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মিলে লুট, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা-নির্যাতন, নারী নির্যাতন ও নানারকম অত্যাচার চালাতে শুরু করেছিল স্থানীয় জনসাধারণের ওপর। এই ধরনের অপকর্ম ধীরে ধীরে ভোলা সদর থেকে দক্ষিণের থানাগুলোতে সংঘটিত হতে থাকে। এই অবস্থায় নির্যাতিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান সিদ্দিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ। এই বাহিনীর অধিনায়ক সিদ্দিক সাহেবের নেতৃত্বে প্রথমদিকে বোরহানউদ্দিন থানায় ও পরবর্তীকালে ভোলার অন্যান্য থানায় অত্যাচারী-লুণ্ঠনকারী-খুনি-নারী নির্যাতনকারী রাজাকার-দালাল ও শান্তি কমিটির সদস্যদেরকে আক্রমণ করা শুরু করেন। আক্রমণের প্রথম দফায় রাজাকার মান্নান, শান্তি কমিটির মাহবুব মৌলবী, ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ নিহত হন ও বোরহানউদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন থানার অনেক দুস্কৃতকারী আহত হন।[৩১৫] মুক্তিযোদ্ধাদের এই তৎপরতায় অচিরেই ভোলা সদর বাদে অন্যান্য এলাকায় দুস্কৃতকারীদের কর্মকাণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পান। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরানোর ক্ষেত্রে সিদ্দিক বাহিনীর এই ভূমিকায় স্থানীয় জনসাধারণ এই দলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ নানামুখি সহযোগিতা করতে থাকেন। মূলত মুক্তিবাহিনীর উল্লিখিত ভূমিকার জন্যই জনতা এই বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি জনযুদ্ধে পরিণত করেন।[৩১৬]

সিদ্দিক বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দ ভোলায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার-পুলিশের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন। প্রধানত এই বাহিনীর যোদ্ধাদের নৈপুন্যেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ভোলা সদর বাদে বাকি পাঁচটি থানা দখলমুক্ত হয়। এর পূর্ব থেকেই ঐসব থানা অবশ্য অনেকটা মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছিল।[৩১৭] আর ভোলা সদর সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় ১০ ডিসেম্বর। এর পূর্বে সিদ্দিক বাহিনী ভোলা সদরে পাকিস্তানি ক্যাম্প এমনভাবে ঘিরে ধরে অবস্থান নেয় যে, প্রায় মাসাধিককাল পাকিস্তানি সৈন্যগণ তাদের ক্যাম্পে প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।[৩১৮] শেষ পর্যন্ত সিদ্দিক বাহিনীর ক্রমাগত চাপেই দখলদার সৈন্যগণ ভোলা ছেড়ে বরিশাল পালিয়ে যান। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সিদ্দিক বাহিনীর সদস্যদেরকে অবরুদ্ধ ভোলায় অবস্থান করেই পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে এ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ভোলা থেকে পালিয়ে বা সরে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারতেন না। যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভোলাতেই প্রতিরোধ, ভোলাতেই আক্রমণ এবং ভোলাতেই অবস্থান নিতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের 'হাইডআউট' হিসেবে এগিয়ে এসেছিল স্থানীয় জনসাধারণ। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই সিদ্দিক বাহিনী মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিল শক্তিধর পাকিস্তানি সৈন্যদলকে।

সিদ্দিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডের জন্য ভোলার জনসাধারণকে বেশ মূল্য দিতে হয়েছিল। অক্টোবরের প্রথম থেকে ক্রমাগত সাফল্যের ফলে সিদ্দিক বাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যদল ২৯ অক্টোবর বোরহানউদ্দিন থানা পুনর্দখল করার চেষ্টা করে। এদিন পাকিস্তানি সৈন্যদলের হাতে প্রায় ৮০ জন সাধারণ মানুষ শহিদ হন এবং বোরহানগঞ্জ বাজারসহ বেশ কয়েকটি এলাকা তারা ভস্মিভূত করেন।[৩১৯] এছাড়াও এ বাহিনীর তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষ অপর পক্ষ দ্বারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসে সিদ্দিক বাহিনীর ভূমিকার কোনো মূল্যায়ন হয়নি। এ বাহিনীর কোনো সদস্যই রাষ্ট্র প্রদত্ত বীরত্বসূচক খেতাব বা অন্য কোনো পুরস্কার এ যাবৎ পাননি। উপরন্তু সিদ্দিক বাহিনীর প্রায় ২৫ জন সশস্ত্র সদস্য আজ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি। আর এ বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী প্রায় দশ হাজার সদস্য তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিটুকুই পাননি। অথচ ভোলায় মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার প্রধান কারিগর ছিলেন এই স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিযোদ্ধাগণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সিদ্দিক বাহিনীর সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবী মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন না হলে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খণ্ডিত হতে বাধ্য।

তথ্যসূত্র

১ *Bangladesh District Gazetteers Khulna*, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978, p. 1

২ *khulnadiv.gov.bd*, প্রবেশের তারিখ ও সময়ঃ ০৭ জুন ২০২০, সন্ধ্যা ৮টা

৩ এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন : জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩২

৪ আকবর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী*, প্রকাশকঃ আকবর হোসেন মিয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯৬

৫ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৬ পরেশ কান্তি সাহা, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৩৩২

৭ সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, দাসগুপ্ত এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৭০২

৮ *ঐ*, পৃ. ৭০২

৯ এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *প্রাগক্ত*, পৃ. ৭২১

১০ *ঐ*, পৃ. ৭২৪

১১ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

১২ মো. আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৬৭

১৩ Major General ATM Abdul Wahab, *Mukti Bahini Wins Victory*, Columbia Prokashani, Dhaka, 2005, p. 179

১৪ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১৫ *ঐ*, পৃ. ২১

১৬ *ঐ*, পৃ. ২২

১৭ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১৮ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

১৯ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

২০ তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১২

২১ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২২ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

২৩ মোছা. খোদেজা খাতুন, ‘মুক্তিযুদ্ধে মাগুরার আকবর বাহিনী’, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩১-৩২, ২০০৮-০৯, পৃ. ২৮৫

২৪ সাক্ষাৎকারঃ মোল্লা নবুয়ত আলী, গ্রামঃ বরিশাট, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১০টা

২৫ *ঐ*

২৬ *ঐ*

২৭ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

২৮ *ঐ*, পৃ. ৫৯-৬০

২৯ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০, ১২১, ১৩১

৩০ সাক্ষাৎকারঃ মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত; আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

৩১ মোছা. খোদেজা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

৩২ মোছা. খোদেজা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২; আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১, ৭২-৭৩

৩৩ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

৩৪ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

৩৫ মোছা. খোদেজা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২

৩৬ সাক্ষাৎকারঃ মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত

৩৭ *ঐ*

৩৮ *ঐ*

৩৯ আকবর হেসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৪০ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪

৪১ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৪২ *ঐ*, পৃ. ১০৪

৪৩ *ঐ*, পৃ. ১৫১

৪৪ সাক্ষাৎকার: মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত

৪৫ মোছা. খোদেজা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫

৪৬ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৪৭ *ঐ*, পৃ. ৪৭-৪৯

৪৮ *ঐ*, পৃ. ৫৫-৫৬

৪৯ *ঐ*, পৃ. ৫৭-৫৮

৫০ *ঐ*, পৃ. ৬৮-৭০; সাক্ষাৎকার: মো. নাসিমুজ্জাম, গ্রাম: টুপিপাড়া, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, তারিখ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১০টা

৫১ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৯

৫২ *ঐ*, পৃ. ৮৮-৮৯

৫৩ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯

৫৪ সাক্ষাৎকার: মো. নাসিমুজ্জাম, প্রাগুক্ত

৫৫ সাক্ষাৎকার: মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত

৫৬ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

৫৭ *ঐ*, পৃ. ৬৪

৫৮ এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬০

৫৯ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৬০ *ঐ*, পৃ. ৪১

৬১ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫

৬২ মোছা. খোদেজা খাতুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫

৬৩ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, একাদশ খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪, পৃ. ৭৬১

৬৪ সাক্ষাৎকার: মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত

৬৫ পরেশ কান্তি সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২

৬৬ সাক্ষাৎকার: মোল্লা নবুয়ত আলী, প্রাগুক্ত

৬৭ সাক্ষাৎকার: আবুল হোসেন মিয়া, গ্রাম: টুপিপাড়া, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১১টা

৬৮ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

৬৯ *ঐ*, পৃ. ৫৭

৭০ আকবর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

৭১ *ঐ*, পৃ. ১০৫

৭২ *ঐ*, পৃ. ১৩১

৭৩ *ঐ*, পৃ. ১৩৬

৭৪ শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বাগেরহাট জেলা*, প্রকাশক: এম. এ এইচ সেলিম, পরিবেশক: আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৬৩

৭৫ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৯

৭৬ স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫৪
৭৭ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত
৭৮ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৩
৭৯ *ঐ*, পৃ. ৫৪
৮০ *ঐ*
৮১ এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশে নির্বাচন*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬০, ৬৭-৬৮
৮২ *ঐ*, পৃ. ৬১
৮৩ শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
৮৪ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
৮৫ শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
৮৬ *ঐ*, পৃ. ১৬২
৮৭ *ঐ*, পৃ. ১৬৭
৮৮ আবু বকর সিদ্দিক, 'একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা', *শৈলী*, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ. ৩০১
৮৯ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৯০ *ঐ*, পৃ. ৭২
৯১ *দৈনিক আজকের কাগজ*, বিশেষ নিবন্ধঃ 'চিরুলিয়া-বিষ্ণুপুরের মুক্তিযুদ্ধ' ৭ আগস্ট, ১৯৯৪
৯২ *ঐ*
৯৩ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
৯৪ *ঐ*, পৃ. ৭৮
৯৫ শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০
৯৬ *ঐ*, পৃ. ২০৪
৯৭ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
৯৮ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, মার্চ ১৯৮৯
৯৯ *ঐ*
১০০ শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৮৯-৯০
১০১ শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধঃ বাগেরহাট জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩
১০২ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
১০৩ শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
১০৪ *দৈনিক আজকের কাগজ*, প্রাগুক্ত
১০৫ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
১০৬ শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধঃ বাগেরহাট জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
১০৭ *ঐ*, পৃ. ২৬৮
১০৮ শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১০৯ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১; শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ : বাগেরহাট জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১, ২৮৫
১১০ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, মার্চ ১৯৮৯
১১১ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
১১২ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, মার্চ ১৯৮৯
১১৩ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
১১৪ *ঐ*
১১৫ শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১১৬ স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[১১৭] শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ: বাগেরহাট জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

[১১৮] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত, মার্চ ১৯৮৯; শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০

[১১৯] *ঐ*; *ঐ*, পৃ. ২০৪-০৫

[১২০] *ঐ*; *ঐ*, পৃ. ২১৪-১৭

[১২১] *ঐ*; *ঐ*, পৃ. ২২১-২৪; স ম বাবর আলী, *স্বাধীনতার দুর্জয় অভিযান*, ডরোথী রানা প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৯১, পৃ. ২৪৬-৪৭

[১২২] *ঐ*; *ঐ*, পৃ. ২৩২-২৩৪; স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

[১২৩] *দৈনিক আজকের কাগজ*, প্রাগুক্ত

[১২৪] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত

[১২৫] *দৈনিক আজকের কাগজ*, প্রাগুক্ত

[১২৬] স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

[১২৭] *দৈনিক আজকের কাগজ*, প্রাগুক্ত

[১২৮] সাক্ষাৎকার: সুশান্ত মজুমদার, সাহিত্যিক, রফিক বাহিনীর সদস্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: আনন্দ ভবন কমিউনিটি সেন্টার, ৫৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১০ অক্টোবর ২০২০, সকাল ১১টা

[১২৯] *ঐ*

[১৩০] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত

[১৩১] *দৈনিক আজকের কাগজ*, প্রাগুক্ত

[১৩২] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৩ নভেম্বর ২০০২

[১৩৩] *ঐ*

[১৩৪] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *মুক্তিযুদ্ধের সেই উন্মাতাল দিনগুলি*, মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনীর পক্ষে বেগম কানিজ মাহমুদা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪২

[১৩৫] *প্রথম আলো*, ২৮ জুলাই ২০১৭

[১৩৬] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[১৩৭] *ঐ*, পৃ. ৪২

[১৩৮] *ঐ*, পৃ. ৩৬-৩৭

[১৩৯] *ঐ*, পৃ. ৩৭

[১৪০] হুমায়ূন রহমান, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, আপন প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৬২

[১৪১] *ঐ*

[১৪২] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

[১৪৩] *ঐ*

[১৪৪] *ঐ*, পৃ. ৬৫-৬৬

[১৪৫] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

[১৪৬] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[১৪৭] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪১

[১৪৮] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[১৪৯] শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[১৫০] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[১৫১] *ঐ*, পৃ. ৫৮

[১৫২] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

[১৫৩] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[১৫৪] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[১৫৫] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[156] *ঐ*, পৃ. ৬১
[157] *ঐ*, পৃ. ৬০
[158] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
[159] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
[160] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
[161] *ঐ*, পৃ. ৮৯-৯১
[162] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, *দশম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫
[163] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, *সেক্টর-নয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[164] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
[165] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
[166] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[167] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
[168] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
[169] *ঐ*, পৃ. ৬০
[170] *ঐ*, পৃ. ৬৪; হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[171] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪
[172] স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
[173] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩
[174] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫
[175] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
[176] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬
[177] লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৭৮
[178] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮
[179] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
[180] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
[181] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
[182] *ঐ*, পৃ. ১১০
[183] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫
[184] *ঐ*
[185] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[186] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪
[187] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪
[188] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪; মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-০৩, ১১১-১১৪; হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-০৩
[189] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪
[190] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৪
[191] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫
[192] *ঐ*, পৃ. ১০০-০২
[193] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[194] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭, ১৪৩
[195] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫
[196] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭
[197] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

[১৯৮] *ঐ*

[১৯৯] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-০৯

[২০০] *ঐ*, পৃ. ১০৬

[২০১] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

[২০২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২২

[২০৩] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯, ১৫২; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮১

[২০৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আলোচ্য বাহিনীর 'যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধসমূহ' অংশটি দেখুন

[২০৫] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

[২০৬] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[২০৭] *ঐ*, পৃ. ১১৩

[২০৮] এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

[২০৯] LT G. JFR Jacob, *Surrender at Dacca : Birth of a Nation*, Dhaka, UPL, 2004, p.189

[২১০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

[২১১] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

[২১২] *ঐ*, পৃ. ১৪৮

[২১৩] *ঐ*, পৃ. ১০৮, ১১৮

[২১৪] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭১; স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬; www.sarankhola.bagerhat.gov.bd, প্রবেশের তারিখঃ ২৫ জুন ২০২০

[২১৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫-২৭; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-০৬; শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯৫

[২১৬] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮; শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০২

[২১৭] *ঐ*, পৃ. ১২৯-৩৩; *ঐ*, পৃ. ১৩৬-১৪১; হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৬

[২১৮] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-৬৫; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-৪৮; শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-৫৭; মো. লিয়াকত আলী খান, মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন সাব-সেক্টর, প্রকাশকঃ লেখক, বাগেরহাট, ২০০১, পৃ. ৫৫-৫৬

[২১৯] হুমায়ূন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-৪৮; শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-৭৬, সত্যজিত রায় মজুমদার, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস বাগেরহাট জেলা*, ঢাকা, তাম্রলিপি, ২০১৭, পৃ. ১০৬-১১০

[২২০] স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০-৮৮; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

[২২১] সত্যজিৎ রায় মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-৩১

[২২২] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৬

[২২৩] *ঐ*, পৃ. ৬২৩; হুমায়ুন রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

[২২৪] বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ কমান্ডো মো. খলিলুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১০৪-৬৪; মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১

[২২৫] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

[২২৬] *ঐ*, পৃ. ১৩৩

[২২৭] সাক্ষাৎকারঃ হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ডেপুটি কমান্ডার (বর্তমান), উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, শরণখোলা, বাগেরহাট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, শরণখোলা, ২৬ মার্চ ২০১৯, দুপুর ১২টা

[২২৮] সাক্ষাৎকারঃ নজরুল ইসলাম লাল, আপুড়াগাছিয়া, তাফালবাড়ি, শরণখোলা, বাগেরহাট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৬ মার্চ ২০১৯, বিকাল ৪.৩০মি.; এম আফজাল হুসাইন যুদ্ধকালীন কমান্ডার, হয়লাতলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ আই ই বি মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা, ১০ এপ্রিল, ২০১৯, বিকাল ৫টা

[২২৯] মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
[২৩০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬-০৭, ৫৮০
[২৩১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-নয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
[২৩২] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
[২৩৩] *ঐ*, পৃ. ১৭১-৭২
[২৩৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *একাদশ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪
[২৩৫] *ঐ*, পৃ. ৮১৭
[২৩৬] *ঐ*, পৃ. ৮২৬
[২৩৭] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
[২৩৮] সাক্ষাৎকার: শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধকালীন কমান্ডার, সুন্দরবন সাব-সেক্টর: সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, শরণখোলা, বাগেরহাট, ২৬ মার্চ ২০১৯, দুপুর ১২টা
[২৩৯] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
[২৪০] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
[২৪১] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টর ভিত্তিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
[২৪২] বিস্তারিত দেখুন বাহিনীর 'প্রেক্ষাপট' অংশে
[২৪৩] মেজর জিয়াউদ্দিন (অব), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
[২৪৪] মেজর এম এ জলিল, *সীমাহীন সমর*, জনতা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৬৬
[২৪৫] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৬
[২৪৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৫-০৬
[২৪৭] *ঐ*, পৃ. ৬১৫-৬৩০
[২৪৮] *ঐ*, পৃ. ৬০৫-৬৩০
[২৪৯] *ঐ*, পৃ. ৬২৯-৩০
[২৫০] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২
[২৫১] স্বরোচিষ সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-৪৪
[২৫২] শেখ গাউস মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
[২৫৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫-৬২৭
[২৫৪] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাড়ি-৩, লেন-২, রোড নং-১০, ব্লক-সি, সেকশন-১১, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা, ৬ আগস্ট ২০২০, বিকাল ৫টা
[২৫৫] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত
[২৫৬] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী মিয়া, পিতা: ইসমাইল মিয়া, ইউনিয়ন: সাঁছড়া, উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: হোটেল দ্বীপ কন্যা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা, ৪ আগস্ট ২০২০, সন্ধ্যা ৬ টা
[২৫৭] মাহফুজুর রহমান, *ভোলা দ্বীপের অনন্য মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮১
[২৫৮] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ১৮৫
[২৫৯] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
[২৬০] কালাম ফয়েজী, *ভোলা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১১৩-১৪
[২৬১] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭
[২৬২] এম. ফরিদ উদ্দিন মনজু, *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল নির্যাতন ও গণহত্যা*, আপন প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৭৫
[২৬৩] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
[২৬৪] *ঐ*, পৃ. ১১৪
[২৬৫] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[২৬৬] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯
[২৬৭] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৬৮] সাক্ষাৎকার: কাজী আব্দুল জব্বার, পিতা: কাজী আব্দুল করিম, বাড়ি: নতুন বাজার, ভোলা সদর, ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ওয়েলকাম মিষ্টান ভাণ্ডার, নতুন বাজার (২য় ব্রিজ সংলগ্ন), ভোলা সদর, ভোলা, ২৬ আগস্ট ২০২০ সকাল ১১টা

[২৬৯] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[২৭০] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৭১] *ঐ*

[২৭২] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত

[২৭৩] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[২৭৪] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত

[২৭৫] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৭৬] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[২৭৭] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত

[২৭৮] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

[২৭৯] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪

[২৮০] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৮১] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত

[২৮২] সাক্ষাৎকার: আমীর হোসেন, পিতা: আব্দুল মজিদ, গ্রাম: সাঁছড়া, উপজেলা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৫ আগস্ট ২০২০, সকাল ১১টা

[২৮৩] *ঐ*

[২৮৪] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত,

[২৮৫] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৮৬] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[২৮৭] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

[২৮৮] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৮৯] *ঐ*

[২৯০] *ঐ*

[২৯১] সাক্ষাৎকার: আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত

[২৯২] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

[২৯৩] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৯৪] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮-৪০; সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৯৫] *ঐ*, পৃ. ১৪৩-৪৭; *ঐ*

[২৯৬] *ঐ*, পৃ. ১৪৯-৫২; *ঐ*

[২৯৭] *ঐ*, পৃ. ১৬৩-৬৭ ; সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬-৯৭

[২৯৮] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[২৯৯] সাক্ষাৎকার: নাজিমুদ্দিন মিয়া, পিতা: হাজী জেবল হক মাতব্বর, ১নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন পৌরসভা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: হোটেল দ্বীপ কন্যা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা, ৫ আগস্ট, সকাল ১০টা।

[৩০০] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬

[৩০১] সাক্ষাৎকার : সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত

[৩০২] *ঐ*

[৩০৩] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[৩০৪] *ঐ*, পৃ. ১৫৮-৫৯

[৩০৫] *ঐ*, পৃ. ১৫৯

[৩০৬] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৯০

[৩০৭] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩
[৩০৮] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
[৩০৯] সাক্ষাৎকার: সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত
[৩১০] *ঐ*
[৩১১] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৩১২] সাক্ষাৎকার: আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত
[৩১৩] সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩
[৩১৪] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫
[৩১৫] *ঐ*, পৃ. ৪৮
[৩১৬] সাক্ষাৎকার: আসমত আলী, প্রাগুক্ত
[৩১৭] মাহফুজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
[৩১৮] সাক্ষাৎকার: আমীর হোসেন, প্রাগুক্ত
[৩১৯] কালাম ফয়েজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চা এ যাবৎকাল পর্যন্ত একরৈখিকভাবে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে শুধুই বিজয়। আর বিজয়ের ইতিহাস বলতে রণাঙ্গনের সশস্ত্র বিজয়ের কথা বলা হয়।[১] আবার রণাঙ্গনে বিজয়ের প্রসঙ্গে অবধারিত হয়ে ওঠে ১১টি সেক্টরের বিজয় এবং সে বিজয় অর্জনে সেক্টর ও সাব-সেক্টর নেতৃত্বের ভূমিকা। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হয়ে উঠেছে মূলত ১১টি সেক্টরের বিজয় কাহিনী।[২] ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই কাঠামোর মধ্যে সেভাবে স্থান পায়নি মুক্তিযুদ্ধের অন্য মাত্রাসমূহ। এই মাত্রাসমূহের মধ্যে রয়েছে অবরুদ্ধ দেশ, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীপক্ষ, গণহত্যা-নির্যাতন, বাংলাদেশ সরকার, বিদেশি সিভিল সমাজ, মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ইত্যাদি।[৩] উল্লিখিত বিষয়গুলো যে শুরু থেকেই যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়নি তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই যে, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত গণহত্যা স্মরণে ২৫ মার্চকে জাতীয় 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উল্লেখ্য, ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের দাবি বহুবছর ধরে সাংগঠনিকভাবে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জানিয়ে আসছিল।[৪] আর দাবিটি ছিল একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মস্তিষ্কজাত। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পাঁচ দশক পরে এসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় 'গণহত্যা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখনো একরৈখিক।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার একরৈখিকতার চাপে পড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো দিক। এই দিকগুলোর অন্যতম একটি দিক হলো অবরুদ্ধ দেশে গড়ে ওঠা আলোচ্য আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক বিবেচনায় আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর ভূমিকা কী ছিল এ প্রশ্নের উত্তর বর্তমান গবেষণায় এভাবে মেলে:

(ক) অবরুদ্ধ দেশে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীসমূহের প্রায় সবগুলো দল এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকেই পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের এদেশীয় সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। পাশাপাশি এসময় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে অসংগঠিতভাবে প্রতিরোধ (প্রধানত বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর জওয়ানদের দ্বারা) চলতে থাকে। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে সেক্টর ও সাব-সেক্টর গঠন করা পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা বাদে দেশের অভ্যন্তরে সরকারি বাহিনী উল্লেখযোগ্য কোনো সামরিক তৎপরতা চালায়নি। এ সময়ে অবরুদ্ধ দেশে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, তার সিংহভাগ গড়ে তুলেছিল আলোচ্য আঞ্চলিক বাহিনীগুলো।

(খ) সেক্টর ও সাব-সেক্টর গঠনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক তৎপরতা চলেছিল মূলত সীমান্ত এলাকায়।[৫] অথচ আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর সামরিক তৎপরতা (আফতাব বাহিনী বাদে) চলেছিল অবরুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরে- আরো এগিয়ে বললে দেশের ভূখণ্ডের প্রায় মাঝখানে পাকিস্তানি সৈন্যদলের পেটের ভেতর। এটি নিঃসন্দেহে খুবই দুঃসাহসী ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।

(গ) জুলাই-এর মাঝামাঝিতে সেক্টর গঠনের পর বাংলাদেশ সরকারের অধীন সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সামরিক তৎপরতা পূর্বের তুলনায় সুসংগঠিত হয়। তবে ১১টি সেক্টরভুক্ত (১০ নং

বাদে) সাব-সেক্টরগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে যেসব এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-দালালদেরকে মোকাবেলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে এলাকাগুলোও ছিল প্রধানত সীমান্ত এলাকা। সুতরাং বলা যায় যে, জুলাই থেকে বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে দখলদার পাকিস্তানি সেনাদল ও তাদের সহযোগী শক্তিকে প্রতিরোধের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তার প্রায় সিংহভাগ ছিল আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা।

(ঘ) সাব-সেক্টরভুক্ত এলাকাসমূহের বাইরে অথচ দেশের অভ্যন্তরে অপরপক্ষকে মোকাবেলার জন্য সেক্টর কমান্ড যে কৌশল অনুসরণ করেছিল, তা বিশ্লেষণ করলে উক্ত কৌশলের দুটি দিক পাওয়া যায়। দুটি দিকের একটি হলো দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের মধ্যে কোনো কোনো বাহিনীর প্রধানকে সাব-সেক্টর বা এরিয়া কমান্ডার বা থানা কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ বা স্বীকৃতি প্রদান করে উৎসাহিত করা। এ ধরনের নিয়োগ বা স্বীকৃতি পেয়েছিল জিয়া বাহিনীর প্রধান জিয়াউদ্দিন আহমেদ, হালিম বাহিনীর ক্যাপ্টেন হালিম, হেমায়েত বাহিনীর হেমায়েত উদ্দিন, আফসার বাহিনীর আফসার উদ্দিন আহমেদ, পাঠান বাহিনীর জহিরুল হক পাঠান ও লুৎফর বাহিনীর লুৎফর রহমান। তবে খেয়াল করতে হবে যে, সেক্টর নেতৃত্বের তরফ থেকে উক্ত নিয়োগ বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল আগস্টের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের ভেতর। এতো বিলম্বিত নিয়োগ বা স্বীকৃতির অর্থ হতে পারে এই যে, সেক্টর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছিল বিধায় বিলম্বে হলেও তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অথবা উল্লিখিত বাহিনীগুলো যেসব এলাকায় তৎপর ছিল সেখানে নতুন করে উপযুক্ত সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধরসদ পাঠানো কর্তৃপক্ষের সামর্থ্যের বাইরে ছিল। ফলে, উল্লিখিত বাহিনীগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া তাদের কাছে ভালো বিকল্প খুব কম ছিল। সেক্টর কর্তৃপক্ষ অনুসৃত কৌশলের দ্বিতীয় দিকটি ছিল আঞ্চলিক বাহিনী সক্রিয় আছে এমন একটি এলাকায় নতুন করে মুক্তিযোদ্ধা দল পাঠানো এবং সম্ভব হলে আঞ্চলিক দলের সমান্তরালে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ রকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মাগুরার আকবর বাহিনী, রৌমারীর আফতাব বাহিনী, বাগেরহাটের রফিক বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকায় আগষ্টের পর যথাক্রমে এটিএম আব্দুল ওয়াহাব, এস আই এম নূরন্নবী খান ও তাজুল ইসলামকে এরিয়া কমান্ডার বা সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করে মুক্তিযোদ্ধা দল প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এসব মুক্তিযোদ্ধা দল রণক্ষেত্রে আবার পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বৃহৎ ঐক্য গড়ে তুলেছিল এবং এই ঐক্য দখলদার পক্ষকে নাস্তানাবুদ করতে খুব কার্যকর হয়েছিল।[৬] তবে লক্ষ করা যায় যে, নতুনভাবে নিয়োগকৃত নেতৃত্ব এসব এলাকায় প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম সংখ্যক লোকবল পেয়েছিল। যার দরুণ সংশ্লিষ্ট এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তি পূর্বের মতোই আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর হাতেই থেকে যায়। প্রসঙ্গত স্বীকার্য যে, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা দল নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ওপর এতদিন থাকা পাকিস্তানি সৈন্যদল ও তাদের স্থানীয় সহযোগী শক্তি সৃষ্ট সামগ্রিক চাপ কিছুটা কমিয়ে ছিল। এই চাপ কিছুটা কমে যাওয়ার ফলে আঞ্চলিক বাহিনীগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকায় পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর হয়ে উঠেছিল।

(ঙ) সাব-সেক্টর বহির্ভূত এলাকাগুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জ-পাবনা এলাকায় লতিফ মির্জা[৭] বাহিনী, নওগাঁ দক্ষিণ ও রাজশাহীর বিল এলাকায় ওহিদুর বাহিনী, নরসিংদী দক্ষিণে মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী, ভোলায় সিদ্দিক বাহিনী, টাঙ্গাইলের দক্ষিণে বাতেন বাহিনীই মূলত তৎপর ছিল। এ বাহিনীগুলোর আওতাভুক্ত এলাকায় আগস্টের পর থেকে সেক্টর কর্তৃপক্ষ ছোটো ছোটো দলে মুক্তিযোদ্ধা (এফএফ) পাঠাতে শুরু করলেও তারা ছিলেন সংখ্যায় ও সামর্থ্যে নগণ্য। গবেষণায় দেখা যায়, এ ধরনের ছোটো ছোটো দলের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে কৌশলগত ও নিরাপত্তার

কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, উল্লিখিত এলাকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের মূল শক্তিই ছিল পূর্বোক্ত আঞ্চলিক বাহিনীগুলো।

(চ) আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর অবস্থান দেশের অভ্যন্তরে হওয়ায় এ বাহিনীগুলোর আওতাভুক্ত এলাকা হয়ে উঠেছিল ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় স্থল ও অনেকটা নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র। পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দালালবেষ্টিত ভূখণ্ডে ভারত প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করে আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা দলগুলো অসাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শুধু তাই নয়, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের অসংখ্যজনের আশ্রয় ও নানামুখী সহযোগিতা প্রাপ্তির উৎস হয়েছিল আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ। এছাড়া, মোটামুটি জুলাই-এর পর থেকে দেশের অভ্যন্তরে তৎপর সেক্টর প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভারত হতে যুদ্ধরসদ (বিশেষত অস্ত্রশস্ত্র) অভ্যন্তরে পাঠানোর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

(ছ) বাংলাদেশ-ভারত যৌথকমান্ড গঠনের পর মিত্র বাহিনীর অভিযানে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর বেশিরভাগই কৌশলগতভাবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ সহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভারতীয় বাহিনীর উত্তর-পূর্ব সেক্টর জামালপুর-টাঙ্গাইল-ঢাকা অক্ষরেখা বরাবর যে অভিযান পরিচালনা করে সে অভিযান সফল করতে কাদেরিয়া বাহিনী, বাতেন বাহিনী, আফসার বাহিনী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সেক্টরের কর্তাব্যক্তিরা টাঙ্গাইলে প্রায় ৫০০০ ছত্রীসেনা অবতরণ করান ১১ ডিসেম্বর। এই ছত্রীসেনা নামানো হয় কাদেরিয়া বাহিনী নিয়ন্ত্রিত (ততদিনে মুক্ত) এলাকায়।[৮] তাছাড়া, কাদেরিয়া বাহিনী ও পূর্বোক্ত বাহিনীসমূহ মিত্র বাহিনীর ঢাকা অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই টাঙ্গাইল ও দক্ষিণ ময়মনসিংহের সিংহভাগ এলাকা মুক্ত করে ফেলেছিল। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদলের পক্ষ থেকে অত্র অভিযানে মিত্র বাহিনীর জন্য বড় কোনো প্রতিরোধ ছিল না। সেকারণে মিত্র বাহিনীর উত্তর-পূর্ব সেক্টর এ বাহিনীর অন্যসব সেক্টরের আগে ১৩ ডিসেম্বর ঢাকার উপকণ্ঠে হাজির হয়। উল্লেখ্য, মিত্রবাহিনীর ঢাকা দখল পর্বে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার যোদ্ধা মিত্র বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে ঢাকায় পৌঁছায়। এছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর এর ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড ডিসেম্বরে চাঁদপুর শহরে পৌঁছানোর পূর্বেই এই এলাকার অধিকাংশ থানা ও সবশেষে চাঁদপুর শহর পাঠান বাহিনীর যোদ্ধাদের হাতে মুক্ত হয়। উল্লেখ্য, চাঁদপুর পতনের সংবাদ পেয়ে জেনারেল নিয়াজী তার বাহিনীর পরাজয়ের ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন।[৯] এর বাইরে মিত্র বাহিনীর পশ্চিম সেক্টরের ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড ৮ ডিসেম্বরে মাগুরা পৌঁছানোর পূর্বে আকবর বাহিনী মাগুরা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এই বাহিনীর যোদ্ধাগণের একাংশ পরবর্তীকালে মিত্র বাহিনীর সাথে ফরিদপুর অভিযানে অংশ নেয় ও বাহিনী প্রধান আকবর হোসেন মিত্র বাহিনীর ফরিদপুর অভিযান পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন।

(জ) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ তাদের আওতাভুক্ত এলাকার অধিকাংশ এককভাবে দখলদার মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য যৌথ নেতৃত্বেও তারা বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে। কাদেরিয়া বাহিনী পুরো টাঙ্গাইল জেলা মুক্ত করে। এই কাজে বাতেন বাহিনীও সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আফসার বাহিনী দক্ষিণ ময়মনসিংহের ভালুকা, ত্রিশাল, গফরগাঁও থানা মুক্ত করে। হালিম বাহিনী মুক্ত করে পুরো মানিকগঞ্জ মহকুমা। মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী শত্রুমুক্ত করে শিবপুর, মনোহরদী ও নরসিংদী সদর থানা। হেমায়েত বাহিনী মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জসহ আরো কয়েকটি থানা। চাঁদপুরে পাঠান বাহিনী মুক্ত করেছিল

হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, ফরিদগঞ্জ ও চাঁদপুর সদর। নোয়াখালীর লুৎফর বাহিনী মুক্ত করেছিল নোয়াখালী সদর, সোনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ ও চাটখিল থানা। ওহিদুর বাহিনীর তৎপরতায় মুক্ত হয়েছিল নওগাঁ মহকুমার আত্রাই, রানীনগর, মান্দা, নিয়ামতপুর, নাটোর মহকুমার সিংড়া, বাগাতিপাড়া এবং রাজশাহীর পুটিয়া, দুর্গাপুর, বাগমারা থানা। লতিফ মির্জা বাহিনীর বদৌলতে সিরাগঞ্জের তাড়াশ, উল্লাপাড়া, বেলকুচি, চৌহালি থানা মুক্ত হয়। মাগুরার আকবর বাহিনী মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল শ্রীপুর ও মাগুরা সদর থানা। সুন্দরবন এলাকায় গঠিত জিয়া বাহিনী মুক্ত করে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া, কাঁঠালিয়া, পিরোজপুর সদর থানা। ভোলায় সিদ্দিক বাহিনী মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বোরহানউদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, দৌলতখানসহ পুরো ভোলা মহকুমা। এছাড়া বাগেরহাট সদর থানা পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত করতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল রফিক বাহিনীর সদস্যদের।

(ঝ) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় যুদ্ধকালে পঁয়তাল্লিশ হাজারের অধিক প্রশিক্ষিত যোদ্ধা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। শত্রুবেষ্টিত দেশে এই বিরাট সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা তৈরি মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিশ্চয়ই খুব তাৎপর্যবাহী ছিল। এছাড়া বাহিনীর নানা প্রয়োজনে (গোয়েন্দা কার্যক্রম, চিকিৎসা সেবা, জনসংযোগ প্রভৃতি) অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর একটি রাজনৈতিক বোধ তৈরিতে সহায়ক হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার সুযোগ কমে আসে।

(ঞ) যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সবগুলো আঞ্চলিক বাহিনীই প্রধানত গেরিলাযুদ্ধ কৌশল তথা 'আঘাত করো ও সরে পড়ো' নীতি অনুসরণ করেছিল। তবে বাহিনীগুলোর অস্ত্রসামর্থ্য (বিশেষত অত্যাধুনিক অস্ত্র) বৃদ্ধি পাওয়ার পর অন্তত আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে তারা সম্মুখ যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছিল। আবার কোনো কোনো বাহিনীর অনুসৃত গেরিলা যুদ্ধকৌশলেও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, কাদেরিয়া বাহিনীর অনুসৃত গেরিলা যুদ্ধকৌশলটি (আনুমানিক জুলাই থেকে) ছিল 'আঘাত করো, অবস্থান করো ও এগিয়ে যাও'। সুন্দরবনে জিয়া বাহিনীর অনুসৃত কৌশলটি ছিল 'প্রলুব্ধ/প্ররোচিত করো, আয়ত্তে আনো/ফাঁদে ফেলো ও আঘাত করো'। উল্লিখিত গেরিলা যুদ্ধকৌশল নিঃসন্দেহে যুদ্ধ কৌশলবিদ্যায় নতুন সংযোজন হওয়ার দাবি রাখে।

(ট) আঞ্চলিক বাহিনীগুলো তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকেই সক্রিয় ছিল। সাধারণভাবে সমাজবিরোধী উপাদান (চোর, ডাকাত, লুটেরা, নির্যাতনকারী ইত্যাদি) নিমূর্লের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এদেশীয় শক্তি (রাজাকার-দালাল-শান্তি কমিটির সদস্য ইত্যাদি) যারা সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনতার শান্তি, সম্পদ, সম্মান ও জীবনহানির কারণ হয়েছিল, তাদের অনেককেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে শাস্তি (আর্থিক দণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত) দিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল আঞ্চলিক বাহিনীগুলো। এর ফলে সাধারণ জনতা নিজ নিজ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকেই আরো বেশি মাত্রায় সহযোগিতা করতে শুরু করেছিল। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রচেষ্টার ফলেই সাধারণ জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয় এবং এর ফলেই মুক্তিযোদ্ধা জনতার মিলনে সূচনা হয় জনযুদ্ধের।

(ঠ) মুক্তিযুদ্ধকালে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর অনেকেই শরণার্থী (এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা দেশ থেকে ভারতে নিরাপদ আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন যারা) সেবা কার্যক্রম চালিয়েছিল। শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, নিরাপত্তা (সম্পদ, সম্মান ও প্রাণ-এর) প্রদানের পাশাপাশি ভারতে গমনেচ্ছুদের নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ (গাইড সরবরাহ, পরিবহন, আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তার স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধাদল প্রেরণ ইত্যাদি) গ্রহণ করেছিল। আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী সেবা কার্যক্রম চালিয়ে ছিল কাদেরিয়া বাহিনী, ওহিদুর বাহিনী, আকবর বাহিনী, জিয়া বাহিনী, মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী।

(ড) মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ দেশের মানুষের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম তুলে ধরতে ও পাকিস্তানি প্রশাসন এবং রাজাকারদের জনবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রচার করতে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর অনেকেই প্রচারপত্র, (লিফলেট, প্যামফ্লেট) পোস্টার, পত্রিকা বের করেছিল। কাদেরিয়া বাহিনী *রণাঙ্গন*, বাতেন বাহিনী *অগ্নিশিখা*, আফসার বাহিনী *জাগ্রত বাংলা*, হালিম বাহিনী *অগ্নিবাণ*, আফতাব বাহিনী *অগ্রদূত* পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করতো। এছাড়া বাহিনীগুলোর তরফে উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা, জনসভা ইত্যাদি জনসংযোগমূলক তৎপরতা অবরুদ্ধ জনতাকে আরো বেশি মুক্তিযুদ্ধলগ্ন করেছিল বলা যায়। মুক্তিবাহিনীর এরকম কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধপন্থি জনতার মনোবল ধরে রাখতে ও বৃদ্ধি করতে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী উপাদানের মধ্যেও একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের জনসংযোগ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধে অবধারিতভাবেই আরো বেশি মাত্রায় গণমানুষের অংশগ্রহণ (যোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য ভূমিকায়) বৃদ্ধি করেছিল। স্মর্তব্য, সেক্টর ও সাব-সেক্টরগুলোর ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের কার্যক্রম প্রায় অনুপস্থিত ছিল। অবরুদ্ধ দেশের মানুষের মনোবল চাঙা রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের উল্লিখিত কার্যক্রম সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

(ঢ) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের মধ্যে কাদেরিয়া বাহিনী (ভূঞাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়), ওহিদুর বাহিনী (আত্রাই ও রাজশাহীর বিল এলাকায়), আকবর বাহিনী (শ্রীপুরের একাংশে), আফসার বাহিনী (ভালুকার একাংশে), জিয়া বাহিনী (মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলার একাংশে), মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী (শিবপুরের প্রায় পুরোটা), আফতাব বাহিনী (রৌমারী-রাজিবপুরের একাংশে) মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। স্মর্তব্য, ১১টি সেক্টরের মধ্যে ৬ নং সেক্টরভুক্ত সীমান্ত এলাকা ব্যতীত সেক্টরভুক্ত কোনো এলাকায়ই এ ধরনের সাফল্য মেলেনি। আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ নিজ নিজ এলাকায় মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এসব জায়গায় বেসামরিক প্রশাসনও চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহিনীগুলো পাকিস্তানপন্থি প্রশাসনের সমান্তরালে বেসামরিক প্রশাসন চালু করে। মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও বেসামরিক প্রশাসন চালু করার ফলে সংশ্লিষ্ট মুক্তাঞ্চলে জনগণের আর্থিক ও সামাজিক জীবন তুলনামূলক নিরাপদ ও স্বাভাবিক হয়। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনতার সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। পাশাপাশি পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার-দালাল-লুটেরাদের দ্বারা নির্যাতিত ব্যক্তি ও পরিবার এবং শরণার্থীদের জন্য অবরুদ্ধ দেশেই মুক্তাঞ্চলগুলো নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে আর্বিভূত হয়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের তরফে পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসন জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় এটিকে একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনতার স্বীকৃতি হিসেবে ও অপরদিকে পাকিস্তানি দখলদার প্রশাসনের প্রতি জনতার প্রত্যাখ্যান হিসেবে গণ্য করা যায়। এছাড়া মুক্তাঞ্চল ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা বর্হির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের দাবির বৈধতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়।

(ন) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের একটি বিশেষ কৃতিত্ব ছিল অবরুদ্ধ দেশে চিকিৎসা কার্যক্রম চালানো। প্রায় প্রতিটি দলের সাথেই চিকিৎসক ও সেবক-সেবিকা যুক্ত খাতায় দলের সদস্যদেরকে যেমন চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তেমনি সাধারণ মানুষকেও এই সেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

(ত) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সংগঠক ও সদস্যদের শ্রেণিচরিত্র বিচার করলে দেখা যায় যে, সংগঠকগণ ছিলেন মোটাদাগে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। কিছু ব্যতিক্রম বাদে (শাহ মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ এমএনএ, রাজশাহী-৭, আব্দুল বাছেদ সিদ্দিকী, এমপিএ, টাঙ্গাইল-৩, মহকুমা ও থানা পর্যায়ের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ ও পেশাজীবী বাদে) আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কেউই সে অর্থে শহুরে নয়, উচ্চবিত্ত তো নয়ই। বাহিনীগুলোর যারা প্রধান বা অধিনায়ক ছিলেন তাদের মধ্যে ৯ জন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন আর ৬ জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যে ৯ জন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে ৫ জন (কাদের সিদ্দিকী, আব্দুল বাতেন, আফসার উদ্দিন আহমেদ, আকবর হোসেন, লতিফ মির্জা) স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং ৪ জন (হালিম চৌধুরী, মান্নান ভূঁইয়া, ওহিদুর রহমান ও রফিকুল ইসলাম) বাম রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী যে ৬ জন সামরিক ব্যক্তিত্ব মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন কমিশনপ্রাপ্ত (লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদ) কর্মকর্তা ছিলেন আর অবশিষ্ট ৫ জন (জহিরুল হক পাঠান, লুৎফর রহমান, আফতাব আলী, সিদ্দিকুর রহমান, হেমায়েত উদ্দিন) ছিলেন কমিশনবিহীন কর্মকর্তা বা সাধারণ সৈনিক। এ হিসেবে এদের সবাই ছিলেন সামরিক বাহিনীর নিম্নস্তরের সদস্য। আর পারিবারিকভাবে লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন আহমেদ ব্যতীত অবশিষ্ট সবাই ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য এবং ৬ জন সামরিক ব্যক্তিত্বই ছিলেন গ্রামীণ জনপদের। সংগঠক পর্যায়ের সদস্যবৃন্দ বাদে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সকল যোদ্ধা ও স্বেচ্ছাসেবক (দু'একটি বিকল্প বাদে) ছিলেন নিম্নবিত্ত ও গ্রামীণ পরিবারের সদস্য।

(থ) মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে (আনুমানিক আগস্ট পর্যন্ত) পাকিস্তানি সৈন্যদল ও রাজাকার-দালালদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীগুলো কর্তৃক গৃহীত সামরিক পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-দালালরা অবরুদ্ধ দেশের বেশ কয়েকটি গণহত্যা, নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। পরোক্ষে হলেও এর দায় আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর ওপর বর্তে। এমন পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও জনতার তরফ থেকে মুক্তিবাহিনীর কাছে অনুরোধ আসে যেন তারা অভিযান পরিচালনা বন্ধ রাখে অথবা যুদ্ধে জয়ী হলে তারা যেন সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থান করে। জনতার উল্লিখিত অনুরোধ বাহিনীগুলোর পক্ষে সবসময় মেনে চলা সম্ভব হয়নি। ফলে ক্ষয়ক্ষতির শিকার ব্যক্তি ও পরিবারগুলো মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু, সময় যত এগিয়েছে এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর (পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার-দালাল) নির্যাতন যত বৃদ্ধি পেয়েছে, অবরুদ্ধ মানুষ তত বেশি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন ও দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করেছেন।

(দ) আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর কোনো কোনো দলের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গুটি কয়েক মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, চাঁদাবাজি, নারী অবমাননা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাহিনীগুলোর নিজ নিজ বিচার বিভাগ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠিন শাস্তি প্রদান করছিল। উল্লেখ্য, প্রতি বাহিনীতেই

হত্যা ও নারী অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ প্রমাণিত হলে (তিনি যতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোন না কেন) অবধারিতভাবেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো।

(ধ) মুক্তিযুদ্ধকালে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে কোনো কোনো দলের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরকার প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধা বা বিএলএফ এর সাথে সেমসাইড (মুক্তিযোদ্ধা বনাম মুক্তিযোদ্ধা) সংঘর্ষ ঘটেছিল। আবার একই এলাকায় সক্রিয় কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যদের সাথে বাতেন বাহিনীর সদস্যদের একবার সংঘর্ষ ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে এ ধরনের সংঘর্ষে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পাঁচ দশক পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে শুধু কাদেরিয়া বাহিনী, হেমায়েত বাহিনী, হালিম বাহিনী, বাতেন বাহিনী ও আফসার বাহিনীর অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলেছে। এদের মধ্যে আবার কাদেরিয়া বাহিনী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বেশিরভাগটা এই দলের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার জন্য আর বাকিটা দল প্রধান কাদের সিদ্দিকীর পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কারণে। আর হেমায়েত বাহিনী রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল মূলত এ বাহিনীর যুদ্ধ এলাকার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে। কিন্তু উল্লিখিত বাহিনীসমূহের তৃণমূলের সংগঠকগণ ও সদস্যগণ সে অর্থে উপযুক্ত দৃষ্টি পায়নি।

মুক্তিযুদ্ধকালে উল্লিখিত আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ ছাড়া আর যেসব বাহিনী সক্রিয় ছিল, তাদের কোনোটিই আঞ্চলিক বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত নয়। তদুপরি, এসব বাহিনীর মধ্যে বাম ঘরানার আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ওহিদুর বাহিনী, মান্নান ভূঁইয়া বাহিনী ও রফিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড নিয়ে খানিকটা বিতর্ক ও নেতিবাচক প্রচারণা যুদ্ধকালেই তোলা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে।

বাংলাদেশ সরকারের সেক্টর কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী মোট মুক্তিযোদ্ধা (১০ নং সেক্টরের ৫১৭ জন বাদে) ছিলেন ১,৮৭,৭৩২ জন।[১০] বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ২,২০,০০০।[১১] এই সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১,৮০,৫১৩ জন।[১২] অর্থাৎ, উক্ত সংখ্যার মধ্যে রণাঙ্গনের বেসামরিক যোদ্ধা ছাড়াও বীরাঙ্গনা, পেশাজীবী, শিল্পী, ফুটবলার, ডাক্তার, নার্স, সাংবাদিক অন্তর্ভুক্ত আছেন। বর্তমান গবেষণায় জানা যায় যে, আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সশস্ত্র সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০,০০০। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্য কিছু সংখ্যক ভারতে প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ও সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ যেহেতু অবরুদ্ধ দেশে সক্রিয় ছিল, সেহেতু ভারতে থাকা বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতকৃত তালিকায় এসব বাহিনীর যোদ্ধাদের নাম পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকার সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রস্তুতকরণে ভিত্তি হিসেবে যেহেতু ভারতীয় তালিকা এবং লাল মুক্তিবার্তাটি সঠিক বলে ধরা হয়[১৩] সেহেতু এক্ষেত্রেও আঞ্চলিক বাহিনীর সকল সদস্যকে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এসব কারণে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর অসংখ্য সদস্য মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় স্থান পাননি। এছাড়া, এসব আঞ্চলিক বাহিনীর সাথে যুক্ত প্রায় এক লাখ স্বেচ্ছাসেবক তো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিটুকুই পাননি। অথচ এই স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতাতেই মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল প্রকৃত জনযুদ্ধ। স্মর্তব্য, অবরুদ্ধ দেশে এই স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন ও সম্পদহানির ঝুঁকি মুক্তিযুদ্ধে জড়িত কোনো পক্ষের চেয়ে কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করতে গিয়ে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের পরিবার প্রাণ, মান ও সম্পদ হারিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত।

মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে এ পর্যন্ত পাঁচবার।[১৪] ২০১৭ আরেকটি তালিকা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া চলমান। মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন:

> এতবার মুক্তিযোদ্ধাদের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হলে অচিরেই এই সংজ্ঞা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। তাছাড়া, যারা সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন, তারা ছাড়াও অবরুদ্ধ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ (পাকিস্তানপন্থি সক্রিয় রাজাকার, দালাল, লুটেরা, আল বদর, আল শামস, শান্তি কমিটির সদস্য ইত্যাদি বাদে) নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহায়তা করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন। সুতরাং তারা মুক্তিযোদ্ধা নয় কেন? মনে রাখতে হবে, অবরুদ্ধ দেশে মানুষ আরো বেশি অনিরাপদ ছিল।[১৫]

অধ্যাপক মামুনের এই বক্তব্য অনুযায়ী আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের স্বেচ্ছাসেবকদেরও 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যেমন এখনও তালিকাভুক্ত হতে পারেননি, তেমনি এই বাহিনীসমূহের যোদ্ধাদের বীরত্বের স্বীকৃতিও সে অর্থে মেলেনি। মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাব প্রদান করে। এর মধ্যে ৫০০ জন সদস্য সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর এবং ১৭৬ জন গণবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৬] আরেকটি উৎসে গণবাহিনী থেকে খেতাবপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা ১৬০ উল্লেখ করা হয়।[১৭] আঞ্চলিক বাহিনীর প্রায় ষাট হাজার সদস্যের মধ্যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য মাত্র ৩৬ জন সদস্য খেতাব পেয়েছেন। এদের মধ্যে আবার সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন ২৪ জন। এছাড়া আঞ্চলিক বাহিনীর ১৫ জন বাহিনী প্রধানের মধ্যে শুধু ৩ জন খেতাব পেয়েছেন যাদের মধ্যে আবার ২ জন সেনাসদস্য ছিলেন। অন্যদিকে সেক্টর কমান্ডারদের ১৪ জনের মধ্যে ১২ জন এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদের ৭৯ জনের মধ্যে সিংহভাগই খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং বোঝা যায় যে, খেতাব প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। উল্লেখ্য খেতাব প্রদানের জন্য যে প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন করা হয় সেটি সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। খেতাব না পাওয়া একজন সাব-সেক্টর কমান্ডার এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "১৯৭২ সালে পদক দেয়ার ব্যাপারে গেলেন্টারি অ্যাকশনের চেয়ে স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ পক্ষপাতিত্বই বেশি কাজ করেছিল"।[১৮] খেতাব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা যে বঞ্চিত হয়েছিলেন, সেটির সত্যতা মেলে খেতাব নিরীক্ষা পর্ষদের সভাপতি এ কে খন্দকারের লেখায়। তিনি লিখেছেন:

> আমি স্বীকার করি, গণবাহিনীর আরও অনেক সদস্যেরই খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। তাঁদের অনেকেই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ অথবা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁরা তাঁদের বীরত্বের কোনো স্বীকৃতি পান নি। ...খেতাব প্রদানের বিষয়ে আমরা আরও উদারতা দেখাতে পারতাম; সরকারও খেতাবের বিষয়ে আরও বাস্তবসম্মত নীতিমালা গ্রহণ করেত পারত। একই সঙ্গে সে সময়ের ফোর্স, সেক্টর ও সাব-সেক্টর অধিনায়করা আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত করতে পারতেন।"[১৯]

এ কে খন্দকারের বক্তব্যের শেষাংশ লক্ষ করলে অনুধাবন করা সহজ হয় যে, কেন আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের মুক্তিযোদ্ধারা খেতাব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিলেন। খেতাব নিরীক্ষা পর্ষদ 'বীর' মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচনের জন্য সর্বাবস্থায়ই সেক্টর, সাব-সেক্টর ও নিয়মিত বাহিনীর কর্মকর্তাদের মতামতের ও সুপারিশের ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তড়িঘড়ি করে খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা চূড়ান্ত করেছিলেন। তালিকা চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে অবরুদ্ধ দেশে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক

বাহিনীসমূহের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা সে অর্থে পর্ষদের ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। তাছাড়া, পর্ষদের ও সেক্টর অধিনায়কদের একাংশের মতামত ছিল "খেতাবের বিষয়টি পেশাদার সৈনিকদের জন্য প্রযোজ্য"।[২০] সামরিক কর্মকর্তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিও খেতাব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বঞ্চিত করেছে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর সদস্যদের বীরত্ব ও ভূমিকার প্রতি অস্বীকৃতি।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মতে, মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন শুরু হয়েছিল বীরত্বসূচক পদক বিতরণের মাধ্যমে।[২১] মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন বলতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ সরকার) ও ব্যক্তিবর্গের অবদানকে খাটো করে বা ঢেকে দিয়ে সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে শুধু নয় মাসের রণাঙ্গনের কর্মকাণ্ড তথা ১১টি সেক্টরের অধীন সমর নেতা ও তাদের কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা ও প্রয়াসকে বুঝিয়েছেন।[২২] প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লিখিত প্রবণতার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের সদস্যদের (যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ছিলেন সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য) ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি মেলেনি। অথচ একাত্তরের ১১ এপ্রিলে প্রচারিত নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'গণযুদ্ধ' বলা হয়েছিল।[২৩] গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ (People's War) তত্ত্বের প্রবক্তা মাও সে-তুঙ এর মতে, "People's War is always revolutionary war ... the revolutionary war is a war of the masses; it can be waged only by mobilising the masses and relying on them."[২৪] জনযুদ্ধের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, জনযুদ্ধের তত্ত্ব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সফলভাবে প্রয়োগকৃত হয়েছে। আর আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ ছিল অবরুদ্ধ দেশে জনযুদ্ধের প্রকৃত কারিগর।

গবেষণায় পর্যবেক্ষণে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতি বিচারে জনযুদ্ধ হলেও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে 'সনদ' ও 'খেতাব' বিতরণের মাধ্যমে এর মূল চরিত্রে বিচ্যুতি ঘটেছে। বক্তৃতায় ও কাগজে-কলমে মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলা হলেও 'সনদ', 'খেতাব' ও 'পুরস্কার' বিতরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অস্বীকার করা হচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে সনদ, খেতাব ও পুরস্কার মুক্তিযুদ্ধকে ও জাতিকে বিভক্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্স বা যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখা 'পার্টিজান'দেরকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার এভাবে মূল্যায়ন করে জাতিকে বিভক্ত করেনি। ফ্রান্স বা যুগোস্লাভিয়া কেন পৃথিবীর যেসব দেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে কোথাও এই 'সনদ', 'খেতাব' ও পুরস্কার' এর প্রচলন দেখা যায় না। তাছাড়া, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি ও খেতাব বা পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি প্রচ্ছন্ন আধিপত্যবাদী রাজনীতি লক্ষ করা যায়। এর প্রমাণ মেলে, যখন স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ২৩৬৭ জন সদস্যের 'মুক্তিযোদ্ধা' স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[২৫] এছাড়া রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীস্বার্থ বীরত্বসূচক 'খেতাব' দেওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রভাবক হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাঠান বাহিনীর প্রধান জহিরুল হক পাঠানের বয়ানে:

> মিজানুর রহমান চৌধুরী (চাঁদপুর আওয়ামী লীগ নেতা) তখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায়। আমরা কয়েকজন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি আমার হাত শক্ত করে ধরে বললেন, "পাঠান সাহেব, আমি আপনার সাথে অন্যায় করেছি। খেতাবের জন্য আমি আপনার পক্ষে সুপারিশ করিনি। আপনার সাথে কলিমউল্লাহ ভূঁইয়া ও তার লোকজন (বামপন্থী) ছিল। এই কারণে আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আপনার খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। পারলে আমাকে মাফ করে দিয়েন"। মিজান চৌধুরীর কথায় আমার সব রাগ-ক্ষোভ চলে গেল। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।[২৬]

মুক্তিযুদ্ধের পরে শ্রেণি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিভক্তির সুযোগে আধিপত্যবাদী সংখ্যালঘু (সামরিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একাংশ) সংখ্যাগরিষ্ঠকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে আড়াল করতে সচেষ্ট ছিল। এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহের ভূমিকা অনালোচিত থেকে যায় এবং তৃণমূলের মুক্তিযোদ্ধারা অসমাদৃত থেকে যান। এ কথা আরো বেশি সত্য শ্রেণি বিচারে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতি বিচারে বাম ঘরানার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। রাজনীতির এই চোরাস্রোতে আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনীর অবদান অস্বীকৃত রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়েছে খণ্ডিতভাবে। এই কারণে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী রাষ্ট্র ও সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিভক্তি বেড়েছে এবং এই সুযোগে জেনারেলদের (জিয়া ও এরশাদ) সমন্বয়বাদী রাজনৈতিক মডেল (মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এক হও) শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সকল স্তর (সংগঠক ও কর্মী), শ্রেণি (আর্থিক বিবেচনায়) ও মতামতের (রাজনৈতিক) মুক্তিযোদ্ধাদের সমভাবে মূল্যায়ন করে জেনারেলদের সমন্বয়বাদী রাজনৈতিক মডেল প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়বাদী মডেলকে (সকল মুক্তিযোদ্ধা এক) রাষ্ট্র চালনার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই রচিত হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

---

১ মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১১

২ এই সিদ্ধান্ত যাচাই করতে দেখুন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* (২০০৬), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক ৭ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (২০০৮)। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আজ অবধি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে উক্ত গ্রন্থগুলোই লিখিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে শুধু যুদ্ধের বিবরণই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর বা অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাতেও একই প্রবণতা (যুদ্ধের বিবরণ উল্লেখ করা) লক্ষণীয়। এজন্য দেখুন: এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, এরিয়া সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ময়মনসিংহ, ২০০১, এম এ. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক (উইং কমান্ডার অব.), *একাত্তরের উত্তর রণাঙ্গন*, বর্ণতরু, ঢাকা, ২০০৫, এম. এ. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক (উইং কমান্ডার অব.), *একাত্তরের নবম সেক্টরে যুদ্ধ*, বর্ণতরু, ঢাকা, ২০০৫, কালাম ফয়েজী, *ভোলা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ্ (বীর প্রতীক, কর্নেল), *মুক্তিযুদ্ধে আট নম্বর সেক্টর*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬, রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩, রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১

৩ মুক্তিযুদ্ধের নানা মাত্রা নিয়ে প্রধানত লিখেছেন মুনতাসীর মামুন। এছাড়া তার উৎসাহে অনেকেই এখন লিখছেন। মুক্তিযুদ্ধের নানা মাত্রা নিয়ে জানতে দেখুন: মুনতাসীর মামুন রচিত *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮; *শান্তিকমিটি ১৯৭১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২; *আলবদর ১৯৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩; *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০; *রাজাকারের মন (অখণ্ড)*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭; *সেইসব পাকিস্তানী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯; *পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর* [মহিউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সম্পাদনা], ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮; *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭; *মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নং সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩; *যেসব হত্যার বিচার হয় নি*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০; *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩; মুনতাসীর মামুন গ্রন্থমালা (সম্পা.) গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ খণ্ড, অনন্যা ঢাকা, মুর্শিদা বিন্তে রহমান লিখিত *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ্স ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮; তপন পালিত রচিত *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন ১৯৭১-২০১৩*, বাংলা একাডেমি, ২০১৬; চৌধুরী শহীদ কাদের রচিত *মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা শরণার্থী, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬; *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের চিকিৎসা সহায়তা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯; *মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যকার কবিতা ও কবিগান*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭। গণহত্যা, গণহত্যা-নির্যাতন ও বধ্যভূমি বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ্স ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা।

৪ *প্রথম আলো*, ২৩ মার্চ ২০১৭

৫ বিস্তারিত জানতে *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* (২০০৬) এর ১০টি খণ্ডে (১০ নং সেক্টর বাদে) সেক্টর ও সাব-সেক্টর গুলোর সামরিক তৎপরতা দেখুন

৬ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন: Major General ATM Abdul Wahab, *Mukti Bahini Wins Victory*, Columbia Prokashani, Dhaka, 2005 ও লে. কর্নেল এস আই এম নূরন্নবী খান বীর বিক্রম (বরখাস্ত), *রৌমারী রণাঙ্গন*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

[৭] লতিফ মির্জাকে ১১ নং সেক্টর কর্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ এলাকার রাজনৈতিক সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ দেন (এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, সময় ২য় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ৬৩)

[৮] লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা: একটি জাতির জন্ম*, ইউপিএল, ঢাকা, নবম মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ১০৩

[৯] *ঐ*

[১০] *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর-এক*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৫-৩৯

[১১] *বিবিসি*, ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

[১২] *যুগান্তর*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮

[১৩] *বিবিসি*, ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

[১৪] *ঐ*

[১৫] সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ ফ্ল্যাট (গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা) ৪ অক্টোবর ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

[১৬] মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ এক*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯৩

[১৭] *দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন*, ২৩ মার্চ ২০১৭

[১৮] মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশি জেনারেলদের মন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০১৫, পৃ. ৬১৬

[১৯] এ কে খন্দকার, *১৯৭১: ভেতরে বাইরে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২০২-০৩

[২০] *ঐ*, পৃ. ২০৩

[২১] মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২৬

[২২] মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ এক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-৯৫

[২৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৫

[২৪] 'Mao on Peoples War', *www. marxist.org; Selected Works of Mao Tse-Tung, Volume-1,* Foreign Languages Press, Peking, 1975, p. 147

[২৫] *প্রথম আলো*, ০৩ জানুয়ারি ২০১৭

[২৬] সাক্ষাৎকার: জহিরুল হক পাঠান, 'পাঠান বাহিনী', চাঁদপুর এর অধিনায়ক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নার্গিস ভিলা, ৫৯ রজ্জব আলী সরদার রোড, পূর্ব জুরাইন, কদমতলী, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১৭, বিকাল ৪.৩০ মি.

মানচিত্র তালিকা

	পৃষ্ঠা
মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ	২৫
কাদেরিয়া বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	৪১
বাতেন বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	৬২
হালিম বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	৭৪
আফসার বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	৯০
হেমায়েত বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	১১১
মান্নান ভূঁইয়া বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	১২৬
পাঠান বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	১৫১
লুৎফর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	১৬৭
আফতাব বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	১৮৮
লতিফ মির্জা বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	২০২
ওহিদুর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	২২৯
আকবর বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	২৫৩
রফিক বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	২৭০
জিয়া বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	২৮৬
সিদ্দিক বাহিনীর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ	৩০৫

গ্রন্থপঞ্জি

১. দলিলপত্র (বাংলা ও ইংরেজি)

আবু সাঈদ খান (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র: ফরিদপুর*, সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা, ২০০৯

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মৌখিক সাক্ষ্য, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৫

মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১)*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিল পত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১

মুনতাসীর মামুন (গ্রন্থমালা সম্পাদক), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২৬ খণ্ড, অনন্যা, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১), তিন খণ্ড*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫ খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯

A.S.M Shamsul Arefin, *Bangladesh Documents 1971*, Somoy Prokashan, Dhaka, 2015

Ali, Mir Shawkat (Lt. Gen.), *Evidence Vol. 1*, Somoy Prokashan, Dhaka, 2008

Ali, Mir Shawkat (Lt. Gen.), *Evidence Vol. 2*, Somoy Prokashan, Dhaka, 2008

Roedad Khan, *The American Papers Secret and Confedential: India, Pakistan, Bangladesh 1965,1973*, UPL, Dhaka, 1999

২. গেজেটিয়ার

Bangladesh District Gazetteers Comilla, Bangladesh Government Press, Dacca,1977

Bangladesh District Gazetteers Khulna, Bangladesh Government Press, Dacca, 1978

East Pakistan District Gazetteers Dacca, East Pakistan Goverment Press, Dacca, 1969

East Pakistan District Gazetteers:Chittagong, East Pakistan Government Press, Dacca, 1970

৩. সংবাদপত্র (দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক)

দৈনিক আজকের কাগজ

৭ আগস্ট ১৯৯৪

দৈনিক কালের কণ্ঠ

১৩ মার্চ ২০১৬

২১ মার্চ ২০১৬

২২ মার্চ ২০১৬

দৈনিক প্রথম আলো

২৮ জুলাই ২০১৭

দৈনিক পূর্বদেশ

২০ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক ভোরের কাগজ

১৩ নভেম্বর ২০০২

মাসিক গণমন

ডিসেম্বর ১৯৭৭

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৯

৪. আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা

অলি আহমদ বীর বিক্রম (কর্নেল অব.), *আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

আকবর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী*, আকবর প্রকাশন, মাগুরা, ১৯৯৬

আতাউর রহমান খান, *অবরুদ্ধ নয় মাস*, মোহনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

আনোয়ার উল আলম শহীদ, *একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

আবু ওসমান চৌধুরী (লে. কর্নেল অব.), *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১

আবুল হোসেন খোকন, *জনযুদ্ধের দিনগুলি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

আমীন আহমেদ চৌধুরী, *১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৬

আশরাফ কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬

এম. আর. আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৫

এম. এ. জলিল (মেজর), *সীমাহীন সমর*, জনতা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪

এম এ মতিন (মেজর জেনারেল), *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০২

এম. এ. হাসান (ডা.), *অবরুদ্ধ দেশ: অনিকেত জীবন*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১০

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, *মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, *মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

কাজী নুরুজ্জামান (কর্ণেল), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা*, অবসর, ঢাকা,

কাজী নূর-উজ্জামান, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, *স্বাধীনতা '৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯২

গাজী আ. সালাম ভূঁইয়া বীরপ্রতীক, *যুদ্ধের স্মৃতিকথা*, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, ময়মনসিংহ, ২০১১

জিয়াউদ্দিন (মেজর অব.), *মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবনের সেই উন্মাতাল দিনগুলি*, মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

মনযূর উল করিম, *শিলালিপিতে একাত্তর*, সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩

মহিউদ্দিন আহমদ, *আমাদের একাত্তর*, সিডিএল, ঢাকা, ২০১৬

মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

মুজিবুল হক, *একাত্তরের হেমায়েত বাহিনী ও আমার মুক্তিযুদ্ধ*, মুক্তদেশ, ঢাকা, ২০১৫

মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, মুক্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

মোস্তফা হোসেইন, *খেতাবপ্রাপ্তদের যুদ্ধকথা*, হাতেখড়ি, ঢাকা, ২০১১

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

শফিউদ্দিন তালুকদার, *একাত্তরের বয়ান*, প্রথম খণ্ড, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

শাফায়াত জামিল বীরবিক্রম (কর্নেল অব.), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

৫. বাংলা গ্রন্থ

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক

অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮

অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পর্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৫

অজয় রায়, শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পর্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৮

আনোয়ার উল আলম ও সাকী আনোয়ার (সম্পা.), *একাত্তরের বীর*, প্রথম খণ্ড, টাঙ্গাইল, শহীদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদ, ২০১৪

আমিনুর রহমান সুলতান, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ময়মনসিংহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১

এ এস এম সামছুল আরেফিন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, প্রথম খণ্ড*, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

এ এস এম সামছুল আরেফিন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা, দ্বিতীয় খণ্ড*, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২

এ কে মোহাম্মদ আলী শিকদার ও অন্যান্য (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, এরিয়া সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ২০০১

এমাজউদ্দিন আহমদ, জসীম উদ্দিন আহমদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, ১১ খণ্ড*, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৬

কাজী সাজ্জাদ আলী জহির (লে. কর্নেল অব.), *রংপুর সেনানিবাসে দুঃসাহসিক আক্রমণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১

কামরুল হাসান ভূঁইয়া (সম্পা.), *স্বাধীনতা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড*, সেন্টার ফর লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ঢাকা, ২০১০

গাজী মো. খলিলুর রহমান (সম্পা.), *জাগ্রত বাংলা*, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ভালুকা উপজেলা কমান্ড, ভালুকা, ময়মনসিংহ, ২০০৯

দবিরউদ্দিন জোয়ারদার (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে ঝিনাইদহ*, প্রথম খণ্ড, ঝিনাইদহ, মুক্তিযোদ্ধা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ২০১১

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (প্রথম-সপ্তম খণ্ড)*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৮

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : কথ্য ইতিহাস, ৪ খণ্ড, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৬

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬

অঞ্চলভিত্তিক

আইয়ুব হোসেন, *বৃহত্তর রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৮

আখতারুজ্জামান মন্ডল, *১৯৭১ উত্তর রণাঙ্গণে বিজয়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

আজহারুল আজাদ জুয়েল, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর দিনাজপুর*, সুবচন, দিনাজপুর, ২০০২

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

আবু সাঈদ খান, *মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর,* সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা, ২০০৮

আবু হারিস রিকাবদার (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে শিবপুর,* মুক্তিযুদ্ধের পুনর্মিলনী কমিটি, শিবপুর, ২০০১

আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

আলহাজ্ব মো. ফখরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী*, প্রকাশক: আলহাজ্ব আঞ্জুমান আরা বেগম ও অন্যান্য, নোয়াখালী, ২০১৪

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর,* ইউনিয়ন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪

এ এস এম সামছুল আরেফিন, *মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ*, এরিয়া সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ময়মনসিংহ, ২০০১

এ কে এম গিয়াস উদ্দিন মাহ্‌মুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, ঢাকা, গতিধারা, ২০১৫

এম এ কাফি, *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর,* অংকুর প্রকাশনী, দিনাজপুর, ১৯৯৬

এম এ. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক (উইং কমান্ডার অব.), *একাত্তরের উত্তর রণাঙ্গন,* বর্ণতরু, ঢাকা, ২০০৫

এম. এ. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক (উইং কমান্ডার অব.), *একাত্তরের নবম সেক্টরে যুদ্ধ,* বর্ণতরু, ঢাকা, ২০০৫

এস. আই. এম. নূরুন্নবী খান বীরবিক্রম (লে. কর্নেল), *রৌমারী রণাঙ্গন,* কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

এস এম শাহান শাহ শাহীন (সম্পা.), *৭১ এর প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী,* লাবনী, ঢাকা

এস এস উবান (মেজর জেনারেল অব.), *ফ্যান্টমস অব চিটাগাং দি ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ,* ঘাসফুল নদী, ঢাকা, ২০০৫

ওহিদুর রহমান, *মুক্তি সংগ্রামে আত্রাই*, সংহতি, ঢাকা, ২০১২

কায়সার ফিরোজ, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,* গতিধারা, ঢাকা, ২০১৪

কালাম ফয়েজী, *ভোলা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস,* গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮

গৌরাঙ্গ নন্দী, *বৃহত্তর খুলনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৬

জামশেদ উদ্দীন, *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সীতাকুন্ড অঞ্চল*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৮

জামাল উদ্দিন, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৬

জাহিদ রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের কামান্নার ২৭ শহীদ,* তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

জিয়াউদ্দিন (মেজর অব.) ও আসাদুজ্জামান, *সুন্দরবন সমরে ও সুষমায়,* তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

জোবাইদা নাসরীন, *মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল,* জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী,* কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

তপন বাগচী, *মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে: কুড়িগ্রাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

নাজিম উদ্দিন মাহমুদ, *লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২

ফখরে আলম, *দক্ষিণের মুক্তিযুদ্ধ*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

বজলুল হাবিব ভূঁইঞা, *সংগ্রামের নয় মাস, শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

বজলুল হাবিব ভূঁইয়া, *সংগ্রামের নয় মাস শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধ*, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

বিলু কবীর, *গাজীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

মঈদুল হাসান ও সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

মহসিন হোসাইন (সম্পা.), *নড়াইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

মামুন তরফদার, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

মামুন তরফদার, *স্বাধীনতা যুদ্ধে টাঙ্গাইল*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৩

মাহফুজুর রহমান, *ভোলা দ্বীপের অনন্য মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *নরসিংদী জেলায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রকাশক: আজিজুন নাহার মঈন, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১

মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন, *নরসিংদী জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

মুহম্মদ শামসুল হক (মেজর), *মুক্তিসংগ্রামে কুড়িগ্রাম (উত্তর রণাঙ্গন)*, চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

মুহাম্মদ আবু তাহের মীর্জা, *স্বাধীনতাযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী*, প্রিন্টার্স অ্যাড, চট্টগ্রাম, ২০০১

মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, *ময়মনসিংহ একাত্তর*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০

মুহাম্মদ লুৎফুর হক (সম্পা.), *দিনাজপুর ১৯৭১ অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

মুহাম্মদ লুৎফুল হক (সম্পা.), *বরিশাল ১৯৭১ অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র,৫*, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনী প্রকল্প, দিনাজপুর, ২০০০

মো. আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১০

মো. দেলোয়ার হোসেন খান, *মুক্তিযুদ্ধে চাঁদপুর*, বেগম শামসুন্নাহার খানম, চাঁদপুর, ২০০২

মোঃ শহিদুল হক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ৬নং সেক্টরের ইতিহাস*, মোঃ শহিদুল হক, কুমিল্লা, ২০১৩

মো. সোলায়মান আলী, *মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ফরিদপুর*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ফরিদপুর, ১৯৯০

মো. হাবিবউল্লাহ বাহার, *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯

মোল্লা আমীর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে খুলনা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৯

মোহাম্মদ আলী ইউনুছ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে সুনামগঞ্জ*, মুক্তি সংগ্রাম স্মৃতিট্রাস্ট, সুনামগঞ্জ, ১৯৯০

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মনজুর, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চল*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৫

মোহাম্মদ সফিকউল্লাহ্ (বীর প্রতীক, কর্নেল), *মুক্তিযুদ্ধে আট নম্বর সেক্টর*, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৬

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চাঁদ মিয়া, *আমার দেখা রাজনীতি ও গোপালগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধ*, এ এস এম খালেদ, ঢাকা, ২০০৪

মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন (সম্পা.), *মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, প্রকাশক: জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ, ১৯৮৭

মোহাম্মদ সেলিম (সম্পা.), *দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩

রুকুনউদ্দৌলাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

লাভলী ইয়াসমীন রুমী, *মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জ*, আলপনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯

শাহজাহান শাহ ও মাসুদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধ: দিনাজপুর*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮

শেখ গাউস মিয়া, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সুন্দরবন সাব-সেক্টর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

শেখ গাউস মিয়া, *মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বাগেরহাট জেলা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

শেখ ফজলে এলাহী, *মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলা*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশাল বিভাগের ইতিহাস ২য় খণ্ড মুক্তিযুদ্ধ পর্ব*, ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল, ২য় সংস্করণ,২০১৫

সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস*, প্রকাশক: আলহাজ কাজী হারুনুর রশিদ, ঢাকা, ১৯৮৫

সিরাজ উদ্দিন সাথী, *মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী: কিছুস্মৃতি কিছুকথা*, প্রকাশক, সেলিনা সিরাজ পপী, নরসিংদী, ১৯৯২

সিরাজউদ্দিন সাথী, *মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, সেলিনা সিরাজ পপি, নরসিংদী, ১৯৯২

সুকুমার বিশ্বাস, নূরুল ইসলাম মনজুর (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা ও খুলনা অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৫

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪

সোহেল মাজহার, *ময়মনসিংহ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৩

স্বরোচিষ সরকার, *বাগেরহাটে মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৬

হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *একাত্তরের রণাঙ্গণ: শিবপুর*, সংহতি, ঢাকা, ২০১৬

হুমায়ূন রহমান, *পিরোজপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, আপন প্রকাশ, ২০১৪

বিভিন্ন বাহিনী বিষয়ক

এস. আই. এম. নূরুন্নবী খান বীরবিক্রম (লে. কর্নেল), *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

এস. এ. কালাম, *'৭১ জাগ্রত বাংলা*, হাজেরা খানম, ময়মনসিংহ, ২০০১

খান চমন-ই-এলাহি, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী*, সাহিত্যদেশ, ঢাকা, ২০১২,

জাহিদ রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনী শত যোদ্ধার স্মৃতিকথা*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

মুজিবুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে হেমায়েত বাহিনী*, মুক্তদেশ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

মো. মাহবুবর রহমান ও মীর ফেরদৌস হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩

মোহাম্মদ মোদাব্বের হোসেন, *মুক্তিসংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আফছার ব্যাটালিয়ান*, প্রকাশক: হাবীবুর রহমান, আজাদ প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৯৭৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আফছার ব্যাটালিয়ান*, আজাদ প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৯৭২

সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯,

যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য

অজয় রায়, *বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন ১৯৪৭-৭১*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

আখতারুজ্জামান মন্ডল, *১৯৭১: উত্তর-রণাঙ্গনে বিজয়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

আতিউর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

আতিক হেলাল (সম্পা.), *মেজর জলিল রচনাবলী*, কমল কুঁড়ি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬

আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, চার খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১

আবু সাইয়িদ, *গেরিলা যোদ্ধা: ইতিহাসে উপেক্ষিত*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০

আব্দুর রউফ চৌধুরী, *১৯৭১ প্রথম পর্ব*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

আহমদ ছফা, *বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১

আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল* ১৯৪৭-২০০০, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

এ এম এস সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও রণাঙ্গন*, স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

এ কে খন্দকার, *১৯৭১: ভেতরে বাইরে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ২০১৪

এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার, *বাংলাদেশ নির্বাচন: জাতীয় সংসদ-সিটি কর্পোরেশন-উপজেলা-পৌরসভা-ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪-২০০৬)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬

এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ একটি রক্তাক্ত দলিল*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫

কামরুল হাসান ভূঁইয়া (সম্পা.), *জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

কামরুল হাসান ভূঁইয়া (সম্পা.), *স্বাধীনতা, তৃতীয় খণ্ড*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১

কামরুল হাসান ভূঁইয়া (সম্পা.), *স্বাধীনতা, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২

কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮

কে এম সফিউল্লাহ্ বীর উত্তম (মেজর জেনারেল অব.), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

জাকির হোসেন রাজু, *গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ*, দিবা প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৩

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *বাঙালীর আত্মপরিচয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১

জে. এফ. আর. জেকব (লে. জেনারেল), *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা একটি জাতির জন্ম*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে ৪নং সেক্টর ও মেজর জেনারেল (অব.), সি আর দত্ত বীরউত্তম*, সমুদ্র প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০০

তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী (পিএসসি, লে. কর্নেল), *মাইনর টাইগার্স ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬

মঈনুল হাসান, *মূলধারা: ৭১*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৪

মতিউর রহমান (সম্পা.), *একাত্তরের বীরযোদ্ধা: খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬

মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে (সম্পা.), *গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে, প্রথম* ও দ্বিতীয় খণ্ড, মাহফুজ শফিক, ঢাকা, ২০০৯

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০

মুনতাসীর মামুন, *ভিনদেশিদের মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশি জেনারেলদের মন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ এক*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১০

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥ দুই*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৯

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩নং সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৯০*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

মুনতাসীর মামুন ও মো. মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি ৩*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৭

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৪

মেসবাহ কামাল, *শ্রেণী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, কপোতাক্ষ, ঢাকা, ১৯৭৪

মো. শাহজাহান কবির (সম্পা.), *একাত্তরের খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বীরগাঁথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে: এ টেল অব মিলিয়নস*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি, মেজর), *বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি,মেজর), *মুক্তিযুদ্ধে রণকৌশল*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৮

রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম (মেজর), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮১

রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৭১*, প্রকাশক: নাজমহল, ঢাকা, ১৯৯১

শাহরিয়ার কবির, *মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশ: মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

৬. বাংলা প্রবন্ধ

আখতারুজ্জাহান, ‘মুক্তিযুদ্ধে বাতেন বাহিনী’, অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা), বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (চতুর্থ পর্ব), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

আফসান চৌধুরী, ‘মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস স্বাধীন বাংলা পত্রপত্রিকা’, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ডিসেম্বর ১৯৮৮

আবু বকর সিদ্দিক, ‘একটি স্বস্তিকর মৃত্যুসংবাদ ও অবরুদ্ধ যুদ্ধদশা’, *শৈলী*, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৮

আমিনুর রহমান সুলতান, ‘মুক্তিযুদ্ধে আফসার বাহিনী’, অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড (প্রথম পর্ব), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২

মোছা. খোদেজা খাতুন, ‘মুক্তিযুদ্ধে মাগুরার আকবর বাহিনী’, *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৩১-৩২, ২০০৮-০৯

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, ‘বরিশাল অঞ্চলে হেমায়েত বাহিনী গঠন ও তৎপরতা’, অধ্যাপক অজয় রায় ও

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, (দ্বিতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

সুস্মিতা রানী দাস, 'মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় বাহিনী বা ১৪নং সেক্টরঃ একটি কেস স্টাডি-পলাশডাঙ্গা যুবশিবির', মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবর রহমান (সম্পা), *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ* ২, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৩৭

৭. ইংরেজি গ্রন্থ

Arora, J.S.B., *War with Pakistan,* Army Publisher, 1971

Ahmed Iftikhar, *Pakistan General Election 1970,* South Asian Institute, Lahore, 1979

Ahmed Iftikhar, *Report on General Election Pakistan 1970-71,* Election Commission, Karachi, 1972

Ali, Shawkat (Col.), *Armed Quest for Independence: State Vs. Sheikh Mujibur Rahman and others (Agartala Case),* Agamee Prokashani, Dhaka, 2001

Ayoob, Mohammad, *From Martial Law to Bangladesh: The Challenge of Bangladesh,* Popular Prakashan, Bombay, 1971

Baxter, Craig, *Bangladesh: A New Nation in an Old Setting,* Westview Press, Boulder, 1984

Chandra, P.,1971 *Bloodbath in Bangladesh,* Pakistan, Bangladesh, Odijk Sjaloom, 1971

Gupta, Joyti Sen, *Bangladesh in Blood and Tear,* Naya Prokash, Calutta, 1981

Hossain, Kamal, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice,* University Press Ltd., Dhaka, 2013

Jacob, J. F. R. (Lt. Gen.), *Surrender at Dacca Birth of a Nation,* University Press Ltd., Dhaka, 1997

Lachman Singh, *Indian Swors Strikes in East Pakistan*, Vikash Publishing House (pvt) Ltd, Gaziabad, UP, India, 2nd Impression,1980

Mao Tse-tung, *Selected Works of Mao Tse-tung*, Foreign Languages Press, Peking, 1975

Mamoon, Muntassir, *The Vanquished Generals and the Liberation War of Bangladesh,* Somoy Prokashan, Dhaka, 2000

Priesland Davis, *The Red Flag: A History of the Communism*, New Grove Press, New York, 2009

Quazi Nooruzzaman, *A Sector Kommander Remembers Bangladesh War 1971*, writers. Ink, Dhaka, 2016

Raghavan, Srinath, *1971 A Global History of the Creation of Bangladesh,* Harvard University Press, Boston, 2013

Safiullah, K.M. Bir Uttam (Maj. Gen.), *Bangladesh At War,* Academic Publishers, Dhaka, 1989

Sethi, S.S., *The Decisive War: Emergence of a New Nation,* Sagar Publications, New Delhi, 1972

Shahi, Shyam Singh, *The Decisive War: Emergance of a New Nation,* Sagar Publishers, New Delhi, 1972

Zaheer, Hasan, *The Separation of East Pakistan,* University Press Ltd., Dhaka, 2000

৮. পিএইচ.ডি. ও এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

সৈয়দ মো. শাহান শাহ্, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী (১৯৪৭,১৯৭১)*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০৫, পৃ. ৫৮

Md. Sarwar Hossain, *Liberation War of Bangladesh,1971 (A Study on the Armed Struggle: 25 March to 16 December*, Ph.D Thesis, Dept. of History, University of Dhaka, 2016, p. 194

৯. কোষ গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ১২ *খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০১৩

সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, অনলাইন সংস্করণ।

১০. মানচিত্র

মোনায়েম সরকার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র ইতিহাস*, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, ২০১০

১১. সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৫ মে ২০১৮ সকাল ১১.৩০ মি.

আজিজুর রহমান, পিতাঃ ওসমান আলী, গ্রামঃ কর্ত্তিমারী, উপজেলাঃ রৌমারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৭টা

আবুল হাশেম, পিতাঃ আব্দুল হালিম সরকার, গ্রামঃ কর্ত্তিমারী, উপজেলাঃ রৌমারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৮টা

আবুল হোসেন মিয়া, গ্রামঃ টুপিপাড়া, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১১টা

আব্দুল আজিজ, পিতাঃ হাজী আব্দুল জব্বার, গ্রামঃ সবুজবাগ, পোস্ট ও উপজেলাঃ রাজিবপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৪ অক্টোবর ২০১৫, সকাল ১২টা

আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, ২০/৩০ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধ্যা ৮টা

আমীর হোসেন, পিতাঃ আব্দুল মজিদ, গ্রামঃ সাঁসড়া, উপজেলাঃ বোরহানউদ্দিন, জেলাঃ ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ৫ আগস্ট ২০২০, সকাল ১১টা

আলী খাজা এম. এ. মজিদ, গ্রামঃ ঝিকরা, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ সার্কিট হাউজ চত্ত্বর, রাজশাহী, ১৩ জুলাই ২০১৯, বেলা ১২টা

আসমত আলী মিয়া, পিতাঃ ইসমাইল মিয়া, ইউনিয়নঃ সাছড়া, উপজেলাঃ বোরহানউদ্দিন, জেলাঃ ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ হোটেল দ্বীপ কন্যা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা, ৪ আগস্ট ২০২০, সন্ধ্যা ৬ টা

এম আফজাল হুসাইন যুদ্ধকালীন কমান্ডার, হয়লাতলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ আই ই বি মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা, ১০ এপ্রিল ২০১৯, বিকাল ৫টা

এমদাদুর রহমান, গ্রামঃ কয়সা, উপজেলাঃ আত্রাই, জেলাঃ নওগাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ শুটকিগাছা বাজার, আত্রাই, ১২ জুলাই ২০১৯, সকাল ১১টা

এস কে মজিদ মুকুল বীর প্রতীক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২০ অক্টোবর ২০১৫, সন্ধ্যা ৬টা

ওহিদুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, মুক্তির মোড়, নওগাঁ, ১১ জুলাই ২০১৯, সকাল ১০টা

কাজী আব্দুল জব্বার, পিতাঃ কাজী আব্দুল করিম, বাড়িঃ নতুন বাজার, ভোলা সদর, ভোলা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ ওয়েলকাম মিষ্টান ভাণ্ডার, নতুন বাজার (২য় ব্রিজ সংলগ্ন), ভোলা সদর, ভোলা, ২৬ আগস্ট ২০২০, সকাল ১১টা

খন্দকার আব্দুল বাতেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ন্যাম ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ২০১৮, বিকাল ৫ টা

গোলাম রাব্বানী, পিতা: ছেরাজ উদ্দিন আহমেদ, ১৭/১৭, মিশন রোড, চাঁদপুর সদর (৩৬০০), চাঁদপুর; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শাহবাগ, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৭, বিকাল ৫টা

জহিরুল হক পাঠান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নার্গিস ভিলা, ৫৯ রজ্জব আলী সরদার রোড, পূর্ব জুড়াইন, কদমতলী, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০১৭ বিকাল ৪.৩০ মি.

জয়দুল হোসেন (লেখক: *মুক্তিযুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া*), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: হেরিটেজ আর্কাইভ্স, কাজলা, রাজশাহী, ১৫ জুন ২০১৯ বিকাল ৫টা

তোবারক হোসেন লুডু, গ্রাম: পারিল, উপজেলা: সিঙ্গাইর, জেলা: মানিকগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল অফিস, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ, ৭ জুলাই, ২০১৭, বিকাল ৪টা

নজরুল ইসলাম লাল, আপুড়াগাছিয়া, তাফালবাড়ি, শরণখোলা, বাগেরহাট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ নিজ বাড়ি, ২৬ মার্চ ২০১৯ বিকাল ৪.৩০মি.

ভূঁইয়া মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও সময়: ১৩/৫ আওরঙ্গজের রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১১টা

মফিজুল ইসলাম খান কামাল, দাশড়া, মানিকগঞ্জ শহর, মানিকগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ৭ জুলাই ২০১৭, দুপুর ১২টা

মহিউদ্দিন মানিক বীর প্রতীক, সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি (বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল শাখার বিপরীতে), বগুড়া রোড, সদর, বরিশাল, ২০ আগস্ট ২০২০, বেলা ১১টা

মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, বি এল এফ কমান্ডার, নোয়াখালী জেলা ও সাবেক সাংসদ, নোয়াখালী,১০ আসন (বর্তমানে নোয়াখালী,৩), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নোয়াখালী জেলা সমিতি কার্যালয়, রূপায়ন তাজ (লেভেল ৬), ১/১, নয়া পল্টন, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬, সন্ধ্যা ৬টা

মিহির দাশগুপ্ত (সাক্ষাৎকার অন্তর্গত: মুহাম্মদ লুৎফুল হক (সম্পা.), বরিশাল, ১৯৭১: অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬)

মীর শামসুল আলম শাহজাদা, গ্রাম: কোনড়া, উপজেলা: নাগরপুর, জেলা: টাঙ্গাইল, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস, নাগরপুর, ৭ ডিসেম্বর ২০১৬, বিকাল ৩.৩০ মি.

মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ডেপুটি ডিরেক্টর (তদন্ত), আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিচার আদালত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: ডেপুটি ডিরেক্টর (তদন্ত) এর অফিস, ধানমন্ডি, ১১/এ, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকাল ৫টা

মুজিবল হক, সাবেক ডেপুটি কমান্ডার, কোটালীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, কোটালীপাড়া, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকাল ৪টা

Dhaka University Institutional Repository

মো. আব্দুল মজিদ মধু, পিতা: বাইনুদ্দীন সরকার, গ্রাম: উপজেলা চত্ত্বর, উপজেলা: রৌমারী, জেলা: কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২২ অক্টোবর ২০১৫, সকাল ১০টা

মো. কাজিম উদ্দিন আহমেদ, পিতা: আফসার উদ্দিন আহমেদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ী, ১১ জুন ২০১৮, বিকাল ৫টা

মো. জামাল উদ্দিন খান, খুর্দ্দ, ভালুকা, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: খুর্দ্দ বাজার, ১১ জুন ২০১৮, সন্ধ্যা ৮টা

মো. নাসিমুজ্জাম, গ্রাম: টুপিপাড়া, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১০টা

মো. ফজলুল ওয়াহাব, অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১২ জুন ২০১৮, সন্ধ্যা ৭.৩০ মি.

মোল্লা নবুয়ত আলী, গ্রাম: বরিশাট, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬, সকাল ১০টা

রুহুল আমিন বীর বিক্রম, পিতা: রহমত উল্লাহ আমিন, গ্রাম: দেউটি, ইউনিয়ন: জয়াগ, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, দেউটি, ১৩ অক্টোবর ২০১৬, রাত ৮টা

শাহ আলম, পিতা: মো. আব্দুল হাই, ২২/৬, ঢাকেশ্বরী রোড, পলাশী, লালবাগ, ঢাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫, বিকাল ৪টা

শাহজাহান মিয়া (সাংবাদিক এবং যুদ্ধকালে আফসার বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক মুক্তিযোদ্ধা), পিতা: আলহাজ্ব আব্দুল আউয়াল, ১০২/৬, মেজর ভিটা, ভালুকা পৌরসভা, ভালুকা, ময়মনসিংহ; সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: রোজ গার্ডেনব হোটেল (আবাসিক), মগবাজার, ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, রাত ৮টা

শেখ আব্দুর রহিম, পিতা: শেখ মোহাম্মদ আলী, গ্রাম: কালিয়া হরিপুর, ইউনিয়ন: ৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: পলাশডাঙ্গা যুবশিবির কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১২টা

শেখ সামছুর রহমান, যুদ্ধকালীন কমান্ডার, সুন্দরবন সাব,সেক্টর: সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, শরণখোলা, বাগেরহাট, ২৬ মার্চ ২০১৯, দুপুর ১২টা

সামছুল হক, পিতা: সুলতান মিয়া পাটোয়ারী, গ্রাম: উলুপাড়া, ইউনিয়ন: জয়াগ, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৩ অক্টোবর ২০১৬, বিকাল ৪টা

সিদ্দিকুর রহমান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: বাড়ি,৩, লেন,২, রোড নং,১০, ব্লক,সি, সেকশন,১১, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা, ৬ আগস্ট ২০২০, বিকাল ৫টা।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মনিরুল ইসলাম ছিন্টু (বুলেট ছিন্টু), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কার্যালয়, গৌরনদী, বরিশাল, ৬ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকাল ৪টা

সোহরাব আলী সরকার, পিতাঃ রজব আলী সরকার, গ্রামঃ কালিয়া হরিপুর, ইউনিয়নঃ ৯ নং কালিয়া হরিপুর ইউনিয়ন, উপজেলাঃ সিরাজগঞ্জ সদর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ পলাশডাঙ্গা যুবশিবির কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫, সকাল ১০টা

হাজী (অব.) ক্যাপ্টেন আফতাব আলী, পিতাঃ মো. ইদ্রীস আলী, গ্রামঃ ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ, উপজেলাঃ গোলাপগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৫ অক্টোবর ২০১৫, বিকাল ৫টা

হাজী মো. সোলায়মান সরকার, পিতাঃ আলহাজ্ব মো. বসারত আলী সরকার, গ্রামঃ শঙ্কর মাধবপুর, ইউনিয়নঃ কোদালকাঠি, উপজেলাঃ রাজিবপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২০ অক্টোবর ২০১৫, বিকাল ৩.২৫ মি.

হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ডেপুটি কমান্ডার (বর্তমান), উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, শরণখোলা, বাগেরহাট, সাক্ষাৎকার গ্রহনের স্থান ও তারিখঃ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন, শরণখোলা, ২৬ মার্চ, ২০১৯, দুপুর ১২টা